

Barcode - 4990010055251
Title - Bangla Upanyaser Kalantar Ed.1st
Subject - LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE
Author - Bandhopadhyay,Saroj
Language - bengali
Pages - 358
Publication Year - 1961
Creator - Fast DLI Downloader
<https://github.com/cancerian0684/dli-downloader>
Barcode EAN.UCC-13



বাংলা উপন্যাসের লীলাভূমি

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়



নতুন সাহিত্য ভবন

কলিকাতা-২০

প্রকাশক
সুশীলকুমার সিংহ
নতুন সাহিত্য ভবন
৩ শঙ্কুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট
কলিকাতা-২০

মুদ্রক
দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ
২৮ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯
অঙ্কসজ্জা
পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৬৮

দাম নয় টাকা

বন্ধুবর অনিলকুমার সিংহের ঐকান্তিক উৎসাহে অবশেষে 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' প্রকাশিত হল। স্বদেশ এবং জীবন সম্বন্ধে আগ্রহ উপন্যাস-পাঠকের রসপিপাসার বিশিষ্ট ধর্ম। সেই আগ্রহ নিয়ে একজন পাঠক যদি বাংলা উপন্যাসের শক্তি ও দৌর্বল্য, সৌন্দর্য এবং অসঙ্গতি অনুধাবন করতে চান তা হলে এই গ্রন্থ তাঁর কিছুটা সহায়তা করুক—বর্তমান গ্রন্থকারের উচ্চাভিলাষ এর বেশি কিছু নয়।

বন্ধুবর অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত নানাভাবে এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের গ্রন্থ-ভাণ্ডার যথেষ্ট ব্যবহার করেছি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমত্যে পৌঁছতে না পেরে তাঁদের বিরক্ত করেছি, বই যথা সময়ে ফেরত দিইনি। কিন্তু তাঁরা সমস্তই হাসি মুখে সহ্য করেছেন। আমার সান্ত্বনা শুধু এই যে এগুলি আমাকে ভালবাসার প্রমাণ নয়, আদর্শবান সাহিত্য-প্রেমেরই নিদর্শন। যে-কোনো ব্যক্তির বেলাতেই তাঁরা এরকম করতেন। সুতরাং কৃতজ্ঞতার প্রগ্ন এখানে বোধ হয় অনাবশ্যক।

বন্ধুবর অনন্ত চক্রবর্তী ও সুবীর রায়চৌধুরী নানা মূল্যবান আলাপনে আমাকে চিন্তায় সহায়তা করেছেন। সুবীরবাবুর বহু ছঁশিয়ারী যথাসময়ে নানা দিক বাঁচিয়েছে। গ্রন্থের নামকরণের জ্ঞাও আমি তাঁর কাছে ধণী।

আমার স্নেহভাজন ছাত্রী শ্রীমতী ইরা রায় বিশেষ যত্নেব সঙ্গে গ্রন্থটির নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করে দিয়েছেন। তাঁকে আমার আশীর্বাদ জানালাম।

শ୍ରীযୁକ୍ତ নରେନ୍ଦ୍ରনাথ দାশগুপ୍ତ
বঙ্কুবরেষু—

সূচীপত্র

উপন্যাসের শিল্পরূপের বৈশিষ্ট্য ৯ । উপন্যাসে বিষয়বস্তুর তাৎপর্য ৩৭ ।
উপন্যাসের ভাবারীতি ৫৭ । বাংলা উপন্যাসের জন্মলয়—আলোচনের ধরনের
দুলাল ৭৪ । বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলা উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা ১০২ । রবীন্দ্রনাথ
ও বাংলা উপন্যাসের নবনিরীক্ষা ১৫৮ । শরৎচন্দ্র ও উপন্যাসিকের দ্বিধা ২২৮ ।
জগদীশ গুপ্ত ও শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া ২৬৬ । তিরিশের যুগ : বাংলা
উপন্যাসের দ্বিধামুক্তি ২৮০ । উদ্ভাস্ত বর্তমান এবং বাংলা উপন্যাস ৩৪১



উপন্যাসের শিল্পরূপের বৈশিষ্ট্য

•• এক ••

ইতিহাস বিচারে যাকে আধুনিক কাল বলা হয় সে-কালের সাহিত্যকর্মের প্রধান এবং শক্তিশালী শাখা হল উপন্যাস—একথা সমালোচকদের দৌলতে আমাদের জ্ঞাত। সে কারণেই উপন্যাসের বিচারকার্যের প্রারম্ভে এবং সমগ্রভাবে উপন্যাস সংক্রান্ত কোনো আলোচনার উপক্রমণিকায় আধুনিক কাল-লক্ষণ ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। বাংলা উপন্যাস সংক্রান্ত বর্তমান গ্রন্থেও সে আলোচনা যথোপযুক্ত সময়ে হবে। আপাতত আমাদের আলোচনা এ প্রবন্ধের শিরোনামাকে লঙ্ঘন করবে না। উপন্যাসের শিল্পরূপের বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হবার পর বাংলা উপন্যাস আলোচনাকালে কাল-লক্ষণ বিচার প্রাসঙ্গিক হবে।

এ আলোচনায় প্রথমেই একটি অপরিহার্য প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। উপন্যাস সত্যিই একটা নির্দিষ্ট শিল্পরূপ বা art-form কিনা? একথা আমরা জানি যে উপন্যাস ছোট গল্প নয়, কবিতা নয়, নাটক নয়। কিন্তু এ তো মাত্র নেতিবাচক পরিচিতি। যে দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা একটা সনেটকে বলি সনেট, ছোট গল্পকে বলি ছোট গল্প বা নাটককে বলি নাটক, উপন্যাসের বেলায় সে ধরনের কোনো স্থনির্দিষ্ট এবং অব্যর্থ সংজ্ঞা বেঁধে দেওয়া যায় কি না এ বিষয়ে সংশয়ের কিছু অবকাশ আছে। Tristram Shandy, Moby Dick এবং Sign of Four, আবার এদিকে Magic Mountain এবং Ulysses—এর সবগুলিই উপন্যাস বলে অভিহিত। অথচ আমরা জানি যে মবি ডিক-কে সার্থক উপন্যাস আখ্যা দিলে আর ইউলিসিস-কে সে আখ্যাদানের যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে না। আবার সাইন অব ফোর-কে উপন্যাস আখ্যা দিলে ম্যাজিক মাউন্টেন-এর

জ্ঞাত্য কোন সংজ্ঞার সন্ধান করব তা স্থির করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। এক সময় মোপাসাঁর কোনো উপন্যাসকে কোনো সমালোচক রচনা হিসেবে রসোত্তীর্ণ বলেও উপন্যাস হিসেবে সার্থক বলতে স্বীকৃত হননি। মোপাসাঁ তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে প্রায় কুড়িখানি উপন্যাসের একটি তালিকা উপস্থিত করেন। উক্ত তালিকাভুক্ত উপন্যাসগুলির একটির সঙ্গে আর একটির এতই পার্থক্য যে একটিকে উপন্যাস বললে আরগুলিকে উপন্যাস বলা যায় না। মোপাসাঁরও প্রশ্ন ছিল এই যে, সার্থক উপন্যাস তাহলে কাকে বলব ?

পাঠকের দিক থেকে বিবেচনা করলে এর একটা প্রাথমিক উত্তর মেলে। আমরা যে-বাসনা নিয়ে নাটক দেখতে যাই, অথবা যে-আবেগ নিয়ে একটি কবিতা পড়ি সেই বাসনা এবং আবেগকে আমরা যেমন চিনি এবং জানি উপন্যাসের কাছে আমাদের প্রত্যাশাকে তেমন করে আমরা জানি চিনি কিনা এর ওপরেই সার্থক উপন্যাস বলতে সঠিকভাবে আমরা কী বুঝি তার উত্তর নির্ভর করবে। নাটকে জীবনের ব্যাখ্যাকে আমরা হৃদযন্তু কবি দৃশ্যের মাধ্যমে। নাটক দৃশ্য-মাধ্যমী জীবন-ব্যাখ্যা। যেহেতু নাটকের প্রাথমিক আবেদন প্রত্যক্ষভাবে আমাদের শ্রুতির কাছে এবং দৃষ্টির কাছে তাই সংক্ষিপ্ত নাটকের মূল লক্ষ্যের অন্ততম। এই সংক্ষিপ্তকে শিল্পোজ্জ্বল করতে গিয়ে নাট্যকার জীবন থেকে ঘটনা এবং চরিত্রকে নাটকের মতো করে, নাট্যকারের মনোভাব নিয়ে নির্বাচন করেন। ঘটনার এবং চরিত্রের স্ব-স্ব অথবা পরস্পর দ্বন্দ্ব নাটকের অনিবার্য বিষয়। নাট্যকারের এই বিষয়-বৈশিষ্ট্যের কাঠিন্য নাট্যশৃঙ্খলের একটি প্রধান নির্দেশের ভিত্তি-নির্ভর। সেটা হল সময়ের অতিপাত। সময়ের অতিপাত বা passage of time নাটকের প্রধান কথা। এই সময়ের অতিপাতকে নাটকে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার না করলে অতি বিশিষ্ট চরিত্র-কল্পনাও হানিগ্রস্ত হয়। সময়ের অতিপাতের বাস্তব-নিষ্ঠ প্রতিফলনের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত objective co-relative-এর। এলিয়ট সাহেব তাঁর বিখ্যাত হামলেট-বিষয়ক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে উপযুক্ত objective co-relative-এর অভাবে হামলেট চরিত্র স্থিতিধর্মী হয়ে পড়েছে। পটোত্তলনের পর যে বিন্দু থেকে ঘটনার যাত্রা যবনিকাপাতের সময় সেই বিন্দু থেকে ঘটনাকে অনেকখানি এগিয়ে আসতে হবে। না হলে নাটকের প্রথম ও প্রধান শর্তই লঙ্ঘিত হয়।

অথচ আমরা জানি যে উপন্যাসে এ রকম কোনো কঠিন নিয়ম নেই। Passage of time বা সময়ের অতিপাত উপন্যাসের পক্ষে একটা প্রধান কথা হতেও

পারে, আবার নাও পারে। ওঅর অ্যাণ্ড পীস-এ অবশ্যই সময়ের অতিপাতের ব্যবহার ঘটেছে। কিন্তু ইউলিসিস্-এর উপন্যাস-মহিমা নিশ্চয় সময়ের অতিপাতের ওপর নির্ভরশীল নয়। সময়ের পরম্পরাও এ উপন্যাসে রক্ষিত হওয়া আবশ্যক নয়।

সে কারণেই মনে হয় যে নাটকের জন্ত যে ধরনের নাটকীয় অনুভূতি প্রয়োজন, কবিতার জন্ত যে-রকম কাব্যিক অনুভূতির দরকার উপন্যাসের জন্ত সে-ধরনের কোনো স্বতন্ত্র অনুভূতির আবশ্যক নেই। স্রষ্টা এবং ভোক্তা উভয়েই এখানে কাব্য এবং নাটকের চেয়ে বৃহত্তর প্রাপ্তরে উপস্থিত। এবং এটাই উপন্যাসের শিল্পরূপকে উপলব্ধি করার গোড়ার কথা। এখানে একটা পুরনো কথা আমাদের স্মরণে আসতে পারে যে, উপন্যাসকার কবি এবং নাট্যকার অপেক্ষা স্বাধীন। কথাটির মধ্যে যেন একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে যে, কাব্য এবং নাটকে যে সাংগঠনিক কাঠিগু বিদ্যমান, যে আঙ্গিকগত অনুশাসন উপস্থিত, উপন্যাসিক তা থেকে মুক্ত বলে তিনি অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থানের অধিকারী। অথচ এ অনুমান একেবারেই মিথ্যা। বরঞ্চ পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে এই ‘স্বাধীনতাই’ উপন্যাসকারের দুর্লভ সমস্তার স্থল।

নাট্যকারকে শুধু নাটক জানলেই চলে, কবিকে শুধু কবিতা। কিন্তু উপন্যাসকার জানেন যে জীবন শুধু নাটক নয়, শুধু কবিতাও নয়। তিনি জানেন যে জীবন নাটক, কাব্য, কাহিনী এবং হয়তো আরো অনেক কিছু। তাই উপন্যাস সর্বগ্রাসী। শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার সর্বত্রচারী। সাহিত্য-শিল্পের যতগুলি শাখা সবগুলিরই, অর্থাৎ কবিতা, নাট্যরস এবং কাহিনীরস সকল কিছুই উত্তরাধিকারকে বহন করছে উপন্যাস। তাই সাহিত্য-শিল্পের আর কোনো শাখাই উপন্যাসের মতো সর্বার্থসাধক নয়। কিন্তু তাই বলে এটা উপন্যাসিকের পক্ষে কোনো সহজ উত্তরাধিকার নয়। কখন নাটকীয় দৃশ্য পরিকল্পনা কার্যকরী হবে, কখন কাব্যসিদ্ধি ঘটবে কবিত্বময় বর্ণনায় তা উপন্যাসের জটিল অভিজ্ঞতায় দীক্ষিত লেখকের পক্ষেই মাত্র জানা সম্ভব। তাই উপন্যাসিককে সর্ব-রস-সিদ্ধ হতে হয়। উপন্যাস-পাঠককেও হতে হয় সর্ব-রস-ভোক্তা। হাতে সকল শক্তির সম্বল আছে বলেই কিন্তু উপন্যাসিকের যথেষ্ট ব্যবহারের অধিকার নেই। যথাসময়ে নাটক পরিহার করে অকস্মাৎ কবিত্বময় বর্ণনার আশ্রয় গ্রহণ, অথবা যেখানে শুধু একটা বিশদ বর্ণনাতেই কাজ হতে পারত যেখানে গুরুগম্ভীর নাটকীয় দৃশ্য পরিকল্পনা কেবল যে উপন্যাসের আঙ্গিকবিদ্যাসেরই হানি ঘটায়

নয়, লেখকের বিস্ময়ভাবনাও যে কতখানি ব্যত্যয়গ্রস্ত তারও পরিচয় দেয়।
এবং এই কাব্য-রস, কাহিনী-রস, এবং নাট্য-রস সকলকেই একাধারে সম্বন্ধিত
করার যে প্রচণ্ড শক্তি উপন্যাসের অধিগত, তার মূল রয়েছে উপন্যাসের
শিল্প-মহিমার একান্ত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই। উপন্যাসের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক
সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। চন্দ্রময় চরিত্র সৃজনে সফল হলেই ভালো নাটক সৃজিত হয়।
অনুভূতিকে চিত্রকল্পময় করতে পারলেই কবিতার সাকল্য আসে। কিন্তু উপন্যাস
জীবন সম্বন্ধে সামগ্রিক বোধ সঞ্চারিত করতে না পারলে সে ব্যর্থ। জীবনের
গোটা রূপই উপন্যাসকারের ধ্যেয়। জীবনের সঙ্গে এই নিবিড় সম্পর্কের
কথা স্মরণ রেখেই উপন্যাসের শিল্পবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে হেনরি জেমস্ তাঁর
সুবিখ্যাত Art of Fiction প্রবন্ধে বলেছেন :

As people feel life, so they will feel the art that is most
closely related to it. This closeness of relation is what we
should never forget in talking of the effort of the novel.

এই closeness of relation বা জীবনের সঙ্গে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার বিচার
উপন্যাসের শিল্প-বিচারের প্রধান কথা। এবং জীবনের ঘনিষ্ঠতাব বিষয়টি স্পষ্ট
উপলব্ধির জন্যই উপন্যাসেব জন্মলগ্নের প্রসঙ্গ অপরিহার্য।

•• দুই ••

উপন্যাস যে the interpretation of human life by means of ficti-
tious narrative in prose—জনশ্রুতির দৌলতে একথা আমাদের মুখস্থ।
যে কোনো শিল্পরূপেই আঙ্গিক তাৎপর্য (significance of form) সেই
শিল্পের জীবন-ব্যাখ্যার বিশিষ্টতাব ধাবক। এখন মূল বিষয় হল এই যে উপন্যাসে
জীবন এবং জীবন-ব্যাখ্যা দুইই আমাদের কাম্য। উপন্যাসের কাছ থেকে
আমরা জীবনের সামগ্রিক রূপের সন্ধান চাই। সমাজ এবং সমাজ বিধৃত মানুষ,
পট এবং পট-নির্ভর জীবনই উপন্যাসের উপাদান। তাই শত আয়োজনেও
উপন্যাস উপন্যাস নয়, যদি না তা পূর্ণাঙ্গ জীবনবোধক হয়ে ওঠে। এই কারণেই
যখন আমরা বলি যে উপন্যাসের কোনো একক ফর্ম নেই, তখন উপন্যাসের
এই জীবন ঘনিষ্ঠতার কথা স্মরণ বেখেই তা বলি। যেহেতু জীবনের কোনো
নিদিষ্ট ফর্ম নেই সেই হেতু জীবনের এই নিকটাত্মীয় শিল্পেরও কোনো বিশেষ
ফর্ম নেই।

বস্তুত উপন্যাসের জন্মও হয়েছিল কোনো বিশেষ শিল্প-সিঁপাসা বা রূপ-(form)
জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি সাধনের জন্ত নয়। বরঞ্চ তীব্র জীবন সিঁপাসার তৃপ্তিসাধনের
জন্তই উপন্যাসের জন্ম। এবং সমস্ত উপন্যাসকেই বুঝতে হবে এই দিক
থেকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের সাহিত্যেতিহাসের অগস্টান পিরিয়ডে ইংলণ্ডের
উপন্যাস সাহিত্যের ষথার্থ উদ্বোধন হয় এক শক্তিশালী art-form বা শিল্পরূপ
হিসাবে। নিজ বিশিষ্টরূপে উপন্যাস যে এ যুগেই স্বতন্ত্র হয়ে উঠবে তাব উপযুক্ত
ঐতিহাসিক কাণণও এ যুগে উপস্থিত ছিল। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এমন
কতকগুলি সামাজিক রূপান্তর এ যুগে সংঘটিত হয়েছিল যা বিশেষ তাৎপর্য-
সূচক।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে এই যুগেই প্রথম সাধারণ মানুষের জীবনচরণকে জীবনাদর্শ
বলে স্বীকার কবে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ বলতে যে সংখ্যা-
তাত্ত্বিক হিসাবের গড়পড়তা মানুষের কথা ভাবা হয় এ সাধারণ মানুষ সেই
বর্ণহীন জনসমষ্টি নয়। এ যুগের কর্মচঞ্চল জীবন্ত ব্যক্তির কথাই এ প্রসঙ্গে
স্ববর্ণীয়। ভোট যুদ্ধে ব্যস্ত রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ে উদ্যোগী বণিক শ্রেণী,
শুভ নীতিবোধে আস্থাবান ধর্মপ্রচারক, দুঃসাহসী ভ্রমণকারী, জমিদারী নিয়ে
ব্যস্ত গ্রামীণ ভদ্রলোক, সেতু-পথ-খাল নির্মাণে অগ্রণী কারুবিদ, সামাজিক
স্বভাবসম্পন্ন মহিলা, চিকিৎসক, আইনজীবী, নাবিক, দোকানদার, সৈনিক সব
মিলিয়ে গঠিত হয়েছিল এই পাবলিক। অবশ্যই এই সাধারণ মানুষ এবং তার
কাষকলাপের কোনো পথায়ই নতুন কথা নয়। কিন্তু এই বিচিত্র-কর্ম সাধারণ
মানুষ নিজের নিজের জীবন সম্বন্ধে এ যুগে হয়ে উঠেছিল অসীম আগ্রহী। এ
যুগের লেখকেরও কাজ ছিল তাই কর্মিষ্ঠ বহুমুখী আশাশীল এই সাধারণ মানুষের
জীবনকে রূপায়িত করা।

এ যুগের এই পাবলিকই ছিল লেখকের বিস্তৃত পাঠকমণ্ডলী। তৎকালীন
প্রধান শিল্পচেষ্ঠা প্রবন্ধ, উপন্যাস এবং সামাজিক কবিতা। এই বিশিষ্ট ত্রিধার
দিকে লক্ষ্য রাখলেও বোঝা যায় কতখানি পাবলিক-সচেতন ছিলেন তখনকার
লেখক। নতুন উদ্যোগী শ্রেণীর উদয়ে পুরাতন পৃষ্ঠপোষকদের দববাবী শৃঙ্খল
ছিঁড়ে তৎকালীন লেখকদের দল এই ব্যাপক পাঠকমণ্ডলীকেই আশ্রয়
করেছিলেন। এবং সে-যুগের সাধারণ মানুষও সাহিত্যে নিজেকেই প্রতিবিম্বিত
দেখতে চাইত। তীব্র জীবনাগ্রহে এ যুগের মানুষের ব্যক্তিত্বরূপ ঘবে বাইরের

জীবন সম্বন্ধে, বিশ্ব প্রকৃতি সম্বন্ধে হয়ে উঠেছিল গভীর কৌতূহলী। জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ব্যাপারেই মানুষ আবিষ্কারের আনন্দ খুঁজে পেত। এই অসীম আগ্রহী মানুষ সাহিত্যেও পেতে চাইত নিজেকে। এ যুগের সাহিত্যাগ্রহ প্রকৃতপক্ষে জীবনাগ্রহেরই এক বিশেষ অচ্ছেদ্য অংশ ছিল। ব্যক্তির জাগরণের আলোকে এ জীবনাগ্রহের অনন্ত মূল্য। এর কারণ এই, ঘরে বাইরে ইংলণ্ডের বাণিজ্যের তখন বিস্তৃতি ঘটছে। বণিক এবং সওদাগরদের কণ্ঠে তখন সমাজের দেওয়া বরমালা। উপন্যাসের চরিত্রে নাটকের চরিত্রে তখন এঁদেরই ঘন ঘন আবির্ভাব ঘটছে। বসন্তের একটা উক্তি সমকালীন ইংলণ্ডীয় মধ্যবিত্তের প্রাণের কথা বলে বিবেচিত হয়ে থাকে :

"In this great commercial country, it is natural that a situation which produces much wealth should be considered as very respectable."

জাতীয় জীবনে এই respectability-র সাধক যারা তাঁরাই ইংলণ্ডের সেই বিখ্যাত gentleman বা ভদ্রলোক শ্রেণী। সর্বতোমুখী কর্মচঞ্চলতায় জীবনাগ্রহী এই ভদ্রলোক শ্রেণী তখন গড়ে তুলেছিলেন এক বাস্তব-উপযোগী মানবতাবাদ বা practical humanism। জাতীয় জীবনের সকল দিকেই—সাহিত্যে রাজনীতিতে দর্শনে বুদ্ধি যুক্তি (লক্ এবং হিউমের প্রভাব) এবং এই বাস্তব উপযোগী মানবতাবাদের প্রাধান্য বিস্তারের ব্যাপার এ সময়ে লক্ষ্য করা যায়। যে ভদ্রলোক শ্রেণী এই প্রাধান্যবিস্তারের শক্তিশালী মেরুদণ্ড তাদের ইতিবাচক স্বরূপটিও প্রণিধানযোগ্য। শোভন আচরণ-বিধি এবং সৌজাত্যের ধারণাই ভদ্রলোক শ্রেণীর একমাত্র পরিচয়চিহ্ন ছিল না। নীতিবাদী ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক এবং দৈহিক সাহস, মানসিক এবং শারীরিক উদ্দীপনা এবং সংস্কৃতিমনস্কতা—এক কথায় যা কিছু সমাজ প্রগতির সহায়ক সমস্তই ছিল নবধা কুল লক্ষণের মতো ভদ্রলোকের পরিচয়চিহ্ন। "A man completely qualified as well for the service and good, as for the ornament and delight, of society." এই ধরনের মানুষের উদ্দেশ্যেই অগস্টান যুগের দার্শনিক, সাহিত্যিক এবং রাজনীতিবিদ তাদের কর্মধারাকে প্রবাহিত করে তুলেছিলেন।

ইংলণ্ডের উপন্যাস সাহিত্যের বনিয়াদ দৃঢ় হয়ে ওঠে এই ভদ্রলোক শ্রেণীর ঘরে বাইরে আত্মবিস্তৃতির যুগে। আগেই বলা হয়েছে শিল্পাগ্রহ অপেক্ষা

জীবনাগ্রহই এর মূলে অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় সক্রিয় ছিল। ব্যক্তির নিজ কীর্তি সম্বন্ধে নব মূল্যবোধের উৎসে ছিল নবীন জিজ্ঞাসা।

•• তিন ••

এই জীবনাগ্রহেব জন্মই এ যুগের প্রধান ঔপন্যাসিকবৃন্দ যথা ডিফো, ফিল্ডিং, রিচার্ডসন এবং স্মলেট সকলেই তাঁদের উপন্যাসের জীবন জীবনেরই মতো প্রতীয়মান করানোর জন্য বেশি তৎপর ছিলেন। এঁরা কেউ ছিলেন ছাপাখানার মালিক, কেউ ছিলেন বা সাংবাদিক, কেউ বা অনুরূপ কিছু। সমকালের জীবনের ঘৃণবাত্যাব কেন্দ্রে ছিলেন এঁরা অধিষ্ঠিত। স্বভাবতই স্বকালীন মর্মবাণীতে এঁরাও বিশ্বাসী ছিলেন দৃঢ়ভাবে। সে মর্মবাণী হল : Follow nature অথবা Portray the world as you see it—যে বিশ্ব-সংসার দর্শন করেছ তাকেই রূপায়িত করে। একে অনুসরণ করেই Restoration Comedy জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। এ যুগের উপন্যাসে Restoration Comedy-র প্রভাব প্রকৃতপক্ষে জীবনকে যা দেখেছ ‘সে ভাবেই চিত্রিত করে।’ এই বাণীরই অনুসরণ মাত্র।

শ্রীমতী ভার্জিনিয়া উল্ফ ডিফোর উপন্যাসকে truth-teller জাতীয় উপন্যাস বলেছেন (তাঁর Phases of Fiction প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এ-কথা বলার পিছনে যে-যুক্তি তিনি প্রয়োগ করেছেন তা হল এই : এ জাতীয় উপন্যাসের প্রধান গুণ এটা আমাদের বিশ্বাসবৃত্তিকে পরিতোষণ করে। ঘটনার যে বিবরণ এ জাতীয় উপন্যাস থেকে পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে আমাদের তিল মাত্র সন্দেহ থাকে না। বর্ণিত ঘটনা যেন চোখের সামনেই ঘটছে এমন মনে হয়। “Belief is completely gratified by Defoe. Here the reader can rest himself and enter into possession of a large part of his domain. He tests it, he tries it, he feels nothing give under him or fade before him.” যে কারণের জন্য শ্রীমতী উল্ফ ডিফোর উপন্যাসের স্থান truth-teller শ্রেণীর মধ্যে নির্দেশ করেছেন অবশ্যই সেই কারণের জন্যই অপর একজন সমালোচক ডিফোর উপন্যাস-ধর্মকে narrative realism বলে আখ্যাত করেছেন। আমরা যদি ডিফো সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করতাম তা হলে একা ডিফোর প্রসঙ্গই বিশেষভাবে আলোচিত হত। কিন্তু আমরা দেখাতে চাইছি এ যুগের বাস্তব জীবনাগ্রহ। এ যুগের শিল্পাগ্রহ যে

বাস্তব জীবনাগ্রহেরই আত্মীয় এ কথাটাই উপন্যাস প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার। জামুয়েল রিচার্ডসন এ যুগের আর একজন প্রধান উপন্যাসিক। “A faithful and chaste copy of real life and manners.” ছিল রিচার্ডসনের লক্ষ্য। এ যুগের গল্পরীতিব যে-ধর্ম—খুঁটিনাটি বাস্তব ব্যাপারের তন্নিত্ত বর্ণনা প্রদান—তাকে রিচার্ডসনও যেন ডিকোর শিষ্যের মতোই অনুসরণ করেছেন।

আবার স্মল্ট এবং ফিল্ডিংও এই লক্ষ্যেই ভিন্নপন্থার পথিক। লেসলি স্টিফেন ফিল্ডিং-এর আলোচনাকালে ফিল্ডিং-এর প্রধান গুণের কথা বলতে গিয়ে তাঁর সবিশেষ বাস্তবানুগ চিত্রকন ক্ষমতাব বিষয়ে বলেছেন। এ যুগের চিত্রশিল্পী হগার্থেব মতো তিনিও তাঁর দৃষ্টিসীমার ভিতবে যা কিছু আসতো তাকেই বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে ধরতেন। (“We have the conviction that the man has given an absolutely faithful portrait of all that came within the sphere of vision.”)

আমাদের আলোচ্য যুগে—যে যুগে উপন্যাসের প্রাধান্য বিস্তারের সূচনা হয়েছিল—যে যুগে সাধারণ মানুষের কর্মধারা তথাকথিত বৃহৎ মানুষের কীর্তি অপেক্ষা সাধারণ মানুষের মনে অনেক বেশি কোতূহলের সঞ্চার করেছিল—এই বহুমুখী বিচিত্রপন্থী মানুষের জীবনই উপন্যাসের বিষয়। উপন্যাসের কাছে জীবনের থেকে বড়ো আর কিছু নেই। উপন্যাসের শিল্পরূপের যে নমনীয়তা সেটা এসেছে এই বিশুদ্ধ জীবনকে সামগ্রিকভাবে অঙ্গীভূত করার প্রয়াস থেকে। যে যুগে জীবনকে নতুনভাবে দেখা হয়, বোঝা হয় সে-যুগেই জীবনের ইতিবাচকতার পাদপীঠে উপন্যাসের নব নব ভাব, নব নব রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। এই উপলব্ধি ও দর্শনের তারতম্যের ওপর কিংবা প্রকাবভেদের ওপর নানা যুগের উপন্যাসের প্রভেদও নির্ভর করে।

যেমন ধরা যাক অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাসের তুলনামূলক পার্থক্যের কথা। অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বাস্থ্যবান সর্বদর্শী বাস্তবতা এবং ঊনিশের শতকের ভাববাদী চরিত্রায়ন ও কাব্যিক অনুভূতি শুধু অগস্টান যুগের সূক্ষ্ম জীবনাগ্রহ এবং ভিক্টোরীয় ভাববাদ বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। আসলে অষ্টাদশ শতক ছিল ইংলণ্ডের ইতিহাসে নতুন শ্রেণীর আত্মবিকাশের কাল। এ সম্বন্ধে আর্নল্ড কেটল তাঁর An Introduction to the English Novel নামক অপরিহার্য পাঠ্য পুস্তকে বলেছেন যে এ-যুগে যে নতুন বাণিজ্যিক শ্রেণীর উদ্ভব হল ঈশ্বর

নিখারিত ধর্ম, নির্জা এবং স্বাষ্ট্রবোধের কারাগারে স্বভাবতই তাঁরা আর বন্দী থাকতে চাইলেন না। স্বাধীনতাই ছিল তাঁদের মূল মন্ত্র। সেই নতুন সমাজের মাহুষের পক্ষে তখন প্রয়োজন ছিল সেই কর্মচঞ্চল সমাজের উপযোগী একটা নব্যদর্শন সৃষ্টি করা। তা তাঁরা করেছিলেন। সে-যুগের উক্ত নতুন মাহুষের দল পূর্বতন শতাব্দীর সামন্তযুগীয় কাঠামোকে ভেঙে ফেলতে চাইছিলেন নিজ অস্তিত্বরক্ষার তাগিদেই। কেননা স্বাধীনতা ছাড়া এই নতুন শ্রেণীর পক্ষে জীবনধারণ ও নানা মুখে সম্প্রসারণ ছিল অসম্ভব। স্বাধীনতা ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য, অল্পসন্ধান-আবিষ্কার কিছুই কল্পনা করা যেত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর নবোদিত বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বাধীনতা স্পৃহারই অপর নাম জীবনাগ্রহ।

কোনো প্রকার সমাজতাত্ত্বিক হবার ভান না করেই এই সহজ শিক্ষালব্ধ সত্য কথাটার আবৃত্তি করা চলে যে, ঊনবিংশ শতাব্দী জীবনবোধের ঐ দুঃসাহসিক আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। জীবনের সঙ্গে উপন্যাসের শিল্পরূপের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ বলে জীবনের স্রোত শুকিয়ে যাবার মুখোমুখি হলেই, অথবা জীবনের ভারসাম্যে কথঞ্চিৎ ব্যত্যয় ঘটলেই জীবন-স্পর্শ-প্রবণ উপন্যাস-শিল্পে তার প্রভাব অনুভূত হবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে থেকেই ইংলণ্ডের উপন্যাস-সাহিত্য সে-জাতীয় প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হল। বাণিজ্যপন্থী ভদ্রলোক এবং আত্মসচেতন ভূস্বামী অভিজাতের সুবর্ণ দিবস ততক্ষণে গত হয়েছে। শিল্পবিপ্লবের প্রচণ্ড তাড়নায় এক অতিশক্তিদ্র শিল্পপ্রভুশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটল।

এর অবশ্যস্তাবী ফল হল—যে-সামাজিক এবং জাতীয়, অথও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অষ্টাদশ শতকের প্রথমপাদে (সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে) রাজত্ব করছিল তা ভেঙে গেল। শোষিত ধ্বংসমুখী গ্রামীণ কৃষিজীবন, নবোদ্ভূত নগর, নগর-জীবনের ধনীদরিদ্রের বিপুল অসাম্য, ভারতবর্ষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে লুণ্ঠন এবং অত্যাচার আমেরিকার প্রথম গণতন্ত্রী সরকাররূপে আত্মপ্রকাশ—ঊনবিংশ শতকের প্রধান ইতিহাস সূত্র। চার্টারিস্টদের অগ্নিগর্ভ বিক্ষোভের কথা স্মরণ রাখলে ছাত্রদম্পতির মতো গত শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরকে আখ্যা দিতে হয় Bleak age বা Age of discontent.

এই অসন্তোষের যুগে এটা স্বাভাবিক যে উপন্যাস চিন্তারও মৌল পরিবর্তন দেখা যাবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর গতগত বাস্তবতার চেয়েও এ যুগের ঔপন্যাসিকদের কাছে কবিসুলভ আদর্শীকরণের ব্যাপারটা অধিকতর প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল। তাই স্কট থেকে ডিকেন্স পর্যন্ত প্রায় সকল ঔপন্যাসিকেরই poetic

idealization-এর ঝোঁক স্পষ্ট। এটাকে ইংলণ্ডের রোমান্টিক যুগের কাব্য-প্রসাদের সঙ্গে ভিক্টোরীয় যুগের বিস্তৃত মধ্যবিত্ত পাঠকসমাজের সখ্য স্থাপনের চেষ্টা বললে ভুল হবে। সামাজিক খণ্ডীভবনের সম্মুখে মীমাংসায় অক্ষম শিল্পীর আদর্শীভবনের কাব্যাত্মক গ্রহণই এর মূল কথা। স্বভাবতই আগের শতাব্দীতে বসুণ্ডয়েল যে respectability সাধনার কথা বলেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর মূল বস্তুতন্ত্রী প্রলুব্ধতার যুগে সেটা হয়ে উঠেছিল একান্তই surface respectability।

সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর গল্প-কাহিনীর মুখ্য লক্ষ্য যেখানে ছিল পাঠক জনসাধারণের বিশ্বাসবৃত্তিকে তোষণ করা, উনবিংশ শতকের গল্প-কাহিনীর মূল লক্ষ্য সেখানে দাঁড়াল পাঠকের কল্পনাকে আকৃষ্ট করা। বস্তুত বাস্তব জীবনের যে অসম্পূর্ণতার যন্ত্রণা থেকে রোমান্টিকতার জন্ম, উপন্যাসের দীর্ঘ বিস্তৃত পটে কবিত্ব অঙ্গীভূত হয়েছে সে অসম্পূর্ণতার যন্ত্রণা থেকেই। ভিক্টোরীয় যুগের আপাত-উজ্জ্বল বর্ণাবরণের অন্তরালে ছিল এই অসম্পূর্ণতাব বোপ। অবশ্যই ডিকেন্স ভিক্টোরীয় যুগের রোমান্টিকতা-বিরোধী প্রতিক্রিয়ার অন্যতম প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো শান্ত কিংবা শেলী'র মতো ঝঙ্কাঘন প্রকৃতি কখনও ডিকেন্সের মূল বিষয় ছিল না। জনাকীর্ণ লণ্ডন শহরের বিভিন্ন পরিবেশ, লণ্ডন শহরের অলিগলি, তাব নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের নানান চিত্র ও এই রকম নানা ধবনের অসংখ্য খুঁটিনাটি ডিকেন্সকে আকৃষ্ট করেছে বেশি। লণ্ডন শহরের এই নতুন চেহারাকে সমগ্রভাবে ধরার চেষ্টাই ডিকেন্সের চেষ্টা। উপন্যাসের অনাসক্ত হাস্যরস-দৃষ্টি ডিকেন্সের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এবণ্ড মূলে সক্রিয় হয়ে রয়েছে তাঁর সর্বগামী অনুভূতির সর্বৈব বিকাশ। সাধারণ ছোট মানুষের জীবনের নাটক এবং প্রাণশক্তিকে আবিষ্কার করা, আত্মসম্মিলন ঐহিকতাবাদকে আঘাত হানা ডিকেন্সের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই দিক দিয়ে ডিকেন্স প্রকৃতপক্ষে এ-যুগের আত্মাকে অনুসন্ধান করেছিলেন। ডিকেন্সের কথা কিন্তু কখনই সমাপ্ত হবে না যতক্ষণ না আমরা ডিকেন্সের শিল্প প্রচেষ্টার প্রতিটি অংশের প্রাণ-স্পন্দনশীল কবিত্বের আভাটুকুর কথা বলছি। স্বভাবতই এ কবিত্ব রোমান্টিক যুগের প্রসাদসম্পন্ন নয় বরঞ্চ এ কবিত্বকে আত্মীয়তার দিক থেকে এলিজাবেথানদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এ-কথা বলা যায়। Poetic fantasy-র ব্যবহারে স্বচ্ছ হাস্যরসের প্রয়োগে ডিকেন্সের কবি প্রতিভা তাঁর উপন্যাসকে অনন্ত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকেরা Bleak House

উপন্যাসের কুয়াশা বর্ণনার কথা উল্লেখ করে থাকেন। আসলে ডিকেন্সের কবিত্ব উপন্যাস-অতিরিক্ত কোনো ব্যাপার নয় বরঞ্চ বলা যেতে পারে সমগ্র উপন্যাসের আত্মাতেই এই কাব্যশ্রীর অধিষ্ঠান।

শুধু ডিকেন্স নয় ভিক্টোরীয় যুগের আর একজন প্রধান শিল্পী জর্জ ইলিয়টের ক্ষেত্রেও এই কবি কল্পনার প্রশ্ন ওঠে। জর্জ ইলিয়টকেই বলা যেতে পারে যে আপাদমস্তক ভিক্টোরীয় যুক্তিবাদের দ্বারা দীপ্ত হয়ে তিনি তাঁর সমগ্র উপন্যাসের পবিমণ্ডলে একটি মননশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যবহার করেছেন। জর্জ ইলিয়টের চরিত্রগুলি আমাদের বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্য কেবল বহিরঙ্গ বিবরণের যথার্থতাকে বহন করার কাজেই ব্যবহৃত হয় না। “Her portraits are all primarily portraits of the innerman”—এই innerman-কে অনুসন্ধান করার জন্যই জর্জ ইলিয়ট পূর্ববর্তী শতাব্দীর তুলনায়, এবং তাঁর ভিক্টোরীয় পূর্ব-সৃষ্টীদের অপেক্ষা জটিলতর চরিত্রকে অঙ্কন করার ব্যাপারে অধিক পারদর্শিতার এবং প্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন। ডিকেন্সের ন্যায় অথবা অনুরূপ আর কারো মতো বাইবের মানুষটাকে নিয়ে জর্জ ইলিয়টের কারবার ছিল না।

জেন অস্টেন, ডিকেন্স এবং জর্জ ইলিয়টের প্রয়াসের কথা স্মরণে রেখেও এ-কথা বলা চলে যে অষ্টাদশ শতকের উপন্যাসে গৌরবমহিমা চ্যানেলের অপর পারেই বরঞ্চ অধিষ্ঠিত ছিল। ইংলণ্ডকে অপেক্ষা করতে হয়েছে হেনরি জেমস কন্রাডের লেখনী ধারণ পশ্চত, তবে সে আবার হতে পেরেছে উপন্যাসের ক্ষেত্রে স্বর্ণপ্রসঙ্গ। উনবিংশ শতকের উপন্যাসের আদর্শ পুরুষ বালজাক, স্তাঁদাল এবং নিঃসন্দেহে অনেকখানিই টলস্টয়। হয়তো এ প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যমহিমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ভিক্টোরীয় আপাতসমৃদ্ধি এবং surface respectability-র কথা উত্থাপিত হতে পারে, এবং চ্যানেলের ওপারে কিংবা কন্টিনেন্টের শেষপ্রান্তে জীবনের এবং সমাজের সর্বস্তরে ইতিহাসের যে নির্মম টানাপোড়েন চলছিল তার কথাও স্তাঁদাল এবং টলস্টয় প্রসঙ্গে আলোচিত হতে পারে—বলা যেতে পারে যে সমাজ এবং সভ্যতার ময়ালমহুর জরদার মতি স্বভাবতই উপন্যাস শিল্পীকে অলস করে তোলে, স্বভাবতই সে অবস্থায় পাঠকের কল্পনাবৃত্তিকে তোষণ করার জন্য উপন্যাসের স্বাভাবিক বিকাশ অপেক্ষা ঔপন্যাসিককে কবিত্বাভিমুখী হতে হয়। এবং এ কবিত্ব লালন করার জন্যই অনেক সময় উপন্যাসের চরিত্রকে উপন্যাসের পূর্বনির্দিষ্ট প্লটের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। হার্ডি সম্বন্ধে ফর্স্টার সাহেবের অভিযোগ-বাণীটিও এ প্রসঙ্গেই স্মরণ করা

চলতে পারে।

কিন্তু আমরা জানি যে এ ধরনের সমাজতাত্ত্বিক টীকাতান্ত্র প্রণয়নে কদাচই শিল্পের গুঢ় রহস্য ব্যাখ্যাত হতে পারে না। দাস্তের কালে তাঁর সমকালীন স্বাদেশিক সভ্যতা ও সমাজের সঙ্গে শেক্সপীয়রের স্বদেশের ও সমাজের সম-সাময়িক রূপের প্রতিতুলনার মধ্যে উভয় মনীষার তারতম্যের কোনো সূত্র স্থপ্ত হয়ে নেই সে কথা। এলিয়ট সাহেবের দাস্তে-বিষয়ক প্রবন্ধের মারফতে আমরা জানি। মুকুন্দরাম এবং শেক্সপীয়র উভয়ে সমপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং কেবল একজনের সমাজ আর একজনের থেকে হীনতর ছিল বলে প্রতিভার ফলেরও তরতম হয়েছে একথা কিছুকাল পূর্বে হয়তো মানাত কিন্তু এখন আমরা জানি এ হাস্যকর উক্তি অর্থহীন। কাজেই স্ট্যান্ডাল এবং টলস্টয় উভয়ে স্বদেশীয় এবং স্বকালীন সমাজ সভ্যতাব নানা টানাপোড়েনের আত্মকূল্য পেয়েছিলেন বলেই মহৎ উপন্যাসের জনক হতে পেরেছিলেন এ-কথা সত্য নয়।

সমাজ এবং সভ্যতার অন্তরের অসঙ্গতি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের কাছে যত স্পষ্ট হয়েছে, যত তার খণ্ডীভবনকে তাঁরা অনুভব করেছেন ততই ঔপন্যাসিকেরা চরিত্রাঙ্কনে অন্তর্মুখিনতার আশ্রয়ী হয়েছেন। এই অন্তর্মুখিনতা বা inwardness-এর সাহায্যে ক্লবেয়ার ও দস্তয়েভস্কি যেমন উপন্যাসের ক্ষেত্রে আঙ্গিকরীতির বিশিষ্টতা সৃজন করেছেন—ইংরাজি সাহিত্যে তেমনি হেনরি জেমস উপন্যাসে আধুনিকতার জনক হয়ে রইলেন—তাঁর প্রথম আঙ্গিক সচেতনতার জন্ম এবং বক্তব্যগত বিশিষ্টতার জন্ম। আঙ্গিক সচেতনতার জন্ম জেমসকে ক্লবেয়ারের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। প্রকরণের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিশীলতা শুধুমাত্র শেষ ভিক্টোরীয় সৌখিন রুচিবিলাস হিসাবে জেমসের কাছে প্রতীয়মান হয়নি। উচ্চ কোটির মাহুষের আপাতশাস্ত্র এবং বিশ্রুজ জীবনের অন্তর্লগ্ন ক্ষয়িষ্ণুতা চিত্রণের বেলায় তিনি বালজাকেরই স্মৃতিবহ। তাঁর প্রথম প্রধান উপন্যাস ‘দি পোর্ট্রেট অব এ লেডি’ প্রসঙ্গে তাঁর রচনাকালীন মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি বলেছেন যে উপন্যাসটির প্রধান বিষয় বা বক্তব্য হল কেমন করে মুক্তি এবং সম্বন্ধের প্রয়াসী একটি তরুণী প্রথানুগত্যের ষাঁতায় নিষ্পেষিত হল। ন্যূনাদিক পরিমাণে জেমস জীবনকে এই রূপকেই ভেবেছেন এবং রূপায়িত করেছেন। স্বভাবতই এই জাতীয় চরিত্র-চিত্রণের জন্ম বৃহৎ ঘটনামুখাপেক্ষী হওয়া অপেক্ষা চরিত্রের অন্তর্মুখিনতাকে রূপায়িত করে তোলা অধিক তাৎপর্যবাহক। কেননা ভালো বা মন্দ, ন্যায় বা অন্যায়ের সংঘাতমূলক কাহিনীতে ঘটনার ডাক পড়ে অবশ্যজ্ঞাবী হিসাবে। জেমস-এর

নাটক-নাট্যিকাদের ~~সীমাবদ্ধ~~ এই তাদের কর্তব্য নির্ধারণের জনক। ইসাবেলের শেষ প্রত্যাখ্যানের মধ্যে যে গভীর আত্মমর্যাদার বোধ বিদ্যমান তার মধ্যে ঐচ্ছিক অনৌচিত্যের প্রশ্ন অপেক্ষা ইসাবেলের জীবনের প্যাটার্নটাই বেশি সক্রিয়। যে মর্যাদা, যে শুচিতা মানুষের পবমার্থ এবং জীবনার্থ উভয় ক্ষেত্রেই হয়ে পড়েছিল বক্ষা, জেম্ন্স মননশীলতায় এবং কবিকল্প বাগ্‌বিষ্ঠাসে সেই মর্যাদার ট্রাজেডিকেই এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করেছেন। জেন অস্টেন এবং জর্জ ইলিয়টে পাত্রপাত্রীর আন্তরিকতার স্বরূপ বিচারের যে প্রাধান্য জেম্ন্স-এর সাহিত্যিকর্মে বক্তব্য-সূত্রে তা অধিকতর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে যুক্ত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে, বহুধাখণ্ডিত জীবন-ব্যাক্যার সূত্রে অন্তর্মুখিনতাই উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল, ফ্রয়েড এবং ইয়ুং-এর প্রভাব অবশ্যই এখানে সক্রিয় ছিল। কিন্তু বোধকবি সমাজের ও সভ্যতার মর্মশায়ী গভীর অন্তঃস্বতাব চেতনা মানুষের মনোময় সত্তাব সন্ধানী হয়ে উঠেছিল স্বাভাবিক নিয়মে। এমন কি, বর্ণাঢ্যতা, বীর্যবত্তা, চূড়ান্ত পরিস্থিতি প্রবণতা কন্বাডেব আপাত-লক্ষণ হলেও উপন্যাসের গঠনসৌষ্ঠবেব আশ্চর্য মহিমায় চবিত্তেব অন্তর্গামী স্বরূপকে ফুটিয়ে তোলাব জগুই তিনি ব্যস্ত ছিলেন অধিক। বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদেব ঔপন্যাসিকেবা—অন্তত যাবা পবিচর্যাশীলতায় বৃহৎ পাঠক সমাজ অভিমুখী নন—ক্লবেযাবেব শিল্পপ্রাণতাব অভিনিবেশী শিল্প ছিলেন এই কাবণে যে অব্যর্থ রূপক, অব্যর্থ প্রতীক প্রয়োগে তাঁবাও ক্লবেযাবেব মতোই স্থিৰ লক্ষ্য খুঁজছিলেন। ক্লবেযাব যে একদিকে ইণ্ডুবোপেব সর্বাপেক্ষা প্রভাবশীল ঔপন্যাসিক সেটা এই শিল্পপ্রাণতাব দিক থেকে অনুধাবনযোগ্য। জয়েস এবং লরেন্স উভয়েব বিপুল বৈপবীত্য সত্ত্বেও, সদৃশ-লক্ষণ বোধ হয় এইখানে যে উভয়েই প্রতীকে এবং কাব্যেব অনুশাসনে উপন্যাসেব শিল্পকর্মকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন। পৃথকভাবে তুজনেই কাব্য চর্চা কবেছেন। এবং তুজনেই উপন্যাসে দৃশ্যের অতীতকে ধবতে চেয়েছেন। লবেস্লেব প্রতীক সে ক্ষেত্রে লবেস্লেব সহায়ক, জয়েসেব গণ্ডেব কাব্য-কল্প অবিচলতা তাঁর বিষয়েব বাহন।

সুতবাং দেখা যাচ্ছে যে যত দিন যেতে লাগল ততই formal realism-এর শক্তিমান গল্প-মাধ্যম বিষয়গত বাস্তবতাব দায় পরিহার কবে, বিষয়ের অতীতে বা স্বরূপে পৌছনোব জগু কাব্যেব দ্বাবে প্রার্থী হতে লাগল। উনিশের শতকের শেষবর্তী দিকে যখন থেকে social disintegration ধীরে ধীরে অনুভূত হয়েছে, তখন থেকেই উপন্যাসের ফর্মে গণ্ডের বস্তু-লক্ষ্য, ঋজু অনুশাসন

অপেক্ষা কাব্যের আবহাওয়া ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগল। উপন্যাস সাহিত্য জীবনের নিকটতম শিল্পকলা বলে উপন্যাসের প্রসঙ্গে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। জাতির জীবনের চিত্রকলা, কাব্যধারা, অর্থাৎ জীবন-বিষয়ক সমকালীন সমস্ত কিছু থেকেই উপন্যাস নিজের প্রাণ-বায়ুর কিছু-না-কিছু অংশ সংগ্রহ করে থাকে। হার্ডির উপন্যাসে চিত্রকল্প, রূপকের প্রয়োগ, কাব্যময় ভাষা ওয়েসেলের আঞ্চলিক জীবনধারার সঙ্গে যেমন অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কিত—সেখানকার লোকজীবনের অনিবার্য অভিব্যক্তি তেমনি আবার হার্ডির পরাভবাত্মক বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গে, এই সব কাব্যময়তা অপরিহার্য। লরেন্স এবং জয়েসও মানুষের আত্মা এবং সমগ্র মনোলোকের বিচারে আয়ত্ত করতে গিয়ে কাব্যের এবং গদ্যের অন্তর্বর্তী ব্যবধানকে কমিয়ে এনেছেন।

লরেন্স এবং জয়েস যখন ইংলণ্ডের উপন্যাস-গগনের প্রধান জ্যোতিষ্ক তখন ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণী আপন বক্ষ্যাত্মে দার্শনিক-শূন্যতায় ক্লান্ত। ইংলণ্ড যে টমাস মানের মতো ম্যাজিক মাউন্টেন সৃষ্টি করল না, এবং আলেক্সি টলস্টয়ের অগ্নিপরীক্ষার মতো উপন্যাস সৃজন করেনি এর কারণ ইংলণ্ডের মধ্যবিত্তশ্রেণীর অভিজ্ঞতার বিশিষ্টতার মধ্যেই অন্তর্সন্বেদ। জাতীয় অভিজ্ঞতার ব্যক্তি-রূপকের আধার উপন্যাসের রসোত্তীর্ণতার যোগ্যতর ধারক। মান-এর ব্যক্তিমানস ইওরোপীয় সংস্কৃতির সংকটের ব্যাকুল চেহারাকে যতটা উপলব্ধি করেছিল তার মধ্যে আবহমানকালের সংস্কৃতির ঐশ্বর্যের চেতনা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অগ্নিপরীক্ষায় একটা জাতির অগ্নিপরীক্ষার পর্বের যন্ত্রণা রূপান্তরিত। লরেন্স এবং জয়েসের সংকট চেতনায় এই-জাতীয় ব্যাপকতার সর্বতোমুখী যন্ত্রণা জলন্ত ছিল না। ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মাত্র নিজশ্রেণীর সংকটকে অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছে। ইংলণ্ডের সংকটকে নয়, ইওরোপের সংকটকেও নয়। সেই শ্রেণী আপন বক্ষ্যাত্ম পর্যায়ে শুধুমাত্র মূল্যের ভাঙনগুলিকে প্রত্যক্ষ করেছে। জয়েস এবং লরেন্স দু-দিক থেকে এই ভাঙনের ছায়াবহ। বহু ভগ্নাংশে পরিকীরণ অস্তিত্বের খণ্ডীভবনের প্রবল প্রতিক্রিয়ায় পৃথকভাবে লরেন্স এবং জয়েস নিজ নিজ শিল্প মাধ্যমের সন্ধানী হয়েছেন। এই সন্ধানের পশ্চাতে যে পরিমাণে শিল্পীর সততা সে পরিমাণে শিল্পের সমস্তাও বিদ্যমান এবং সে সমস্তার উৎস নিঃসন্দেহেই জীবন।

বর্তমান পরিচ্ছেদে ইংরাজি উপন্যাস সাহিত্যের যৎসামান্য সীমারেখাগত পরিচয় বাংলা উপন্যাস সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনা-গ্রন্থে নানা কারণে প্রাসঙ্গিক।

জীবনের জন্তু নিবিড় আগ্রহে অনন্ত এই শিল্প মাধ্যমে সমাজ এবং সভ্যতার নানা-
কালের টানাপোড়েন, দ্বন্দ্ব, নানা গভীর প্রশ্ন সদাই প্রত্যক্ষ ছায়াপাত করে।
জীবন প্রত্যক্ষ সৃষ্টিবাচকতায় পূর্ণ হলে উপন্যাসেও আসে মানুষের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম
ও প্রত্যক্ষ সংকটের ছায়া এবং তদুপযুক্ত মাধ্যম বা আঙ্গিকরীতি—জীবন অবক্ষয়ে
ক্লান্ত, কর্মসার্থকতাহীন পরোক্ষ এবং নেতির সম্মুখীন হলে তার প্রসঙ্গ প্রকরণও
বিভিন্ন। ডিফো-ফিল্ডিং থেকে লরেন্স-জয়েস সেই ইতিহাস। বাংলা উপন্যাস
আলোচনাকালে এই সূত্র আমাদের সহায় হবে।

•• চার ••

আসল কথা উপন্যাসিকের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড়ো বিষয় হল জীবনের সমগ্রতার
সন্ধান। সে সন্ধানের প্রেরণা সর্বত্রই উপস্থিত। বলা বাহুল্য আমরা আগেই
বলেছি যে উপন্যাস জীবনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। জীবনের এই আত্মীয়তাকে
স্বীকার করে নিয়ে উপন্যাসকার জীবনের সামগ্রিক রূপের সন্ধান করেন। এই
সামগ্রিকতা ব্যতিরেকে কখনই সার্থক উপন্যাস সৃজিত হতে পারে না।
ইউলিসিস পযন্ত যতগুলি সার্থক উপন্যাসের কথা আমরা স্মরণে আনতে পারি,
সকল ধরনের এবং সকল বিষয়ের উপন্যাসেরই প্রধান কথা হল এই সমগ্রতা।
আমরা ইংলণ্ডের যে-যুগের উপন্যাস সাহিত্যের কথা বললাম সে-যুগে নিশ্চয়ই
ডিকেন্স, জেন অস্টেন প্রমুখের রচনায় এই সমগ্রতার সন্ধান উপস্থিত ছিল।
কিন্তু এই সন্ধানের সার্থকতর রূপ তখনই সৃজন করা যায় যখন উপন্যাসকারের
নির্ভীক নিরাসক্তি জীবন সন্ধান লেখককে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত করে তোলে
(স্ত্রীদাল এবং বালজাক এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়)। ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডের surface
respectability-র যুগে এই নির্ভীক নিরাসক্তি ছিল ব্যাহত। যখন আমরা
হার্ডির চরিত্রকে প্লটের কাছে কবিত্বময় আত্মসমর্পণ করতে দেখি, কিংবা
দেখি ডেভিড কপারফিল্ডের আশ্চর্য বাস্তবতাবোধের অবাস্তব স্নিগ্ধ পরিসমাপ্তি
এবং এরই পাশাপাশি যখন আমরা দস্তয়েভস্কির (যার ওপর ডিকেন্সের প্রভাব
নাকি বিদ্যমান) ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্টের নায়কের যন্ত্রণার কথা ভাবি, কিংবা
রেজারেকসনের নেথল্যাডফ চরিত্র প্রসঙ্গ চিন্তা করি একমাত্র তখনই এই নির্ভীক
নিরাসক্তির ব্যাপারটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। উপন্যাসে আসক্তি মানেই
আংশিকতা।

এ নির্ভীক নিরাসক্তির ফল কিছুতেই বাস্তবের স্থূল অতিবর্ণনা নয়। তা যদি

হস্ত তাঁহলে নিশ্চয়ই আমরা ভিত্তৌরীয় তচিবায়ুতার গঠনমিকার জোলা-র প্রসঙ্গ উত্থাপন করতাম। কিন্তু আমরা জানি যে এ প্রসঙ্গে জোলা-র গুরুদেব রুবেন্স-এর কথা যদিবা উত্থাপিত করা চলে জোলা নৈব নৈব চ। সামগ্রিকতা মানে totality of objects এবং totality of objects মানে cataloguing of details নয়; নয় শুধুমাত্র পরিধিগত পৃথুলতা। আসলে এটা লেখকের অভিজ্ঞতার প্রদর্শনী নয়। লেখকের জীবনবোধ পূর্ণবৃত্ত হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা এইটাই প্রধান কথা। উপন্যাসকার যে জীবন আমাদের সামনে হাজির করেন সে জীবন সামগ্রিক এই কারণে যে সে জীবন সং নয়, অসং নয়, শুদ্ধ নয়, অশুদ্ধ নয়, নীতিদৃষ্ট নয়, নীতিগ্রস্ত নয়; সেই জীবন মানসোৎসুক হংস যে সব সময় উত্তীর্ণ হতে চাইছে; সে জীবন সেই সীতা যে বারংবার অগ্নি পরীক্ষার ভিতর দিয়ে নিজের শুদ্ধ স্বরূপের পরিচয় দেবে কিন্তু পরীক্ষার কখনও অন্ত হবে না। এই সমগ্র জীবনকেই অডিসি, ইলিয়াড, রামায়ণ, মহাভারতের মহাকবিরা একদিন ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের আশ্চর্য বোধের সামনে আমাদের যে এখনও স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয় তার কারণ এই সর্বতোমুখী সমগ্রতা। যিনি পিতৃসত্য পালনের জন্ত বনে ঘান তিনি পত্নী পুনরুদ্ধারের জন্ত বালীবধ করেন। মানুষের এই পরীক্ষাই প্রকৃতপক্ষে জীবনের সামগ্রিকতার পরীক্ষা। যিনি এতে উত্তীর্ণ হন তিনি মহাকবি—একালে মহৎ ঔপন্যাসিক। সেই জন্তই বলা হচ্ছে যে শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষ দর্শনের সাহায্যেই এই সামগ্রিক বোধের জন্মদান সম্ভবপর নয়। সামগ্রিক বোধ তখনই সৃজিত হতে পারে যখন ঔপন্যাসিকের জীবন অভিজ্ঞতা একটা নৈতিক সচেতনতায় শেষ পর্যন্ত মগ্নিত হয়ে ওঠে। আর্নল্ড্ কেটল্ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে উপন্যাসের প্রধান উপাদান কী এ-কথা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে উপন্যাসে থাকা চাই জীবন এবং জীবনের বিস্তারিত শিল্পরূপ দুইই। এই life and pattern-এর যুগল দাবিতে গড়ে ওঠে সার্থক উপন্যাস। ফর্স্টার সাহেব তাঁর সুবিখ্যাত Aspects of Novel গ্রন্থে pattern প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন “The pattern appeals to our aesthetic sense.” সুতরাং উপন্যাস শুধু জীবনের যথাদৃষ্ট রূপ নয়—উপন্যাসকে জীবনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলে স্বীকার করেও সে-কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। Pattern causes us to see the book as a whole—এবং এই সময়েই উপন্যাসটির প্রকৃত পরীক্ষা। উপন্যাসের জীবনবোধে ফাঁকি থাকলে অথবা

জীবনের পরিচয় অসম্পূর্ণ হলে যত তথ্য লক্য়ন হোক না কেন এই pattern-এব বোধ পাঠক মনে সঞ্চারিত হবে না। এবং এই pattern-এর বোধ সঞ্চারিত না হলে যে নৈতিক সচেতনতা এবং জীবনের অমেয় সম্ভাবনামূলক বিশ্বাস উপন্যাসের অস্থিষ্ট তা আয়ত্ত হওয়াও সম্ভব নয়। বিভিন্ন উপন্যাসের অভিজ্ঞতায় বলা যায় যে pattern হচ্ছে সেই বস্তু যা উপন্যাসিকের রচনাকে অখণ্ড বসমূর্তি দান করে।

জীবনের সামগ্রিকবোধ এবং pattern-এব ব্যাপারটি পবম্পব ঘনসন্নিবদ্ধ। একটি উপন্যাস থেকে আমবা শেষ পর্যন্ত শুধু জীবন খুঁজি না, জীবন সম্বন্ধে উপন্যাসিকের কী বক্তব্য সেইটাবই সন্ধান করি। উপন্যাসের pattern, তাব মানে অভিজ্ঞতাব সাহায্যে সেই অখণ্ড বসমূর্তি-বচনা যা পাঠকের বস পিপাসাব সর্বতোভাবে নিবৃত্তিসাধক—সেই pattern লেখকের এই জীবন সম্বন্ধে নিজস্ব ধ্যান ধাবণাব ওপবেই স্থাপিত। এই ধ্যান ধাবণাই হল লেখকের জীবনদর্শন। টলস্টয় বা স্তাঁদালের শিল্পে এই জীবন এবং জীবনদর্শন দুইই সমমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

জীবন সম্বন্ধে এই সামগ্রিক বোধ শুধুমাত্র আমাদের বিশ্বাসবোধকে তোষণ কবা নয়, বা শুধুমাত্র আমাদের বাস্তবজ্ঞানের সম্প্রসারণ অথবা আমাদের কল্পনারূত্তিব পবিচযাও এব লক্ষ্য নয়। জীবনের কাব্য এবং নাটক, কাহিনী এবং আলেখ্য সকল কিছুকেই কুক্ষিগত কবে এই সামগ্রিকবোধ গড়ে ওঠে। সেই সমগ্রতাবোধেব একমাত্র লক্ষ্য জীবনের অফুবস্ত সম্ভাবনাকে উপন্যাসে রূপদান। এ কাবণেই উপন্যাস কখনই realism naturalism ইত্যাদির পুঁথি নির্দিষ্ট ছককে অনুসরণ কবে চলে না। যেহেতু জীবনের কোনো ছক নেই সেই হেতু উপন্যাসকেও তাব এই সামগ্রিকতাব জগুই, কোনো ছকে ফেলা চলে না। টলস্টয় দস্তয়েভ্ক্ষি, টমাস মান প্রমুখ মহৎ শিল্পীদের বচনায় আমরা যে সামগ্রিকতাব সাক্ষাৎ পাই তা এই কারণেই কোনো প্রকাব ছক, পূর্বচিন্তা, পূর্বপোষিত মতাদর্শ বা dogma নিবপেক্ষ ভাবেই গড়ে উঠেছে। জগৎ জীবন সম্বন্ধে অভিনিবিষ্ট আগ্রহ কোনো সূত্র-নির্ভব হতে পাবে না।

•• পাঁচ ••

এখন প্রশ্ন হবে একজন উপন্যাসিকের সৃজিত জীবন সম্বন্ধে এই সামগ্রিকতাবোধ ব্যাপারটি বস্তুত কী? কী ভাবে আমরা এব বিচাব করব এবং কী ভাবেই বা

আমরা এর ব্যাখ্যা করব ?

প্রত্যেক উপন্যাসই প্রকৃতপক্ষে জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে লেখকের ধ্যান ধারণার রূপক। এবং এই সুবিস্তৃত রূপকে লেখক ঘটনা, আখ্যান, চরিত্র, কথোপকথন, সমাজ-প্রতিবেশ এবং রচনামূলক—এই প্রতি বিষয়েরই ব্যবহারে তাঁর উদ্দিষ্ট রূপকার্থেরই প্রতিফলন ঘটে। রূপকের লেখকের মতো সচেতন ভাবে তিনি এটা করেন কিনা এবং করলে তা শিল্পকর্ম হয় কিনা এ প্রশ্ন অবশ্যই উত্থাপন যোগ্য কিন্তু আপাতত আমরা এই প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে এই কথাটুকু বলতেই পারি যে উপন্যাসের সমগ্র জীবন যখনই একটি pattern পরিগ্রহ করে তখনই রসিক পাঠকের কাছে উপন্যাসে বিস্তৃত জীবন এক বিস্তৃত রূপকের আকারে প্রতিভাত হয়। উপন্যাসে উপরোক্ত সমস্ত উপাদানই তখন অংশত এবং সমগ্রভাবে সেই রূপকেরই তাৎপর্য বহন করে। উপন্যাস সমগ্রভাবে সেই রূপক নির্মাণ করে বলে উপন্যাসের প্রতি অংশের সঙ্গে এই রূপকের সম্পর্ক নিবিড়। এরকম একটা ধারণা থাকা স্বাভাবিক যে উপন্যাসের সৃষ্ট চরিত্রই বুঝি সেই সমগ্রতার ধারক এবং বাহক। চরিত্র যদিও সমগ্রতা নির্মাণে অনেকখানি ভূমিকা পালন করে তথাপি উপন্যাসের সমগ্রতা চরিত্র ছাড়াও আবও নানা কিছুর ওপর নির্ভরশীল। চরিত্র তার মধ্যে একটা অংশ বিশেষ। চরিত্রের মাধ্যমে উপন্যাসিক জীবন সম্বন্ধে তাঁর ধ্যান ধারণার কথা বাক্য করেন এটা ঠিকই, কিন্তু এই ধ্যান ধারণা যেহেতু উপন্যাসের সমগ্রতার ভিত্তির ওপর স্থাপিত সেইহেতু আরও নানা কিছু এ প্রসঙ্গে উপন্যাসকারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেগুলি হল ব্যক্তি, সমাজ এবং সভ্যতা ও ইতিহাস সম্বন্ধে প্রগাঢ় সচেতনতা। উপন্যাসকার তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টার সাহায্যে অবশ্যই প্রাথমিক ভাবে পাঠকের জীবন সম্বন্ধে কোতূহলের নিরাস্তি সাধন করবার জন্য প্রয়াসী হন। কিন্তু বহুরূপী বলেই জীবন সম্বন্ধে কোতূহলও অন্তহীন। এই কারণে একই বিষয় নিয়ে দুই লেখকের রচনা দুই ভিন্ন কোতূহলের পরিভূষ্টি সাধন করে। অন্তহীন এই জীবনের বহু বিচিত্র রূপই বারে বারে উপন্যাসিকে ডাক দেয় জীবনের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য। উপন্যাসিকের মন সেই বহিরঙ্গ বিচিত্রতার ব্যবহারে জীবনের একটা সমগ্র অর্থ সৃজন করে, যা শেষ অবধি উপন্যাসকে একটা জীবন-দর্শনে পৌঁছিয়ে দেয়। এই জীবনদর্শন উপন্যাসিক সৃজন করেন জীবনের আঁকাড়া তথ্যগুলি থেকে। সুতরাং লেখকের মন এবং সেই মনের উৎকর্ষ এবং সমৃদ্ধি একটা সার্থক উপন্যাসের নেপথ্যে সক্রিয় থাকে। হেনরী জেমস

এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে উৎকৃষ্ট মনই উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মে রূপায়িত হতে পারে। “The deepest quality of a work of art will always be the quality of the mind of the producer.” এখন শিল্পী মানসের সেই গভীর মনীষার পরিচয় আমরা উপন্যাসের ভিতরে কেমন করে সন্ধান করি উপন্যাসের সমগ্রতা এবং তার pattern-এর বিচার প্রসঙ্গে সে-কথা আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেকটি উপন্যাসই শিল্পীর অন্তরাঙ্গারই প্রতিফলন। সুতরাং উপন্যাসের শিল্প বিচারের সময় আমাদের দেখতে হয় পাঁচটি বিষয়। এক, কোন্ পদ্ধতিতে শিল্পী জগৎ এবং জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন ; দুই, তিনি কী গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন , তিন, কী তিনি পরিহার করেছেন ; চার, কোন্ ধরনের সমস্যা তিনি উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন , পাঁচ, এই সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি কোন্ নৈতিক মূল্য নিষ্কাশিত করেছেন—এই পঞ্চ পরিচয়ের ওপরে ঔপন্যাসিকের মানসোৎকর্ষের বিচার হবে। এবং এর ওপরে একটা উপন্যাস শিল্পকর্ম হিসাবে কতখানি উত্তীর্ণ হল তারও মীমাংসা হবে। শিল্পীর অন্তরাঙ্গার পরিচয় গ্রহণের কালেই এই পদ্ধতির ভিতরে তাঁর সমাজ সভ্যতা বিষয়ক জিজ্ঞাসাও স্পষ্ট হবে। সুতরাং অভিজ্ঞতাসঞ্চার অনুভূতিকে ঔপন্যাসিক উপন্যাসের রূপকে তুলে ধরেন একথা আমরা যে কোনো মহৎ উপন্যাস আলোচনা কালে উপলব্ধি করতে পারি। তাই যদিও পাঠকের জীবনাগ্রহের পরিভূষি সাধন করা ঔপন্যাসিকের লক্ষ্যের একটা প্রাথমিক অংশ তাহলেও শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে অভিজ্ঞতা অপেক্ষা ঔপন্যাসিকের quality of mind-টাই বড়ো কথা হয়ে দাঁড়ায়। কেননা একক অভিজ্ঞতাব কোনো অন্ত নেই। মানুষও যেমন বহুবিভূত অন্তহীন বৈচিত্র্যের অধিকারী বাস্তবতাও তেমনি শতরূপিণী। কাজেই শুধু অভিজ্ঞতাকে আলাদা করে কখনই বিচার করা যায় না। এ প্রশ্নের কখনও মীমাংসা হয়নি যে অভিজ্ঞতার কোথায় আরম্ভ আর কোথায় শেষ। অভিজ্ঞতা কখনও সম্পূর্ণ হয়েছে বলে কেউ দাবি করতে পারেন না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতা থেকে যে জীবন রসের নিষ্কাশন হবে স্বভাবত সেটাই প্রধান ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে প্রধান কর্মকর্তা হল শিল্পীমানসের কল্পনার উৎকর্ষ। রোমান্টিক কবিদের কাছে যেমন কল্পনাই অন্তর্দৃষ্টি, কল্পনাই যেমন তাদের উপাঙ্গ ঈশ্বর, ঔপন্যাসিকের কাছে তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত কল্পনাই হল প্রধান কথা। এই বুদ্ধিদীপ্ত কল্পনা অথবা লেখকের ঔপন্যাসিক মনীষাকে আমরা যে-কোনো স্বাধিকারই দিতে প্রস্তুত—তা সে তাঁর বিষয়বস্তু, তাঁর মতাদর্শ যে

ব্যাপারেই হোক না কেন। আমাদের শুধু বিচার্য হল এই যে তিনি তাঁর সমস্ত উপাদানের ব্যবহার করেছেন কী ভাবে। তাঁর আহৃত সমস্ত অভিজ্ঞতা, সমস্ত তথ্য এবং উপাদান গভীর এবং গূঢ় মনের ভিতর দিয়ে স্থনির্দিষ্টভাবে প্রবাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা pattern পরিগ্রহ করেছে কিনা; শেষ পর্যন্ত সমস্ত উপন্যাসটি তাঁর সমস্ত জীবন ধারণার একটি বিস্তৃত রূপকের আকার ধারণ করেছে কিনা। সুতরাং লেখকের অভিজ্ঞতা—যেটা উপন্যাসের একটা প্রধান ব্যাপার—সেটা আদর্শে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা নয়। উপন্যাসিকের অপরিহার্য প্রধান শক্তি কী এই প্রশ্ন যদি কখনও ওঠে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র উত্তর হবে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও মননসমৃদ্ধ কল্পনাই হল উপন্যাসিকের ব্রহ্মাস্ত্র। যেহেতু শিল্পমাত্রেরই শেষ পর্যন্ত নিপুণ এবং অভিনিবিষ্ট নির্বাচন সেই-হেতু উক্ত কল্পনা এ বিষয়ে উপন্যাসিককে, তাঁর অন্তর্দৃষ্টিকেই সাহায্য করে। এই কারণেই বলা হয়ে থাকে যে-মন কৃত্রিমতায় পূর্ণ, যে-মন আসক্ত, যে-মন পল্লবগ্রাহী সেই মন কখনও উৎকৃষ্ট উপন্যাসের স্রষ্টা হতে পারে না। উপন্যাসিকের মন কবির মতো শুধু কবিত্বেরই আসক্ত নয়, নাট্যকারের মতো শুধু নাট্যরসেই তার পক্ষপাত নয়, সেই মন জীবনের সহজ স্বাস্থ্যের অধিকারী বলেই জীবনের কাব্যে কাহিনীতে নাট্যে, তুচ্ছ এবং উচ্চ, নিচ এবং মহৎ, সুন্দর এবং কদর্যের সকলেরই রূপসাধনা করতে পারে। এই বিচিত্র রূপসাধনা প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসিকের নিজস্ব রসসাধনা। এ রসসাধনার লক্ষ্য জীবন স্বরূপ সন্ধান। এই জীবন স্বরূপই সামগ্রিকতা।

রসসাধনার এই দুর্লভ পথে শিল্পীকে প্রতি পদেই পরীক্ষা দিতে হয় নানাভাবে। জীবন এবং বাস্তবের মায়ী সৃজনে সে পরীক্ষার প্রথম অধ্যায়, আবার সেই সৃজিত মায়ী থেকে মায়াদীপ সত্যে পৌঁছানোর প্রয়াসে এ পরীক্ষার চূড়ান্ত রূপ। জীবন এবং বাস্তবের এই মায়ী রচনার ক্ষেত্র উপন্যাসিকের স্বভূমি। এই ভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি কবি-নাট্যকারের থেকে পৃথক। বরঞ্চ এ বিষয়ে তাঁর প্রতিযোগী শিল্পী-পুরুষ হলেন চিত্রশিল্পী। চিত্রশিল্পেরও প্রধান কথা হল জগৎ ও জীবনের সাদৃশ্য বহন। উপন্যাসিকেরও কাজ তাই। আমরা বর্তমান আলোচনার শুরুতে এ-কথা বলেছি যে উপন্যাস পাঠকের কাছে রস পিপাসা এবং জীবন পিপাসা প্রায় একীভূত ব্যাপার। জীবন আধুনিক যুগে যত ফিউডাল কাঠামোকে ভেঙে ভেঙে নানাদিকে নিজেকে বিকশিত করতে চেয়েছে ততই সে হয়েছে বিচিত্র এবং কোতূহলোদ্দীপক। এই জীবন সম্বন্ধে অসীম আগ্রহের জন্ম এ

যুগের অন্ত্যতম সাহিত্য-সন্তান উপন্যাসের কাছে অসীম এবং বিচিত্র জীবনের সাদৃশ্য আমরা কামনা করি। উপন্যাসিকের মানসোৎকর্ষ সেই বাস্তব জীবন-মায়া সৃজন করে। কেমন করে এবং কী ভাবে পরবর্তী পরিচ্ছেদে সেটাই আলোচিত হবে।

•• ছয় ••

জীবনকে জীবনেরই মতো উপন্যাসে প্রতীয়মান করানোর অনুজ্ঞা উপন্যাসিককে অক্ষরে অক্ষবে পালন করতে হয়। এরই অপর নাম বাস্তব এবং জীবনের মায়া (illusion) সৃজন। কেমন ভাবে এই মায়া সৃজিত হয় তা অবশ্যই জটিল সৃষ্টিক্রিয়ার অঙ্গীভূত ব্যাপার। কাজেই কতকটা দুজ্জের্ষণ্যও বটে। এ সম্বন্ধে নানা মূনির নানা মত। সেই মতারণ্যে দিশাহারা হবারই কথা। বিশেষত বিয়ালিজম, ন্যাচারালিজম প্রমুখ নানা ইজমের প্রবক্তাবা যেখানে নানা মতবাদী বক্তব্য নিয়ে সদাই প্রস্তুত। আমরা এই মতবাদেব জটিল বিতণ্ডায় না গিয়ে একেবাবে ব্যাপারটির মর্যাদাব্যবস্থার চেষ্টা করব। জীবনকে জীবনের মতো প্রতীয়মান কবাত্রে গিয়ে উপন্যাসিকের কর্তব্য কী হবে এ প্রশ্নে জোলা-র একটি বক্তব্য এখানে উপস্থিত করা যাক। জোলা বলছেন :

“একজন লেখক বঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে একটি উপন্যাস লিখতে চান। এই অভিপ্রায় থেকে তিনি যখন কাজ শুরু করলেন তখন তাঁর প্রথম কর্তব্য হবে (চরিত্র বা বিষয় কিছুই তখন তাঁর হাতে নেই) উপাদান সংগ্রহ করা ; মঞ্চ জগৎ সম্বন্ধে তিনি যা বর্ণনা করতে চান তার বিষয়গুলি খোঁজাই হবে তাঁর প্রধান কাজ। তিনি তখন হয়তো কতকগুলি অভিনেতাব সঙ্গে আলাপ করবেন এবং কিছু অভিনয়ও দেখবেন। তারপরে তিনি তার বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ করবেন, তাদের মতামত সংগ্রহ করবেন, গল্প এবং চিত্রাদি যোগাড় করবেন। কিন্তু তা-ই সব নয়। প্রাপ্তব্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক পুঁথিপত্র তাঁকে পড়তে হবে। পরিশেষে তিনি তার যথানিদিষ্ট স্থানটি পরিদর্শন করবেন এবং একটি থিয়েটারে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার জন্য কয়েকদিন অতিবাহিত করবেন, অভিনেত্রীদের সাজঘরে একটি সন্ধ্যা কাটাবেন এবং যতটা সম্ভব সেই পরিবেশকে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করবেন। যখন এই সমস্ত উপাদান এইভাবে সংগৃহীত হবে তখনই উপন্যাস নিজ নিয়মে তার আকার ধারণ করবে।”

পরিবেশকে আত্মসাৎ করবার এই যে ব্যাপার এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে সমালোচক-দের কঠিন মতামত প্রযুক্ত হতে দেখা গেছে। এই ধরনের লেখকেরা এই প্রকার অনুজ্ঞা অনুসরণ করে যে উপন্যাস রচনা করেন তাতেও অ্যাভারেজ সাধারণ চরিত্রই মুখ্যত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এই আর্টপৌরে অ্যাভারেজ চরিত্র এবং ডিফো-ফিল্ডিং-এর আমলের অ্যাভারেজ মানুষ এক বিষয় নয়। এ হল এক ধরনের যান্ত্রিক গড়পড়তার সাধারণ মানুষ। ডিফো-ফিল্ডিং-এর অ্যাভারেজ মানুষ সমাজের পটে আবির্ভূত সে-শতাব্দীর নতুন মানুষ। তারা ছিল এক নবোদ্ভূত শ্রেণীর প্রতিনিধি। কাজেই টাইপ এবং ব্যক্তির দ্বন্দ্বমূলক ঐক্য সেখানে উপস্থিত ছিল। জোলা-র বাস্তব-মায়ায় এই গড়পড়তা মানুষের দল কোনোপ্রকার pattern বা রসতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যতিরেকে উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আমাদের আপত্তি শুধু এইখানেই নয়। To absorb the atmosphere বা পরিবেশকে আত্মসাৎ করা বলতে জোলা কী বুঝেছেন। এ যদি হয় শুধুমাত্র আহৃত উপাদানের বর্ণহীন আর্টপৌরে প্রদর্শনী, অথবা সংগৃহীত অভিজ্ঞতার যদৃচ্ছ প্রকাশের একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থালিপি মাত্র তাহলে অবশ্যই এ থেকে কোনো বৃহত্তর সার্থকতার সাক্ষাৎ মিলবে না। এই প্রসঙ্গে হেনরী জেমস যে কথা বলেছেন সে কথা সর্বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেছেন লেখকের অভিজ্ঞতার শক্তি কখনই উপন্যাসকে জীবনের ছবছ অনুকৃতি করে তোলার সাধনা নয়। নিখুঁত সাদৃশ্য উপন্যাসের একটা গুণ হতেও পারে, নাও পারে। কেননা ডন কুইকস্মোট কিংবা মিঃ মিকোবরের বাস্তবতা স্রষ্টার রঙে এত অনুরঞ্জিত যে এদের যত বাস্তবের নিখুঁত অনুসরণ বলা চলুক না কেন এরা কিছুতেই সাধারণভাবে সংসারে দেখতে পাওয়া চরিত্র নয়। অভিজ্ঞতার শক্তি আসলে একটা প্রচণ্ড অনুভবের শক্তি এবং এই অনুভবক্রিয়া সৃজনী-চেতনার প্রকোষ্ঠে যে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ জাগতিক ঘটনার এমন আশ্চর্য প্রতিধ্বনি তুলতে পারে, এবং সেখানে এত সূক্ষ্ম ব্যাপারেরও এত সূক্ষ্ম সাদৃশ্য জাগে যে এই ব্যাপারটাকে একটা অপক্লপ মানস পরিবেশ উদ্ভূত ব্যাপার ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। লেখকের এই মানস পরিবেশই আমাদের পূর্বে কথিত জীবন ও জগতের মায়াসৃজনের মূলে।

পরিবেশকে আত্মসাৎ করা অবশ্য প্রয়োজন। তার মূল্যকে অস্বীকার করা হচ্ছে না। এবং একথা যথার্থই যে পরিবেশকে আত্মসাৎ করার সঙ্গে মানস-পরিবেশ সৃজনের কোনো মৌল বিরোধ নেই। বরঞ্চ শিল্পীমানস পরিবেশকে

আত্মসাৎ করলে পরেই মনের নির্বাচনী ক্ষমতা অবচেতন স্তরে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে এবং তখনই সৃজিত হতে পারে সেই অবস্থা যার ফলে উপন্যাসে স্পষ্ট হয়ে উঠবে লেখকেরই মানস-মণ্ডল। তাই বলা হয় যে উপন্যাসে জীবনকে জীবনের মতো প্রতীয়মান করাতে গিয়ে ঔপন্যাসিক কখনই ছবছ অলুপির আশ্রয়ী হন না। হলেও, তিনি জানেন যে এর ওপরে বাস্তবের অধ্যাস রচনার সার্থকতা নির্ভর করে না। পরিবেশকে লেখকের গোটা জীবন-বিষয়ক বক্তব্যের সঙ্গে সম্বন্ধবদ্ধ করে তোলাতেই এর সার্থকতা। ডিফো-র রবিন্সন ক্রুশো থেকে এর একটা উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে।

এ-কথা সুপরিজ্ঞাত যে ডিফো-র Formal Realism-এর প্রধান ভিত্তি ছিল পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদন করায়। যে বিষয় তিনি বর্ণনা করতে মনস্থ করেন যে সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিষয়ের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অংশও তিনি এমন বিশ্বাস্তভাবে বর্ণনা করেন যার ফলে পাঠকের চিত্তে শুধু যে অবিশ্বাসের ইচ্ছাকৃত নির্বাসন ঘটে তাই নয়, পাঠক একেবারে স্পষ্টত বিশ্বাসের দিকেই ঝুঁকে পড়েন। রবিন্সন ক্রুশোয় জাহাজডুবির পর ক্রুশো যখন ক্রুশোর মৃত বন্ধুদের সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতি লিপিবদ্ধ করছেন তখন তিনি বলছেন : I never saw them afterwards, or any sign of them, except three of their hats, one cap, and two shoes that were not fellows, বর্ণনার এই অংশটুকু অন্তর্ধাবন কবলে দেখা যাবে যে শেষ বাক্যাংশটুকুই হচ্ছে সেই অব্যর্থ অংশ যার ওপরে ভর করে পাঠকের বিশ্বাস্ততা নিমেষে গড়ে উঠতে পারে। দুটো জুতো ভেসে এসেছে এবং এ দুটো জুতো একই জোড়ার দুটো জুতো নয় এই ব্যঙ্গনাটুকু সমুদ্রের বিশালতা এবং উদাসীনতা এই উভয়কে আশ্চর্যভাবে নিমেষে রূপায়িত করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এই অতি তুচ্ছ বর্ণনাংশের মাহাত্ম্য এইখানে যে এ পাঠকের চিত্তে নানাভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। এবং এর ফলে লেখকের আশ্চর্য তন্ময় দৃষ্টি সম্বন্ধে আমরা একপ্রকার বিশ্বয়ের আনন্দ লাভ করি। কিন্তু ব্যাপারটি যদি শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে এটা হয় একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কৌশল যা গড়পড়তা লেখকের সম্বল। এ শক্তিটি তখনই লেখকের প্রবল মানসিক শক্তির পরিচায়ক যখন এই ধরনের তুচ্ছ বর্ণনাংশ আপন তাৎপর্যের গুণে পাঠকের চিত্তকে অকস্মাৎ অতিমাত্রায় গ্রহণশীল কবে তোলে। অর্থাৎ কল্পনার দিক থেকে পাঠকের মনকে সক্রিয় করে তোলে। Three hats, one cap and two shoes কেবলমাত্র আক্ষিক যথার্থ্যের পরিচায়ক।

That were not fellows এই বাক্যটুকুতে লুকিয়ে রয়েছে সমুদ্র-ব্যাঙ্গনা। পাঠকের মনে এর ফলে জেগে ওঠে এক ভাবধন অবস্থা। এরপর থেকে সে আর ঔপন্যাসিকের সৃজিত জীবনের প্রতিবিম্বকে এক মুহূর্তের জন্য অবিখ্যাস করে না। ক্রুশো, বিরাট সমুদ্র, বিজন দ্বীপ, এক কথায় ঔপন্যাসিকের সমগ্র বিষয়কে এ বর্ণনা স্পষ্ট করেছে বলেই এ সার্থক শিল্প।

এই প্রসঙ্গে টিলসিটের 'ওঅর অ্যাণ্ড পীস' থেকে একটা যুদ্ধ বর্ণনার অংশও অনুলিখনযোগ্য। Before Tilsit অধ্যায়ের ৩৭শ পরিচ্ছেদে যুদ্ধান রুশ ও ফরাসী সৈন্যদের যুদ্ধোত্তম মুহূর্তের বর্ণনা দিচ্ছেন লেখক :

It was now past noon, and the weather had cleared ; a brilliant sun was moving westward over the Danube and the surrounding hills ; the air was windless, rent now and then by bugle call and the shouts of the enemy. There was nothing now between the squadron and the enemy but some patrols. An empty space of some three hundred fathoms divided them from each other. The enemy had ceased firing, and all the more one felt that ominous, insurmountable and indefinite barrier that lies between two hostile armies. One step beyond the boundary on either side lies something that suggests that other boundary which divides the dead from the living. What is it ? Is it the dread Unknown of suffering and death ? What is it ? just beyond that field, on the other side of that tree, of that roof on which the sun is shining ! Who can tell, and who does not wish to know ? The soldier fears and yet longs to cross the line, for he feels that, sooner or later, he must, and that then he will know what lies beyond as surely as he will know what lies beyond this life. He is full of exuberant vigour, of health, spirits, and courage, and those around him are just as eager, just as brave as himself..... .."

এখানেও উল্লেখযোগ্য যে যুদ্ধক্ষেত্রের ঝড়ের আগের স্তব্ধতা বর্ণনার সাফল্য

দুই যুযুধান বাহিনীর মধ্যবর্তী empty space-এর বর্ণনার ওপৰ নিৰ্ভর-
শীল। এই empty space বা শূন্য এলাকাত বর্ণনাকে এক লহমায় টলস্কাই
জীবন-মৃত্যুৰ সীমাবেখাৰ ৰূপকে উন্নীত কৰেছে। এব ফলে ঔপন্যাসিকের
কবিতাই যে শুধু প্রকাশিত হয়েছে তাই নয়, যুদ্ধক্ষেত্ৰের যুদ্ধাৱন্তের ভয়াবহ
মুহূৰ্তের সংশয় উত্তেজনা আশঙ্কা এই ৰূপকের সাহায্যে সত্য বলে প্রতিভাত
হয়ে উঠতে পৰেছে। যুদ্ধৰ গভীৰ বিস্তৃত বৰ্ণনাৰ জন্ত পাঠকেৰ মন প্রস্তুত
হয়ে উঠতে পৰেছে। এবপৰ সে যুদ্ধকে দাৰ্শনিকের নিবাসভূমিতে গ্ৰহণ
কৰবে।

আবার একটি ছোট বর্ণনাৰ আঁচড়ে বোবোদিনেৰ যুদ্ধেৰ সুবিশাল অস্ত্র-
সম্বল পৰিবেশ এবং অমীমাংসিত যুদ্ধফল-কে জীবন্ত কৰে তুলেছেন টলস্কাই।
পিটাব এবং এক ফবাসী সৈনিক যেখানে কণ্ঠ আঁকডি ধবীলা পাকডি দুইজনা
দুইজনে যেখানে লেখক বৰ্ণনা কৰেছে :

It was French officer , but he dropped his sword, and took
Peter by the collar. They stood for a few seconds face to
face, each looking more astonished than the other at what
he had just done.

“Am I his prisoner or is he mine ?” was the question in
both their minds The Frenchman was inclined to accept
the first alternative, for Peter’s powerful hand was tighten-
ing its clutch on his throat.

‘কে কাৰ বন্দী’—উভয়েৰ এই যুগপৎ চিন্তাৰ ব্যাপাৰটি বুঝিয়ে দিচ্ছে যুদ্ধ
কতখানি ঘোৱালো হয়েছিল। যুদ্ধেৰ সুবিশাল প্যানোৰামা যে কাজ পাতার
পৰ গাতা ধৰে কৰেছে, কামান শ্ৰেণীৰ পৰিসংখ্যান, বিভিন্ন সেনাবাহিনীর
সংস্থান তথা যে কাজে নিযুক্ত কৰা হয়েছে, এই একটি অতি ক্ষুদ্ৰ দৃশ্যাংশ সে
কাজেৰ সাফল্যে সকলকে ছাড়িয়ে গেছে।

যে কোনো শিল্প-সফল উপন্যাসে বাস্তব জগতে জীবনেৰ অধ্যাস বচনাৰ এই
শক্তি সদাই বসিক পাঠকে মুগ্ধ কৰে। আধুনিক বালা সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রী
লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েৰ বচনা থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি নিয়ে দেখা যায়
যে ঔপন্যাসিকেৰ এই গূঢ় শক্তিতে ইনি কতখানি শক্তিমান। মানিক বন্দ্যো-
পাধ্যায়েৰ সুবিখ্যাত উপন্যাস পদ্মানদীৰ মাঝিতে কুৰেবেৰ গৃহ বৰ্ণনা কৰেছে

লেখক । এই বর্ণনায় দেখা যায় যে বিষয় এবং বিষয়ীর এমন এক সুষোগ্য সাদৃশ্য ঘটেছে যার ফলে বর্ণনা পাঠকের কাছে জীবনকল্পরূপ ধারণ করেছে । বর্ণনাটি এই :

কোনার দিকে রক্ষিত জিনিসগুলি চিনিতে হইলে ঠাহর করিয়া দেখিতে হয় । ঘরের একদিকে মাটিতে পোতা মোটা বাঁশের পায়ায় চৌকি-সমান উঁচু বাঁশের বাতা বিছানো মাচা । মাচার অর্ধেকটা জুড়িয়া ছেঁড়া কাঁথার বিছানা । তৈল চিকন কালো বালিশটি মাথায় দিয়া কুবেরের পিসী এই বিছানায় শয়ন করে । মাচার বাকি অংশটা হাঁড়ি কলসিতে পরিপূর্ণ । নানা আকারের এতগুলি হাঁড়ি কলসি কুবেবের জীবনে সঞ্চিত হয় নাই, তিন পুরুষ ধরিয়া জমিয়াছে । মাচার নিচেটা পুরাতন জীর্ণ তক্তায় বোঝাই । কুবেরের বাপের আমলের একটা নৌকা বাব বার সারাই করিয়া এবং চালানোর সময় ক্রমাগত জল-সেঁচিয়া বছর চারেক আগে পর্যন্ত ব্যবহার করা গিয়াছিল, তাবপর একেবারে মেরামত ও ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ায় ভাঙিয়া ফেলিয়া তক্তাগুলি জমাইয়া রাখা হইয়াছে । ঘরের অন্যদিকে ছোট একটা ঢেঁকি । ঢেঁকিটা কুবেরের বাবা হাবাধন নিজে তৈয়ারি করিয়াছিল । কাঠ সে পাঠিয়াছিল পদ্মায় । নদীর জলে ভাসিয়া আসা কাঠ সহজে কেহ ঘরে তোলে না, কার চিতা রচনার প্রয়োজনে ও কাঠ নদীতে আনা হইয়াছিল কে বলিতে পারে ? শবেব মতো চিতার আগুনের জড়তম সমিধটিরও মানুষের ঘরে স্থান নাই । কিন্তু এই ঢেঁকির কাঠটির ইতিহাস স্বতন্ত্র ।

এই গৃহ বর্ণনায় প্রথমেই যেটা নজরে পড়ে সেটা হল, লেখক দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতাকে পরিভাষা-কণ্টকিত করে প্রকাশ করার জন্য দাস্ত হযে ওঠেননি । সমগ্র বর্ণনাটিকে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে ঢেঁকির কাঠের প্রসঙ্গে । পদ্মার জলে ভেসে আসা কাঠের প্রসঙ্গ কুবেবের ঘরের দরিদ্র মাঝির বর্ণহীন গৃহ-স্থালির বর্ণনায় বৈচিত্র্য সঞ্চার করেছে । এই ঢেঁকির কাঠের সাহায্যে ঘরগানি পাঠকের কাছে হয়ে উঠেছে পদ্মানদীর মাঝির ঘর । ঢেঁকির কাঠের মতো তুচ্ছ বিষয় পদ্মার অনন্ত জীবন-মরণ রহস্যকে, এক কথায় উপন্যাসে পদ্মা যে নিয়তির প্রতীক তাকে বিশ্বাস করে তুলেছে । এই বর্ণনার সমালোচনা হিসাবে এইটুকু বলা যায় যে লেখক কুবেবের বাপের আমলের নৌকার প্রসঙ্গ যদি পরিহার করতে পারতেন তাহলে এ বর্ণনা প্রথমশ্রেণীর বর্ণনায় পরিণত

হতে পারত। কুবেরের বাপের আমলের নৌকার প্রসঙ্গ বাস্তবতার আতিশয্যের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে। শ্রেষ্ঠ শিল্প সৃষ্টিতে এই ঝোঁক অবশ্য বর্জনীয়।

বলা প্রয়োজন যে ঔপন্যাসিকের এই শিল্প-কৌশলের মূলে রয়েছে ঔপন্যাসিকের নির্বাচনী ক্ষমতা। উপন্যাসের চরিত্র, মিলিউ, প্লট এবং ঘটনাংশ সমস্ত কিছুতেই লেখকের নির্বাচনী ক্ষমতারই প্রকাশ ঘটে। যেহেতু আধুনিক সমাজ এবং সভ্যতার সমস্ত কিছুই পরস্পর ঘনসন্নিবদ্ধ এবং সংযুক্ত সেই হেতু লেখকের নির্বাচনী ক্ষমতার ভিতরেই সেই শক্তি রয়েছে যা ঘটনা, চরিত্র এবং খুঁটিনাটি বিষয় ও বিষয়াংশের নির্বাচনে জীবনের গোটা রূপকে আভাসিত করে তোলে। উল্লিখিত উদাহরণগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে বর্ণনাংশের যেসব ছোট ছোট কাজের ওপর জীবনের মায়া-সৃজন নির্ভর করে রয়েছে, সেগুলি লেখকের নির্বাচনী ক্ষমতার ফল। এই নির্বাচনী ক্ষমতা একদিকে লেখকের কাছে ঋণী এবং আর একদিকে তা উপন্যাস-ধৃত সমগ্রতাব সঙ্গে অধ্বিত। যে বিশিষ্ট জীবনবোধ লেখকের সৃষ্টিগত মানসিক অবস্থা গড়ে তুলেছে এই নির্বাচনী ক্ষমতা আসলে তারই সন্তান। পরিবেশ এবং পরিবেশ-ধৃত মানুষকে উপলব্ধির ব্যাপারে লেখকের মনীষা কতখানি সাহায্য করেছে এই নির্বাচনী ক্ষমতা তারও প্রমাণ বটে। এই নির্বাচনী ক্ষমতা শিল্প এবং জীবন এই দুই কূলে সমদৃষ্টি রাখতে পারলে কখনও যাত্রাব্রষ্ট হয় না। জীবনের মায়া-সৃজনের রহস্য মোটামুটি এই। একটি অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ সৃষ্টিগত মানসিক অবস্থা-সম্পন্ন শিল্পী যখন জীবনকে তাঁর শিল্পের রূপকে ধরতে চান তখন এই নির্বাচনী ক্ষমতাতেই তাঁর প্রথম পরিচয় মেলে। তাঁর প্রধান পরিচয় অবশ্যই অন্তর। সে-কথা স্থানান্তরে আলোচিত হবে।

মহাকাব্যের মতো সার্থক মহৎ উপন্যাসও শাস্ত্ররস পরিণামী। উপন্যাসের ফলশ্রুতিতে পাঠক চিত্তে জীবন সম্বন্ধে আগ্রহের গভীরতা বাড়ে, ব্যক্তি জীবনের বাসনা কামনাকে স্মরহৎ পটে স্থাপিত দেখে তাদের সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসের আতিশয্যের হ্রাস হয়। আমরা তখন সহিষ্ণু উদার চিত্তে জীবনের অগাধ অসীমতা সম্বন্ধে সচেতন হই। চিত্তে শমভাবের সঞ্চার সার্থক উপন্যাসের শিল্পকর্মের লক্ষ্য। একজন সার্থক ঔপন্যাসিকের বিষয়বস্তু এবং তার ব্যবহারে সেই কারণেই আবিষ্টতা পরিহার্য। যে বিষয়, যে ভাষা, যে রচনারীতি

বা ঘটনা-সংস্থান লেখক নির্বাচিত করেন সেই সমস্ত কিছুই আসলে এক স্থানে এক আধারে এসে সংহত হয় লেখকের জীবন-বিষয়ক বক্তব্যের টানে। এই বক্তব্যই ঔপন্যাসিকের জীবনার্থ, যাকে তিনি আহরণ করেছেন তাঁর অভিজ্ঞতায়, সঞ্চয় করে রেখেছেন তাঁর স্মৃতিতে, গড়ে তুলেছেন তাঁর কল্পনায় তাঁর মননে। ব্যক্তিস্বরূপের এই নিয়ত আবিষ্কারের অনলস প্রয়াসে নৈব্যক্তিকতাই তাঁর সাধন পীঠ। তাঁর জীবনার্থও জীবন-নির্ভর।



উপন্যাসে বিষয়বস্তুর তাৎপর্য

•• এক ••

উপন্যাসের গল্পাংশ বা আখ্যানভাগকেই উপন্যাসের বিষয় বলে না। ফর্স্টাভ সায়েব যে story বা plot-এর কথা বলেছেন উপন্যাসেব বিষয়বস্তু বলতে শুধু তাদেরও বোঝায় না। তেমনি আবার কেবলমাত্র সৃজিত চরিত্রাবলীর ঘোরাফেরা, তাদের গতি-পরিণতিও উপন্যাসেব বিষয় নয়। আনা কারেনিনা এবং মাদামঃ বোভাবির গল্পাংশে ক্ষীণ সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও (বিবাহিত নারীর প্রেম) এই দুই উপন্যাসেব বিষয়বস্তু পৃথক। বিষবৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইল দুটো উপন্যাসই পুরুষেব দ্বিচাৰিতার বিষয় নিয়ে লিখিত হলেও এই দুই উপন্যাসের লক্ষ্য এক নয়—কাজেই এরা শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় ভিন্ন বিষয়ের উপন্যাস। সে কারণে শুধু শৈশবকল্পনার চিত্রণে সমৃদ্ধ হয়েছে বলে জাঁ ক্রিস্তফেব প্রথম খণ্ডের সঙ্গে পথের পাঁচালির সাদৃশ্যসন্ধান নিবর্থক, যেমন নিবর্থক শুধু যুদ্ধের উত্থান-পতন ব্যবহৃত হয়েছে বলে রাজসিংহের সঙ্গে ওঅব অ্যাণ্ড পীসেব তুলনা সন্ধান। কেননা, বিষয়-বিধৃত বক্তব্যে এক একটি উপন্যাস এক এক রকমেব।

Subject-matter বা বিষয়বস্তুর বা উপন্যাসেব বিষয় বিষয়াশ্রয়ী বক্তব্যেব রূপক। উপন্যাসিকের জীবনদর্শন বিষয়াতিগ নয়। সকল শিল্পের ক্ষেত্রেই যেমন একথা সত্য যে শিল্পের বক্তব্য শিল্পনিহিত ব্যাপার, শিল্পাতিগ কিছু নয়—উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সে কথা সমান প্রযোজ্য। শিল্পের বক্তব্য শিল্পনিহিত। ‘ওড টু নাইটিঙ্গেল’ কবিতার যা বক্তব্য তা কবিতাটির সরল গষ্ঠীকরণের মধ্যে অপ্রাপ্য—সে বক্তব্য শুধু ঐ কবিতাটির শিল্পসারের মধ্যে সন্কেয়। তেমনি একটি উপন্যাসের যা বক্তব্য বা জীবন-ব্যাখ্যা তা উপন্যাসের সমগ্র প্যাটার্নের মধ্যে

নিহিত থাকে। উপন্যাসকার যখন তাঁর গল্প নির্বাচন করেন, চরিত্র ধ্যান করেন, চরিত্র-পরিবেশ এবং ঘটনার পরস্পর সম্পর্কের কথা চিন্তা করেন তখনই জীবন সম্বন্ধে তিনি কী বলতে চান তাও ভাবা হয়ে যায়। উপন্যাসিকের সৃষ্টিপর্যায়ের এই স্তর শিল্পীর পক্ষে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্রণাময় স্তর। লেখক স্বভাবতই সচেতনভাবে জীবন সম্বন্ধে বক্তব্য স্থিরীকরণের পর উপন্যাস রচনায় নিযুক্ত হন না। তাঁর গল্পের এবং চরিত্রের পরিভাষায়, তাদের মাধ্যমে তিনি জীবন সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যকে রূপময় করে তোলেন। এই রূপান্বিত বক্তব্যই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। একজন উপন্যাসিকের বিষয়বস্তু কী সে-কথার উত্তরে আমরা এই রূপান্বিত বক্তব্যের কথাই বলে থাকি। এ শুধু আখ্যানভাগের সারাংশ লিখন নয়।

•• দুই ••

এ শুধু আখ্যানভাগ নয় বলে, এর সঙ্গে উপন্যাসিকের জীবনদর্শনের প্রশ্নও জড়িত থাকবে বলে, উপন্যাসের প্রসঙ্গে পট এবং পটবিধৃত মানুষের সম্পর্কের ব্যাপারটা প্রধান। উপন্যাসের অব্যবহিত পূর্বপুরুষ পিকারেস্ক-জাতীয় উপন্যাস থেকেই প্রকৃতপক্ষে এই পরিবেশ এবং পটের প্রসঙ্গ প্রভাবী হয়ে উঠেছে। Outcast বা সমাজচ্যুত মানুষ, যে সমাজকে উপেক্ষা করে, এবং যাকে সমাজ উপেক্ষা করে, তার প্রতিক্রিয়া সমাজেব নিদিষ্ট ছকে কোন্ আলোড়ন সৃষ্টি করে পিকারেস্ক উপন্যাসের রস পরিণামে মেটাই লক্ষ্য। ব্যক্তি বা Individual-এর যে প্রশ্ন পরবর্তী উপন্যাসসমূহে প্রধান হয়ে উঠল পিকারেস্ক উপন্যাসে তারই প্রথম সূত্র। ব্যক্তির প্রশ্ন উপন্যাসের প্রধান প্রশ্ন। কিন্তু এই প্রশ্নের রূপ দ্বিবিধ। ব্যক্তিবৃন্দের পরস্পর সম্পর্কে এর এক রূপ; সমাজ বা সভ্যতার সঙ্গে এদের সম্পর্ক নিরূপণে এর দ্বিতীয় রূপ। গোরা উপন্যাসের গোরা-চরিত্র এর আশ্চর্য নিদর্শন। গোরা-সুচরিতা-আনন্দময়ীর সম্পর্ক অথবা গোরা-বিনয়ের সম্পর্ক-সূত্র বা পরেশবাবু-ললিতার সম্পর্ক এই উপন্যাসের ব্যক্তিসম্পর্কের দিক। আবার গোরার যন্ত্রণায় পরেশবাবুর শাস্ত দৃঢ়তায় বিনয়-ললিতার বিবাহে এই উপন্যাসের সমাজ-ব্যক্তির সম্পর্কের দিক। আমরা যেভাবে পৃথক করে এখানে বিষয়টির বর্ণনা দিলাম সেভাবে উপন্যাসে ব্যক্তি-সমাজ সম্পর্কের পৃথক রূপায়ণ ঘটে না। ব্যক্তির মৌল প্রশ্নের সঙ্গে পরিবার এবং সমাজের বিস্তৃত পটভূমি জড়িয়ে যায়। যখন এইভাবে পটবিধৃত ব্যক্তির যন্ত্রণাময় কর্মশীল বা অহুভূতিময় সংবেদনশীল সত্তাকে উপন্যাসিক

রূপময় করে তুলতে পারেন তখনই সার্থক উপন্যাসের জন্ম। যেমন ম্যাজিক মাউন্টেন এবং ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট, যেমন রেজারেকসন এবং যোগাযোগ। এগুলি মহৎ উপন্যাস। এবং এই অনুভূতিময় সংবেদনশীলতার জন্মই জেমস জয়েসের ইউলিসিসও মহৎ সৃষ্টি।

এই ব্যক্তি-সমাজ সম্পর্কের মূল্যবান প্রশ্নটি উপন্যাস আলোচনার ক্ষেত্রে ইতিহাস-গত কারণেই প্রাসঙ্গিক। সমাজ এবং সভ্যতা কোথাও স্থিতিশীল নয়। সূতরাং এই প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তনশীল সমাজ ও সভ্যতার বৃহৎ দায় ব্যক্তি কেমন করে বহন করছে, আবার ব্যক্তি কীভাবে সমাজ ও সভ্যতার পরিবর্তনে ভূমিকা পালন করছে উপন্যাসের ব্যক্তি-সমাজ সম্পর্কে এই প্রশ্নটি অগ্রতম প্রশ্ন। সাহিত্য জীবনেরই একটি অংশ। জীবন প্রতি মুহূর্তেই রূপান্তরমুখী। কালান্ত্রিত জীবনের এই রূপান্তরমুখিতার দিকে দৃষ্টি রেখেই একথা বলা হয় যে every age is an age of transition। সূতরাং ব্যক্তি এবং সমাজের পরস্পর সম্পর্কের এই সূত্রটি গাণিতিক সূত্রের মতো। লেখকের মাথায় ভর না করে থাকলেও উপন্যাসের রচয়িতার কাছে যে-কটি বিষয় আপন মননের সাহায্যে অনুধাবনীয় এই বিষয়টি তার মধ্যে প্রধান। উপন্যাসের বিষয়বস্তু বলতে আমরা ব্যক্তি এবং সভ্যতার সম্পর্কের এই বিশিষ্ট প্রশ্নটিকেই বুঝি। ‘আউটসাইডার’ উপন্যাসে নায়কের যন্ত্রণা বর্তমান সভ্যতার পবিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক। এই কারণে উপন্যাসের আলোচনায় তথা তার বিষয়বস্তুর আলোচনায় দেশকালের আলোচনা উত্থাপিত না হয়ে পারে না। যদিও শেষ পর্যন্ত শিল্পরূপ প্রধান হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক তথাপি যেহেতু শিল্পরূপ কোনো নির্বস্তুক (abstract) ব্যাপার নয় সেই হেতু আধুনিক কালের এই প্রধান শিল্পকে দেশকালের কঠিন যুক্তিক। থেকেই জীবনরস সংগ্রহ করতে হয়। এক এক দেশের উপন্যাস সেই সেই দেশের সমাজ এবং সভ্যতার জটিল এবং বক্রিম গতির চিহ্নধর। সে-কারণে উপন্যাসিকের জীবন সম্বন্ধে বক্তব্যের (যেটা উপন্যাসের বিষয়বস্তুর অগ্রতম অঙ্গ একথা আমরা পূর্বে বলেছি) তারতম্য এবং পার্থক্য এই দেশকাল-সাপেক্ষ সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন গতির জন্ম সম্ভবপর হয়। একই ধরনের উপন্যাসে মোটামুটি গাণ্ডিক বিষয় এক হওয়া সত্ত্বেও বিষয়বস্তু যে শেষ পর্যন্ত পৃথক হয়ে যায় সে বিচারও এই দৃষ্টিকোণ থেকে করণীয়।

মাদাম বোভারি এবং আনা কারেনিনা উপন্যাস দুটির নাম-চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা এ প্রসঙ্গে উত্থাপনযোগ্য। উভয় নারী সমাজ-জীবনের প্রচলিত ছকের

বাহরে চলে গিয়েছিল। উভয় নারীর জীবনে জীবন সম্বন্ধে কুমার বিচিত্র অভিব্যক্তি আমরা অনুভব করেছি। উভয়েরই বিয়োগান্ত পরিণতিতে আমরা নির্ভর জীবনের ক্ষমাহীন অনিবার্যতা সম্বন্ধে সচেতন হই। কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে টলস্টয় এবং ফ্লেবোয়ারের Idea of writer's subject বা বিষয়-ধারণা এক নয়। ফ্লেবোয়ারের ক্ষুরধার মনীষা উপন্যাসের আঙ্গিক-রীতির ইতিহাসে মাদাম বোভারির মতো চিরস্মরণীয় সৃষ্টির নিদর্শন রেখে গেলেও আনা কারেনিনার বিশাল নৈতিক তাৎপর্য মাদাম বোভারির নেই। একটা ছোট মফস্বল শহরের চিকিৎসক-বধূ, যার ভাবপ্রবণ ক্ষুধা এবং নির্বোধ পল্লবগ্রাহিতা পণ্ডিতস্বত্ত্ব স্বামীর বৈচিত্র্যহীন জীবনে নিজ-তৃপ্তি খুঁজে পায়নি—একটি সম্ভান থাকা সম্বন্ধে—সেই বধূটি মাদাম বোভারি—উপন্যাসেব নাযিকা। অবশ্যই মাদাম বোভারি উপন্যাসে শিল্পীর শিল্পবোধের পরীক্ষা হয়েছে চূড়ান্তভাবে। ফ্লেবোয়ারকে ব্রতী হতে হয়েছে শিল্পীর দ্বৈত-সাধনায়। বিষয়ীর নিরাসক্ত বাস্তব-চেতনা এবং বিষয়ের যথাযোগ্য রূপ-সাধনা—যে কোনো উপন্যাসিকেরই দ্বৈত-সাধনার দুই দিক। এক্ষেত্রে ফ্লেবোয়ারের পরীক্ষাও ছিল এই জাতীয়। কিন্তু এ জাতীয় পরীক্ষা হলেও ফ্লেবোয়ারের পরীক্ষা ছিল কঠিনতর। বাস্তব দৃষ্টি এখানে বোমাস্টিক নারীমানসের সমগ্রতাকে রূপায়িত করতে ব্যয়িত হয়েছে। কাজেই কল্পনাচারিতা এবং বাস্তববুদ্ধির উভচর শক্তিকে আয়ত্তাধীন করেছেন লেখক। এর যে কোনো একটির ইবং আতিশয্যে যে রূপসিদ্ধির জন্য উপন্যাসটির ক্লাসিক মর্যাদা সেই রূপেরই হানি ঘটত। এ পথ ক্ষুরশ্রধারা নিশিতা ছবতায়।

কিন্তু এই সমস্ত বক্তব্যকে স্বীকার করেও একটা প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত অনাহত থাকেই। এমা বোভারির জীবনের ঘটনা শেষ পর্যন্ত কোন্ তাৎপর্যকে বহন করছে—লেখকের বিষয়ধারণার দিক থেকে এই প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। এমার অভিজ্ঞতা, এমাব দুঃখবোধ, এমার সমুদয় চাওয়া এবং বিডম্বনার পরম মূল্য কোথায়? এ-প্রশ্নের উত্তর না দিলে শিল্প-জিজ্ঞাসা জীবন-জিজ্ঞাসার আত্মীয় হয়ে উঠতে পারে না। কেননা, সতর্ক শিল্পবোধ বিশিষ্ট জীবনবোধের প্রতিফলন। এ-কথা শিল্প-সাহিত্যের যে কোনো শাখা সম্বন্ধে প্রযোজ্য—উপন্যাস সম্বন্ধে এ কথা আরো বেশি করে সত্য। তাই ফ্লেবোয়ারের অমিত কীর্তিধর প্রতিভাকে উপন্যাসিকের নিরাসক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুপ্রণাম জানিয়েও এ প্রশ্ন স্বাভাবিক যে বোভারি-দম্পতির মফস্বল-জীবনের নিস্তরঙ্গ মধ্যবিত্ত মানস একটা নির্দিষ্ট পটভূমির সঙ্গে যেন দৃঢ়বদ্ধ হতে পারেনি। নির্দিষ্ট কোনো পটভূমিগত ব্যাপ্তি ছিল না বলে

এমার চাওয়া এবং পাওয়ার বিড়ম্বনা এমাকে কেন্দ্র করেই শুধু বেঁচে রইল।

ততধিক কোনো ব্যঞ্জনা সঞ্চার করতে পারল না।

অথচ এই প্রসঙ্গেই আমরা যখন আনা কারেনিনার কথা চিন্তা করি তখন আনার সমস্ত জীবন ব্যাপারকে এমন তাৎপর্যবাহিত হতে দেখি যা উপন্যাসের বিষয়কে অননুসাধারণ গৌরবে মণ্ডিত করেছে। আমরা আগেই বলেছি যে উপন্যাসের ব্যক্তি কদাচ একক ব্যক্তি নয়। ব্যক্তি-কাহিনীও একক কাহিনী নয়। পরস্পর সম্পর্কের টানাপোড়েনে ব্যক্তির জীবনের শুধু নয়, সমষ্টিরও মূল্য-বোধের নানা দিক এবং তাদের যথার্থতা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। ব্যক্তি-জীবনের মুকুরে সমাজ-জীবনের মূল্যবোধের যাচাই হয়। কাজেই পটভূমির প্রসঙ্গকে পরিহার করে উপন্যাস বিচার অসম্ভব। আনাব ভিতরে এমন কোনো বিশেষ ধবনের অসঙ্গতি নেই যার ফলে তাকে আমরা মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার বিষয় বলে মনে করতে পারি। বস্তুত আনাব জীবনচরণে আর পাঁচজনের ব্যতিক্রম নেই—অন্তত প্রথমে ছিল না। এমা বোভারির মতো নির্বোধ বোমাটিক ক্ষুধাব সাক্ষাৎ আনা-ব ক্ষেত্রে পাই না। এই অসীম জীবনাগ্রহী স্তম্ভ তরুণী যখন থেকে প্রচলিত ছকের বাইরে চলে গেল তখন থেকে ভ্রনস্কির প্রসঙ্গে না বিচার কবলে এই গোটা ব্যাপারটির মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়। কোনো বিখ্যাত সমালোচক বলেন যে আনা-ভ্রনস্কি এবং কাবেনিনের কাহিনীতে বুর্জোয়া দাম্পত্য জীবনের ও প্রেমের অন্তর্নিহিত অসঙ্গতিরই রূপায়ণ ঘটেছে। একেবারে এমনভাবে সূত্রান্তসারী বিচারপদ্ধতি না অনুসরণ করেও বলা চলে যে আনার অভিজ্ঞতার ফলে প্রচলিত সমাজপটের একটা নতুন ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে—যে ব্যাখ্যা আনার জীবন-নিবাসে যুক্ত বলেই শিল্পসম্মত হতে পেরেছে।

কাবেনিনকে বিবাহ আনার হৃদয়ে কোনো নতুন প্রত্যাশার জাগরণ ঘটায়নি।

All happy families are alike—এই উক্তির ভিতরে টলস্টয় তাঁর বক্তব্য বলেছেন। কাবেনিন এবং আনার দাম্পত্য-জীবন সচরাচর উচ্চ মধ্যবিত্তের দাম্পত্য-জীবন। কারেনিনের যান্ত্রিক জীবনধারা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারকে লেখক যথোপযুক্ত স্তবিচারেব সঙ্গে এঁকেছেন। কারেনিনকে যে আনা আবেগেব সঙ্গে কোনোদিনই ভালবাসতে পারেনি—এর জন্তে কারেনিনের কোনো অস্বাভাবিকতাকে লেখক দায়ী করেননি। আনার ব্যাপার যে সৃষ্টি-ছাড়া কিছু ব্যাপার নয় সে সম্বন্ধেও লেখকের ইঙ্গিত পরিস্ফুট। ভ্রনস্কির মায়ের সম্বন্ধে কিছু কিছু উল্লেখই যথেষ্ট। আনা বর্তমান সামাজিক জীবনের সম্প্রতিবাদী

স্বামী পত্নী। সে আশাহত আবেগহত অল্পভূতিশূল আশীর্বাদে মধ্যবিত্ত ঘরনীর ক্লাস্তিময় দাম্পত্য-জীবনে যে চূড়ান্ত বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থাকে তারই প্রতীক। সেই জগুই তার গোটা অভিজ্ঞতা। এমা বোভারির মতো মাঝারি অভিজ্ঞতা নয়।

আবার যে লোকটা আনাকে প্রচলিত জীবনের ছকে অঙ্গুগত থাকতে দিল না তার সম্বন্ধেও টলস্টয়ের অভিনিবেশ লক্ষণীয়। ভ্রনস্কি-আনার প্রেম এবং আনার মৃত্যু এই উভয়ের প্রত্যক্ষ হেতু। কী করে সে আনার প্রেমকে জাগ্রত করল, আবার কী করে সে আনার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করল দুইই অল্পধাবনযোগ্য। আশ্চর্যের বিষয় উভয় ব্যাপারই সংঘটিত হচ্ছে ভ্রনস্কির ব্যক্তিচরিত্র এবং সামাজিক চরিত্রের টানাপোড়েনে। যে ভ্রনস্কি ঘোড়দৌড়ের মাঠে বিমুক্ত প্রাণাবেগের প্রতীক, যে ভ্রনস্কি সামরিক-বিভাগ পরিহার করে নাগরিক জীবনের সন্ধানী, যে ভ্রনস্কি উদারতাবাদী রুশ যুবকদের তৎকালীন প্রতিভূ—যে ভ্রনস্কি নিজ জীবনের ধারা-ধরনের পরিবর্তন প্রয়াসী সেই ভ্রনস্কি আনার হৃদয়ে প্রেমের জাগরণ সম্ভব করে তুলেছিল। আনা কারেনিনের ঘরনী হিসাবে যে যান্ত্রিক জীবন বহন করছিল তার জগুে তার মনে ফস্ক-বিস্ফোভ বিদ্যমান ছিল, যাকে সে নিজেও হয়তো ভালো করে চিনত না। ভ্রনস্কির প্রতি আসক্তি সেই বিস্ফোভের স্ফুট-পথ। আবার এই একই ভ্রনস্কির ভিতরে উদারতাবাদী রুশ মধ্যবিত্ত যুবকের সর্বাঙ্গীণ অসঙ্গতিও উপস্থিত। সে নিজের জীবনের ধারা পরিবর্তনের প্রয়াসী, কিন্তু এই পরিবর্তন প্রচেষ্টা তাকে যা করে তোলে তা হল সূক্ষ্মতা-বিলাসী dilettante। এই সূক্ষ্ম রুচিবিলাসীর জীবনের মূল অসঙ্গতিই হল এখানে যে এর সামর্থ্য সীমিত। কাজে কাজেই আনার সমুদয় প্রেমের দায় সে বহন করার যোগ্য নয়। চায়ের টেবিলে আনার চা খাওয়ার ভঙ্গিকে তার মনে হয় কুৎসিত। এমনি করে আনারও ঘোড়দৌড়ের ঘটনার পরে মনে হয়েছিল যে কারেনিনের কানগুলো খুব বড়ো বড়ো। কিন্তু টলস্টয়ের বিষয়চেতনা এমনই মর্মগ্রাহী যে পাঠকের কাছে আনার মনে-হওয়াটাকে মনে হবে নির্দোষ। মনে হবে যে সেটা হল কারেনিনের নিরাবেগ অভ্যাসিকতা-মহুর জীবনের বিরুদ্ধে নবজাগ্রত প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তি। আর ভ্রনস্কির মনে-হওয়াটাকে মনে হবে কদর্য। কেননা ভ্রনস্কি প্রেমের দায়কে বহন করার ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছিল। ঘটনার উজ্জল নায়ক অনিবার্য প্রতিমুখে স্থাপিত হয়ে স্তিমিত হয়ে গেল। দেখানো হল, আধুনিক যুগের তথা সভ্যতার বিশিষ্ট পর্যায়ে কিবা দাম্পত্য-

জীবন, কিবা প্রেম উভয়েরই সংকট ও অন্তর্জটিলতা কতখানি কঠিন, কতখানি অমোচনীয়। এই অন্তর্জটিলতা সম্বন্ধে সচেতনতায় আনা কারেনিনা উপন্যাসে নৈতিক সচেতনতা সক্রিয় হয়ে রয়েছে। এবং এই বিচারেই এমা বোভারির মাঝারি অভিজ্ঞতা অপেক্ষা আনা কারেনিনার গভীর অভিজ্ঞতা অনেক বেশি তাৎপর্যবহ। উপন্যাসের এই পট এবং পটবিধৃত ব্যক্তির সম্পর্ক প্রসঙ্গে তরুণ মোপাসাঁকে লিখিত ফ্লবেয়ারের একটি চিঠি আলোচ্য। মোপাসাঁকে ফ্লবেয়ার লিখেছিলেন যে যদি শিল্পীকে একটি বিশেষ গাছের বিষয় বর্ণনা করতে হয় তাহলে তিনি ততক্ষণ ধরে সেই গাছটিকে প্রত্যক্ষ করবেন যতক্ষণ না সেই বিশেষ গাছটিকে অন্য সকল গাছ থেকে পৃথক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ফ্লবেয়ারের ধারণা ছিল এই পদ্ধতিতেই নাকি সেই বিশেষ গাছটির সমস্ত স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়বে। কিন্তু আংশিকভাবে এর কার্যকারিতা মেনে নিলেও এই পদ্ধতির সীমিত দিকটিও আমাদের দৃষ্টিতে আনা উচিত। এই পদ্ধতির ফলে ঐ বিশেষ গাছটি যে প্রকৃতির বিস্তীর্ণ পটভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তাতেই যে পূর্ণ শিল্পবোধের ব্যত্যয় ঘটে শিল্পীর সে বিষয়ে অবহিত থাকা প্রয়োজন।

•• তিন ••

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে উপন্যাসিকের বিষয়চেতনা অন্য শিল্পের মতো শুধু প্রকাশ-চেতনা বা বৃহৎ অর্থে আঙ্গিক-সচেতনতা নয়। তদতিবিক্ত কিছু। এইখানে উপন্যাসের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে পটের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। মিলিয়ে দেখতে চাওয়াটাই উপন্যাসিকের দেখতে চাওয়া। এই ব্যক্তি আর পরিবেশকে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে উপন্যাসিক দেখান কী এবং কতটুকু মিলছে এবং কী কোথায় মিলছে না। অসমন্বয়ের এই যন্ত্রণাকে উপন্যাসিক নানানভাবে পরীক্ষা করেন। সকল প্রেমে, সকল কর্মে মানুষ তার সং-স্বরূপকে খুঁজছে। ব্যক্তিমানুষের এই সন্ধানী যাত্রায় ঘন ঘন করাঘাত সমাজ-পরিবেশের বুকের ওপরেই বাজতে থাকে। তাতে যে সুর-তরঙ্গ সৃষ্টি হয় উপন্যাসের ফলশ্রুতি নির্মাণে তার ভূমিকা অগ্ন্যতম। সে কারণে বলা যায় যে যন্ত্রণাই সমস্ত উপন্যাসের বিষয়—সে যন্ত্রণা অস্তিত্বের যন্ত্রণা।

এ প্রসঙ্গে আমরা বর্তমানে আলোচনা করব—একদিকে রাসকলনিকফ ও নেখলুডফের অভিজ্ঞতার কথা, আর একদিকে ভ্রমর, কুমু এবং সাহেব-বিবি-গোলামের বোঁঠানের অভিজ্ঞতার মূল্য।

ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্ট এবং রেজারেকশনের নায়ক রাসকলনিকফ এবং নেথল্যাডফ জীবনের বহুধাবিস্তৃত পটে কর্মতৎপরতায় বিশিষ্ট নায়ক। ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্ট এবং রেজারেকশনের কাহিনীতে অবশ্যই পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু এই দুই নায়কের যন্ত্রণার সাদৃশ্যটুকু লক্ষণীয়। এই সাদৃশ্য দ্বিবিধ : প্রথম, উভয় নায়কেরই এক পাপরুতির চেতনা রয়েছে—নেথল্যাডফের মাসলোভা সংক্রান্ত স্মৃতি এবং রাসকলনিকফের খুনের এবং পরস্বাপহরণের স্মৃতি। দ্বিতীয়, উভয়েই এই পাপচেতনার আগুনে পুড়ে পুড়ে নিজেদের শুদ্ধ স্বরূপের সন্ধান করেছে। এই সন্ধানের জটিল বিস্তৃত পর্যায় শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস দুটি শেষ হয়েছে। দুই উপন্যাসের শেষ বাক্য হচ্ছে এক পর্যায় সমাপ্ত হল। যে নব পর্যায়ের শুরু হল তা কেমন হবে সে গল্প আর এক গল্প (ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্ট), একমাত্র ভবিষ্যৎ তার বিচারক (রেজারেকশন)।

দুটি উপন্যাসে প্রেমের ব্যবহার করা হয়েছে বিশেষ তাৎপর্যের সঙ্গে। এই প্রেমের আখ্যান রাসকলনিকফ এবং নেথল্যাডফের জীবনের পরিণতি রচনায় মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যে দুঃখদহনের স্বেচ্ছা-বরণে এই দুই নায়কের শুদ্ধতার জন্ম সংগ্রামের পরম নিদর্শন, প্রেম তাকে উভয় ক্ষেত্রেই উজ্জ্বল করে তুলেছে। কিন্তু দুই উপন্যাসে দেখা যায় যে প্রেম-কাহিনীর ব্যবহার কোনো গতানুগতিক পদ্ধতিতে হয়নি। যন্ত্রণার পথে প্রেম এসেছে যন্ত্রণাকে বৃহত্তর তাৎপর্য দানের জন্ম, যন্ত্রণাকে পরম রমণীয় করে তোলা এই দুই প্রেমকাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল না। সে কারণে বলা চলে যে মহৎ উপন্যাসের যোগ্য আবহাওয়া রয়েছে এই প্রেমের আখ্যানভাগে। উপন্যাসের মুণ্ডকিল আসানের উদ্দেশ্যে যান্ত্রিক উপায়ক্রম হিসাবে এদের ব্যবহার ঘটেনি। রেজারেকশনে নায়কের দীর্ঘযাত্রার শেষে দেখা গেল নায়িকা মাসলোভা নেথল্যাডফকে বিবাহ করতে অক্ষম। দানব্রতী কর্ণের কবচকুণ্ডল পরিহারের মতো নেথল্যাডফকে মাসলোভার প্রত্যাশাকেও শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করতে হল। এবং জীবনের যে সং-স্বরূপকে অভিজ্ঞতার ছকে ছকে সে নানাভাবে খুঁজল তার সেই জীবন-পিপাসারও চূড়ান্ত পরীক্ষা হল এই শেষ যন্ত্রণার কষ্টপাথরে। আবার রাসকলনিকফের যন্ত্রণাকেও সহনীয় করে তোলার জন্ম সোনিয়ার সঙ্গে তার প্রেমের ব্যাপারটিকে ব্যবহার করা হয়নি। সাইবেরিয়ায় মাসলোভা নেথল্যাডফকে প্রত্যাখ্যান করেছিল—ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্টে সেক্ষেত্রে রাসকলনিকফ সোনিয়াকে সাইবেরিয়ার উষ্ণ বন্দী জীবনের মাঝখানে স্বীকার করে নিল। অবশ্যই দুটো ব্যাপারের

নিষ্পত্তি হচ্ছে দু-রকম ভাবে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই দুই লেখক একটা বিন্দুতে আশ্চর্যভাবে স্থির। টলস্টয় এবং দস্তয়েভস্কি কোনো শিল্পী-সুবিধাবাদকে প্রশ্রয় দেননি। নায়ককে জীবনের যন্ত্রণার মুখে স্থাপিত করে, পরে প্রেমের উপাদানের সাহায্যে সে-যন্ত্রণাকে সহনীয় করে তোলার আয়োজন করলে সেই সুবিধাবাদকেই প্রশ্রয় দেওয়া হত। ‘আমি সমস্ত কিছু স্বীকার করব’—এই সিদ্ধান্তের পরমুহূর্ত থেকেই রাসকল্টনিকফ সোনিয়ার সঙ্গে দূরত্ব রচনা করার প্রয়াসী হয়ে উঠেছে। সে সোনিয়ার কাছ থেকে যখন বিদায় গ্রহণ করেছে তখন মৌখিক বিদায় সম্ভাষণ করাও প্রয়োজন মনে করেনি। সাইবেরিয়ার কারাবাসে সোনিয়াকে দেখে প্রথম প্রথম যে ব্যবহার সে করেছিল সে-ব্যবহার ছিল রুঢ় এবং উদাসীন। সুতরাং প্রেমের আকাশে মুক্তি পাবার প্রলোভনে সে গ্লানিমোচনের পথে পা বাড়ায়নি। নেথল্যাডফ এবং রাসকল্টনিকফ এদের ছুজনের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে অস্তিত্বের গভীর অন্তস্তল থেকে যন্ত্রণাব উৎসমুখ উন্মোচিত হয়েছে। এই যন্ত্রণা থেকে এরা উভয়ে পৃথিবীর পীড়িত স্বরূপকে উপলব্ধি করেছে—বুঝেছে যে পৃথিবীর গভীর, গভীরতর অস্থখ এখন। এই সমস্তা গোটা ব্যক্তি-বিবেকের সমস্তা। যেহেতু গোটা ব্যক্তি-বিবেকের কথা একক অংশীভবনের ভিতর দিয়ে বলা যায় না, সেইহেতু গোটা ব্যক্তি-বিবেকের কথা বলতে গিয়ে ব্যক্তিটা যে সমাজের অংশ, সভ্যতার যে পযায়ের সে প্রতিনিধি তার বিচিত্র রূপও এই সব ব্যক্তি-জীবনের মুকুরে নানাভাবে ছায়াপাত করে। উপন্যাসিকের বিষয়-চেতনা এই সকল কিছুকেই আত্মসাৎ করে থাকে।

বাংলা সাহিত্যে এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল ভ্রমর এবং কুমু। কৃষ্ণকান্তের উইল এবং যোগাযোগ অবশুই এক ধরনের এবং ভঙ্গির উপন্যাস নয়, কিন্তু এই উপন্যাসদ্বয়ের নায়িকায়ুগলের মূলভিত্তিক সমস্তার একটা স্বদূর সাদৃশ্য বিদ্যমান। সমস্তাটা এই যে, উভয়েরই স্বামী নামক আইডিয়ালের প্রতি, বা স্বামীত্বের ভাবাদর্শের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা; কিন্তু গোবিন্দলাল বা মধুসূদন উভয়েরই ব্যক্তি-জীবনের আচরণের সঙ্গে ভ্রমর এবং কুমু সেই ভাবাদর্শের সঙ্গতি কেমন করে রক্ষা করবে? কৃষ্ণকান্তের উইলে এই সমস্তা চূড়ান্ত হল উপন্যাসের নাটকীয় ঘটনাগতির চূড়ান্ত সীমায় বা climax-এ পৌঁছে—রোহিনী-হত্যার পর। যোগাযোগে এ সমস্তা উপন্যাসের প্রারম্ভ থেকেই বিদ্যমান। উপন্যাসটি অসমাপ্ত। কাজেই এ সমস্তার শেষ পরিণতি কী তা জানা সম্ভব নয়।

তথাপি একটা কথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে উভয় ক্ষেত্রে সমস্তার মূল সূত্র নিহিত

হয়ে রয়েছে দুই নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বোধে। ভ্রমর বলেছিল তার স্বামীকে যে, যতদিন তার স্বামী শ্রদ্ধার পাত্র ছিল ততদিন সে শ্রদ্ধা করেছে। আবার কুমুর ক্ষেত্রে সমস্তটা এসেছিল এইভাবে যে জীবনযাত্রার এক বিপরীত বিচ্ছিন্নতার বা ছকের মাঝখানে গিয়ে কেমন করে সে নিজেকে তার সঙ্গে মেলাবে। ভ্রমর তার যা কিছু ethical শিক্ষা সংগ্রহ করেছিল তার স্বামী গোবিন্দলালের কাছ থেকে। গোবিন্দলাল তাকে যা শিখিয়েছিল তা উনিশ শতকের সম্পত্তিবাদ যুবকের নীতিবিশ্বাস প্রণোদিত শিক্ষা। এ শিক্ষার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ আমরা কৃষ্ণ-কান্তের উইল উপন্যাসে পাই না। কিন্তু সেই শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল ভ্রমরকে আমরা এই উপন্যাসে নানাভাবে দেখতে পাই। গোবিন্দলালের প্রদত্ত শিক্ষা নিশ্চয়ই ধনবান একান্তবর্তী সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের বিরোধী কোনো শিক্ষা নয়। কাজে কাজেই বধু হিসাবেই ভ্রমরের অস্তিত্ব। তার বাইরে ভ্রমরের কোনো অস্তিত্ব নেই। ভ্রমরের ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল আলোকে তখনই দীপ্তিময়ী হয়ে ওঠা সম্ভব হল যখন সে স্বামীরই প্রদত্ত বিচারবোধের মাপকাঠিতে স্বামীকে বিচার করে বসল। ভ্রমর গোবিন্দলালকে বলেছিল যে, তুমি শ্রদ্ধার উপযুক্ত নও, আর বলেছিল মৃত্যু মুহূর্তে, ‘আশীর্বাদ করিও যেন জন্মান্তরে সুখী হই।’ এই দুটো কথাই হিন্দু সমাজের প্রচলিত পত্নীত্বের সংজ্ঞাবিরোধী। সর্বাবস্থায় পতি হিন্দু নারীর পূজা এবং পতিগতপ্রাণতায় তার সুখ, ভ্রমর এই দুই ধারণারই বিরুদ্ধতা করল। এইখানেই ভ্রমর-চরিত্রের নৈতিক মূল্য। যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আলোকে বঙ্কিম নিজে উদ্ভাসিত ছিলেন ভ্রমরের চরিত্রের ভিতর দিয়ে তারই অভিব্যক্তি ঘটেছে। ভ্রমরের চরিত্র তার নিজ গ্রায়কে অনুসরণ করতে করতেই বঙ্কিমের আন্তর সত্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এই যে reflection of writer’s inner self—শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-কীর্তির এটা একটা বড়ো নিদর্শন। ভ্রমরের ক্ষেত্রে অবশ্যই সামান্য অসঙ্গতি রয়ে গেছে। ভ্রমরের জা নেই, খাণ্ডি থেকেও নেই (স্বধর্মুখীরও এই অবস্থা ছিল)। ফলে ভ্রমরের অন্তঃপুরের পারিবারিক জীবন-যাত্রার সমস্ত প্রকার সম্পর্কগুলোকে ঠিকমতো উপস্থাপিত করা হয়নি। এইভাবে উপস্থাপিত করলে ভ্রমরের যন্ত্রণা আরও বেশি real হয়ে উঠতে পারত। কারণ আমরা জানি মেয়েদের জীবন এত বেশি ছক-অনুবর্তী ও এত বেশি নানা সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল যে শুধু দাম্পত্য সম্পর্কের ভিতর দিয়ে একটি নারীর সর্বস্ব উপলব্ধি হয় না। রোহিনীকে যেমন আমরা রোহিনীর সমশ্রেণীর বি-

চাকরানী প্রমুখ পরিবেশ অন্তর্ভুক্ত অবস্থাতেই সর্বদা পাচ্ছি, ভ্রমরকে সে জায়গায় একক অন্তঃপুরচারিণী বলে মনে হয়। ভ্রমরকে যে কেবল শেষ পর্যন্ত একটা ideal-এর মূর্ত প্রতীক বলে ভ্রম হয়েছে সেটা এই কারণে। নারীর সহস্র গ্রন্থিল পারিবারিক জীবনে চাপ এবং প্রতিক্রিয়া যদি প্রতি মুহূর্তেই তার ওপর পড়ত তাহলে এই অবস্থার সৃষ্টি হত না।

কিন্তু এইভাবে সামাজিক ও পারিবারিক পটের দিক থেকে সম্পর্কগত থানিকটা ব্যত্যয় থাকলেও অন্য একদিক থেকে ভ্রমর একটি নিরুপম আদর্শের সৃষ্টি করেছে। সেটি ইতিহাসের দিক থেকে। এ-কথাটি একটু পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন। এক হিসাবে শিল্প-সার্থক প্রতিটি উপন্যাসই ঐতিহাসিক লক্ষণাক্রান্ত। প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের কুশীলবেরা এই ঐতিহাসিক লক্ষণকে বহন করে থাকে। প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তায় তার ব্যক্তি-জীবনের ন্যায়-ক্রম যতটা ক্রিয়াশীল থাকে ইতিহাসের সমকালীন টানাপোড়েনও ততটা না হোক কম-বেশি করে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এ প্রভাব কখনও প্রত্যক্ষ, কখনও পরোক্ষ। কিন্তু একটি সার্থক লক্ষ্য উপন্যাসের চরিত্রাবলী কখনই এই ইতিহাস ব্যাখ্যার সীমাকে লঙ্ঘন কবে চলতে পারে না। রবিনসন ক্রুশো চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ শিল্প-রূপের সম্যক আলোচনায় আমাদের নিশ্চয় কেবলমাত্র ডিফো-র কালের ইংলণ্ডীয় সমাজ-ইতিহাসের নজির আকর্ষণ করলেই চলবে না, তার সাহিত্য সমালোচনাই সেখানে মূল কথা। কিন্তু এ সাহিত্য সমালোচনাও আবার পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না ডিফোর শিল্পীমানসের নিজস্ব বিচিত্র গতিকে আমরা সকল দিক দিয়ে উপলব্ধি করছি। এই উপলব্ধি আরো বহু কিছুর সঙ্গে ঐতিহাসিক পটবিচারেরও মুখাপেক্ষী। টুর্গেনিভের বিখ্যাত নায়ক বাজারভের প্রসঙ্গও এ-ক্ষেত্রে তুলনীয়। বাজারভকে রুশ মধ্যবিত্ত যুবকদের তৎকালিক চিন্তাগত পটভূমিকায় স্থাপন করা ছাড়া তার অভিজ্ঞতার পূর্ণ স্বরূপকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ভ্রমরের ব্যাপারেও অনুরূপ বিচার পদ্ধতি প্রয়োজন।

ভ্রমর বাংলা দেশের নারীসমাজের এক বিশিষ্ট পর্যায়ের প্রতিনিধি। কিন্তু তাই বলে ভ্রমরকে শুধু সেই আখ্যায় ভূষিত করলেই তার স্বরূপাবিষ্কার সম্ভব হবে না। এ-কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে উনিশ শতকের নবজাগ্রত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ ভ্রমরের চিন্তায় এবং চেতনায় পরোক্ষ উদ্ভাসন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু লেখকের অন্তরাআর এই বিশিষ্ট প্রতিফলন গণিতের সরল সূত্র অনুসরণ করে সম্ভব হয়নি। সৃষ্টিক্রিয়ার গূঢ় এবং জটিল পন্থার অনুসরণ এখানে লক্ষণীয়। চরিত্রের

প্যাটার্নের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে ভ্রমর সম্পূর্ণভাবে সমাজ ও পারিবারিক জীবনের প্রচলিত ছকের অঙ্গীভূত চরিত্র। সে একান্তবর্তী সামন্ত-পরিবারের বধ। সেই বধুত্বের যে বোধ সেই বোধের নির্দেশ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখেই তার সম্ভাবনা এবং প্রতিশ্রুতিকে ব্যবহার করেছেন লেখক। এই সূত্র থেকেই সঞ্চারিত হয়েছে ভ্রমরের অন্তর্দ্বন্দ্ব। সমষ্টিরূপ এবং ব্যক্তিরূপের মধ্যস্থিত এই দ্বন্দ্বময় রূপের শিল্পায়নই ঔপন্যাসিকের কাজ। ভ্রমর সে-হিসাবে খাঁটি উনবিংশ শতকের বাঙালী বধ। যার বধ-চেতনায় চিরকালের বাংলাদেশ ক্রিয়াশীল—যার নীতি-চেতনায় উনবিংশ শতকের প্রভাব। এই ঔপন্যাসিক-লক্ষণের বিद्यমানতার জন্মই ভ্রমরের সামান্য পটভূমিকাগত সীমাবদ্ধতার ক্ষতি-পূরণ হতে পেরেছে।

কুমুর ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিক হিসাবে ব্যাপকতর অভিনিবেশের পরিচয় দিয়েছেন। মধুসূদনের পরিবারে কুমুর অস্তিত্বকে নানা সম্পর্কের আলোকে তুলে ধরা হয়েছে। মধুসূদনের রুচি এবং কুমুর রুচির মধ্যে যে বিরোধ তা অবশ্যই জীবনের দুটো বিদ্যাসের বিরোধ। দুটো ব্যক্তিত্বের বিবোধ। সম্পত্তিবান মধুসূদনের অধিকার-বোধের সঙ্গে নিজ শুদ্ধ স্বরূপের সন্ধানী এক নারী, যে পত্নীও বটে, তাদের অমীমাংসার সমস্যা যোগাযোগের সমস্যা। ভ্রমরের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের প্রশ্নের উৎস যেখানে কুমুর উৎস তদপেক্ষা আরো গভীরে। এ কারণে রক্ষকান্তের উইল অপেক্ষা যোগাযোগের বিষয় অধিকতর গভীর।

ভ্রমর, কুমু এবং সাহেব-বিবি-গোলামের ছোট বৌয়ের কাহিনীর তুলনামূলক বিচারে তিনজন লেখকের বিষয়বস্তুর উৎকর্ষের তারতম্য-বিচারও সুসাধ্য। ভ্রমরের চিন্তার সংকট এসেছে একটা অতি স্থূল চরিত্রের ঘটনা থেকে। তার স্বামী চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে গেল। ভ্রমর এবং গোবিন্দলাল উভয়ে মিলে জীবনের যে ছক গড়ে তুলেছিল বহির্নিষ্কিপ্ত একটা ঘটনার আঘাতে সেই ছকের বাইরে চলে গেল ভ্রমরের স্বামী। রোহিনীর বিষয়ে গোবিন্দলাল নিরাসক্ত থাকলে ভ্রমরের সংকট সম্ভব হত না। তারা উভয়েই সচরাচর অন্তঃস্বত জীবনযাপন করতে পারত। পুণ্যবান মানুষও দুর্বল বলেই পাপের প্রলোভনে সাড়া দিয়ে ফেলে—
—শুধু এই ঘটনার আতিশয্যেই এই উপন্যাসের সমস্ত সম্ভাবনা নিহিত হয়ে অপেক্ষা করছিল। এইখানে যোগাযোগের তুলনায় বিষয়গত গভীরতার ন্যূনতা। এ ধরনের ঘটনাচক্র এবং অদৃষ্টের আকস্মিক দুর্যোগ যোগাযোগে অনুপস্থিত। মধুসূদন একদা পুণ্যবন্ত ও অধুনা পাপাসক্ত নীতিশাস্ত্রপড়া যুবক নয়। উপন্যাসের

সমস্কারস্ত তথাকথিত নৈতিক কেন্দ্রবিন্দু থেকে নয়। কুমুর কাছে এবং মধুসূদনের কাছে জীবনের মানে পৃথক, সমস্কারস্ত এখানে। মধুসূদন এবং কুমু পরস্পরকে পরিহার করতে চাইলে সমস্কার কোনো অস্তিত্বই সম্ভব হত না। এখানে এরা দুজনে পরস্পরকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিতে চায়। তার পথে যে বাধা দুর্লভ হয়ে রয়েছে এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু হল সেই বাধার সঙ্গে যুদ্ধের কাহিনী। সে-বিচারে এ উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে লেখক অপার নৈতিক সচেতনতার বা moral awareness-এর পরিচয় দিয়েছেন। সেটা হল : আমরা ভালবাসতে চাইলেই যে ভালবাসতে পারব এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আসলে ব্যক্তিমানস একটি জটিল সৃষ্টি। সেই ব্যক্তিমানসের সারীভূত রূপ হল ব্যক্তিত্ব। আমাদের নিভৃত ভালবাসার অধ্যায় রচনার ক্ষেত্রেও সেই স্বতন্ত্র ব্যক্তিমানস তার ভূমিকা হারিয়ে ফেলে না। কুমুর অভিজ্ঞতার মূল্য এ কারণেই ভ্রমরের অভিজ্ঞতা থেকে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। এইসব সাহিত্যাদর্শের পাশে সাহেব বিবি গোলামের ছোট বোঁঠানের অভিজ্ঞতার প্রতিতুলনা যদি করা যায় তাহলে বোঝা যায় ছোট বোঁঠানের অভিজ্ঞতার মূল্য এদের তুলনায় কত স্বল্প। বিষয়বস্তু হিসাবে ছোট বোঁঠানের অভিজ্ঞতা লেখকের ব্যবহারের দোষে তাৎপর্যহীন হয়েছে। এ গল্পে অবশ্যই ছোট বোঁঠানের ব্যক্তিস্বরূপকে সামন্ত পরিবারের বধূত্বের ফ্রেমে ঠিক ভাবেই বসানো হয়েছে। কিন্তু ছোট বোঁঠানের কারুণ্য ভ্রমরের ট্রাজেডির পর্ষায়ে উঠতে পারল না লেখকের বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত দুর্বলতায়। স্বামীর ওপর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যে বধূটি মৃত্যুপান করে ও আত্মবিসর্জন দেয় তার নিঃসহায় কারুণ্যের মূল্য কতটা? নির্ধাতিত নারীত্ব বা জমিদার বাড়ির কেচ্ছা ছাড়া একে আর অন্য কোন্ তাৎপর্যে অর্থবান করে তোলা যাবে? নিজে মৃত্যুপানাসক্ত হয়ে স্বামীর কাছে বেগুনাদের বিকল্প রচনা করে ট্রাজিক মহিমা তবেই অর্জন করা যেত যদি নীতিবোধ সম্বন্ধে বোঁঠানের কোনো দৃঢ় স্পষ্ট চিন্তা ছিল এ সম্বন্ধে স্পষ্ট পূর্ব-প্রমাণ আমাদের হাতে থাকত। তবেই মৃত্যুপানের ভিতরে বোঁঠানের দ্বন্দ্বময় আতি রূপায়িত হতে পারত। এর অবতমানে যা হয়েছে তা হল সত্যিই চাকরের চোখে দেখা একটি বিশেষ জমিদার বাড়ির আভ্যন্তরীণ কেচ্ছা কাহিনী মাত্র।

আসলে বিষয়বস্তুটা ততক্ষণ লেখকের কাছে বিষয়বস্তু হয়ে উঠছে না যতক্ষণ না লেখক নিজে একটা জীবন-বিষয়ক বক্তব্যে পৌঁচেছেন। অমুক বইয়ের বিষয়বস্তু এই অথবা ঐ বইটার বিষয়বস্তুটা ভালো এসব কথা এই জগতই নিরর্থক। অতি

সাধারণ বিষয়ও বক্তব্যের টানে শিল্পময় হয়ে অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে। অসাধারণ বিষয়ও বক্তব্য বিরহিত অবস্থায় ব্যর্থ শিল্পকর্মের নজির হিসেবে কাজে লাগতে পারে। এই ভাবেই একটি ছোট ছেলে বা মেয়ের বড়ো হওয়ার বিষয় একজনের কাছে শৈশব অতিক্রমণের গল্প, আর একজনের কাছে যৌন চেতনা উন্মেষের গল্প, তৃতীয় জনের কাছে একট জগৎ ভেঙে গুঁড়িয়ে আর একটা জগৎ গড়ে ওঠার গল্প। জেন অস্টেনের ‘এমা’ উপন্যাসের subject matter হল বিবাহ—সেও এই ভাবেই শিথিল উক্তি। আমাদের দেখা দরকার subject matter বা বিষয়বস্তুর সাহায্যে লেখক ব্যক্তি-সমাজ এবং সম্পর্কের চলিষ্ণু রূপকে কী অর্থে বিশিষ্ট করলেন, কীভাবে রূপময় করলেন। সে বিশিষ্টতাতেই প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসের বিষয়।

•• চার ••

সে কারণেই বলা হয়ে থাকে যে উপন্যাসিকের বিষয়জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে তার সময়জ্ঞান, সমাজজ্ঞান, ইতিহাসজ্ঞান এবং ব্যক্তিমানসের জ্ঞান এই সমস্তের সারাংশ। সেই কারণেই বলা হয়ে থাকে যে উপন্যাসেই একমাত্র মানুষের সহস্র সম্পর্কের সূত্রগুলিকে উন্মোচিত করে দেখানো সম্ভব। এর মূলে রয়েছে পূর্ব পরিচ্ছেদে কথিত উপন্যাসের বিষয়বস্তু বা লেখকের বিষয়-চেতনা। বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে উপন্যাসিকের বোধ এবং চেতনার বিস্তার এবং গভীরতা উপন্যাসের প্রতিটি অংশেই অভিব্যক্তি লাভ করে থাকে। পার্সি লাবক তাঁর সুবিখ্যাত Craft of Fiction নামক গ্রন্থে উপন্যাসের ঘটনাংশের বা বর্ণনাংশের রূপায়ণ পদ্ধতিকে নানাভাবে শ্রেণী-বিভক্ত করেছেন। চিত্রাঙ্গ বর্ণনা বা pictorial treatment, দৃশ্যাঙ্গ বর্ণনা বা scenic treatment, নাট্যাঙ্গ বর্ণনা বা dramatic treatment প্রভৃতি নানা পদ্ধতির কথা উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের ভিন্ন উদাহরণও উপযুক্ত উপন্যাস থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের treatment বা বিষয় ব্যবহারও শেষ পর্যন্ত নির্ভরশীল লেখকের বিষয়বোধের বনিয়াদে। একই ধরনের ঘটনাংশ দুই ভিন্নধর্মী উপন্যাসে দুই জীবন-ব্যাপ্যার জন্মদাতা।

ওঅর অ্যাণ্ড পীস উপন্যাসে বডোদিনের রাত্রির নারী পুরুষের যথেষ্ট-সজ্জার কোতুক আর ম্যাজিক মাউন্টেন-এর Walpurgis Night-এর যক্ষ্মা-রোগীদের যথেষ্ট-সজ্জার রঙ্গরঙ্গ আপাতদৃষ্টিতে একই লক্ষণাক্রান্ত। নাটকের

রিলিফের মতো বড়োদিনের সন্ধ্যা এবং Walpurgis Night গাভীর্ষ-ঘন, ঘটনা ছায়াচ্ছন্ন এই দুই উপন্যাসে এনে দিয়েছে অবাধ মুক্তির সানন্দ অবকাশ। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের পটভূমিকায় স্থাপিত ওঅর অ্যাণ্ড পীস-এর কাহিনীর ঘটনাঘন অধ্যায়ে উক্ত ছদ্মসজ্জার রজনীতে নাট্যশার ওষ্ঠে গুন্ফাক্সন এবং তাতার সওয়ারের বেশ ধারণ, নিকোলাস, সোনিয়ার বরফ-হিম রাত্রে উদ্দামগতিতে প্লেজগাড়ির অশ্বধাবন তৎকালীন রুশিয়ার কামান-বিঘোষিত ইতিহাসে নবীনের অনিবার্য প্রাণাবেগের প্রতীক। শেষ পর্যন্ত যে জীবন নতজানু হয় না— এই প্রগল্ভ উল্লাসময় ঘটনাংশ তারই প্রমাণ। যক্ষ্মা হাসপাতালের মৃত্যু ছায়াচ্ছন্ন আকাশে Walpurgis Night (ম্যাজিক মাউণ্টেনে) এক রাত্রির জন্ম মৃত্যু-উপেক্ষী ব্যাধি-বিস্মৃতির বিলাসকে প্রশ্রয় দেয়। রোগীরা সেদিন কেউ বা সাজে থার্মোমিটার, কেউ বা সাজে ওষুধের রেখাক্ষিত শিশি। এরও আপাত-তাৎপর্য ওঅর অ্যাণ্ড পীস উপন্যাসের বড়োদিনের সন্ধ্যার তাৎপর্যের সঙ্গে সমতুল্য। কিন্তু অবশ্য স্বীকার্য সাদৃশ্যের সীমা এই পর্যন্ত। গৃঢ় ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দুই ঘটনাংশই ভিন্ন তাৎপর্যের অধিকারী। এ তাৎপর্য উভয় উপন্যাসের বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতেই মাত্র উপলব্ধি করা সম্ভব। নতুবা নয়।

Walpurgis Night এবং বড়োদিনের রাত্রি—এই উভয় সদৃশ ঘটনা উক্ত উপন্যাস দুইটিতে মূল প্রেমকাহিনীর একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। নিকোলাস এবং সোনিয়ার প্রেম এবং হান্স কার্স্টপ ও ক্লাভদিয়ার প্রেম কাহিনীর গতি এবং আবেগ সঞ্চারের কাজে উক্ত দুই রাত্রির বর্ণনা উপন্যাসিকের কাছে অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল। হান্স কার্স্টপ ও ক্লাভদিয়ার প্রণয় স্বাভাবিক এবং সাধারণ প্রণয় কাহিনীর পর্যায়ে পড়ে না। এই প্রেম কাহিনীর পটভূমিকা যক্ষ্মা হাসপাতাল। প্রেমের পাত্রপাত্রী দুজনও যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত। স্বভাবতই হান্স কার্স্টপ-এর প্রেমে morbidity বা রুগ্নতার আশঙ্কা সদা সর্বদা উপন্যাসে ছিল। কম বেশি করে টমাস মানকে এই রুগ্নতাকে পরিহার করার সংগ্রামে সারা উপন্যাসেই নিযুক্ত থাকতে হয়েছে। মানে-র অন্তর্ভেদী জীবনদৃষ্টি জীবনের বহিরঙ্গের সমস্ত রুগ্নতা, দুর্বলতা এবং খর্বতাকে ভেদ করে জীবনের সত্যস্বরূপের শুদ্ধতার সন্ধানকে এই উপন্যাসে শিল্পের উৎস বলে মনে করেছে। হান্স কার্স্টপ-এর সর্বতোমুখী জীবন সন্ধান—তা সে Herr settembrini-এর সঙ্গে মানবতাবাদ বিষয়ে তর্কের কচকচিতেই

হোক, অথবা ছরম্ব বরফপাতের রাত্রে একক পরিভ্রমণে হোক, কিংবা জীবতত্ত্ব বা উদ্ভিদতত্ত্বের গবেষণাতেই হোক—এই উপন্যাসে নানাভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। Walpurgis Night-এর ছদ্মাবৃত কৌতুকময়ী প্রগল্ভতার বর্ণনায় ক্লাভদিয়া এবং হান্স কাস্ট'প-এর প্রেমও তাই সেই বিস্তৃত জীবনান্বেষণের একটি অধ্যায় বলে পরিগণিত হবে। ম্যাজিক মাউন্টেন অবশ্যই টমাস মান-এর এবং এ যুগের একটি অগ্ৰতম মহৎ সৃষ্টি। এ সম্বন্ধে অবশ্যই দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু কখনো কখনো যেন মনে হয় যে টমাস মান ম্যাজিক মাউন্টেন রচনাকালে তার বিষয়বস্তুর সীমা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। একটা মহৎ উপন্যাসের বিষয়বস্তু হবার পক্ষে ম্যাজিক মাউন্টেন-এর বিষয়বস্তু যে সর্বাংশে উপযুক্ত নয় এই বোধ যেন টমাস মানকে সদাই পীড়িত করেছিল। তাই, দেখা যায় হান্স কাস্ট'প-এর অশ্বেষা, সর্বতোমুখী জীবন সন্ধান, প্রকৃতপক্ষে বিষয়বস্তুর দুর্বলতা শেষ পর্যন্ত পরিহৃত হয়েছে। মান জানতেন যে ওমর আণ্ড পীস-এর লেখকের মতো তাঁর হাতে কোনো ঘটনার ঘনঘটাচ্ছন্ন বিষয় নেই। স্মৃতিরাজ যক্ষ্মানিবাসের মিত-পরিসরে জীবনের নানা বর্ণকে প্রতিফলিত করার দুঃসাধ্য ব্রত তাকে পালন করতে হবে। হান্স কাস্ট'প-এর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সেই জীবনের বহুধাবিস্তৃত অভিজ্ঞতার মূল্যও নিরূপিত হবে। সমগ্র উপন্যাসটি এই ছকে নির্মিত। উপন্যাসিকের স্মৃষ্টিশীল চৈতন্য শেষ পর্যন্ত উপন্যাসে যে-জীবন-ব্যথার জনক এ উপন্যাসে সেই শৃঙ্খলা এবং জীবন-ব্যথা দুইয়েরই সাক্ষাৎ মেলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এবস্থিধ বিষয় মান-এর পক্ষে অস্ববিধাজনক হয়েছিল এ কথা অনস্বীকার্য। এ উপন্যাসের বিরুদ্ধে যে গুরুভার পণ্ডিতীয়ানার অভিযোগ ওঠে তার উৎস এখানেই। স্মৃতিরাজ মান-কে এই অস্ববিধা অতিক্রম করার জন্য উপন্যাসের পটভূমিকায় আনতে হয়েছে ইওরোপীয় মহাকাশের বিস্তৃতি। বিষয়বস্তুর যা অস্ববিধা তাকে তিনি অতিক্রম করেছেন পটভূমিকাকে অগাধ-বিস্তারের তাৎপর্য-প্রদানের ভিতর দিয়ে। উপন্যাসে বর্ণিত যক্ষ্মা-হাসপাতালকে সংকটাপন্ন ইওরোপীয় সংস্কৃতির রূপকে ধারণ করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যেই। নানা দেশ থেকে আগত রোগীবৃন্দের সমাহারে বিরচিত পরিবেশে তাই বারে বারে ইওরোপের বিরাট ভাবাকাশের প্রতিবিন্দু প্রতিফলিত হয়েছে। ম্যাজিক মাউন্টেন-এর দূরস্থিত মানমন্দির উক্ত ভাবাকাশের গ্রহসংস্থান অবলোকনের জন্য উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ-ভূমি। শেষ

পর্যন্ত মানুষেই মুক্তি হান্স কার্টপ-এর এই সিদ্ধান্তের জন্য পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ঘনায়মান সংকটকে যক্ষ্মা হাসপাতালের জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে নানাভাবে ব্যবহৃত করা হয়েছে। হের সেটেমত্রিনি এবং তার বন্ধু নাস্তা-র ভূমিকা এবং ক্লাভদিয়া আর হান্স কার্টপ-এর প্রেমের আখ্যান এই সমগ্র ব্যাপারেরই এক একটা অংশ। পটভূমির পরোক্ষ বিস্তৃতিসাধন না ঘটালে ম্যাজিক মাউন্টেন-এর সমস্ত কাহিনী কেবল রোগী এবং রোগের কাহিনী বলে পরিগণিত হত।

সুতরাং বলা চলে যে ক্লাভদিয়া এবং হান্স কার্টপ-এর পরস্পর সম্পর্ক প্রচলিত অর্থে নরনারীর প্রেম-সম্পর্ক মাত্র নয়। সে কারণেই কানিভ্যাল-রাত্রির প্রগল্ভতার অন্তর্নিহিত কারুণ্য হান্স কার্টপ-এর জীবনদর্শনকে উপলব্ধি করার পথে বড়ো সহায়। হত-ভবিষ্য হান্স কার্টপ যেন হত-ভবিষ্য মানবতারই প্রতিভূ। সে যখন বলে যে ঐ রাত্রের মুখোশধারী চপলতার অন্তরালে Thou had the full sway তখন তা প্রকৃতপক্ষে আশ্রয় যাজ্ঞ। ক্লাভদিয়া-র কাছে সেই প্রবাসী আত্মার মিনতিই সে পরোক্ষে ব্যক্ত করেছিল। একদিক দিয়ে সভ্যতা মানুষকে প্রবাসীর যন্ত্রণাই দিয়েছে। কিন্তু তার অসঙ্গতি এইখানে যে সে আর সেই যন্ত্রণাকে পরিহার করার জন্যও কোনো ফলপ্রসূ প্রেরণা অনুভব করে না। যেমন হান্স কার্টপও আর সমতল ভূমিতে নেমে যেতে কোনো তীক্ষ্ণ ইচ্ছা বোধ করে না। সে ভেবেছিল ক্লাভদিয়ার প্রেমে সে খুঁজে পাবে জীবনার্থ। ক্লাভদিয়া চলে যাবার পর তার জন্য প্রতীক্ষাকেও তার তাই মনে হয়েছে। এই প্রেমকাহিনীর Carnival-অধ্যায় (Walpurgis Night) এবং পরে Peeper corn-এর অধ্যায়ে জীবনের সেই জটিলতার যন্ত্রণাই বিধৃত। কানিভ্যাল রাত্রি সেই মানুষ এবং মানুষের ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন যুবকের মনে যন্ত্রণাকে প্রেমের রূপ দিয়েছিল। হান্স কার্টপ-এর যে-অভিজ্ঞতা উপন্যাসের বিষয়বস্তু, উপন্যাসের প্রেমের আখ্যানভাগও সেই বিষয়-মাহাত্ম্যেই সমৃদ্ধ এবং অনন্ত।

এইভাবে উপন্যাসিকের বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক জীবন-ব্যাখ্যা উপন্যাসের প্রতি অংশে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। ক্লাভদিয়ার উপবেশন ভঙ্গি থেকে শুরু করে সব কিছুই হান্স কার্টপ-এর হামবুর্গীয় ভ্রম্যনার ঐতিহ্যবিরোধী। এতৎ সত্ত্বেও যে ক্লাভদিয়ার প্রতি হান্স কার্টপ আকর্ষণ অনুভব করেছে উপন্যাসের মূল প্রতিপাত্য থেকে এই ক্ষুদ্র ব্যাপারটিও বিচ্যুত হয়। জীবন-

ব্যাখ্যাহীন বা অদার্শনিক লেখকের রচনাতেই কেবল দেখা যায় যে উপন্যাসের গোটা কাঠামোয় প্রেমের ঘটনাংশ ভারসাম্যের ব্যত্যয় ঘটায়।

অবশ্যই ওঅর অ্যাণ্ড পীস উপন্যাসে বডোদিনের সন্ধ্যার বর্ণনায় টলস্টয়কে মানে-র মতো বিষয়বস্তুগত অন্ত্রবিধা ভোগ করতে হয়নি। পটভূমিকার পরোক্ষ বিস্তৃতি বা বিষয়বস্তুর রূপক নির্মাণের জ্ঞান সতত জাগ্রত প্রয়াসের বোঝাও টলস্টয়ের ছিল না। এ উপন্যাসের প্রাণশক্তির মূল রহস্য স্বগত বিশ্লেষণে বা বিদগ্ধ আলাপনের উজ্জ্বল আলোকসম্পাতে নয়। ঘটনানু-ক্রমিকতায় ওঅর অ্যাণ্ড পীস-এর শিল্পরস নিহিত হয়ে রয়েছে। এবং উপন্যাসটির এই সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য লেখকের বিষয়গত বক্তব্যেরই প্রতিফলন। যেখানে উদ্দেশ্য উদাসীন মহাকাালের পদক্ষেপকে ইতিহাসের বৃহৎ ক্ষুদ্র ঘটনায় প্রতিবিম্বিত করে তাবই প্রভাবকে ব্যক্তি জীবনের সুখে-দুঃখে অনুভব করানো—সেখানে এই সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন স্বতঃস্বীকার্য। বডোদিনের সন্ধ্যার যথেষ্ট-সজ্জাব বর্ণনাকেও এই নিরিখেই বিচার করতে হবে।

এই ঘটনাংশের পূর্বে এনড্রুর প্রবাস জীবনকে অবলম্বন করে নাট্যাশার যন্ত্রণা কোন্ তীব্রতাব আবর্তে পড়েছিল সে কাহিনী কথিত হয়েছে। যে কোনো মর্মদাহী যন্ত্রণা মানুষকে পরিশুদ্ধ করে—এই টলস্টয়ী বিশ্বাস এখানেও শিল্পকর্মের মূল প্রেরণা হিসাবে ক্রিয়াশীল। যন্ত্রণাব পরবর্তী অধ্যায়ে নাট্যাশার শান্তশুদ্ধ মূর্তি বডোদিনের রাত্রিব সাধারণ মানুষের আনন্দাবেগের সহজ ধারায় স্নান করে মনের পক্ষাঘাতকে অতিক্রম কবল। এই মানসিক বিহ্বলতাকে অতিক্রম না কবলে নাট্যাশার প্রেমের সংকট (আনাতোল অধ্যায়) উপন্যাসে উপস্থাপিত হতে পারে না কিন্তু তাই বলে এটা কোনো সাধাবণ উপন্যাসের যান্ত্রিক চাতুর্য নয়। জীবন বসোচ্ছল নাট্যাশা চরিত্রের জায অনুসারে এটা তার জীবনের স্বাভাবিক গতি বলে প্রতিভাত হয়। বডোদিনের সন্ধ্যায় নাট্যাশার পুনরুজ্জীবন পরবর্তী আনাতোল অধ্যায়েই পরোক্ষ প্রস্তুতিপথ। এইভাবে যন্ত্রণা থেকে অধিকতর যন্ত্রণায় না উত্তীর্ণ হলে শুদ্ধ থেকে অধিকতর শুদ্ধতার পথের পথিক হওয়া যায় না। বডোদিনের বাত্রি নাট্যাশার জীবনের যন্ত্রণার দুই স্তরের মধ্যবর্তী এক সহজ আনন্দের সঞ্জীবনী অধ্যায়।

সোনিয়া এবং নিকোলাসের দিক দিয়ে দেখলেও এই বডোদিনের সন্ধ্যার তাৎপর্য তাদের প্রেমের প্রসঙ্গেই অনুধাবনীয়। বডোদিনের সন্ধ্যায় সোনিয়া এবং নিকোলাসের প্রেমের ঘনীভূত অধ্যায়ের পরেই এই প্রণয়ীদ্বয়ের প্রেমের সংকট

বিবাহ সমস্তার রূপ ধারণ করে দেখা দেবে। সেই সংকটের প্রত্যক্ষ প্রস্তুতিপর্ব বডোদিনের আবেগময় সন্ধ্যার পলাতক মুহূর্তে। ভবিষ্যৎ দর্শনের দর্পণে সোনিয়া কিছুই দেখেনি। যা সে দেখেছে তা শুধু শূন্যতা। কিন্তু নাট্যাশাব ব্যাকুল আত্মানে সে মধুর মিথ্যা ভাষণে রত হয়েছে। বলেছে—এনড্রুকে দেখেছি শায়িত কিন্তু সানন্দচিত্ত। এখানে সোনিয়াব শূন্য ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে।

ওসর অ্যাণ্ড পীস উপন্যাসে বডোদিনের সন্ধ্যাব মতো আনন্দে নিটোল সন্ধ্যা আব দ্বিতীয়টি নেই। সমগ্র উপন্যাসে জীবনের সরু মোটা দুই তাব জড়িয়ে যাওয়াব বেদনা সর্বত্রই সমুপস্থিত। বডোদিনের সন্ধ্যার এক উজ্জ্বল বর্ণ-সমাবোহ সে হিসাবে সাবা উপন্যাসে একক। এই সন্ধ্যাই সেই স্থখের গিবিচুড়া—এবং নাট্যাশা ও সোনিয়াব প্রেমের সংকটের উপোদ্ঘাত। এব পবেই সংকটের আবর্তের দিকে অবতরণ।

•• পাঁচ ••

এ সব উদাহরণ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে আত্মাতীন দেহ যদি বা সম্ভব, বক্তব্যহীন উপন্যাস কদাচ সম্ভব নয়। বক্তব্যহীন উপন্যাস উপন্যাসই নয়। উপন্যাসের বিষয়বস্তু লেখকের জীবনার্থের ধাবক এবং পোষক। বিষয়বস্তু মযাদা নিকপিত হবে তা কতখানি লেখকের জীবনদর্শনের প্রতিফলন সেই মাপকাঠিতে। সে-কারণেই অশ্লীল বিষয় বলে কোনো কথা সার্থক উপন্যাসের আলোচনাকালে উত্থাপিত হতে পারে না। যে বিষয়বস্তুকে অশ্লীল বলে মনে হচ্ছে তা যদি লেখকের বিস্তৃত জীবন-সংক্রান্ত গভীর বক্তব্যের অংশীভূত হয় তবে তা কোনো মতেই অশ্লীল পদবাচ্য নয়। উপন্যাসের প্রতিটি অংশ—ঘটনা, চরিত্র, বর্ণনা—সকল কিছুই উপন্যাসের নির্দিষ্ট শিল্পকর্মের অংশ—পক্ষান্তরে গোটা শিল্পকর্মটাই এক অখণ্ড মূর্তি ধারণ করতে পারে লেখকের জীবন বিষয়ক বক্তব্যকে প্রকাশ করার তীব্র প্রেরণায়। কাজেই উপন্যাসে সেই বক্তব্যের প্রসঙ্গের বাইরের যা কিছু তাই কুশিল্প অথবা অশিল্প—তাই অপ্রকাশ্য।

•• ছয় ••

এবং এই বিচার-দৃষ্টিতেই বর্তমান শতাব্দীর মনোভূমি-প্রধান বা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তু মূল্যও অনুধাবনযোগ্য। আমরা জানি যে গত

শতাব্দীর প্লট-নির্ভর বা ঘটনাত্মক উপন্যাস আর এ শতাব্দীর অনুভূতি-সঞ্চারী উপন্যাসে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। এও জানি যে গত শতকের উপন্যাসের লক্ষ্য ছিল যেখানে নায়ক-নায়িকার জীবন-বৃত্তান্তকে, তাদের অভিজ্ঞতাকে বিধৃত করা, এ শতাব্দীতে সেখানে নায়কের চেতনার স্রোতস্বিনীর নানা তরঙ্গ-শীর্ষে প্রতিফলিত চিন্তার আলোকরশ্মিকে পাঠকের সম্মুখে স্পষ্ট করাই উপন্যাসিকের লক্ষ্য। কাজেই বাস্তবের মায়া সৃজনের জন্য নির্বাচনশীল হওয়ার ঝোঁক এখনকার উপন্যাসিকের নেই। বরঞ্চ তিনি যে নির্বাচনশীল নন—এই মায়া সৃজন করতে পারলেই অনুভূতির শতমুখী সামগ্রিক চেহারা পরিস্ফুট হতে পারে।

সুতরাং নায়কের অনুভূতিই এখানে বিষয়বস্তু। স্বভাবত সে অনুভূতি নায়কের অভিজ্ঞতার নামান্তর বাতীত আর কিছু নয়। Every thought is a part of a personal consciousness—সুতরাং চিন্তার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের প্রতিফলনের ভিতর দিয়ে পুরো ব্যক্তি-চেতনার আভাস মেলে। যেহেতু ব্যক্তি-চেতনা স্বয়ংস্ব ব্যাপার নয়, সমাজ এবং সভ্যতার বিশেষ অবস্থার সঙ্গে ব্যক্তির যোগফল হল ব্যক্তিচেতনা, তাই শেষ পর্যন্ত একটি ব্যক্তিচেতনার মুকুরে সভ্যতার চেহারাকেই আমরা প্রত্যক্ষ করি। সভ্যতা এবং সমাজের একটি বিশেষ অবস্থা এখানে একটি পরোক্ষ পটভূমির মতো বিরাজমান।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে গেলে বলতে হয় যে আধুনিক উপন্যাস যদিও অতিকায় বিষয়ভারে মন্থরগতি বিপুল গ্রন্থ আর নয়, তথাপি যে বিশেষত্ব নিয়ে শিল্পরূপ হিসাবে উপন্যাসের আবির্ভাব আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস সে বৈশিষ্ট্যে বঞ্চিত নয়। মনের সমগ্র চেহারায় সভ্যতারই সমগ্র চেহারা সেও আঁকতে চায়।



উপন্যাসের ভাষারীতি

উপন্যাসের শিল্পরূপ সর্বার্থসাপেক্ষ বলে কাহিনী, কবিত্ব, নাট্যরস এবং বর্ণনা একই উপন্যাসের পরিসরে পরস্পর-নিবদ্ধ। এ কারণে এবং উপন্যাসের অবাধগতি সর্বত্রচারিতার দিকে দৃষ্টি রেখেই বলা যেতে পারে যে সাহিত্যের সকল শাখার মধ্যে উপন্যাস সর্বাপেক্ষা গণতন্ত্রী। আপন বলিষ্ঠ প্রাণবন্তায় কাহিনী, কবিত্ব, নাট্যরস সকল কিছুকে কৃষ্ণিগত করে উপন্যাস নিজ স্বরূপে বিশিষ্ট। উপন্যাসের ভাষাও তাই বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষরে চিহ্নিত। উপন্যাসের অনুজ্ঞা বহন করে কখনো বা কাবোর মতো গভীরগামী, কখনো বা মস্তুর এবং গম্ভীর। বলাবাহুল্য উপন্যাসে ভাষার ভূমিকা সম্বন্ধে আমাদের সমালোচনা এখনো তাদৃশ সচেতন নয়। উপন্যাসের ভাষা যে উপন্যাস-নিরপেক্ষ কোনো ব্যাপার নয়, ছাপা ও বাঁধাইয়ের মতো পৃথক উচ্চারণে উপন্যাসের ভাষার প্রতি সমালোচকের কর্তব্য শেষ হয় না—আমাদের আলোচনায় এখনো এ কথাটা অপরিষ্কৃত অথবা অর্ধ পরিষ্কৃত।

কারণ, উপন্যাসের ভাষা সম্বন্ধে আমাদের ঔপন্যাসিকের ধারণাও নাতিস্বচ্ছ। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং হয়তো আর মাত্র দুজন ব্যতিরেকে আমাদের সমুদয় ঔপন্যাসিককুল কখনো উপন্যাসের ভাষাকে ভেবেছেন ভারবাহী পশু—উপন্যাসের ঘটনা বহন করাই তার কাজ, কখনো ভেবেছেন একে অযথা আবেগ প্রকাশের কাব্যিক রাজপথ, কখনো ভেবেছেন বর্ণাঢ্যতায় বুঝি এর কাব্য, কখনো ভেবেছেন বর্ণাঙ্কতায় এর বাস্তবতা। অথচ গল্প এ-যুগের শক্তিশালী মাধ্যম। ইংরাজি সাহিত্যের ঊনবিংশ শতাব্দীতে কাব্য সাহিত্যের সঙ্গে গল্প সাহিত্যের ব্যবধান ছিল যতটা স্তূর পরবর্তী শতাব্দীতে এবং বর্তমানে গল্প স্বীয় গতিশীল

ভূমিকার সাহায্যে কাব্যকে ততখানিই নিজ সীমার মধ্যে আকর্ষণ করে সে ব্যবধানকে করে তুলেছে ক্ষীয়মাণ। কাব্য যেদিন থেকে গল্পকে নিজ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করল গল্পের সর্বগ্রাসী শক্তির প্রতি সেই দিনই সে জানিয়েছে প্রথম প্রণতি। এ-যুগের সমস্ত কাব্য প্রয়াসের মূলকথা গল্পের ব্যাপক শক্তির বিস্তারকে আয়ত্ত করা, কিংবা তার সঙ্গে আপস করা।

কিন্তু উপন্যাসের বা গল্পসাহিত্যের ভাষা সর্বগ্রাসী বলেই যথেষ্টাচারী নয়। বরঞ্চ দেখা যায় যে কবিতারই মতো উপন্যাসের ভাষাও স্রষ্টার কল্পনার এক অলিখিত অন্তশাসনের সূত্রে বাঁধা। সেখানেও ভাষা ব্যবহারের তুচ্ছাতুচ্ছ নিদর্শনে লেখকের ঔপন্যাসিক রস-সজ্জানের অব্যর্থ লক্ষ্যের কথাই প্রমাণিত হয়। লেখকের জীবনদৃষ্টি এবং দর্শনের সঙ্গে ভাষার ওতপ্রোত সম্বন্ধ। বাক্য যোজনায়, শব্দ-প্রয়োগে, বর্ণনায় এবং চিত্রকল্প-নির্মাণে সর্বত্রই ঔপন্যাসিকের বৃহৎ কল্পনা ক্রিয়াশীল বলেই সমালোচনায় বহুধাবিস্তৃত ব্যবহারে এরাও নবনব তাৎপর্যের স্রোতক। এবং উপন্যাসের ভাষার এই ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনাকালে হার্ডির মতো বিধুর কবিপ্রাণ ঔপন্যাসিকই যে আলোচনার বিষয়ীভূত তা নয়—ডিফোর মতো গল্পময় অথবা কন্‌রাডের মতো এপিক-লক্ষ্য ঔপন্যাসিকও এ জাতীয় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য। আসলে উপন্যাস যদি শুধু গল্প বা কাহিনী মাত্র না হয়, বালিকা বা কিশোরীদের অবসর বিনোদের বিন্ময়বিলাস না হয়ে সে যদি সার্থক শিল্পসৃষ্টির কাছাকাছিও যাবার প্রয়াসী হয়—উৎকৃষ্ট রস-কল্পনা এবং শিল্পগত নৈতিক দীপ্তি যদি উপন্যাসের অভিপ্রায় হয়, উপন্যাসের ভাষায় সেক্ষেত্রে একটা অথও কল্পনার ছাপ পড়বেই।

ঔপন্যাসিকের কল্পনা এবং লক্ষ্যের সঙ্গে তাঁর ভাষার সম্পর্ক কী সে-কথা নানা ভাবে বিভিন্ন বিদেশী সমালোচক দেখিয়েছেন। আমাদের বর্তমান আলোচনায় সেই সমস্ত উদাহরণের কিঞ্চিৎমাত্র পরিচয় গ্রহণ করে আমাদের উপন্যাস আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাবে। এ পরিচয় গ্রহণের প্রয়োজন সাহিত্য বিচারে বহিঃপ্রবণতার অভিযোগের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্ত।

সার্থক উপন্যাসের ভাষা ঔপন্যাসিকের অথও কল্পনার কতখানি দৃঢ়বদ্ধ অনুবর্তী তা ডিফোর রবিনসন ক্রুশো উপন্যাসের আলোচনাকালে জনৈক সমালোচক দেখিয়েছেন। রবিনসন ক্রুশোর বিষয়বস্তু ডিফোর কল্পনাকে গভীরভাবে বিধৃত করে রাখতে পেরেছিল বলেই এমনটা ঘটেছে। প্রসঙ্গত ঝড় ও নৌ-বিপর্যয়ের পর ভাঙা জাহাজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আহরণ করার জন্ত ক্রুশোর দ্বিতীয়

বার যাওয়া এবং ধীপে পুনরায় ফিরে আসা উল্লেখযোগ্য।

I was under some apprehensions during my absence from the land, that at last my provisions might be devoured on shore, but when I came back, I found no sign of my visitor, only there sat a creature like a wild cat upon one of the chests which, when I came towards it ran away a little distance, and then stood still. She sat very composed and unconcerned, and looked full in my face, as if she had a mind to be acquainted with me. I presented my gun at her, but as she did not understand it, she was perfectly unconcerned at it, nor did she offer to stir away, upon which I tossed her a bit of biscuit and she went to it, smelled of it and ate it. শুধু বর্ণনার যথাযথই উদ্ধৃত অংশের একমাত্র 'আকর্ষণ' নয়। এই বিষয়টি সত্যই কৌতূহলের উদ্রেক করে যে ভাষার এই লক্ষ্যভেদী অব্যর্থতা একটা উপন্যাসের বিরাট এবং কখনো কখনো অসংহত পরিসরে কী করে বহন করা হয়। ক্রুশোব দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগের জগৎ devour ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ বিড়ালের বিস্কুট ভক্ষণের জগৎ eat ক্রিয়াই যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে। এটা কেবল বাগ্‌বিলাস নয়। যেখানে ক্রুশোব সমগ্র সত্তাব প্রশ্ন জড়িত সেখানে eat অপেক্ষা শক্তিশালী devour-এর সন্ধান করা হয়েছে। আবার tossed এই ক্রিয়ার ব্যবহাবটিও লক্ষ্য করার মতো। Tossing-এর পরিবর্তে throwing ব্যবহার করা চলত বটে কিন্তু toss করার মধ্যে ক্রুশোব কৌতুকপ্রীতি এবং আপাত শান্ত মনের পরিচয় রয়েছে। সামুদ্রিক বিপদের পবই ক্রুশোব মনে ছুরন্ত অ্যাডভেঞ্চারের অধ্যায় শেষ হয়েছে, উপন্যাসেও। এব পব শুরু হবে পুনর্বসতির অধ্যায়। বিড়ালের ব্যবহাব তারই প্রতীক। কাজেই toss ক্রিয়া এখানে সেই তাৎপর্যেই প্রযুক্ত হয়েছে। হয়তো এতখানি পুঙ্খানুপুঙ্খতা সত্যই বহিঃসঙ্গ বিচার কিন্তু উপন্যাসের সমগ্র পরিকল্পনার পটভূমিকায় যখন উপন্যাসের ভাষা ব্যবহাবের প্রশ্ন আলোচিত হয় তখন তা উপন্যাসের মৌল বক্তব্যকেই নব নব ভাবে আলোকিত করে। এদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে উপন্যাসের ভাষা-বিগ্রাস যে উপন্যাসের তারতম্যের সঙ্গেই জড়িত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। ডিফোর দীর্ঘ বাক্যাবলী,

বাক্যের বিলম্বিত লয় রবিনসন ক্রুশোর মতো truth-teller জাতীয় উপন্যাসের প্রয়োজনীয় বিশ্বাস্যতা সৃষ্টির পক্ষে উপযোগী ভাষা।

অবশ্যই ভাষা-রীতি উপন্যাসের সমগ্র রীতি বা রচনাধর্ম থেকে পৃথক কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু এটাও একটা প্রাথমিক সত্য কথা যে, ব্যক্তি এবং সমাজ চেতনার সমগ্র মহিমাকে লেখক তাঁর ভাষা-রীতির আধারেই ধরে রাখেন। কী করে রাখেন, গল্প সাহিত্য কেমন করে সাহিত্যের দীর্ঘ কালগত ঐতিহ্যকে অধিকার করছে, উপন্যাসের গল্পের ধর্ম কী এবং মহৎ ঔপন্যাসিক কী ভাবে সে ভাষাকে ব্যবহার করেন—সচেতন পাঠকের কাছে সেটা একটা বিশেষ মনোনিবেশের বিষয়। মনস্তত্ত্বমূলক অথবা রোমান্টিক অথবা রবিনসন ক্রুশোর মতো truth-teller যে জাতীয় উপন্যাসই হোক না কেন, বিভিন্ন ধরনের উপন্যাসের জগৎ স্বভাবতই ভাষার বিভিন্ন বিত্তাস, বিভিন্ন ভঙ্গি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। উচ্চধ্বনিময়, পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতাপরায়ণ বিশেষণ সমন্বিত বর্ণাঢ্য গল্প কখনোই ডিফোর উপন্যাসের ভাষা হতে পারে না। বলা হয়ে থাকে ক্রুশো ‘নতুন মানুষ’ এবং অষ্টাদশ শতকীয় ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রতিভা, বলা হয়ে থাকে ক্রুশো প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর বিলয় এবং নতুন উৎপাদন শক্তির উন্মেষের কালের যোগ্য প্রতিনিধি। সেই জগৎই ক্রুশোর কাহিনীর জগৎ যে ভাষা ব্যবহৃত হয় তার লক্ষ্য গণতান্ত্রিকতা—ডিফোর ভাষায় যে সমালোচকেরা বলেছেন অ্যাংলো-স্নাকসন উপাদান বেশি, মনে হয় তারও মূলে এই সর্ববোধগম্যতা এবং সর্বজনবিশ্বাস্যতা উৎপাদনের প্রয়াস। ডিফোর বর্ণনা-রীতিও সেই আদর্শেই বিশিষ্ট।

কিন্তু বিভিন্ন ধরনের উপন্যাসে বিভিন্ন ধরনের ভাষাব্যবহার লক্ষ্য করা গেলেও মোটামুটি এক জায়গায় ঔপন্যাসিককুলবে মিলিত হইতেই হয়। সেটা হল উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষার ভূমিকার ক্ষেত্রে। (উপন্যাসের ভাষা জীবনের বাস্তবতা এবং জীবনের কাব্য দুইকেই ধারণ করে।) আর যেহেতু উপন্যাস যে-কাব্যের সন্ধানী তা বাস্তবতার অতিরিক্ত কিছু নয়, লেখকের অভিজ্ঞতার নিয়ামাত্র নয় সেহেতু বাস্তবতার স্বরূপ উদ্ঘাটনকালেই উপন্যাস-লেখক জীবনের কাব্যকে অধিগত করে থাকেন। কাব্যিক মানুষ অথবা নাটকীয় মানুষ নয়, পূর্ণ মানুষটাই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য। তার কমিষ্ট অস্তিত্বকে সমগ্রভাবে রূপায়িত করতে গিয়েই উপন্যাস-শিল্পের জন্ম। উপন্যাসের ভাষাকে তাই উভচর হতে হয়। গল্পের স্থল এবং কাব্যের জল উভয়তই তাকে হতে হয় অবাধগতি।)

রাম দাড়ি কামাচ্ছে, বাজার করছে, দৈনন্দিনের নানান কাজ করছে এও যেমন সত্য, রামের জীবনের আবেগময় মুহূর্তগুলিও তেমন সত্য। পূর্ণাবয়ব জীবিত-কল্প রামকে আঁকতে গেলে ঔপন্যাসিককে নিজ প্রয়োজনে এমন ভাষা গড়ে নিতে হয় যা তাঁকে উভয় ক্ষেত্রেই সাহায্য করবে।

এবং এই উভচর বৃত্তিতে ঐক্যবদ্ধ সাবলীলতায় উপন্যাসের গল্পের লাভণ্য। খুঁটিনাটি তুচ্ছ বিষয় বলতে বলতে জীবনগত কাব্যকে আবিষ্কার করবে এই গল্প। এই দুই পথায় এমনভাবে মিলেমিশে থাকে সার্থক উপন্যাসের গল্প ভঙ্গিতে যে কখনো মাটিতে আছড়ে পড়লাম অথবা হঠাৎ বেলুনের মতো আকাশে উড়ে গেলাম এ জাতীয় বিসদৃশ অনুভূতি আমাদের পীড়িত করে না। মধ্যবিত্ত রুচিশীল ছাত্রী-নায়িকা এবং তার প্রেমকে অবলম্বন করে রচিত বুদ্ধদেব বস্তুর তিথিডোর উপন্যাসের ভাষার কারুকলা নিঃসন্দেহেই কৃতিত্বপূর্ণ। শুধু ক্রটি এইখানে যে এই ভাষার সীমাবদ্ধতায় বিজনের মতো বখাটে ছেলেকে ব্যক্ত করা যায় না। তিথিডোর উপন্যাসেও তা যাযনি। বুদ্ধদেবের উপন্যাসের ভাষা উপন্যাসের অতিরিক্ত বলেই তাঁর চরিত্রগুলি তাঁর গল্পভঙ্গির কীর্তিসাধক হয়ে থাকতে চায়। উপন্যাসের গল্পভঙ্গিও এটা একটা ক্রটি।

তা বলে নিশ্চয় ডিফোব গল্পময় বর্ণনার অতি অনুসরণকেই আদর্শ বলা হচ্ছে না। প্রত্যাহেব কর্মময় মানুষের বর্ণনা দিতে গিয়ে তার গল্পরূপটিকেই চিত্রিত করা উপন্যাসের কাজ নয়। এবং যদিও স্কটের ব্যর্থতা সম্বন্ধে আমরা সচেতন—হয়তো বেশি সচেতন—তথাপি স্কটের পক্ষে একটা কথা বলা হয়েছে যে তিনি Prose of life এবং Poetry of life-কে নিজ উপন্যাসে দাঁপবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রত্যেক সার্থক ঔপন্যাসিকই নিজ নিজ পন্থায় উপন্যাসের গল্পকে এই আদর্শে গড়ে নিতে চান। সে কারণেই উপন্যাসকার যদি তাঁর বর্ণিত বিষয়বস্তুতে গাঢ় রহস্যের উপাদান আছে এ-কথা বোঝাতে গিয়ে ‘অদ্ভুত’ ‘বিচিত্র’ ‘দুর্বোধ্য’ ‘অস্পষ্ট’ প্রমুখ বিশেষণে সে-কথা ব্যক্ত করতে চান তবে আমরা একথা গ্ৰাহ্যতাই মনে করতে পারি যে ঔপন্যাসিকেব কল্পনায় ক্রটি আছে। এবং সেই ক্রটিই উপন্যাসের বর্ণনায় ছায়াপাত করেছে। যেমন উৎকৃষ্ট কবিতায় কল্পনাকে বস্তুময় করে তোলা কবির কাজ তেমনি উপন্যাসের গল্পকেও যথার্থ লক্ষ্যভেদী করে তোলা ঔপন্যাসিকের কাজ। নায়িকা কেবল ‘হাহাকার’ কবলেই নায়িকার অস্তিত্বের যন্ত্রণাময় অস্থিরতা প্রকাশ পায় না। তা যদি পেত তাহলে জেবউরিসা চাষার মেয়ের মতো মাথা কুটিতে লাগিল—এই বর্ণনায় “চাষার মেয়ের

মতো” কথাটি কেবল উপমাবিলাস বলেই পরিগণিত হত।

(এই দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি আমরা আমাদের উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম দিককার নিদর্শনগুলিকে পরীক্ষা করি তাহলে কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য না করে উপায় থাকে না। আমাদের ঔপনিবেশিক জীবনের মজ্জাগত পঙ্গুতায় ক্রুশোর মতো নায়কের পরিকল্পনা সম্ভবপর ছিল না। কাজেই truth-teller জাতীয় উপন্যাস রচনায় আমরা কখনোই অভ্যস্ত হইনি। ইংরাজি সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘটনাগতপ্রাণ উপন্যাসের যে অভিজ্ঞতা উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ, ঔপন্যাসিকদের পিছনে ছিল আমাদের উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম দিকের দিকপালদের পিছনে এ জাতীয় কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। ডিফো, ফিল্ডিং-এর মতো গদ্যময় মানুষের কথা বলবার স্বেযোগ আমাদের ঘটেনি। আমাদের উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম প্রধান পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র। রোমান্সের এবং ভাবময় বীরোচিত পরিবেশের অঙ্গনেই তাঁর প্রথম পাঠ।)

সেই কারণেই বঙ্কিমের গদ্য মানুষের কর্মময় দৈনিকের চিত্রাঙ্কনে পরানুখ। সে গদ্য মানুষের আটপৌরে চেহারা আঁকতে চায় না। বস্তুত বঙ্কিমের অন্য উপন্যাসের কথা স্মরণ রেখেও বলতে হয় যে কপালকুণ্ডলার পরিবেশে এই উন্নীত গদ্য যে পরিমাণ স্বচ্ছন্দ হতে পেরেছে তেমনটি বোধ করি আর কোথাও নয়। এই রচনায় বঙ্কিমের গদ্য এবং তার কল্পনা যে সায়ুজ্য লাভ করেছে বঙ্কিমের উপন্যাসের অন্তর তা তুল্ভ। বাস্তবিক পারিবারিক এবং সামাজিক উপন্যাস-গুলিতে বঙ্কিমের ভাষার প্রধান ত্রুটি বলে যেটা পরিগণিত হবে সেটা হল আমাদের আটপৌরে জীবনযাত্রাকে সে ভাষা চিত্রিত করতে পারেনি। উনিশ শতকের আপিস-আদালতের কথা দূরে থাক একান্নবতী পরিবারের বিভিন্ন সম্পর্ক, কিংবা তার ঘাত-প্রতিঘাতকে বঙ্কিমচন্দ্র বরাবরই এড়িয়ে চলতেন। মানুষের গদ্যময় রূপ, তার কর্মিষ্ঠ চেহারা বঙ্কিমের কল্পনাকে স্পর্শ করত না। আসলে ডিফো-ফিল্ডিং-এর পর্যায় বাদ দিয়ে আমরা একেবারেই রোমান্টিক পর্যায় থেকে শুরু করেছি। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই যে মানুষের হৃদয়গত ভাববৈষম্যের বর্ণনায় বঙ্কিমী কল্পনা এবং ভাষা যে পরিমাণে সার্থক, বিরলরেখ জীবনের বর্ণনায় তা সেই পরিমাণেই বিফল। বঙ্কিমের যুদ্ধ বর্ণনা যে পরিমাণে সার্থক, গৃহস্থালী বর্ণনা যে পরিমাণে ব্যর্থ। সে সময়ের অন্য ঔপন্যাসিকদের প্রশ্ন এ-প্রসঙ্গেই উঠতে পারে। সে যুগের কর্মময় মধ্যবিত্তের কথঞ্চিৎ পরিচয় আমরা রমেশ দত্তের সামাজিক উপন্যাস ছুটিতে পাই। কিন্তু রমেশ দত্তের ঔপন্যাসিক

কল্পনা এবং তার গল্প আমাদের কল্পনা এবং প্রত্যয় কিছুই উৎপাদন করে না। এমন কি রমেশ দত্তের বহুবিধ প্রগতিশীল চিন্তা সম্বন্ধেও ইন্দিরাও আমাদের কাছে প্রিয়তর গ্রন্থ। কারণ রমেশ দত্তের বাচনিক প্রগতিশীলতা উপন্যাসকারের কল্পনার শুদ্ধ গভীরতা থেকে উৎসারিত হয়নি। শেষ পর্যন্ত সংসার ও সমাজ কেরিয়ারমুখী বাঙালী যুবকের কাহিনীই হয়ে দাঁড়িয়েছে। ‘গ্রামে থাকিলে উন্নতির সম্ভাবনা নাই’—এ ব্যক্তি স্বাভাবিক নয়, সামন্ত কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও নয়। সরল চাকুরি-প্রাণ মধ্যবিত্তের সহজ স্বীকারোক্তি। এভাবে সংসার ও সমাজ রমেশ দত্তের নৈতিক দীর্ঘ থেকে বঞ্চিত হয়ে উপন্যাসের কল্পনা ও ভাষাকে সীমিত এবং স্তিমিত করেছে। সেক্ষেত্রে বঙ্কিমই রমেশ দত্তের মতো সংসার ও সমাজ অথবা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো স্বর্ণলতা না লিখলেও নতুন কালের চিন্তায় ধৃত মানুষের যন্ত্রণাকে ধরতে চেয়েছিলেন। সে যন্ত্রণা তাঁর কল্পনাকে স্পর্শ করেছিল বলেই তার বর্ণনায় বঙ্কিমী-গদ্য কাব্যের প্রসাদগুণে বিশিষ্ট। বিষয়ক্ষেত্রীর কবলে পড়বার আগে কুন্দর বিশ্বলতার বর্ণনা লক্ষ্য করার মতো।

অট্টালিকার বৃহৎ অন্ধকারময় কায়া, আকাশের গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে। সেই অন্ধকার বেষ্টন করিয়া কুন্দনন্দিনী বেড়াইতে লাগিল। মানস, একবার নগেন্দ্রনাথের শয়নকক্ষের বাতায়নপথে আলো দেখিয়া যায়। একবার সেই আলো দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে।

তাহার শয়নাগার চিনিত—ফিরিতে ফিরিতে তাহা দেখিতে পাইল—বাতায়ন পথে আলো দেখা যাইতেছে। কবার্ট খোলা—সার্মী বন্ধ—অন্ধকার মধ্যে তিনটি জানেল। জলিতেছে। তাহাব উপর পতঙ্গজাতি উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে। আলো দেখিয়া উড়িয়া পড়িতেছে, কিন্তু রুদ্ধ পথে প্রবেশ করিতে না পারিয়া কাছে ঠেকিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। কুন্দনন্দিনী এই ক্ষুদ্র পতঙ্গদিগের জন্ত হৃদয়মধ্যে পীড়িতা হইল।

অথবা—

রাত্রি অন্ধকার, চারিদিক অন্ধকার, গাছে গাছে থলোতের চাকচিক্য সহস্রে সহস্রে ফুটিতেছে, মুদিতেছে, মুদিতেছে, ফুটিতেছে। আকাশে কালো মেঘের পশ্চাতে কালো মেঘ ছুটিতেছে—তাহার পশ্চাতে আরো কালো মেঘ ছুটিতেছে—তৎপশ্চাতে আরো কালো। আকাশে দুই একটি নক্ষত্র মাত্র, কখনো মেঘে ডুবিতেছে, কখনো ভাসিতেছে। বাড়ির চারিদিকে ঝাউ

গাছের শ্রেণী, সেই মেঘময় আকাশে মাথা তুলিয়া নিশাচর পিশাচের মতো দাঁড়াইয়া আছে। বায়ুর স্পর্শে সেই করালবদনা নিশীথিনী-অন্ধে থাকিয়া, তাহারা আপন আপন পৈশাচী ভাষায় কুন্দনন্দিনীর মাথার উপর কথা কহিতেছে।

অথবা—

এখন আলোকময় গবাক্ষ যেন অন্ধকার হইল। চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া চক্ষের জল মুছিয়া, কুন্দনন্দিনী উঠিল।..... নিশাচর পিশাচ ঝাউ গাছেরা সর্ব সর্ব শব্দ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল “কোথা যাও?” তালগাছ তর্ব তর্ব শব্দ করিয়া বলিল “কোথা যাও?” পেচক গম্ভীর নাদে বলিল “কোথা যাও?” উজ্জ্বল গবাক্ষশ্রেণী বলিতে লাগিল—“যায় যাউক, আমরা আর নগেন্দ্র দেখাইব না।”

এই অংশের বর্ণনাভঙ্গির সমস্ত কিছুই লক্ষ্য করার মতো। এর ভাষা এবং চিত্রকল্প দুই-ই তাৎপর্যপূর্ণ। ঘন ঘন দ্বিকুক্তি, কাটা কাটা বাক্যবিগ্ৰাস, কুন্দনন্দিনীর প্রায়-অপ্রকৃতিস্বতাব পক্ষে উপযুক্ত মাধ্যম। বঙ্কিমের গদ্যে এরূপ ক্ষেত্রে প্রায় কাব্যের স্পন্দন আসে। উদ্ধৃত অঙ্কুশেদের তৃতীয়াংশের গদ্য যেন গদ্যচ্ছন্দের নিকটবর্তী হয়েছে। প্রথমাংশের ‘অন্ধকার বেষ্টন কবিয়া কুন্দনন্দিনী বেড়াইতে লাগিল’ কুন্দ পারিকল্পনার মৌল ধারণার উপযুক্ত চিত্রকল্প। পতঙ্গের ব্যঞ্জনাও যে কোনো সাধারণ পাঠকের চোখে পড়বে। সর্বোপরি প্যাথোটিক ফ্যালাসি বা ব্যবহার সমগ্র বঙ্কিম রচনাবলীতেও এর চেয়ে অধিক সুপ্রযুক্ত কোথাও হয়নি। যেন একটা ঘনবদ্ধ কবিতার যথাবিহিত পরিণতিতেই এটা এসেছে।

কিন্তু এই প্যাথোটিক ফ্যালাসি, চিত্রকল্প এবং ভাষাবিগ্ৰাস শেষ পর্যন্ত কুন্দব কাব্যিক মূর্তির অতিরিক্ত কিছু গড়তে পারল না। আত্মহত্যার পূর্বমুহূর্তের আনা কারেনিনা আর উদ্ধৃত অংশের কুন্দনন্দিনীর প্রতিতুলনা করলেই এটা ধরা পড়ে। গোটা ব্যক্তিটা চিবকালই বঙ্কিমের চোখে হারিয়ে গেছে। এবং কল্পনার উচ্চগ্রামকে স্পর্শ করে না এমন সব কিছুকে পরিহার করতে গিয়ে বঙ্কিমকে জীবনের অনেকখানি বাদ দিতে হয়েছে। বিষয়ক্ষেত্রে জমিদার বাড়ির বর্ণনায় যে পরিমাণ যথাদৃষ্টং তথালিখিতং পদ্ধতি তিনি ব্যবহার করেছেন তাতে ঔপন্যাসিকের কল্পনা এবং জমিদার বাড়ির বাস্তবতা কোনোটাই নেই। তাই, যদিও বঙ্কিমের কল্পনা বঙ্কিমের নৈতিক চেতনায় দীপ্ত হওয়ায় তিনি তাঁর সমকালীন ঔপন্যাসিকদের স্কুল গদ্যের থেকে অনেক কার্যকরী গদ্য সৃজন

করেছিলেন—যেমন ‘সংসারের’ কলিকাতা বর্ণনা এবং ইন্দিরার চোখে প্রথম দেখা কলিকাতার বর্ণনার প্রতিলোম। এ-ক্ষেত্রে স্বরণ করা যেতে পারে—তথাপি বঙ্কিমের কল্পনা এবং ভাষা জীবনের গতিকে প্রায়ই হারিয়ে ফেলেছে। জীবনের কাব্যও যে এর ফলে সর্বত্র রক্ষিত হয়েছে তা নয়। ভ্রমরকে বাঁচানো গেলেও রোহিনীর জীবনের বাস্তবতার ভয়ে তার জীবনের কাব্যকে সমগ্রভাবে ধরা যায়নি। ইন্দিরার স্বামী কমিসারিয়েটের জুয়াচোর হয়ে থাকলে যে ইন্দিরাকেই ব্যর্থ হতে হয় এবং এভাবে জীবনের গতময় দিকটিকে যে ধরা যায় না বঙ্কিমের উচ্চকল্পনাচারী মনই তাঁকে সে কথা বুঝতে দেয়নি—এই উচ্চকল্পনাচারী মনকে যখনই একটু নিচু গ্রামে বাঁধতে চেষ্টা করেছেন তখনই তাঁকে কল্পনার অসঙ্গতির ফল ভোগ করতে হয়েছে। তবু যে ইন্দিরার গতভঙ্গি সংসার ও সমাজের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম বলে গণিত হবে ইন্দিরা চরিত্রের ইতিবাচকতাই তার মূলে।)

(উপন্যাসের পক্ষে যা কিছু প্রয়োজনীয়—সর্ববিধ বিষয়, এবং সবস্তরের মানুষ, তথা এর বিস্তৃতিতে নিয়ন্ত্রিত করার যোগ্য ভাষাই উপন্যাসের আদর্শ ভাষা। জীবন সম্বন্ধে লেখকের ইতিবাচক মনোভাব, জীবনের নৈতিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতনতাই উপন্যাসে উক্ত বিষয় ও চরিত্র নিয়ন্ত্রণের দৃঢ়তা সঞ্চার করে। আবার এই দৃঢ়তাই ভাষাব ক্ষেত্রেও ঘনীভূত হয়ে উঠে উপন্যাসকে ভাবে-রূপে সার্থকতা দান করে। কিভাবে করে ‘গোরা’ তার একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। গোরা উপন্যাসের প্রধান গুণ এর বিশাল পরিসরের সর্বত্রব্যাপী সূক্ষমতা। উপন্যাসের কল্পনা, ভাষা, ঘটনা-বিবৃতি এবং চরিত্র-চিত্রণ—সর্বত্র উপন্যাসিকের সামঞ্জস্যজ্ঞান শেষাবধি সমুপস্থিত। এই সর্বত্রব্যাপী সূক্ষমতার মূলে গোরা মৌল পরিকল্পনাই ক্রিয়াশীল। কাব্যিক মানুষ বা নাটকীয় মানুষ নয়, দেশকালের বিচিত্র বিবৃতিতে ধৃত গোটা মানুষকেই রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসের পটে ধরতে চেয়েছেন। ফলে কবিত্ব এবং নাটকীয়তা ভাষাবিবৃতিতে এই দুইয়ের কোনোটাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। গোরা গতরীতির প্রধান গুণ এই যে উপন্যাসের পরিমণ্ডলের সঙ্গে এ এমনভাবে একাত্ম হয়ে রয়েছে যে আনাদের মনোযোগের অগ্ৰাণ্য অংশকে এই ভাষাবিবৃতি কখনোই দাবি করে বসে না। উপন্যাসের আদর্শ গতবীতিতে এমন এক নিরাসক্ত প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে যে তার স্থিতিস্থাপকতা চমৎকৃত করে। চরঘোষপুরের নাপিত, হরিমোহিনী, কৈলাস, মহিম অথবা স্বচরিতা কারো জন্তই পৃথক কোনো ব্যবস্থা নেই—গোরারই মতো নির্ভীক এবং সর্বত্রচারী এই

গল্পরীতি । সেই জন্মই নাপিতের মুখেও রবীন্দ্রনাথ নিজের গল্পের ভঙ্গি তুলে দিতে ভীত হন না । অতি বিশেষীকরণের জন্য অকারণ বাস্তবতায় উপন্যাসের এপিক মর্যাদার লাঘব করেন না । সে দিক থেকে বাংলা উপন্যাসের গল্পরীতির কিছুটা পরিচয় নিতে গেলে আমরা দেখব যে উপন্যাসের গল্পের তাৎপর্য কমক্ষেত্রেই হৃদয়ঙ্গম করা হয়েছে ।

বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস আলালের ঘরের দুলালের ভাষায় যে ধরনের গল্পময় বাস্তবতা অঙ্কনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় সেই গল্পময় বাস্তবতা প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতা নয় । মাত্র বিষয়ানুগ বর্ণনা । যে-কোনো কারণেই হোক, উনবিংশ শতাব্দীর নব্য গল্পরীতিতে সামাজিক বাস্তবতাকে আবিষ্কার করার প্রয়াস সর্বদাই মাত্র বাস্তবের বহিরঙ্গ-বিশ্বস্ততা রক্ষার্থেই নিঃশেষিত হয়েছে । আলালের ঘরের দুলাল ও বিষবৃক্ষ থেকে দুটি নিদর্শন এ প্রসঙ্গে আলোকসম্পাত করতে সক্ষম ।—

বৈজ্ঞাটের বাবুরামবাবু বাবু হইয়া বসিয়াছেন । হরে পা টিপিতেছে । এক পাশে দুই-একজন ভট্টাচার্য বসিয়া শাস্ত্রীয় তর্ক করিতেছে—আজ লাউ খেতে আছে—কাল বেগুন খেতে নাই—লবণ দিয়ে দুধ খাইলে সত্ত গোমাংস ভক্ষণ করা হয় ইত্যাদি কথা লইয়া ঢেঁকির কচকচি করিতেছেন । একপাশে কয়েকজন শতরঞ্জ খেলিতেছে । তাহার মধ্যে একজন খেলোয়াড় মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে—তাহার সর্বনাশ উপস্থিত—উঠসার কিস্তিতেই মাত । একপাশে দুই-একজন গায়ক যন্ত্র মিলাইতেছে—তানপুরা মেও মেও করিয়া ডাকিতেছে । একপাশে মুহুরী বসিয়া খাতা লিখিতেছে—সম্মুখে কর্জদার প্রজা ও মহাজন সকলে দাঁড়াইয়া আছে—অনেকের দেনা পাওনা ডিক্রি ডিসমিস হইতেছে—বৈঠকখানা লোকে খই খই কবিতোছে ।

শুধুমাত্র বাক্তভঙ্গিতে কিছুটা গান্ধীর্যের প্রশ্ন মেনে নিলে এই একই বর্ণনাত্মক রীতি, যার কাজ কেবলমাত্র অবহিত করা, অনুমত হয়েছে বিষবৃক্ষে জমিদার বাড়ির বর্ণনায় :

দাসদাসী কেহ জলের ভার আনিতেছে, কেহ ঘব ধুইতেছে, কেহ চাল ধুইয়া আনিতেছে, কেহ ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে কলহ করিতেছে । অতিথি-শালায় কোথাও ভস্মমাখা সন্ন্যাসী ঠাকুর জটা এলাইয়া, চিত হইয়া শুইয়া আছেন । কোথাও উর্ধ্ববাহু এক হাত উচ্চ করিয়া, দত্তবাড়ির দাসী মহলে ঔষধ বিতরণ করিতেছেন । কোথাও শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট গৈরিকবসনধারী

ব্রহ্মচারী কল্পাক্ষমালা দোলাইয়া, নাগরী অক্ষরে হাতে লেখা ভগবদ্গীতা পাঠ কবিতেন। কোথাও কোনো উদবপবায়ণ ‘সাধু’ ঘি ময়দার পবিমাণ লইয়া, গঙগোল বাধাইতেছে। কোথাও বৈবাগীব দল শুক কণ্ঠে তুলসীর মালা আঁটিয়া, কপাল জুড়িয়া তিলক কবিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতেছে, মাথায় আর্কফলা নডিতেছে এবং নাসিকা দোলাইয়া “কথা কইতে যে পেলেম না —দাদা বলাই সন্ধে ছিল—কথা কইতে যে” বলিয়া কীর্তন কবিতেন।

এই অপরকে অবহিত কবাব প্রবণতা, মাত্র বর্ণনাত্মক বীতি, আমাদের দৃষ্টিকে শুধু বিষয়ের মধ্যেই সীমিত রাখে। বলা বাহুল্য এতে বিষয়েই স্বরূপ উপলব্ধি ব্যাহত হয়। যে কোণে তন্নিষ্ঠ অভিজ্ঞতা মনুষ্য বসে জাবিত হয় সে কোণে ববীন্দ্রনাথের হাতে ছাড়া বাংলা সাহিত্যে ইতোপূর্বে আর কোথাও সাবলীল হয়ে দেখা দেয়নি। একই উদ্দেশ্য-সাধক নিচের বর্ণনাটি অনুধাবনযোগ্য। এ অংশটি যোগাযোগ থেকে উদ্ধৃত।

দীর্ঘ তাঁর গৌববর্ণ দেহ, বাববি-কাটা চুল, বডো বডো টানা চোখে অপ্রতিহত প্রভুত্বের দৃষ্টি। ভারি গলায় যখন হাঁক পাড়েন, অশ্রুচর-পবিচরদের বুক থবথব করে কেঁপে ওঠে। যদিও পালোয়ান বেথে নিয়মিত কুস্তি কবা তার অভ্যাস, গায়ে শক্তিও কম নয়, তবু স্ক্রুমাংস শব্দেই অমের চিরু নেই। পবনে চুনট-কবা ফুবফুবে মসলিনের জামা, ফবাসডাঙা বা ঢাকাই ধুতির বহুযত্নবিহীন কোঁচা ভুলুঠিত, কত্রাব আসন্ন আগমনের বাতাস ইন্তাম্বল আতবের স্তম্ভবর্তা বহন করে। পানের সোনার বাটা হাতে থানসামা পশ্চাদবর্তী, দ্বাবের কাছে সর্বদা হাজির তকমা-পবা আবদালি। সদর দরজায় বৃদ্ধ চন্দ্রভান জমাদার তামাক মাখা ও সিদ্ধি কোটার অবকাশে বেঞ্চে বসে লম্বা দাড়ি দুই ভাগ করে বাব বাব আঁচড়িয়ে দুই কানের উপর বাঁধে, নিম্নতন দাবোয়ানবা তলোয়ার হাতে পাহারা দেয়। দেউড়ির দেওয়ালে ঝোলে নানা বকমের ঢাল, বাঁকা তলোয়ার, বহুকালের পুবানো বন্দুক, বল্লম, বর্শা।

এই বর্ণনার বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, কেবলমাত্র বিষয় অনুগামী বিশ্বস্ততাকে বহন কবাই এর কাজ নয়। সেই কারণে এখানে বাণত বিষয়েও একটা চরিত্র আছে। সে চরিত্র বর্ণনাটিকে নির্বিশেষত্ব থেকে উদ্ধার করে একটা স্বকীয়তা এনে দিয়েছে, যে স্বকীয়তা যোগাযোগ উপন্যাসের পবিমণ্ডলের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। উপন্যাসের গল্পবীতিতেও Style is the man-এর প্রসঙ্গ অচল নয়।

ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিপুরুষই বাণীভঙ্গিমার জনক। স্বভাবতই সে বাণীভঙ্গিমা ঔপন্যাসিকের চিন্তা, দর্শন এবং অভিজ্ঞতার স্বকীয়তা থেকে উদ্ভূত। ওপরের বর্ণনার লক্ষ্য জমিদার-বাড়ির অতীত মহিমার স্মৃতি চিত্রণ। সেই স্মৃতিচিত্রণ সফল হয়েছে কতকগুলো আশ্চর্য উল্লেখ। ‘ইস্তাখুল আতরের স্নগন্ধবাস্তা’, ‘পানের সোনার বাটা’, ‘বহুকালের পুরানো বন্দুক, বল্লম, বর্শা’—এই সমস্ত শুধুমাত্র যে একটি বাস্তব বর্ণনার জন্ত প্রয়োজনীয় হয়েছে তা নয়। প্রকৃতপক্ষে বহুকালের জমিদার বাড়ির মৌদা পুরনো সৌবভকেও এরা যেন ধরে বেঁধেছে। এই ভাবেই বর্ণনা জীবন্ত হয়। যে ব্যক্তিপুরুষ এর চিত্রকর তিনি বিষয়টিকে বিষয়-নিষ্ঠের মতো খুঁটিয়ে দেখেছেন তার পরে কবির মতো অনুভব করে সেটাকে সাজিয়েছেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের পুরনো কালের আভিজাত্যকে চেনবার পদ্ধতি, তার চবিত্রকে উপলব্ধি করার সাহস সমস্তই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুরনো সামন্ততন্ত্রের প্রতাপ এবং স্বেচ্ছাচারের অপব্যয়ের এবং দিলাসের মৌন্দয এবং চরিত্র দুটিকেই রবীন্দ্রনাথ ধরতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই সাফল্যের মূল তাঁর ব্যক্তি জীবনীতে খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক। সেই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র এবং প্যারীচাঁদ যেখানে বিভ্রালা পরিবারের বর্ণনা দিতে গিয়ে “কেহ কেহ” এবং ‘কোথাও কোথাও’ এই বলে বাক্যাংশ শুরু করে খুঁটিয়ে বর্ণনার দিকে অগ্রসর হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে দুটি একটি মোক্ষম উল্লেখে লক্ষ্যভেদ করেছেন।)

রবীন্দ্রনাথের গল্পরীতির আলোচনা আর একটু গভীর ভাবে কবার আগে এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের গল্পরীতির কথা একটু বলে নেওয়া ভালো। (শরৎচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রকে অবলম্বন করে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের অনেকটাই বাগভঙ্গির দিক দিয়ে রবীন্দ্র প্রভাবিত। বিশেষ শরৎচন্দ্রের গল্পরীতিতে রবীন্দ্রপ্রভাব স্পষ্টতই ক্রিয়াশীল। শরৎচন্দ্রের প্রধান ক্ষমতা, যে-কোনো ভাবেই গল্প কথনের ক্ষমতা।) এই ক্ষমতার জন্তই বিরোধী সমালোচকেরা শরৎচন্দ্রের কোনো ক্ষতি করতে পাবেননি। এই গল্প কথনের ফলশ্রুতিকে মুগ্ধতা সঞ্চারী করে তোলার দিকে শরৎচন্দ্রের আগ্রহ সদাই অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই শরৎচন্দ্রের গল্প কখনও বঙ্কিমের মতো সংবাদবহ নয়, রবীন্দ্রনাথের মতো উচ্চকল্পনা-সঞ্চারীও নয়। এর একমাত্র কাজ হল গল্পকে পাঠকের কাছে পরম উপভোগ্য করে তোলা। নিচের অংশটুকু লক্ষণীয় :

কত দেশ, কত প্রান্তর, কত নদ-নদী-পাহাড়-পর্বত-বন-জঙ্গল ঘাঁটিয়া

ফিরিয়াছি, কত প্রকারের মানুষই না এই দুটো চোখে পড়িয়াছে, কিন্তু এত বড়ো মহাপ্রাণ তো আর কখনও দেখিতে পাই নাই ; কিন্তু সে আর নাই । অকস্মাৎ একদিন যেন বৃদবৃদের মতো শূণ্ণে মিলাইয়া গেল । আজ মনে পড়িয়া এই দুটো শুষ্ক চোখ জলে ভাসিয়া যাইতেছে—কেবল একটা নিষ্ফল অভিমান হৃদয়ের তলদেশ আলোড়িত করিয়া উপরের দিকে ফেনাইয়া উঠিতেছে । সৃষ্টিকর্তা ! এই অদ্ভুত অপাখিব বস্তু কেনই বা সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়াছিলে, এবং কেনই বা তাহা এমন ব্যর্থ করিয়া প্রত্যাহার করিলে ! বড়ো ব্যথায় আমার এই অসহিষ্ণু মন আজ বারংবার এই প্রশ্নই করিতেছে—ভগবান ! টাকা-কড়ি ধন-দৌলত, বিজ্ঞা-বুদ্ধি ঢেব তো তোমার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে দিতেছ দেখিতেছি , কিন্তু এত বড়ো একটা মহাপ্রাণ আজ পর্যন্ত তুমিই বা কয়টা দিতে পারিলে ?

এ-ভাষার শক্তি এইখানে যে এ অবাদ এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের মতো একটানা অগ্রসর হবার ক্ষমতা রাখে । কিন্তু উপন্যাসের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে এ-ভাষা ত্রুটিপূর্ণ, কেননা বিষয় সম্বন্ধে লেখকের ভাবোচ্ছ্বাসকে ব্যক্ত করাই এর কাজ । ভাবোচ্ছ্বাসে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, আপত্তি ভাবোচ্ছ্বাস অসংহত বলে । মহা, অদ্ভুত, অপাখিব প্রভৃতি বিশেষণের সাহায্যে যে কিছুকে রূপময় করে তোলা যায় না এ-কথা যেন শরৎচন্দ্র বিশ্বত হয়েছিলেন । সেই কারণে ‘এত বড়ো মহাপ্রাণ তো আর কখনও দেখিতে পাই নাই’ এ যেন অনেকটা লেখকের প্রদত্ত ক্যারেকটার সার্টিফিকেট । সার্টিফিকেট দিয়ে চরিত্রকে জীবন্ত করা বা রূপায়িত করা যায় না । ‘অদ্ভুত’, ‘অপাখিব’, ‘রহস্যময়’, ‘ভীষণ’ এই সমস্ত বিশেষণও কিছুকেই বিশেষিত করে তুলতে পারে না । এই ধরনের গল্পরীতি কল্পনার অমার্জিত বিজ্ঞাসের ফল । শরৎচন্দ্রকে যারাই অনুসরণ করেছেন, এমন কি বিমল মিত্র পর্যন্ত, তাঁদের সকলের কথাসাহিত্যের গল্পরীতি এই পরম উপভোগ্য হবার কল্পনায় ত্রুতী বলে অল্লবিস্তর এই দোষে তুষ্ট ।)

(সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের গল্প রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিপুরুষেরই অভিব্যক্তি । আমরা রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উপন্যাস গোরা থেকে এইবার সামান্য আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের গল্পরীতির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করব । বিশিষ্ট এবং ঐক্যমূর্ত্রে ধৃত গল্পরীতির জগুই উপন্যাসের বিরাট পটভূমিকাকে রবীন্দ্রনাথ এত অনায়াসে ব্যবহার করতে পেরেছেন । এবং এই একই কারণে উপন্যাসের ঘটনা-ঘন মুহূর্তে এই গল্প সার্থক কবিত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে ।

উপন্যাসের গল্পের নিরবচ্ছিন্ন গতিশীলতায় এই কবিত্ব কখন যে পুষ্পিত হয়ে ওঠে আবার কখন যে ঘটনাকে বহন করে চলতে শুরু করে পাঠকের কাছে তা থাকে দুর্লভ্য। মেরিডিথ এবং শার্লট ব্রন্টি-র দুটি রচনা আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীযুক্তা ভার্জিনিয়া উল্ফ এ-প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা স্মরণীয়। তিনি বলেছেন যে, উপন্যাসের ছন্দোপাত ঘটিয়ে কাব্যের অকস্মাৎ-আগত purple patch লেখকের কল্পনার অসঙ্গতির কথাই ঘোষণা করে। (“The objection to the purple patch, however, is not that it is purple but that it is a patch.”) উপন্যাসের অংশ-বিশেষের লিরিক্যাল গুণ যতই হৃদয়গ্রাহী হোক না কেন, কিংবা তার গল্প যতই কাব্যগুণে অধ্বিত হোক না কেন উপন্যাসের সকল দিকের বিচারে তারা কতখানি সুষ্প্রযুক্ত হয়েছে সেটাই দ্রষ্টব্য। গোরার মতো সার্থক সৃষ্টি তার কবিত্বকেও সর্বব্যাপী সঙ্গতির সঙ্গেই মিলিয়ে নেয়। তখন সেখানে কবিত্ব আর পৃথক সত্তা নয়।)

নতুবা যে দোষটা ঘটে সেটা শিল্পরীতির একটা সাধারণত প্রধান ত্রুটি। তা হল লেখকের ভাষাবিগ্ৰাসে অতি যত্নশীলতার দৃষ্টিকটু বহিঃপ্রকাশ। শিল্পীর কল্পনার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনে এটা একটা বড়ো বাধা। এ-কালের বুদ্ধদেব বন্থ এবং অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাসের ভাষা সম্বন্ধে আমাদের এ-অভিযোগের কারণ আছে। যদিও বুদ্ধদেব বন্থর ব্যক্তিগত রচনার গল্পের আমি রীতিমতো ভক্ত এবং অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পের ক্ষুরধার গল্প বহুবার আমাকে মুগ্ধ করেছে তথাপি দেখেছি উভয়েরই ভাষা উপন্যাস-নিরপেক্ষ ভাবে শানিত এবং উজ্জ্বল। লেখকের উপন্যাস সম্বন্ধে ধারণার অসঙ্গতি থেকেই এগুলো জন্মায়। আর আশ্চর্য ছোটগল্পের গল্পের চাল যে উপন্যাসে অচল অচিন্ত্যকুমারের শেষতম উপন্যাস পড়ে মনে হল সেটা যেন তিনি স্বীকার করেন না।

সে-ক্ষেত্রে গোরাই ষ্টিমারে বিনয়-ললিতার রাত্রিযাপনের অংশটুকু এবং তৎপূর্ববর্তী চরঘোষপুরের হাঙ্গামার অংশটুকু পাশাপাশি রাখলে দেখা যায় যে দুটো বিপরীত-ধর্মী ঘটনা হওয়া সত্ত্বেও একটা ঘটনা থেকে আর একটায় উত্তরণের কালে ভাষার গতিতে কোনো অসমতা আসেনি। কোনো প্রকার ঝাঁকুনি ব্যতিরেকেই আমরা নিম্নোক্ত অংশে উপনীত হই :

—শুভ্রির মধ্যে মুক্তোটুকু যেমন, গ্রহতারা-মণ্ডিত নিঃশব্দ-তিমির বেষ্টিত এই আকাশমণ্ডলের মাঝখানটিতে ললিতার এই নিদ্রাটুকু, এই সুডোল সম্পূর্ণ সুন্দর বিশ্রামটুকু জগতে তেমনি একটি মাত্র ঐশ্বর্য বলিয়া আজ

বিনয়ের কাছে প্রতিভাত হইল। ‘আমি জাগিয়া আছি’, ‘আমি জাগিয়া আছি’—এই বাক্য বিনয়ের বিস্ফারিত বক্ষঃকুহর হইতে অভয় শঙ্খধ্বনির মতো উঠিয়া মহাকাশের অনিমেষ জাগ্রত পুরুষের নিঃশব্দ বাণীর সহিত মিলিত হইল।

শুভ্রির বন্ধনে মুক্তা অথবা বক্ষঃকুহর থেকে অভয় শঙ্খধ্বনির মহাকাশ গমন এই দুই চিত্রকল্পই বিনয়ের বর্তমান মনোভাবের পরিচায়ক। ললিতা সম্পর্কে তার প্রেমাত্মভূতি ব্যতীত বিনয় গোরার বন্ধু এবং হৃদয়োচ্ছ্বাসের নীরব শ্রোতাই থেকে যেত এ-কথা খুবই সত্য। সুতরাং এই প্রেমাত্মভূতি তার নিজ ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির সূত্র। যে প্যারাগ্রাফ থেকে উদ্ধৃত অংশটি গ্রহণ করা হয়েছে সেই সমস্ত প্যারাগ্রাফটিই বিনয়ের এই নিজেকে চেনার আবেগে স্পন্দিত। এখানে প্রবহমান জলরাশি থেকে শুরু করে সমস্ত নিসর্গ বর্ণনা, সমস্ত চিত্রকল্প বিনয়ের নবাজিত স্বাতন্ত্র্যের দিকেই অঙ্গুলি সংকেত করেছে। (অনুপ্রাণিত শিল্পীর মতো লেখকের কল্পনা ভাষার একটা ঘনীভূত রূপ সৃষ্টি করেছে গোরা। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য গোরা উপন্যাসে ব্যবহৃত উপমা-রাশির কথা। ঘন ঘন সুপ্রযুক্ত উপমায় রবীন্দ্রনাথ গোরা-র উপন্যাসগত ভাবকেই শুধু সমৃদ্ধ করেননি,—এ উপন্যাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় একপ্রকার ব্যাপকতব জীবনবোধেরও পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ভাষা বিষয়ে অমিতব্যয়ী, অথবা তাঁর উপমা আতিশয্যে কখনো কখনো যুক্তির আসন পরিগ্রহ করে—রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এ সমস্ত অভিযোগবাণী গোরা উপন্যাসের কাছ থেকে নীরবেই ফিরে যাবে।

এবং এই উপমার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। উপন্যাসের প্রথম দিকে শতাবধি পাতায় লেখক একেবারেই প্রায় উপমা প্রয়োগ করেননি। নিরলংকৃত বাক্য-শ্রোত সরাসরি উপন্যাসের উদ্দিষ্ট ঘটনাবলীর মাঝখানে গিয়ে না পৌছনো পর্যন্ত বাক্যের অলংকরণের দিকে মনোযোগী হয়নি। এবং এর পর যে উপমা-রাশি ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে তা অবলীলায় গোবার প্রচণ্ডতা, ললিতার নাটকীয়তা, ষ্টিমারে রাত্রির কবিত্ব সকল কিছুকেই যথারীতি ব্যক্ত করেছে। উৎকৃষ্ট কবিতার মতোই গোরা উপন্যাসের মৌল কল্পনার সঙ্গে এই ব্যবহৃত উপমা-রাশির নিবিড় যোগের আর একটি নিদর্শন হল বিভিন্ন প্রসঙ্গেই মাঝে মাঝে জল বা নদী বা শ্রোত সংক্রান্ত কোনো চিত্রকল্প প্রযুক্ত হয়েছে। গোরার জীবনই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু—রচনাকালে গোরার চরিত্র-কল্পনাই বারে বারে নদীতে তার যোগ্য উপমা খুঁজে পেয়েছে। এবং এই কারণে, শুধুমাত্র প্রেমের

উন্মেষের দৃশ্য বলে নয়—উদ্ধৃত ঠিমারের অধ্যায় উপন্যাসের মৌল আবহাওয়ায় অতথানি প্রাণসঞ্চার করতে পেরেছে।

গোরা উপন্যাসের ভাষাভঙ্গিতে আগাগোড়া যে ঐক্য বিচ্যমান সেই ঐক্য উপন্যাসের ভাষার একটা আদর্শ। চতুরঙ্গ এ প্রসঙ্গে আর একটি উদাহরণ। এখানে স্পষ্টত বলা প্রয়োজন যে চতুরঙ্গ অথবা গোরার ভাষাকে যে আদর্শ বলা হচ্ছে তার অর্থ এই নয় যে এই ভাষাই অনুকরণীয়। গোরা বা চতুরঙ্গে উপন্যাসের ভাষা নির্বাচনের পদ্ধতি অনুধাবনযোগ্য। গোটা উপন্যাসের ভাষার ভিতরে যখন সৃষ্টির অনুশাসন সক্রিয় থাকে তখনই ভাষারীতিতে আত্মস্তু ঐক্যের বঁধন দৃঢ় বলে মনে হয়। আপাতদৃষ্টিতে যাকে কালানৌচিত্য বলে ভুল হয় তারও ব্যাখ্যা করা যায় শিল্পীর উক্ত অনুশাসনের আলোকে। (চতুরঙ্গ গোরাব পরবর্তী রচনা। চতুরঙ্গে নায়ক-নায়িকার কথোপকথনে সাধু ক্রিয়াপদাত্মক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ পূর্ববর্তী রচনা গোবায় নায়ক-নায়িকার কথোপকথনে চলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যাপানটি নিশ্চয় খেয়ালখুশির নিদর্শন নয়। গোরাব দেশকালের অতিপ্রত্যক্ষ আবহাওয়ায় এবং বিস্তৃত বহুবিধ জীবনের সমাবেশে পাত্রপাত্রীর অভিজ্ঞতা স্বভাবতই প্রত্যাহের জলবাতাস থেকে প্রাণ সংগ্রহ করেছে। তাদের কথাবাতার লৌকিকতার ভিত্তিভূমি রক্ষা অবশ্য প্রয়োজনীয়। চতুরঙ্গের জগৎ ভিন্ন ভঙ্গি প্রয়োজন হয়েছে। এখানে প্রথম থেকে উপন্যাসকে এই ভাষাব উপযুক্ত উচ্চতায় উন্নীত করা হয়েছে, আমাদের বোঝানো হয়েছে যে যাদের কথা, অভিজ্ঞতা এবং যন্ত্রণাব বিষয় এ উপন্যাসে বিধৃত তাদের ব্যক্তিসত্তার একক এবং নিঃসঙ্গ মহিমা প্রথম থেকেই এমনভাবে কল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত যে এরা সাধু ভঙ্গিতে কথা না বললে মনে হত যেন এদের অনেকটা নিচেষ নামানো হয়েছে। কাবানাটকেব চরিত্রগুলি যেমন মাত্র কবিতায় কথা বলবার জগুই কবিতা বলে না, কাব্যভূমিতেই তাদের জন্ম, তেমনি এই উপন্যাসেরও চরিত্রগুলি কল্পনায় জন্মমুহূর্ত থেকেই সাধু ভঙ্গিতে কথা বলে। এর ফলে এদের যন্ত্রণায় একটা সুন্দর নিঃসঙ্গতার সৌন্দর্য এসেছে।)

উপন্যাসের ভাষাজ্ঞানের এবস্থিৎ মান আধুনিক বাংলা উপন্যাসে একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে সহজপ্রাপ্য। মানিকবাবুর সাহিত্যকর্মের আলোচনা-কালে আমরা তার বিস্তৃত আলোচনা করব। (বর্তমান বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের ভাষায় প্রধানত তিন ধরনের ভাষাভঙ্গির প্রভাব বিচ্যমান। এক নাটুকে রীতি, দুই সর্বদা প্রস্তুত প্রচলিত রীতি; তিন চটকদার সাবলীল

রীতি। প্রথম রীতির উদ্দেশ্য পাঠককে বিস্মিত করা ; দ্বিতীয় রীতির উদ্দেশ্য পাঠকের চিন্তাকে কোনোভাবে আঘাত না করে প্রচলিত চিন্তার ছকে তাকে বেঁধে রাখা ; তৃতীয় রীতির উদ্দেশ্য হল পাঠককে চমৎকৃত করা। ঔপন্যাসিকের ভাষার বিশিষ্টতা ঔপন্যাসিকের চিন্তার বিশিষ্টতার ধারক।) বর্তমান বাংলা উপন্যাসে যে ক-এর সঙ্গে খ এবং খ-এর সঙ্গে গ-এর ভাষার কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না তার কারণ অধিকাংশের মতোই চিন্তার ক্ষেত্রেও কোনো প্রভেদ নেই। আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার জগতই বর্তমান বাংলা উপন্যাসের ভাষায় আভ্যন্তরীণ গুণের এত কদর।

একে অতিক্রম করার জন্য কেউ কেউ অকারণ আবেগমত্ততার আশ্রয়ী হন। এটা ঔপন্যাসিক ধ্যান ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। জীবনের স্বরূপকে আবিষ্কার করা উপন্যাসের কাজ। ভাষা তার অন্ততম আধার। এই আধারের দৌর্বল্যে জীবনের স্বরূপকে তিনি রূপময় করতে পারবেন না।

পূর্ণ জীবনবোধে অনুপ্রাণিত ঔপন্যাসিকের ভাষায় সূদৃঢ় অনুশাসন ও উপযুক্ত গাভীর প্রধান গুণ বলে বিবেচিত হয়। সে বিচারে উপন্যাসের উপযুক্ত বিষয়বস্তু ব্যতীত উপযুক্ত ভাষার শৈলি-নির্মাণ কদাচ সম্ভব নয়। উপন্যাসের ভাষা ঔপন্যাসিকের বিষয়জ্ঞানেরই অপর নিদর্শন।



বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্ন—আলালের ঘরের দুলাল

•• এক ••

ইতিহাসেব যে ন্যায়সূত্রেব অমোঘ নির্দেশে ইংলণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীতে উপন্যাসেব জোয়ার তারই কিঞ্চিৎ উনবিংশ শতাব্দীেব বাংলা দেশেব সামাজিক বিপ্লবাসেও বিজ্ঞমান ছিল এবকম ভাবা হয়ে থাকে । বাংলা উপন্যাসেব জন্মলগ্নেব ইতিহাসটি আমাদেব উপন্যাসেব গতি-প্রকৃতি এবং শক্তি-দৌর্বল্য উপলব্ধিেব জন্য বিশেষভাবে অমুখাবনীয় । বর্তমান গ্রন্থেব প্রথম পবিচ্ছেদে আমবা এ-কথা আলোচনা কবেছি যে সমকালীন জীবন সম্বন্ধে বাস্তব আগ্রহ হল উপন্যাসেব জন্মলগ্নেব প্রাথমিক শত । সমকাল এবং সমকালীন জীবন সম্বন্ধে আগ্রহেব ভিন্ন রূপ ভাবতবর্ষেব ইতিহাসে অবশ্য অন্তভাবে উপস্থিত ছিল । বুদ্ধদেব বা চৈতন্য মহাপ্রভুব জীবৎকাল এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য । এঁদেব অব্যাহত কীর্তি সমন্বিত জীবন স্বভাবতই তাঁদেব সমকালেব মানুষকে আকৃষ্ট কবেছিল । এ দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যযুগ আবো বিশিষ্টতােব অধিকাৰী । প্রথমহেঁ কলিযুগ সর্বযুগসার—এই উক্তিে কল্পিত সত্যযুগেব পশ্চাদ্ধাবন না কবে সমসাময়িক কালকেই স্বীকার করে নিতে চেয়েছিলেন সে-যুগেব বৈষ্ণব সাধকরা । গৃহধর্মীদেব সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনেব নেতাদেব প্রচাবিত ধর্মানর্শেব কোনো মৌল বিরোধ না থাকায় মোটামুটি বাংলা দেশ তখন এই সমকালানুবর্তিতাকে সহজে গ্রহণ কবতে পেবেছিল ।

কিন্তু এই সমকালানুগত্য, এই জীবিত মানুষ সম্বন্ধে আগ্রহ উনবিংশ শতাব্দীর (বাংলা দেশেব) জীবনাগ্রহ থেকে দূরবর্তী ব্যাপাব । ষোড়শ শতাব্দীতে পুরুষার্থ-চেতনায় মোক্ষ এবং ধর্ম মুখ্য ছিল । উনবিংশ শতাব্দীতে ক্রমশই পুরুষার্থ-

চেতনা চতুর্বর্গকল লাভের সম্যক অর্থকে উপলব্ধি করার পথে অগ্রসর হয়েছিল। সমকালীন জীবন সম্বন্ধে বাস্তব আগ্রহ এই নতুন পুরুষার্থ চেতনার জনক। এ বাস্তব আগ্রহেব স্বরূপনির্গম বাংলা উপন্যাসেব জন্মকালের আলোচনায় অবশ্য প্রয়োজনীয়। উপন্যাস যেহেতু জীবনেব সমগ্র ধারণার সঙ্কানী সেহেতু এ যুগেব জীবনেব সমগ্র চেহারার কিছুটা নকশা না-সংগ্রহ কবলে এ যুগের জীবনের সমস্তাব স্থূল আঁচডগুলোব ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না। উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা এবং মফস্বলেব জীবনেব বিজ্ঞাস, সে বিজ্ঞাসেব ওপব নানা আলোছায়াব বৃদ্ধি সমাজতাত্ত্বিকেব কাছে অবশ্যই কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু সাহিত্য জিজ্ঞাসুর কাছেও সে সময়েব তীব্র টানাপোডেন কম চিত্তাকর্ষক নয়। কেননা এই টানা-পোডেনেব অমোঘ আকর্ষণেই জন্মলাভ করেছে বাংলা উপন্যাস।

(এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছর ব্যয়িত হয়েছে কলকাতাই জীবনেব একটা norm বা স্থিতিদর্শ সঙ্কানেব প্রয়াসে। আসলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছর জীবনেব দান্দিক অবয়বকে তখনকাব শিক্ষিত বাঙালীর কাছে ধীবে ধীরে স্পষ্ট কবে তুলেছিল। জীবন যে একটা অতি কঠোর দ্বন্দ্বময় বাপাব এটা উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে সামাজিক ভাবে অন্তর্ভুক্ত উপলব্ধি কবা যায়নি।) অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত জীবনাচরণের বিরুদ্ধে কখনো কখনো ক্ষীণভাবে হয়তো একটা অস্পষ্ট বিদ্রোহের স্রব শোনা গেছে। দারু ব্রহ্ম উপাসক বামানন্দেব পাঁচালি অবশ্যই উদ্ধৃতিব যোগ্য :

দারু ব্রহ্ম সেবা কবি জেববার হৈল।

বৃথা কাষ্ট সেবি কাল কাটা নহে ভাল ॥

বস্তুহীন বিগ্রহ সেবিয়া নহে কাজ।

নিজ কষ্টদায় আব লোকমধ্যে লাজ ॥

কিন্তু এ ধবনেব একক স্ববেব কথা বাদ দিলে বলা যায় উনবিংশ শতাব্দীতেও আমাদের সমস্ত জীবনবোধই দাঁড়িয়েছিল এই দ্বন্দ্বকে উপলব্ধিজনিত সামাজিক অনুভূতিব ওপবে। কলকাতা এবং কলকাতাব সন্নিকটবর্তী মফস্বলকে অবলম্বন কবে তখন জীবনেব দুই ধাবা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। একদিকে ছিল কলকাতাশ্রয়ী দেওয়ান মুন্সুফি প্রভৃতি বর্ণমযাদাচ্যাত নব্য বড়োলোক শ্রেণী— তাব সমস্ত বাবুয়ানি-বিলাস-ব্যভিচারাদি সমেত—আব একদিকে ছিল দুর্বল এবং প্রতিপত্তিহীন প্রাচীন-পুঁথি-আশ্রয়ী সংস্কৃত বিজ্ঞাব্রতী সমাজ। ছতোমের বিবরণে, নবাবু বিলাসে এবং বন্ধিমের লোকবহস্তের বর্ণনায় বিদ্রূপের

আতিশয্যটুকু বাদ দিলে এই দুই ধারারই প্রতিচ্ছবির সাক্ষাৎ মেলে। যদি এই দুই ধারার মধ্যে কোনো একটিও সৃষ্টি সম্ভাবনায় একাকীই পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারত তাহলে অবশ্যই বাংলার উনিশের শতকের সামাজিক ইতিহাসে সরল-রেখার মসৃণ গতি আমরা পেতে পারতাম। কিন্তু ইতিহাস রচনায় মানুষের কর্তৃত্ব কদাচ ইতিহাসের নিজস্ব ত্রায়ক্রমকে ছাড়িয়ে যায় না বলেই ইতিহাসের গতিরেখা জটিল এবং বন্ধিম। সে সময়ের নব্য বড়োলোক শ্রেণী সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে ছিলেন ততটাই পঙ্গু, সংস্কৃষ্ট প্রাচীনপন্থী পৃষ্ঠপোষকহীন পণ্ডিতেরা ছিলেন যতটা নিঃসহায়। এঁদের পুরনো অবলম্বনগুলো যত ভেঙে পড়ছিল ওঁদের বার্থ বাবুয়ানির মর্যাদা ভিক্ষা ততই বাইজির নাচে, দুর্গোৎসবের ক্ষেমটায় আবর্তিত হচ্ছিল নিষ্ফলভাবে।

হয়তো তদানীন্তন কলকাতার সমস্ত বহিরঙ্গণ ছিল এই অবস্থারই একটা দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপক। লটারি কমিটির প্রচেষ্টায় কলকাতা শহরের ক্রমোন্নয়নের পশ্চাতে রয়েছে পক্ষে পল্লবে জঙ্গুলে কলকাতার রূপাবর্তনের ঝোঁক। ঝাঁঝি ডাকা স্ত্রীতালুটি আর জলেই নিভে-যাওয়া বেড়ালের বিয়ের জলুস সেই দ্বিমুখী জীবনেরই দুই চেহারা। ‘সাহেব বিবির দিগের ইংলণ্ডীয় গীতবাজ’ এবং ‘চিৎপুরের রাস্তায় মেঘ কল্লেরই কাদা হয়’—এও সেই দুই চেহারারই প্রতিফলন।

•• দুই ••

সম্ভাবতই কলকাতা নগরীর তাৎপর্য এ-যুগে নানামুখী ছিল। তৎকালীন সমাজ-পটের যে দ্বন্দ্ব-দীর্ঘ চেহারার কথা পূর্ব-পরিচ্ছেদে বলা হল তা একান্তরূপেই ছিল কলকাতা-কেন্দ্রিক। আবার এই দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত হয়ে স্থির জীবনাদর্শের সন্ধানের প্রয়াসও ছিল কলকাতাশ্রয়ী। রামমোহন অথবা বিজ্ঞানাগর কেউই কলকাতাই মানুষ নন। কিন্তু উভয়েরই কর্মকেন্দ্র ছিল কলকাতা। অবশ্য হয়তো এই কারণেই এঁদের দুজনের কাছেই গোটা স্বদেশের প্রেক্ষাপট কখনো হারিয়ে যায়নি। হিন্দু কলেজীয় অত্যাচ্ছাদ এবং অনুস্বরবাদীদের মানসিক কার্পণ্য যে কদাচ রামমোহন-বিজ্ঞানাগর-মধুসূদন এবং আংশিক ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করেনি তার কারণ এইখানে যে কলকাতার নব্য জীবনের মিতপরিসর অতি-দীপ্তিকে এঁরা কেউ স্বদেশ জীবনের বিকল্প ভাবেননি। এঁদের মানস-আকাশে স্বদেশ বিদেশের ভাববিস্তৃতি সত্ত্বেও এঁদের জীবনের মূল ছিল দেশজ মৃত্তিকায় সে কারণে এঁরা যা কিছু দেখেছেন ভেবেছেন বা দেখতে ভাবতে চেয়েছেন ত

সমস্তই দেশের মানস-আবহ ও ভাবাকাশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাওয়া। এই অর্থেই এঁরা কলকাতার বাইরের হওয়া সত্ত্বেও যথার্থ নাগরিক মনের অধিকারী।

কিন্তু এই নাগরিকতার প্রসাদ সমগ্র বাংলা দেশ কখনো লাভ করেনি। কলকাতার জীবনের আকর্ষণ মধ্যবিত্ত বাঙালী অবশ্য অনুভব করেছে এমন কি তার রূপ-সৌন্দর্যকেও যে আবিষ্কার করার প্রয়াস পেয়েছে বাংলা সাহিত্যে সে নিদর্শন দুর্লভ নয়। বিহারীলালের প্রেম প্রবাহিণী থেকে পবিত্রী অংশটুকু লক্ষণীয়—

কতদিন এ নগরে নিশীথ সময়ে
যে সময়ে নিসর্গ বয়েছে স্তব্ধ হয়ে
ব্যোমময় তারা সব করে দপ দপ,
যেন মণিখচিত অসীম চন্দ্রাতপ,
কোনো দিকে কোনো রব নাহি শুনা যায়
কভু মাত্র পিছুকাহা হাঁকে পাপিয়ায়।
গ্যাসেব আলোক আছে পথ আলো কবে
প্রহরীর দেহ টলমল ঘুমঘোরে।
ফিবিয়াছি পথে পথে পাড়ায় পাড়ায়
বেখানে দু-চোখ গেছে গিয়েছি সেথায়।
কোথাও উঠিছে হররা উল্লাস চিৎকার,
যেন ঠিক যমালয়ে নরক গুলজার।
কোথাও উঠিছে হরিবোল হরিবোল,
ধেই ধেই নাচিতেছে বাজিতেছে খোল।
পথে পথে শুঁড়িদের দর্জা ঠেলাঠেলি,
তার উপরের ঘরে ঘুণা হাসি খেলি।
আশে পাশে মাতোয়াল লোটে নর্দমায়
গায়ের বিটকেল গন্ধে আঁত উঠে যায়।
কোনো পথে বাবুজির পাইশালের দ্বারে
পড়ে আছে দু-এক অনাথ অনাহারে।

এরই সঙ্গে যদি রমেশচন্দ্র দত্তের সংসার উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদে শরৎ ও হেমচন্দ্রের ভবিষ্যৎ চিন্তামূলক কথোপকথন মিলিয়ে পড়া যায় তাহলে সে সময়ের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কলকাতা-চিন্তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ অংশে

শব্দভের বক্তব্য এই : আপনারা কলকাতায় আসুন, আপনারা কি চিরকাল গ্রামেই বাস করবেন ? হেমচন্দ্রের বক্তব্যও অনুরূপ : কলকাতা অতি মহৎ স্থান । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হেমচন্দ্র কলকাতার সংকট সম্বন্ধেও সচেতনতা প্রকাশ করেছেন : সেখানে আমি অপেক্ষা সহস্রগুণে উপযুক্ত লোক কর্মের জন্ত লালায়িত হচ্ছে । গ্রামে থাকিলে উন্নতি নাই—মধ্যবিত্ত মানসে তখন কলকাতা এ চিন্তার স্বাক্ষর এঁকে দিয়েছে । বিহারীলালের মতো রমেশ দত্তের নায়িকাদেরও চোখে কলকাতার নতুন রূপের ঘোর ।

বিস্মিত নয়নে সূখা ও বিন্দু লাট সাহেবের বাড়ি দেখিতে দেখিতে গড়ের মাঠে বাহির হইয়া পড়িলেন । তখন সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, ইন্দ্রপুরী তুলা চৌবন্ধীতে দীপালোক প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, এখন মর্তে যাহারা দেবত্ব করিতেছেন তাঁহারা বেরুণ, ফিটন বা লেগুনেট করিয়া ইডেন গার্ডেনে সমাগত হইতেছেন । ঐ প্রসিদ্ধ উদ্যান হইতে অপূর্ব বাগ্‌ধ্বনি শ্রুত হইতেছে এবং আকাশের বিদ্যুৎ মনুষ্যের বিজ্ঞান ক্ষমতার অধীন হইয়া নরনারীর রঞ্জনার্থ আলোক বিতরণ করিতেছে । ভারতবর্ষের আধুনিক অধীশ্বরদিগের গৌরব ও ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও বিলাস দেখিয়া তালপুকুর নিবাসিনী দ্বিবিদ্রা বিন্দু বিস্মিত হইলেন ।

কিন্তু শিল্পীমানসে কলকাতা নগরীর এই যে ছায়াপাত এ সম্বন্ধে আমবা যতই উদ্ধৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি করি না কেন এর অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা আমাদের দৃষ্টি এড়াই না । বিহারীলালের কাব্য-ধৃত কলকাতায় যদিবা কলকাতা শহরের অন্তর্বের চেহারা কিছুটা প্রতিবিম্বিত হয়েছিল এ-কালের উপন্যাসে কলকাতার সর্বাঙ্গীণ রূপ আদতেই প্রস্ফুট হয়নি । রমেশ দত্তের নায়িকার চোখে বর্ণিত কলকাতা আর স্বর্ণলতায় নীলমাধবের চোখে দেখা কলকাতার বর্ণনায় কলকাতা দর্শনের প্রথম বিস্ময় উপস্থিত বটে (এমন কি ইন্দিরাতেও) কিন্তু কলকাতা বা কোনো শহর সমগ্রভাবে এ-যুগের কোনো উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়নি । একমাত্র আলালের ঘরের দুলাল এর ব্যতিক্রম । এ বিষয়ে আলোচনা আমরা বিস্তৃত ভাবে পরে করছি ।

ওপরের উদ্ধৃতি সম্বন্ধে আপাতত আমাদের যেটুকু অনুধাবনীয় তা হল এই যে কলকাতা নগরীর প্রসাদ সারা বাংলা দেশ লাভ করেনি । ইতিহাসের অনিবার্য আকর্ষণে শতাব্দীর পর শতাব্দীর প্রলেপে কলকাতা নগরীর ক্রমনির্মাণ হয়নি । একদিক দিয়ে দেখতে গেলে ছতোমের বর্ণিত হঠাৎ বাবুদের মতো সেও হঠাৎ

শহর। মহাভারতের ষোড়শ মহাজনপদের কলকাতা কেউ নয়। ইংলণ্ডের শিল্প-রূপান্তরের টানে লণ্ডন শহরের বিস্তৃতি অথবা গ্রামীণ ইংলণ্ডের নববিজ্ঞান, 'নতুন শহরের উদয় উদ্ভব প্রভৃতির সঙ্গে কলকাতা শহরের ইতিহাসের কোনো মিল নেই। স্বভাবতই কলোনির প্রয়োজনে নির্মিত শহরের বহিরঙ্গের জেলা জৌলুস বডোজোর 'বাবুদেব মেলা'। শিল্প-রূপান্তরের প্রবল আকর্ষণে উদ্ভূত শিল্প শহরগুলির মূলে ইংলণ্ডীয় জীবনে যে-যন্ত্রণা যে-আবেগ কলকাতা শহর সৃষ্টির মূলে তা অনুপস্থিত। কলকাতা শুধু বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো জেগে রইল। বিশাল মফস্বল বাংলায় স্বনিয়মে, নতুন সৃষ্টিব গ্যায়কে অনুসরণ করে কোনো শহর সৃজিত হল না। অথচ শূণ্য মক্তব-মাদ্রাসা-টোল এবং নিঃশেষিতপ্রাণ কুটির শিল্পকে ব্যঙ্গ করে দিনে দিনে জনাকীর্ণ হতে লাগল কলকাতা। আর দিনে দিনে শূণ্য-প্রায় মক্তব-মাদ্রাসা-টোলের জন্তু বাংলাব বিপুলতর জনসমাজে কোনোও স্পষ্ট ক্ষোভের দেখা পাওয়া গেল না। মধ্যযুগীয় গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞানের কিস্কৃত গঠনেব জন্তুই গ্রামীণ উচ্চ-কোটির মানুষ যেমন ব্যাপকভাবে অসন্তুষ্ট কুটিরশিল্পী, নিপীড়িত নীলচাষীদের জন্তু কোনো সমবেদনা অনুভব করলেন না বর্ণাশ্রমের সেই প্রেত তাড়নাতেই তেমনি প্রাচীন শাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিত সমাজের বিপর্যয়েও কোথাও জাতীয় বিপর্যয়বোধের বেদনা অনুভূত হল না। অথচ কলকাতার উদয়েও শুধু সুবিধাভোগের প্রত্যাশা ছাড়া নেই কোনো প্রাণীন উল্লাস। ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের সমকালীন ইতিহাস স্বতন্ত্র। সেখানে শিল্প-বিপ্লবের প্রচণ্ড তাড়নাব মূলেও যেমন জাতীয় আবেগ, ১৮৪৬ সালের শস্ত্র স্বাধীন বাণিজ্যের নীতির ফলে agricultural decline-এও তেমনি জাতীয় বিপর্যয়-বোধ। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লেখা ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এব অ্যান ইনভেন্টিভ এজ নামক কবিতায় রূপান্তরের কবি-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার মতো :

Wherever the traveller turns his steps
He sees the barren wilderness erased
or disappearing.

কিন্তু কবির মনে এতে কোনো উল্লাস নেই :

I grieve when on the darker side
Of this great change I look : and there behold
Such outrage done to nature as compels
The indignant power to justify herself.

কলকাতার আঘাতে, উদীয়মান বহু শহরের প্রতিক্রিয়ায় আমাদেরও গ্রামীণ জীবন-বিকাশ এ-জাতীয় great change-এর সম্মুখীন হলে অনুরূপ আঁতি আমাদের মনোও উচ্চারিত হত। কিন্তু কলোনির স্বীয় স্বার্থে গ্রামীণ সমাজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিতর দিয়ে রইল অর্ধজীবিত হয়ে। বিকল্পে কোনো মহৎ পরিবর্তন এল না। পূর্ণ আবেগে ইংলণ্ডে ১৮৬৫ সালের অল্পপরিচিত কবি উইলিয়ম কসমো মক্কাহাউস রেলগাড়ির প্রতীকে রূপান্তরিত ইংলণ্ডের অদম্য আত্মাকে ধরতে চেয়েছিলেন। তাঁর দি নাইট এক্সপ্রেস কবিতাটির ভাবলোকে লাসেক্ষ্যের দিনের আশ্রয় ছবি :

Straight on my silent road
Flanked by no man's abode
No foe I parley with, no friend I greet ,
On like a bolt I fly
Under the starry sky,
Scorning the current of the sluggish street.

বলা বাহুল্য, ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর বেদনা এবং মক্কাহাউস-এর উল্লাস, এ-দুয়ের কোনোটারই অবকাশ আমাদের ঊনবিংশ শতকীয় জীবনে ছিল না। নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করলে চারেখার, কিংবা কলিতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ—এর ক্ষীণ ব্যতিক্রম মাত্র। কাজেই বিহারীলালে যখন নগর-জীবনের ক্লান্তি ধ্বনিত হত তা রমেশ দত্তের নায়কদের নগর-জীবনাকাজ্জ্বল্যের মতোই কৃত্রিম। আসলে কলকাতার অভ্যুদয় বৃহৎ বঙ্গ মনোভূমির তীরটুকুকে মাত্র স্পর্শ করেছিল, তীর প্রান্তকে অতিক্রম করে জাতীয় জীবনের অন্তঃপুরে সে ঢেউয়ের প্রসাদ বিশেষ কেউ বয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হননি। শনিবারে শনিবারে গৃহ প্রত্যাগত কেরানীর মতো সে হয়তো থেকে থেকে বিলিয়েছে কিছু প্রসাধন, কিছু নিরাময়—তা নইলে রয়ে গেছে যেমন দূরে তেমন দূরে।

•• তিন ••

স্বভাবতই ব্রিটিশ পুঁজির এই নিরাপদ প্রয়োগ-ক্ষেত্রে ভালো করে কিছু গড়ে উঠল না, ভালো করে কিছু ভেঙেও গেল না। সেই অষ্টাবক্র অসম্পূর্ণতার মাঝখানে বাস্তব জীবনাগ্রহও সম্যক এবং সম্পূর্ণ হতে পারে না। সে অসম্পূর্ণতার দায়ভাগ আমাদের উপন্যাসের জন্মলগ্ন থেকেই বহন করতে হচ্ছে। বিমূঢ় বৃহৎ বাংলাকে

বাদ দিলে উনিশের শতকের কলকাতার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের সমস্ত প্রয়াস ছিল জীবনের norm বা স্থিরাদর্শ সন্ধানের প্রয়াস। যাকে আমরা উনিশের শতকের সংস্কারান্দোলন বলি তার মূলে অবশ্যই উক্ত স্থিরাদর্শ সন্ধানের প্রেরণা। তীব্র জীবনাগ্রহ থেকেই জীবনকে সমৃদ্ধ করার বাসনার জন্ম। 'সংস্কারান্দোলন, ধর্ম-ান্দোলন অথবা নবজাগরণ সকল ঐতিহাসেই পশ্চাৎপটে এই জীবনাগ্রহ। সমাজের নতুন শ্রেণীর অবলম্বনে এ জীবনাগ্রহ বাস্তবায়িত হয়। কলকাতাকে আশ্রয় করে বাংলার মধ্যবিত্ত মানসেও এই জীবনাগ্রহ অঙ্কুরিত এবং সঞ্জীবিত হল বটে কিন্তু এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসম্পূর্ণতায় এই জীবনাগ্রহেরও অসম্পূর্ণতা অনুভূত হল।'

কালান্তরের প্রতিক্রিয়ায় নতুন কালকে চেনার পূর্ণ প্রয়াস সর্বত্র সফল হয়নি। কলকাতাই বডোলোক শ্রেণীর বিলাস বিকারের প্রগল্ভ জীবনাচার আর গ্রামাণ পণ্ডিত মণ্ডলীর বিপর্যয়ের দ্বন্দ্ব অবশ্যই কলকাতার নব-জাগৃত মধ্যবিত্ত মনের অগ্রণী অংশে অনুভূত হয়েছে। 'এ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই সফল সংস্কার প্রয়াসের মূলে এই দ্বন্দ্ব থেকেই উত্তরণের অভীপ্সা সে কথা আমরা পূর্বে বলেছি। কিন্তু সে অভীপ্সাও সীমিত হতে বাধ্য হয়েছিল উপলব্ধির অসঙ্গতিতে। তাই যদিও সমাচার দর্পণের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে ইংরাজি শিক্ষার নতুন বিস্তারের কাহিনী, জনতার সামনে বালকদিগের ইংরাজি বিজ্ঞার পারদর্শিতা প্রদর্শনের বিবরণ, ছড়িয়ে রয়েছে পত্র-লেখকদের গল্পের আকারে লেখা পত্রে বিচিত্র যত খবরের রসালো বিষয়, রয়েছে নতুন কলকাতার সবতোমুখী প্রচেষ্টার কথা—তবু বোঝা যায় যে এ-সমস্তই বাহ্য। একটি কি দুটি আত্মীয় সভার মতো প্রতিষ্ঠান বা ইয়ং বেঙ্গলের মতো জলন্ত উগ্রতা জাতীয় জীবনের সমগ্র প্রেক্ষাপটে কতটুকু? কতটুকু উক্ত ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারের আয়োজন? শিষ্টবিত্তজীবীদের পাদোদক পদধূলির প্লাবনে এবং ঝড়ে প্রাচীন বিজ্ঞাব যখন লুপ্তি ঘটতে চলেছে সে সময় রামমোহনের একক মনীষা এবং আত্মীয় সভার গুরুতর ভূমিকার কথা অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু যে অসঙ্গতির দায়ভার আমাদের কলোনির বিপাকে সদাসততই বহন করতে হয় রামমোহনের ক্ষেত্রেও তা তুলক্ষ্য নয়। কালান্তরের অসম্পূর্ণতায় জ্ঞাত আমাদের তৎকালীন জীবনের অসঙ্গতি রামমোহনের চোখে ধরা পড়েছিল :

যে ব্যক্তি স্বয়ং এবং পিতা ও পিতামহ তিন পুরুষ ক্রমশ স্বেচ্ছের দাসত্ব করে, সে যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি যে নিজে স্বেচ্ছের চাকরি করিয়াছে তাহাকে

স্বধর্মচ্যুত ও ত্যজ্য কহে, তবে তাহাকে কি কহি ? যদি এক ব্যক্তি যবনের কৃত মিসি প্রায় নিত্য দন্তে ঘর্ষণ করে ও যবনের চোয়ানো গোলাব ও আতর এ সকল জলীয় দ্রব্য সর্বদা আহারাদিকালে ও অন্য সময়ে শরীরে ব্রক্ষণ করে কিন্তু অণ্ডকে কহে যে তুমি যবন স্পর্শ করিয়া থাক অতএব তুমি স্বধর্ম-চ্যুত, ত্যজ্য হও, একরূপ বক্তাকে কি কহা যায় ? এক ব্যক্তি নিজে যবন ও স্নেচ্ছের নিকটে যাবনিক বিজ্ঞার অভ্যাস করে ও মনুমহাভারতাদির বচনকে সমাচার-চন্দ্রিকা ও সমাচার-দর্পণে ছাপা করায়—যাহা সে ব্যক্তির জ্ঞাতসারে অনেক স্নেচ্ছ লইয়া থাকে, কিন্তু অণ্ডকে কহে যে তুমি যবন শাস্ত্র পড়িয়াছ ও শাস্ত্রের অর্থকে ছাপা করিয়াছ, সুতরাং স্বধর্মচ্যুত, ত্যজ্য হও, তবে তাহাকে কি শব্দে কহিতে পারি ?

স্বভাবতই জীবনের জট-পাকানো সূত্রগুলির চেহারা যে রামমোহনের কাছে স্পষ্ট হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু রামমোহনের উপলব্ধি—যা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চয়ই অনন্তসাধারণ—একটা সীমায় এসে থমকে গিয়েছিল। ‘শাস্ত্রের অর্থকে ছাপা করানোর’ মধ্যে স্বীয়-আসনচ্যুত দেশীয় পণ্ডিতদের পৃষ্ঠ-পোষকহীন জীবনের যে অসহায়তা, তার ঐতিহাসিক কারণাবলী অল্পসম্মান রাম-মোহন করেননি। শাস্ত্রার্থকে মুদ্রা যন্ত্রের মাধ্যমে বিতরণ করার মধ্যে যে অনিবার্যতা তার মূল নির্ণয়ে রামমোহনের অক্ষমতাই প্রতিফলিত হয়েছে অন্তত নীলকর সাহেবদের চবিত্র নির্ণয়ের অক্ষমতায়। নীলকরেরা গ্রামীণ জীবনচবণের পরিবর্তন আনছে—রামমোহনের এই বিপাকগ্রস্ত সিদ্ধান্তে সেই চেতনার সীমারেখাই চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে বাংলা দেশে এই নতুন সম্পর্কের আসল চেহারাটা ১৮২৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বরে সমাচার দর্পণ থেকে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণভাবে বোঝা যায়। “১৭৯২ সাল ও ১৮২২ সালের বাঙ্গালার ও ইংলণ্ডের আমদানি রপ্তানি দ্রব্যের এক হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য কি প্রকার বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদেশ হইতে রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে নীল প্রধান রূপে গণ্য তাহা ১৭৯২ সালে ৭২৬৬ মন মাত্র এখান হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানি হয়, এবং বর্তমান বৎসরে যে নীল রপ্তানি হইবে তাহা প্রায় এক লক্ষ মনের অধিক হইবে কিন্তু অন্তপক্ষে বস্ত্রের বিষয়ে রপ্তানির অতি স্বল্পতা হইয়াছে যেহেতুক ১৭৯২ সালে এদেশ হইতে বার লক্ষ বাইশ হাজার খান কাপড় ইংলণ্ডে যায় এবং তৎপরে এই বাণিজ্য এমন পতিত হয় যে ১৮২২ সালে কেবল এক

লক্ষ খান কাপড় এদেশে হইতে রপ্তানি হয়। ইহাতে দেখা যায় যে ইহার ত্রিশ বৎসর পূর্বে যত রপ্তানি হইত তাহার বার ভাগের এক ভাগ এক্ষণে রপ্তানি হয়। পুনশ্চ যদি আমরা আমদানির দিকে দৃষ্টি করি তবে দেখিতে পাই যে বাণিজ্য বিষয়ে এমত বৃদ্ধির তুলনা নাই, যেহেতুক ১৭৯২ সালে এতদ্দেশে ১৬৫০ টাকার বিলাতী কাপড় আমদানি হয়। এবং ১৮২২ সালে এক কোটি চৌদ্দ লক্ষ টাকার কাপড় এদেশে আমদানি হয়। এই উভয় একত্র করিলে দেখা যায় যে এদেশের এমত রপ্তানির ন্যূন হইয়াছে যে বার ভাগের এক ভাগ মাত্র অবশিষ্ট আছে এবং আমদানির অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই আমদানির বৃদ্ধি হওয়াতে যে তাঁতিদের বাবসায় একেবারে লুপ্ত হইল ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই। ১৭৯২ সালে তের লক্ষ টাকার তাম্র এদেশে আমদানি হয় এবং ১৮২২ সালে একেবারে ত্রিশ লক্ষ টাকার তাম্র আইসে। পাতিলোহার আমদানির অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঘড়ি ও রূপাময় বাসনের আমদানিরও অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে ১৭৯২ সালে পঞ্চাশ হাজার টাকার এই সকল দ্রব্য আমদানি হইয়াছে। পশমী কাপড়েরও আমদানি বাড়িয়াছে। ১৭৯২ সালে এগার লক্ষ টাকার কাপড় আসিয়াছিল পরে ১৮২২ সালে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকার পশমী কাপড়ের আমদানি হয়।”

আদান-প্রদানের এই নিবিড় সম্পর্কের ভিতরেই সেই প্রয়োজনীয় সূত্রটি নিহিত রয়েছে যা দিয়ে সমকালীন ইংলণ্ড ও বাংলা দেশের অনেক কিছু বোঝার পথ পরিষ্কার হয়। স্বাভাবিক-বাণিজ্য ইংলণ্ডের শিল্প-রূপান্তরের প্রেরণা কোথায় এবং কী থেকে, ইংলণ্ডের সেই surface respectabilityর যুগের চিন্তা-জট, উপন্যাসের সীমিত কল্পনা, দর্শনে-অর্থনীতিতে থিসিস অ্যাণ্ডিথিসিসের কাটাকুটি খেলা প্রভৃতির অর্থনৈতিক-ঐতিহাসিক কারণ সূত্র কোথায় এও যেমন এই বিবরণী থেকে স্পষ্ট হয়, তেমনি ভারতবর্ষের তথা বাংলা দেশের বুদ্ধিজীবীরা দেশীয় জীবনের তৎকালীন প্রেক্ষাপটকে উপলব্ধি কতটা করেননি তাও এর মধ্যে প্রকট। বঙ্কিমচন্দ্র এ অবস্থাতেও protection-এর নীতিকে মহাভ্রমাত্মক বলে আখ্যা দিয়েছিলেন সে কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

লক্ষ লক্ষ টাকা নীলের বহির্বাণিজ্য যেমন ভারতবাসীর কোনো কাজে লাগেনি ঠিক তেমনিই নবগত ইংরাজি শিক্ষাও সাধারণ দেশবাসীর জীবনে কোনো রূপান্তরের প্রসাদ আনেনি। শুধু তাই নয় ১৮৩০ সালের মধ্যেই ইংরাজি শিক্ষা সীমিতকরণের বিচিত্র প্রস্তাবের গূঢ়ার্থটুকুও লক্ষণীয় :

সমাচার চন্দ্রিকা থেকে নিচের অংশটুকু দেওয়া হচ্ছে—

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তানেরা ইংরাজি বিদ্যাভ্যাস করিলে উপকার লেশও নাই যেহেতুক তাহারা উভয় বিদ্যায় পারগ হইলে যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ এই ষট্কার্মে তুচ্ছ পরিগ্রহ করিয়া বিষয় কর্মে রুচি করিবেন কিন্তু তাহারো অপ্রাপ্তি কেননা হিন্দু কালেজাদি নানা পাঠশালা দ্বারা অনেক বিষয়ী লোকের সন্তানেরা ইংরাজি বিদ্যায় পারগ হইয়াছে হইতেছে ও হইবেক । ইহারা কেহ দেওয়ানের পুত্র কেহ কেরানীর ভাই কেহ খাজাঞ্চির ভ্রাতৃপুত্র কেহ গুদাম সরকারের পৌত্র কেহ নীলামের সেল সরকারের সন্থকী ইত্যাদি প্রায় বিষয়ী লোকের আত্মীয় তাহারদিগকে কর্মে উক্ত ব্যক্তির। অবশ্যই নিযুক্ত করিয়া দিবেন এবং এই প্রথমত কর্ম হইয়া থাকে যতপি কোনো মুন্সুফির গুরু বা পুরোহিতের পুত্র গিয়া কহেন যে আমাকে এক কর্মে নিযুক্ত করুন সেই মুন্সুফি তাহাকে কর্ম করিয়া দেওয়া দূবে থাকুক বরঞ্চ এমত কহিবেন তুমি অশুভক্ষণে জন্মিয়াছ এমন লোকের সন্তান হইয়া চাকরি করিতে চাহ ।

অথচ এরই উল্টোপিঠে আদালতে পারসী ভাষার পরিবর্তে ইংরাজি প্রচলনের জন্য বে ধরনের অপূর্ব যুক্তি সরববাহ করা হয়েছে তার উপভোগ্যতাও কম নয় । আদালতের বিচার কাযাদিতে ইংরাজির প্রচলনের পর থেকেই মোকদ্দমা ব্যবসায়ের সূত্রপাত এবং তাকে অবলম্বন কবেই আদালতশ্রয়া দাবুশ্রেণীর উদ্ভব । নিম্নোক্ত অংশে যে কারণে পারসী বিদ্যায়ের প্রস্তাবনা করা হয়েছে তার অসঙ্গতিও লক্ষ্য করার মতো । যে সংখ্যার জোরে দেশকে ইংরাজি শিক্ষিত বলে ভেবে নেওয়া হচ্ছে তার ক্ষুদ্র চেহারা যে শুধু হাস্যকর তাই নয়— কলকাতাকেই দেশ ভেবে নেওয়ার প্রবণতাও অনুধাবনযোগ্য ।

পূর্বে তাহার (আদালতে ইংরাজি ভাষা প্রচলনের) এই প্রতিবন্ধক ছিল যে বাঙ্গালী লোকেরা ইংরাজি বুঝিতে পারিত না এবং লিখিতেও পারিত না কিন্তু এক্ষণে সে বাধা ঘুচিয়া গিয়াছে যেহেতুক আমরা দেখিতেছি যে কলিকাতায় কালেজে চারিগত বালক ইংরাজি লিখিতেছে এতদ্বিন্ন কলিকাতার মধ্যে অণু অণু ইচ্ছুলে যত বালক ইংরাজি পড়ে তাহাদের সংখ্যা এক করিলে এক হাজারের নূন হইবে না এবং তাহারা এমত ইংরাজি শিক্ষা করিতেছে যে আদালতের মধ্যে সওয়াল জবাব করিতে তাহাদের আটক হয় না ।

এই বিপাকের ফলে—আত্মীর সভার পুস্তক প্রকাশন, ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য, তত্ত্ববোধিনীর মননজাত ফসল এবং রামমোহনের-বিজ্ঞানাগরের দৃঢ়চিত্ত লক্ষ্য-পরতার যথার্থ ঐতিহাসিক মূল্য শোধ করেও বলা চলে এর কোনো কিছুই জাতীয় ভাববিপ্লবের সূত্রে উন্নীত হতে পারেনি। স্বতন্ত্র শাস্ত্রীর সঙ্গে বিচারে রামমোহনের জয়লাভে কলকাতায় দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কলকাতার মুষ্টিমেয় তাৎকালিক বুদ্ধিবাদীর ভাবরাজ্যের বাইরে সে আলোড়নের মূল্য কতটুকু? অ্যাডাম সাহেবের ইউনিটেরিয়ান সোসাইটির সঙ্গে রামমোহনের সাময়িক সম্পর্কের চেয়ে তার জোর কোন্ অংশে বেশি সে সময়ের কলকাতার জীবনচরণের দিকে তাকালে এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। হয়তো সমস্ত সামাজিক সংস্কার হিন্দু কলেজ আর সংস্কৃত কলেজের মধ্যবর্তী রেলিং-ভেদ আর প্রাচীর-ভেদের লুপ্তি ঘটাতে চেয়ে নকলবুঁদিগড় ধ্বংসের তৃপ্তি অনুভব করেছিল। চেয়ে দেখেনি সাবা দেশের ছুত-অচ্ছূতের সমস্যা। তাই সব বিপ্লবেরই নমুনা দেওয়া চললেও সত্যিকারের বিপ্লব কোথাও ঘটেনি। আমাদের যুক্তি-আদর্শ ধর্ম-বিপ্লব সবই আমদানি করা কথা মাত্র। পরে ‘ভারতী’ পত্রিকার সময়ে ঐ পত্রে যখন ভারতবর্ষে বিধবা বিবাহের তালিকা প্রকাশিত হয় তখন সে তালিকার সংক্ষিপ্ততাতেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বিজ্ঞানাগর মহাশয় এ ব্যাপারে জাতীয় জনচিত্তের গভীরে কোনোও তরঙ্গ সৃজন করতেই পারেননি। বস্তুতপক্ষে কালবৈগুণ্যে তখন আমাদের নিজস্ব প্রাচীন জীবন-বিজ্ঞান হতে বসেছিল শতখান, আর দু-একজন শক্তিশালী কৃষকের মানবজ্ঞান চাষের অসামান্য প্রয়াস সত্ত্বেও নতুন কালের ফসল আমরা ঘবে তুলতে পারিনি। সমাজ-সংস্কারের গায়া চেষ্টায় ভুলতে বসলাম গ্রামীণ জীবনের একদা ঐশ্বর্যবান অতীত, ভুলতে বসলাম তার আসন্ন বিপর্যয়কে।

অথচ যে ইংলণ্ডীয় বিজ্ঞান জন্ম উনিশ শতকের প্রথম পাদে এতদেশীয় বালক-দিগের মধ্যে আগ্রহাতিশয্য দেখা দিয়েছিল সে ইংলণ্ডে তখনকার সমগ্র চেহারাও যদি আমাদের চিন্তনায়কদের চোখে পড়ত তাহলে সমগ্র ইংলণ্ডই জিজ্ঞাসা-চিহ্নের আকারে ফুটে উঠত আমাদের সামনে। ১৮৫০ সাল পর্যন্ত, অগ্নিগর্ভ চার্টার্ড আন্দোলনের প্রাবল্যে খণ্ডযুদ্ধে ও রুটি অথবা রক্তের ধর্মে আইনের অস্তিত্বকে পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সংস্কৃত সেই ইংলণ্ডের গোটা রূপকে জানলে যে জিজ্ঞাসার জন্ম সম্ভব হত অ্যাডাম সাহেবের ইউনিটেরিয়ান কমিটির অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসায় সে সামগ্রিকতা সম্ভব ছিল না।

আমরা যখন শূদ্রকে বেদাধিকার দানের জন্য সংগ্রাম করেছি রীতিমতো। নিষ্ঠার সঙ্গে—শূদ্ররা তখন চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত ও নীলের দাদনের নাগপাশে রুদ্ধথাস। আমরা যখন কলকাতার স্বল্পপরিসর আলোকোজ্জ্বল জীবনে গুটি কয়েক বিদ্যোৎসাহী সাহেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে শিক্ষা-সংস্কারের খসড়া রচনা করছি তখনই অগ্নিগর্ভ গ্রাম বাংলায় নীলকর সাহেবদের সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষে রত হয়েছে বাংলাবচাষীরা। নীল দর্পণ ছাড়া কোনো বাংলা উপন্যাসে নীল চাষীদের সাক্ষাৎ মিলল না। সিপাহী বিদ্রোহের কামান গর্জনও থেকে গেল অশ্রুত। সমকালের প্রধান ঘটনাগুলি সম্বন্ধে বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্নে এই কিস্তুত-কিমাকার অনাগ্রহ লক্ষণীয়। আমরা গভীর ভাবে গ্রাম্য সমাজের বিপর্যয়-মুখী কাঠামোর প্রাচীন বনিয়াদকে বুঝতে চেষ্টা করলাম না—ভুল বিদেশকে অনুবাদ করতে চাইলাম সভা-সমিতির প্রস্তাবে।

•• চার ••

ফলে আমাদের যে জীবন-তৃষ্ণার জন্ম উনবিংশ শতকে সম্ভব হয়েছিল তাব সঙ্গে অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডের নবজাত জীবনাগ্রহের আপাত সাদৃশ্য থাকলেও বস্তুত কোনো মিল নেই। সে যুগেব ইংলণ্ডেব নবোদিত সাধারণ মানুষ জীবনের সমগ্র ব্যাপারে যে অসাম কোতূহলের পরিচয় দিয়েছিল সে কোতূহলেব চিহ্ন আমাদের জীবনে তেমন স্পষ্ট ছিল না। চাকরানীর জীবনই হোক আর সমুদ্রবেষ্টিত নিজনি দ্বীপ কিংবা শ্বেততিমিৰ হিংস্রতাই হোক—শ্রীল অশ্রীল, তুচ্ছ মহৎ, ক্ষুদ্র বৃহৎ, জীবনের সকল কিছু সম্বন্ধে একটা স্বাস্থ্যকর ক্ষুধা এ যুগেব ইংলণ্ডীয় জীবনের অন্ততম বৈশিষ্ট্য। বাংলা দেশের উনবিংশ শতকে উনবিংশ শতকের ইংলণ্ডের সাংস্কৃতিক সংকটের ছায়াই প্রতিফলিত হয়েছে—ইংলণ্ডেরই উনবিংশ শতাব্দী যেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর সে বীষবত্তা হাবিয়ে ফেলেছিল তখন ইংলণ্ড-চোয়ানো সেই জীবনীশক্তি বাংলা দেশে আর কী নতুন ফসল ফলাবে?

সুতরাং পিকারেস্ক উপন্যাসেব outcast-দের ধাবা বহন করে জীবনেব অতি সামান্য ভগ্নাংশ সম্বন্ধেও অশেষ কোতূহলী বাংলা উপন্যাস সৃজিত হল না। একটি মাত্র বিষয়ে আমাদের আগ্রহ ছিল, ইংরাজি নীতিশিক্ষার পাঠশালার পড়া সং-মানুষের মডেল হবার আগ্রহ। জীবনের বিচিত্র ভূমিতে পর্যটন করা বিশেষ আমাদের অদৃষ্টে সম্ভব হয়নি, বহু অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ বর্ণময়তায় আমরা উজ্জ্বল হতে

পারিনি। রামমোহন-বিজ্ঞানাগরের অগ্নি-বলয় থেকে জাত ছায়কান্ধ গঙ্গোপাধ্যায়ের গায় অসমসাহসী কর্মীর অভিজ্ঞতা বা জীবন-দৃষ্টি আমাদের কল্পনাকে স্পর্শ করেনি। আমাদের প্রথম উপন্যাস আলালের ঘরের দুলাল একটি গোটা উপন্যাসের সকল প্রতিশ্রুতি পালন করলেও অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধ প্রয়োগে সীমিত শিল্পকর্মই থেকে গেল।

তথাপি যেহেতু আলালের ঘরের দুলাল আমাদের প্রথম উপন্যাস সে কারণে আলালের ঘরের দুলালের সপ্রসঙ্গ আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখন চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আবিষ্কারের পর ফুলমণি এবং করুণার কথা আলালের ঘরের দুলালের প্রসঙ্গে অবশ্যই উত্থাপিত হবে। এবং আমাদের বিবেচনায় শুধুমাত্র সাল-তারিখের বিচারেই প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা বিতরণ সীমাবদ্ধ না রেখে উভয় রচনাব তাৎপর্ষের তুলনামূলক বিচার হওয়া প্রয়োজন। এই তাৎপর্ষ নির্ণয়েই প্রথম সার্থক উপন্যাসেব মর্যাদা স্থিরীকৃত হবে।

কোনো জাতির সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম উপন্যাস তাকেই বলা চলে যে প্রথম রচনা জাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশিষ্ট পর্ষায়েব সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। শুধু প্রথমত্বই তার একমাত্র গুণ নয়। বাস্তব পক্ষে উপন্যাস ব্যাপারটির সঙ্গে সভ্যতার ও সংস্কৃতির চলিষ্ণু ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ যোগ একটা আবশ্যিক ঘটনা। পরীর গল্প উপন্যাস নয়, বাস্তব জীবনের মর্মমূলের সঙ্গে তার যোগ নেই বলে। তেমনি যদি কোনো গল্প-গ্রন্থের সন্ধান ফেলে যে বচনায় জাতীয় ভাবাকাশের সাক্ষাৎ ক্ষণেকের জন্তেও মেলে না তাকে আর যাঁই হোক জাতীয় উপন্যাসের তালিকায় প্রথম স্থান দেওয়া চলে না।

আমরা আগেই বলেছি, এবং পরে বিস্তারিত ভাবেই বলব যে আলালের ঘরের দুলালে প্রচুর সীমাবদ্ধতা। সে সীমাবদ্ধতার মূলেও রয়েছে উনবিংশ শতকের স্বদেশের সমাজ ইতিহাসের অষ্টাবক্র অসম্পূর্ণতা। তথাপি সে মূলশায়ী অসঙ্গতি সবার্থেই জাতীয় অসঙ্গতি। পববর্তী স্মরণীয় প্রতিভাধর উপন্যাসেও সে অসঙ্গতির পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ নানা প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু এ-কথা সদাই স্বীকার্য যে মূল-লগ্ন সেই দুর্বল মৃত্তিকার সবটাই দেশজ মৃত্তিক। ফুলমণি এবং করুণাব বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান অভিযোগ মূলত এইখানে। একে বড়ো জোর একটা গল্পকাহিনী বলা যায় হয়তো, এর বেশি কিছু নয়। যে-মৃত্তিকা এর উৎসমূলে তার সঙ্গে ডোম আন্তোনিয়-জেন্টুদিগের সহিত কথোপকথনের মিল আছে—উপন্যাসের আকাশ

নানা পরিচয় দিয়েছেন সেগুলিকে পরীক্ষা করা যাক। লেখিকা করুণার মতি পরিবর্তনকে মনে করেছেন ঈশ্বরের দয়া। সে দয়াব সূত্র অবশ্যই মেমসাহেব স্বয়ং। করুণাব যথাবিহিত খ্রীষ্ট ধর্মাচরণেব ফলে, নিয়মিত গির্জা-গমনেব ফলে সে যখন স্বামীসোহাগেব অধিকাৰিণী হল তখন অবহেলায় মৃত জ্যেষ্ঠ পুত্রেব কথা তাব প্রায়ই মনে পড়ত। পুস্তকেব শেষাংশে লেখিকা করুণাব কথা বর্ণনা করেছেন

‘করুণা শেষে সত্য খ্রীষ্টিয়ান হইল, কিন্তু সে ধৰ্ম্মেতে কখন প্রফুল্লিতা হইতে পারিল না। কেননা তাহাৰ জ্যেষ্ঠ পুত্রেব মৃত্যু অনেকবার মনে পড়িত’
চিত্তবঞ্জনবাবু এব ব্যাখ্যায় বলেছেন।

‘লেখিকা এখানে তাঁব উদ্দেশ্য ভুলে গেছেন, তিনি যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচাবক সে কথা মনে থাকলে কখনো লিখতে পারতেন না যে, ধর্ম করুণাকে শাস্তি দিতে পারেনি। শ্রীমতী ম্যালেন্সের প্রচাবক সত্তা তাঁব শিল্পী-সত্তাব নিকট পরাজিত হয়েছে। করুণা না এটাই তাব সবচেয়ে বড় পরিচয়। তাই ধর্মের উপদেশ সন্তান হাবাবাব বেদনা ভুলাতে পারেনি।’

দুঃখের বিষয় এব কোনো কথাই সত্য নয়। প্রথমত খ্রীষ্টধর্ম বৈষ্ণব ধর্ম নয়। হবি নাম উচ্চারণেব সঙ্গে সঙ্গে পাপস্ফালনেব কথা খ্রীষ্টধর্মে নেই। এবঞ্চ আদি পাপেব স্মৃতি সেখানে একটা ভূমিকা অবিকার কবে হয়েছে বলেই অনুশোচনাৰ স্থান সেখানে বিচ্যমান। ‘প্রার্থাশিত্ত বিনা ঈশ্বর একটি পাপও ক্ষমা কবেন না’— এই হল বাইবেলীয় বিশ্বাস। শ্রীমতী ম্যালেন্সও সেই বিশ্বাসেবই বশবর্তী হয়েছেন। এখানে প্রচাবক-সত্তা এব শিল্পী-সত্তাব প্রসঙ্গ এই কাৰণে নিবর্থক। দ্বিতীয়ত, যদি দেখা যেত করুণাব পুত্রেব অপমৃত্যুৰ বেদনা তাকে ধর্মাচরণেব মাঝেও অশান্ত কবে তুলেছে তবে চিত্তবঞ্জনবাবুৰ বক্তব্যেব কথঞ্চিৎ সার্থকতা পাওয়া যেত। যেটুকু চিত্তবঞ্জনবাবু উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার কবেছেন তাব পবেব কথাগুলি হল “এমত সময়ে সে কেবল প্রভুৰ বাক্য পাঠ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিত।” স্বতবাং দেখা যাচ্ছে যে ধর্ম-নিদেশ নিবপেক্ষ যে বেদনাৰ কথা চিত্তবঞ্জনবাবু বলেছেন তা একান্তই তাব কল্পনা।

চিত্তবঞ্জনবাবু এই পুস্তকে ব্যবহৃত নানা চবিত্রে হৃন্দ এব মানসিক সংঘাতাদি দেখতে পেয়েছেন। তিনি এমন কথাও বলেছেন, যে—

‘মানসিক হৃন্দেব উপর আলোকপাত কবে শ্রীমতী ম্যালেন্স বাংলা সাহিত্যেব চবিত্র চিত্রণেব ক্ষেত্রে প্রথম আলোকপাত কবেছেন।’

অথবা

‘আধুনিক উপন্যাসে ঘটনার পৃথক কোন মূল্য নাই, মনে কি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি কবেছে তা দিয়েই ঘটনার মূল্য বিচার করা হয়। শ্রীমতী ম্যালেন্সের উপন্যাসের এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট।’

প্যাবির খ্রীষ্টান হতে চাওয়া ও স্বামীব বাধাদানের প্রসঙ্গে লেখিকা প্যাবির মনোভাব বর্ণনা কবেছেন

‘আমি একবার মনে কবিলাম, যদি ঘবে ঘাইয়া স্বামীব সাক্ষাতে ঠাকুব পূজা’ কবি, ও সন্তানদিগকে গোপনে খ্রীষ্টের বিষয়ে শিক্ষা দিই তবে আমি তাহাবা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সন্তানস্বত্ব খ্রীষ্টান হইতে পাবিব।’

এই প্রতাবণার ক্ষণিক ইচ্ছা চিত্তবঞ্জনবাবুব মতে দ্বন্দ্ব। অবশ্যই এই তথাকথিত দ্বন্দ্বের পূর্বেই আদর্শ খ্রীষ্টানের মতোই পারিকৈ দিয়ে উচ্চারণ কবানো হয়েছে যে :

‘কিন্তু তাহাদেব বিবহে অতীব আমি কখনো খেদ কবি নাই কেননা যীশু পবিবাব হইতেও ভাল, তিনিই আমাব সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য যোগাইয়াছেন।’

সুতরাং এখানেও দ্বন্দ্বের কোনো অবকাশ ছিল না। প্যাবির প্রতাবণার ইচ্ছা আসলে সেই আদি শয়তানের প্রলোভন, যীশুব রূপায় এ থেকে মুক্তি ঘটল। চিত্তবঞ্জনবাবু যাবে উপন্যাস প্রতিপন্ন কবাব জন্ত বাস্তব তাকে বাংলা ভাষায় লিখিত ইংবাজি উপন্যাসও বলা যায় না। ভাবতবর্ষের সভ্যতাকে বোঝা এবং ইংবাজি উপন্যাস সাহিত্যের দাবাকে আয়ত্তাধীন কবা দুইই লেখিকাব ক্ষমতার বাইরে ছিল।

●● পাঁচ ●●

পক্ষান্তরে আলালের ঘবের ঢুলাল একটি যথার্থ উপন্যাসের সকল লক্ষণ অঙ্গীভূত কবেই বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে আবির্ভূত হয়েছে। প্যারীচাঁদের সাহিত্য-কীর্তির সমালোচনা বিস্তারিতভাবে আমবা পবে কবছি। প্যারীচাঁদের লেখায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম যে যে বৈশিষ্ট্যের দেখা পাওয়া গেল বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে সেই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বৈশিষ্ট্যগুলি এই—

(ক) উপন্যাসোচিত একটি সমস্তাব প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া গেল এই বচনায়।

ঠকচাটী কোনো উপায় না দেখিয়া চুড়িওয়ালী হইয়া ভেটিয়ারি গান
'চুড়িয়ালের চুড়িয়া' গাইতে গাইতে গলি গলি ফিরিতে লাগিল।

লক্ষণীয় যে, পাপেব সাজা পুণ্যেব পরাজয় জাতীয় কোনো মন্তব্য ব্যতীতই প্যারী-
চাঁদ এই সমাপ্তিবাদন কবেছেন। যে অনাসক্ত জীবন-প্ৰীতির ফলে উপন্যাস এ
যুগেব বিশিষ্ট শিল্পরূপ সেই অনাসক্ত জীবন-প্ৰীতির প্রথম প্রকাশ আলালের
ঘরেব ঢুলাল।

•• ছয় ••

(কিন্তু তথাপি বাংলা দেশের ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক কালের প্রতিষ্ঠায় যে
অসংলগ্নতা যে অসম্পূর্ণতা, সে অসম্পূর্ণতাব দায়ভাব অবশ্যই প্যারীচাঁদকেও বহন
করতে হয়েছিল।) শিল্পীর প্রয়াস নিজ জীবনবোধের টানেই শিল্পময় হয়ে ওঠে।
কিন্তু সে প্রয়াসের ঝাঁকে ঝাঁকে তাব স্বাধীন ধাবাকে নিয়ন্ত্রিত করে সভ্যতাব
নিজস্ব ছন্দ, কাললগ্নের বিশেষ বিশেষ প্রভাব। আমবা এই আলোচনার প্রথমে
জাতীয় প্রেক্ষাপটে কলকাতা নগরীকে স্থাপিত করে তাব স্বরূপ বোঝাব চেষ্টা
করেছি। বলেছি যে, ইংলণ্ডে যে-জীবনম্পৃহা থেকে উপন্যাস-সাহিত্যেব জন্ম
আমাদের ঔপনিবেশিক জীবনের মিত পরিসরে সে জীবনম্পৃহা ছিল সীমিত।
অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে যে আত্মাবেজ মানুষ ছিল সকলের চেয়ে আগ্রহোদ্দীপক
বিষয়—ঠিক সেই ধবনের আত্মাবেজ মানুষেব সাক্ষাৎ সাধারণ ভাবে এদেশে
মেলেনি। নবকালের ফলস্বরূপ যে নতুন মানুষেব উদয় হল ঊনিশ-শতকের মধ্য
ভাগে তাদের কর্মময় জীবনেব পবিসব ছিল গণ্ডিবদ্ধ। সে জীবনেব সমস্তা, সে
জীবনেব আশা এ সমস্তই ছিল মাঝারি ধবনের। ঔপনিবেশেব পাকে বদ্ধ জীবনে
মিলের ইউটিলিটি অথবা বেঞ্চামের হিতবাদ সবই তত্ত্বানুভূতি—বৃহৎ কর্মময়
ভূমিকা ছিল অনুপস্থিত। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আমাদের মধ্যবিত্ত
জীবনে যেটা সত্যিকাবেব বাসনা ছিল তা হল ইংবেজের (ঊনিশ-শতাব্দীর
ইংরেজ) দেওয়া লেখা পড়া শিখে সংমানুষ হবার বাসনা। ঐ শতাব্দীর শেষার্ধে
ভিক্টোরীয় মেজাজ এই বাসনাকে একটা বিশিষ্ট রূপও হয়তো দিয়েছিল। কিন্তু
এই সংমানুষদের কর্মময় ভবিষ্যৎ কী ছিল? স্বভাবতই তেমন কিছু না। বার্ক
আমাদের কাছে তখন ছিলেন উত্তেজনামূলক জনশ্রুতি। কীটসের মৃত্যু অথবা
শেলির বিদ্রোহ ছিল আমাদের কাছে কাহিনী মাত্র। আমাদের শাস্ত্র ভদ্রমানার
সাধনায় রাজার চেয়েও বোধ হয় শঙ্খলার দাবিদার ছিলেন ঈশ্বর। স্বভাবতই

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে ইংরাজ ভদ্রলোকের উদয়ে ইংলণ্ডের ইতিহাস হয়েছিল age of respectability, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে আমরা সে ভদ্র-লোকদেরই সন্ধান কবেছিলাম। দুঃখের বিষয় যাদের দেখা পেলাম তাই ইংবাজি স্কুলের good boy মাত্র।

ফলে এক ধবনের টাইপ অঙ্কনে বাংলা উপন্যাস যতটা সিদ্ধকাম—নতুন কালের নতুন চবিত্র অঙ্কনে সে-জাতীয় সাফল্যের অষ্টা হতে পারেনি। বেণীবাবু এবং ববদাবাবুর চবিত্রে এই সীমায়ন অনেকটা স্পষ্ট। বন্ধিমের বোমাসের চবিত্রগুলির বর্ণনাময়তাব কথা বাদ দিলে, তাঁর সামাজিক উপন্যাসের নায়কেরা অনেকে, বা বমেশবাবুর সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাসের ভদ্রলোক চবিত্রাবলী সকলেই এই সীমায়নের ফলভোগী। ঠকচাচার মতো সার্থক টাইপের সাক্ষাৎ বাংলা সাহিত্যে প্রায়ই মেলে—স্বর্ণলতার জীবন্ত ‘ঙ’-র কথা ভিন্ন প্রসঙ্গে স্ববর্ণীয়। আসলে যেমন বলা হয়েছে—ঠকচাচা ভাড়াবত্তের বংশধর মাত্র। এ চবিত্র রূপায়ণে লেখকের সংসার-চেতনা এবং বাস্তব দৃষ্টির যদিবা স্থগাতি কবা যায়—কল্পনাশক্তির নয়। প্যারীচাঁদ ঊনবিংশ শতাব্দীর একমাত্র বাঙালী লেখক যিনি আঁকাডা বাস্তবকে উপন্যাসে উপস্থাপিত করতে পেরেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর নানামুখী সাফল্যের প্রসঙ্গেই ঠকচাচা এবং বক্রেখবের চবিত্র স্বর্ণের যোগ্য এবং বলা যায় যে ঊনিশ-শতকের সহসা-উদ্ভূত নগর-জীবনের অসংগঠিত পরিবেশে ঠকচাচা এবং বক্রেখবের চবিত্র প্রতিনিধিত্বানীয়। কিন্তু এতসম্বন্ধে এ-কথা উপন্যাস আলোচনার ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য যে, যে-ব্যক্তির রূপায়ণ উপন্যাস প্রসঙ্গে প্রধান ব্যাপার, টাইপের মাধ্যমে সেই ব্যক্তির সাক্ষাৎ মেলে না। বক্রেখবের হাস্যমর্গী প্রবন্ধনা এবং ঠকচাচার অন্তর্নিহিত যক্ষণায় প্রভেদ থাকলেও এই উভয় চবিত্রেই নবকালের নেতির দিকটাই অধিক প্রস্ফুট। মূল নায়ক মতিলালেও অনুরূপ ঘটনাই দৃশ্যমান। অবশ্যই নেতি এবং ইতিব প্রশ্নই শিল্পীর কাছে একমাত্র মূল্যবান প্রশ্ন নয়। নেতির প্রতিক্রিয়াতেও শিল্পী অনেক সময় জীবনের গুঢ় তাৎপর্যকে উপলব্ধি করেন ও কবাবে পাবেন যদি জীবনের বোধ-সংক্রান্ত সূত্রগুলিতে কোনো রুদ্রিমতা না থাকে। কিন্তু মতিলালের মধ্যে, ঠকচাচার মধ্যে বা বক্রেখবের মধ্যে জীবনের যে নেতির দিক প্রকাশিত হয়েছে তাই মূল্যই বা কতটুকু?

নেতি দৃষ্টি শিল্পে কখনই মাত্র নেতি দৃষ্টির জন্যই মূল্যবান হতে পারে না। কার্টুন রচয়িতাকে যেমন বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন থেকে কার্টনের অভীক্ষিত

বিকৃতি রচনা করতে হয়—নেতিবাচক চরিত্রকেও শিল্পী তেমনি সাহিত্যে উপস্থাপিত করেন স্তম্ভ এবং পূর্ণ জীবন সম্বন্ধে নিজে অবহিত থেকে। আলালের ঘবেব ছুলালেব ইতিবাচক চরিত্রগুলির মধ্যে প্যাবীচাঁদ মল্লিক বলতে কী বুঝতেন সে ধারণা প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান। এই চরিত্রগুলির অতি সীমাবদ্ধতার জন্যই মতিলাল, ঠকচাচা এবং বক্রেশ্বরের ফাঁকিবাজিব এবং শূন্যমনস্কতার রূপও পুঁথির পাতাকে বিশেষ অতিক্রম করতে পাবেনি। ঠকচাচা ছাড়া, মতিলাল এবং বক্রেশ্বরের যা সাংসারিক সম্ভাবনা ছিল তা হল বেণী বা বরদাবাবু হয়ে ওঠা। কিন্তু বেণী বা বরদাবাবুব অতিসীমিত রূপে আমবা এমন কিছু পেলাম না যাব জন্মে মতিলাল এবং বক্রেশ্বরের ব্যর্থতাকে আমাদের কাছে জীবন্ত বলে মনে হবে। ফলে উপন্যাসের গঠনগত ভাবসাম্য আহত হয়েছে।

কেননা বরদাবাবুদের জীবনাচরণে কোনো যন্ত্রণা নেই। নেই কোনো দ্বন্দ্ব। এমন কি এই আদর্শ জীবনাচরণেব কোনো তাৎপর্যকেও লেখক উপন্যাসেব বস সূত্রে গ্রথিত করতে পাবেননি। শুধু সদাচারী এবং সদালাপী চরিত্রের মডেল হয়ে উঠেছেন বরদাবাবু। বামতন্ত্র লাহিড়ী এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তিবৃন্দের জীবনে বরদাবাবুব আদর্শ কল্লিত হয় না। পরবর্তীকালে শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন-কাহিনীতে শুদ্ধতার জন্ম যে জীবনব্যাপী প্রয়াস পবিলক্ষিত হয় তাব একটা ত্রিমাত্রিক রূপ নিঃসন্দেহে বিদ্যমান। কিন্তু বরদাবাবুব চরিত্রে সে ত্রিমাত্রিকতা নেই। শিল্পবোধেব এই ত্রুটি প্যাবীচাঁদেব জীবনবোধেব ত্রুটি থেকেই উৎসাবিত। বরদাবাবুব সদাচারী জীবনেব নিদর্শনকে প্যাবীচাঁদ এই ভাবে একস্থানে উপস্থাপিত কবেছেন

একজন ভদ্রলোক এক আঘাতিত ব্যক্তিকে ক্রোড়ে কবিয়া বসিয়া আছেন—আঘাতিত ব্যক্তিব মস্তক দিয়া অবিভ্রান্ত রূপেব নির্গত হইতেছে, ঐ বক্তে উক্ত ভদ্রলোকেব বস্ত্র ভাসিয়া যাইতেছে। সাবজন জিজ্ঞাসা কবিল, আপনি কে, ও এ লোকটি কি প্রকাবে জখম হইল। ভদ্রলোক বলিলেন, আমাব নাম বরদাপ্রসাদ বিশ্বাস—আমি এখানে কোনো কর্ম অনুরোধে আসিয়াছিলাম। দৈবাৎ এই লোক আঘাতিত হইয়াছে। এই জন্ম আমি আঙুলিয়া বসিয়া আছি—শীঘ্র হাসপাতালে যাইব তাহাব উদযোগ পাউতেছি। একথানা পালকী আনিতে পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু বেহারারা ইহাকে কোনো মতে লইয়া যাইতে চাহে না, কাবণ এই ব্যক্তি জেতে হাড়ি। সাবজন কহিল—বাবু—বাঙালীবা হাড়িকে স্পর্শ করে

না, বাঙালী হইয়া তোমার এতদূর করা বড়ো সহজ কথা নহে, বোধহয় তুমি বড়ো অসাধারণ ব্যক্তি ।

স্বভাবতই বরদাবাবুকে এখানে সংকার্যেব জন্ত বন্ধপবিকব সংস্কারমুক্ত উনিশ শতকীয় চবিত্তের প্রতিনিধি রূপেই আমবা পাচ্ছি । কিন্তু উপন্যাসে যে জীবন-বোধব শিল্প-স্পর্শ ঘটলে এ চবিত্ত জীবন্ত হয়ে উঠতে পারত তা যে ঘটেনি সেটা যে-কোনো সৌখিন পাঠকের কাছে ও স্পষ্ট । এব সঙ্গে গোবা উপন্যাসেব প্রায় সমজাতীয় একটি ঘটনাং বর্ণনার প্রতিতুলনা কবা চলে—

একজন বৃদ্ধ মুসলমান মাথায় এক ঝাঁকা ফল-সবজি আঙা মাখন প্রভৃতি আহাৰ সামগ্রী লইয়া কোনো ইংরাজ প্রভুব পাকশালা অভিমুখে চলিতে-ছিল । চেন পবা বাবুটি তাহাকে গাড়িব সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবাব জন্ত ইঁাকিয়াছিল, বৃদ্ধ শুনিতে না পাওয়াতে গাড়ি প্রায় তাহার ঘাডেব উপব আসিয়া পড়ে । কোনো মতে তাহার প্রাণ বাঁচিল কিন্তু ঝাঁকা সমেত জিনিসগুলি বাস্তায় গড়াগডি গেল এবং ক্রুদ্ধ বাবু কোচবাক্স হইতে ফিবিয়া তাহাকে ডামশুয়াব বলিবা গালি দিয়া তাহার মুখেব উপব সপাং করিয়া চাবুক বসাইয়া দিতে তাহার কপালে বক্তেব বেথা দেখা দিল । বৃদ্ধ আল্লা বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া যে জিনিসগুলি নষ্ট হয় নাই তাহাই বাছিয়া ঝাঁকায় তুলিতে প্রবৃত্ত হইল । গোবা ফিবিয়া আসিয়া বিকীর্ণ জিনিসগুলি নিজে কুড়াইয়া তাহার ঝাঁকায় উঠাইতে লাগিল । মুসলমান-মুটে ভদ্রলোক-পথিকেব এই ব্যবহারে অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া কহিল, “আপনি কেন কষ্ট কবছেন বাবু—এ আব কোনো কাজে লাগবে না ।”

গোবা এ কাজেব অনাবশ্যকতা জানিত, এবং সে ইহাও জানিত, যাহাব সাহায্য কবা হইতেছে সে লজ্জা অনুভব কবিতেছে—বস্তুত সাহায্য হিসাবে এরূপ কাজেব বিশেষ কোনো মূল্য নাই—কিন্তু এক ভদ্রলোক যাহাকে অন্তায় অপমান কবিয়াছে আব এক ভদ্রলোক সেই অপমানিতেব সঙ্গে নিজেকে সমান মনে কবিয়া ধর্মেব ক্ষুদ্র ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য আনিতে চেষ্টা কবিতেছে, এ কথা বাস্তাব লোকেব পক্ষে বোঝা অসম্ভব ।

গোবা উপন্যাসে এই ঘটনার তাৎপর্য অনুধাবনযোগ্য । আলালের ঘরের ঢুলালে ববদাচরণ বিশ্বাসেব আচরণে যেখানে ইংরাজি পাঠশালাব ইওরোপীয় উদাবতাবাদের মাত্র বাস্তবে অনুবাদ, উদ্ধৃত অংশে গোরাব আচরণেব গূঢ়ার্থ সেখানে তাব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক । দুই ঘটনাংশেই দেখা যায় যে শিক্ষিত

উদার-চেতা বাঙালী বাবু দেশবাসীর সংকীর্ণতায় পীড়িত। কিন্তু দুই প্রতিভার তারতম্য স্বীকার কবেও একটা প্রশ্ন অক্ষুণ্ণ থাকেই, তা হল আলালের ঘবেব ঢুলালের বর্ণিত অংশে জীবিতকল্প সপ্রাপ্ত। নেই, সে-ক্ষেত্রে গোবা উপন্যাসেব উদ্ধৃত অংশে বাস্তবিক একটি পীড়িত মানুষেব স্পন্দন অনুভব কবা যায় কেন? উপন্যাসেব রস-সিদ্ধিব গঢ়-কৌশলেব মনোই তাৰ উত্তৰ নিহিত। সভ্যতাব যে বিশিষ্ট পৰ্যায়েব সঙ্গে উপন্যাসেব সম্পর্ক প্রত্যক্ষ, সেই বিশিষ্ট পৰ্যায়েব প্রধান উপাদান বা সূত্রগুলিব সাহায্যেই ঔপন্যাসিক গড়ে তোলেন উপন্যাসেব শিল্পরূপ। এটাই হল প্রকৃতপক্ষে জীবনকে শিল্প-বিগ্ৰহ কবা। সেখানে এব ব্যত্যয় ঘটে সেখানে উপন্যাসে আব জীবন জীবনেব মতো প্রতীয়মান হবে না। মুসলমান মুটেব সংকোচ, গোবাব সাহায্যেব অনাবশ্যকতা-বোধ এব সাহায্যেব অকিঞ্চিৎকরত্ব সম্বন্ধে লজ্জা, অপব ভদ্রলোকেব কৃত অগাধ অপমানেব ফলে অপমানিতেব সঙ্গে নিজেব একাত্মতা স্থাপনেব প্রয়াস—এই সকল কিছু মধ্য গোৱা অনুভব কবেছে বাবু-জীবনেব সংকীর্ণ পরিণিব সঙ্গে বৃহত্তর দেশ-জীবনেব বিচ্ছেদেব ঘন যক্ষণ। এই যক্ষণেব বড়ে গোবা হয়ে উঠেছে জীবন্ত। ববদা-প্রসাদ বাবুও সমগ্র দেশেব জন্ত বৈদনা অনুভব কবেন বটে। কিন্তু সে বৈদনাৰ লাঘব সাধনেব জন্ত তিনি অচিবেই খুঁজে পান সাহুনাৰ কৃত্রিম সূত্রগুলিকে। বেহাবাবা হাড়িব আতত দেহ বইবে না—আমাদেব সমাজ জীবনেব রূপ নিগণে এ ছবি যথার্থ। কিন্তু সাজেণ্টেব প্রশংসাপত্রে যে শিক্ষাভিমানেব প্রশংসা—‘বোধহয় তুমি বড়ো অসাধারণ ব্যক্তি’, সে সাহুনাৰ না প্রস্তুট হয় জীবন, না প্রস্তুট হয় শিল্প। যে-কোনো পদ্ধতিতেই হোক না কেন গোটা জীবনেব প্রতিক্রিয়া উপন্যাসেব মূখ্য চৰিত্রগুলিতে অনুভব কবানো ঔপন্যাসিকেব একটা কাজ। সে পদ্ধতিতে ক্রটি থাকলে শিল্পেবও ক্রটি ঘটে। আলালের ঘবেব ঢুলালের ভদ্রলোক চৰিত্রগুলিতে এই মৌল ক্রটি বিদ্যমান। এখানে তৎকালীন জীবনেব বহির্মুখ গতিৰ প্রতিক্রিয়াকে একান্তই ঋজুভাবে প্রতিফলিত কবা হয়েছে।

•• সাত ••

১

কিন্তু ঠকচাচাব প্রসঙ্গ পৃথকভাবে আলোচনা না কবে আলালের ঘবেব ঢুলালের কথা শেষ কবা যায় না। বাংলা সাহিত্যেব সমালোচক ঐতিহাসিক ডাঃ সুকুমার সেন এই মত পোষণ কবেন যে, ঠকচাচাব দিক থেকে বিচার কবলে আলালের ঘবেব ঢুলালকে পিকাবেস্ক-জাতীয় নভেলেব পৰ্যায়

ফেলতে হয়^{১)} ঠকচাচা পিকারো বা Rogue-এর পর্যায়ে অবশ্যই পড়ে।) কিন্তু
 মাত্র এই কারণেই পিকারেস্ক-উপন্যাসের প্রয়োজনীয় শর্ত পূরিত হতে পারে
 না। প্রধানত যে ঐতিহাসিক কাব্য পবম্পবায় পিকাবেস্ক নভেলের নভেলের
 অব্যবহিত পূর্বপুরুষ হিসাবে আবির্ভাব সেই সামন্ততন্ত্রী সামাজিক কাঠামোর
 বিপর্যয়ের সমস্ত চাবিত্রা এদেশে বিদ্যমান ছিল না। কনওয়ালিসের ভূমি-
 ব্যবস্থার ফলে সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারাকে কোনোক্রমে জীবিত রাখার ব্যবস্থা
 বরং এদেশে হয়েছিল। ফলে সামন্ততন্ত্রের বিলয় এবং ধনতন্ত্রের উদয়ের মহা-
 সন্ধিক্ষণ এদেশে কখনো পবিস্ফুট হয়নি। পিকারো-ব সমাজ-উপেক্ষী
 ঙ্গসাহসিক কার্যকলাপের নিদর্শনও সে কারণেই এদেশে ছিল না। ঠকচাচা
 নিকপায় প্রবঞ্চনাশ্রমী জীবনে পিকারোর ঙ্গসাহস নেই। {কাজেই ব্যঙ্গ দৃষ্টি
 এবং বঙ্গাত্মক ঘটনার (Satiric observation and comic episodes)
 কিছু ব্যবহার রয়েছে বলেই একে পিকাবেস্ক নভেলের পর্যায় ফেলা যায় না।}
 দ্বিতীয়ত, {পিকারোর চবিত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়}—He is not so
 much a complete individual personality whose actual life
 experiences are significant in themselves কেননা {Picarো
 অদৃষ্টে লিখিত সমস্ত ঙ্গখণ্ডভোগকেই পিকারো যেন মজ্জে জল কবে দেবার ক্ষমতা
 রাখে।*} এই চবিত্রে ব্যতিক্রম ছিল বলেই বিখ্যাত সমালোচক আর্নেস্ট ওয়াট
 ডিফোর ‘মল ফ্লাগার্স’ এবং নাথিকার কার্যকলাপে পিকারো-ব তুলনা পেলেও
 উক্ত উপন্যাসকে পিকাবেস্ক উপন্যাস বলতে স্বীকৃত হননি। {ঠকচাচা
 ঠকচাচা বেদনাকে জল কবে দেবার ক্ষমতার কোনো পবিচয় পাই না।
 বরঞ্চ ঠকচাচা সংসার-বর্ণনায় ঠকচাচা এবং ঠকচাচীর কথোপকথনে যে
 বেদনার চিত্র পবিস্ফুট হয়েছে তা বাতিমতো চিত্তদ্রাবী। ঠকচাচা
 ঠকচাচীর চুড়িওয়ালী হয়ে যাওয়া প্রভৃতিতে যে কাকণ্য তা স্পর্শগ্রাহ্য বাস্তবতায়
 রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে বলেই ঠকচাচা ক্রিয়াকলাপে Picaro-র ছায়া খুঁজে
 পেলেও সে শেষ পর্যন্ত পিকাবেস্ক নভেলের নায়ক নয়। ঠকচাচা
 দুঃখী জীবনের প্রগাঢ় প্রকাশের জন্যই ঠকচাচা পূর্ণাবয়ব বাস্তব আকৃতি লাভ
 করেছে। প্রাথমিক ব্যঙ্গের দৃষ্টি অচিরেই বিলীন হয়েছে অশ্রুর বাষ্পাবেগে।}

* Picaro enjoys that charmed immunity from the deeper stings of pain and death Ian Watt

{এটা পিকারেস্ক উপন্যাসের লক্ষণ নয়।} প্যারীচাঁদ মিত্র ঠকচাচার চরিত্র রূপায়ণে প্রথম দিকে হয়তো কিছুটা ক্যারিকেচারের ভঙ্গি বজায় রেখেছিলেন।} ডিকেন্সের ক্যারিকেচারগুলো স্মরণ করলে এ-কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে উপন্যাস সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ক্যারিকেচারগুলোও সাদৃশ্য বহনের দিক থেকে প্রয়োজনীয় সাধারণ দাবি করতে পারে। {ঠকচাচা এবং বাহুলা উনিশ শতকের সামাজিক ডামাডোলের এক কিস্তৃতকিমাকার অবস্থার নিদর্শন। কলকাতা-কেন্দ্রিক নতুন বিচারালয়ের আইন ব্যবসায়গত (বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে বর্ধিমচন্দ্রের কটাক্ষ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়) জটিল অবস্থার অনিবার্য ফল ঠকচাচা এবং বাহুলা।} বলা যেতে পারে বাংলা দেশের নতুন কালের আইন-জগন্নাথের এরাই হল পাণ্ডা। {বাহুলার বেপরোয়া চরিত্রের পটভূমিকায় ঠকচাচার সংসারী মানুষের কারুণ্য ঠকচাচাকে Picaro বা Rogue-এর পর্যায় থেকে পূর্ণ ব্যক্তিত্বে উন্নীত করেছে। ঠকচাচা-বাহুলা সংবাদের শেষ দৃশ্য সে প্রসঙ্গে অনবদ্য।}

এখানে ঠকচাচা ও বাহুলা জাহাজে চড়িয়া সাগর পার হইয়া চলিয়াছে।

দুটিতে মানিকজোড়ের মতো, এক জায়গায় বসে—এক জায়গায় থায়—এক জায়গায় শোয়, সর্বদা পরস্পরের দুঃখের কথা বলাবলি করে। ঠকচাচা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলে—মোদের নসিব বড়ো বুরা—মোরা একেবারে মেটি হলুম—ফিকির কিছু বেরোয় না, মোর শির থেকে মতলব পেলিয়ে গেছে—মোকান বি গেল—বিনির সাথে বি মোলাকাত হল না—মোর বড়ো ডর তেনা বি পেটে সাদি করে।

বাহুলা বলিল—দোস্তু, ওসব বাত দেল থেকে তফাত করো—তুনিয়াদারি মুসাফিরি—সেরেফ আনা যানা—কোই কিসিকা নেহি—তোমার এক কবিলা, মোর চেটে সব জাহান্নমে ডাল দেও, আবি মোদের কি ফিকিরে বেহতর হয় তার তদ্বির দেখ।

বাতাস হু হু বহিতেছে জাহাজ একপেশে হইয়া চলিয়াছে তুফান ভয়ানক হইয়া উঠিল। ঠকচাচা ত্রাসে কম্পিত কলেবর হইয়া বলিতেছে—দোস্তু, মোর বড়ো ডর মালুম হচ্ছে আন্দাজ হয় মোর মৌত নজদিগ।

বাহুলা বলিল—মোদের মৌতের বাকি কি? মোরা মেমুদো হয়ে আছি। চল মোরা নিচু গিয়ে আল্লামির দেবাচা পড়ি। মোর বেলকুল নোকজাবান আছে যদি ডুবি তো পীরের নাম লিয়ে চেল্লাব।

বাহুল্য তুলনায় ঠকচাচাকে এখানে অনেক ক্লান্ত বলে মনে হয়। ‘যদি ডুবি
তো পীরের নাম লিয়ে চেলাব’ আর ‘মোর বড়ো ডর তেনা বি পেটে সাদি করে’
এই দুই উক্তিই পার্থক্য লক্ষণীয়। সে কারণে ঠকচাচাকে কল্পনাসিদ্ধ চরিত্র
না বলা গেলেও, মিকবরের মতো তাতে বলিষ্ঠ কল্পনার আঁচড় না দেখা গেলেও,
সে যে পূর্ণ-জীবন-প্রমাণ আলেখ্য, ব্যঙ্গচিত্র নয় এ-কথা অনস্বীকার্য।

আলালের ঘরের দুলালের ন্যায় গল্পময় বাস্তবতার কোনো দ্বিতীয় নিদর্শন গোটা
উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে মেলে না। স্বর্ণলতার ক্ষীণ প্রচেষ্টার কথা
বাদ দিলে প্যাবীটাদের সৃষ্টিই এ-ক্ষেত্রে একক। এই গল্পময় বাস্তবতার সীমা
বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথর মননে প্রথমেই ধবা পড়েছিল বলে বঙ্কিম স্বতন্ত্র ধারাতত্ত্ব
হয়েছিলেন।



বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলা উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা

উনবিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা দুর্লভতম বিষয় বঙ্কিম-অধ্যয়ন। সে কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষা বারে বারে পুঁথিপ্রাণ প্রথা-পন্থী পণ্ডিতবৃন্দকে এবং মনন-শীল বুদ্ধিজীবীদের আকর্ষণ করে। আনলভ্য প্রথা-সমাজ-সভ্যতার পটে বঙ্কিমকে স্থাপিত করে বিচারের প্রয়াস বা সাহিত্য মূল্যায়নের নাম করে এক ধরনের সরলীকরণের প্রচেষ্টা—বঙ্কিম প্রসঙ্গে এ সমস্তই ঘটেছে। অবশ্য বঙ্কিম কীর্তির বৈশিষ্ট্যের সন্ধানে কিছু না কিছু আনন্দের পুরস্কার বঙ্কিম বরণের শেষে সকলেবই ভাগ্যে অপ্রাপ্য। তবে, নানাধিক সকলেই বঙ্কিম-অধ্যয়নের দুর্লভতাব মূল নির্দেশ করেছেন উনিশ শতকের বাঙালী মানসের আত্ম-প্রতিষ্ঠার কঠিন কর্মে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিবাদী ভূমিকা এবং সৃজনশীল শিল্পীস্বাতন্ত্র্যের দৈত লীলায়।

•• এক ••

যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প-মহিমার স্বরূপ ব্যাখ্যা আমাদের বর্তমান অধ্যায়ের লক্ষ্যসীমা, তথাপি বঙ্কিমমানসের আধুনিকতার চারিত্র্য নির্ণয়েই যে সেই ব্যাখ্যাকর্মের ভূমিকা, এ-কথা স্বতঃস্বীকার্য। উপন্যাসিকের মানসোৎকর্ষের প্রতিফলন ঘটে তাঁর শিল্পকর্মে। শিল্পীর স্বাধীন জীবন-জিজ্ঞাসার নিজস্ব নিয়মে সে মানসোৎকর্ষের ক্রমবিকাশ ঘটলেও দেশকালানুগ চিন্তাসূত্রগুলিকে অনুধাবন না করলে সে মানসোৎকর্ষের সঠিক ঠিকানা মেলে না। উনবিংশ শতাব্দীতেই যেহেতু প্রথম আমাদের মনোলোক বিশ্বের চলিষ্ণু জীবনধারার সঙ্গে লগ্ন হবার সুযোগ লাভ করল, সেহেতু বঙ্কিমের দেশকালানুগ ভাব ও

ভাবনার রূপ পরিচয়ে প্রায় বিশ্বপরিচয়ের আনন্দই লভ্য। সে বিচারে
 রামমোহন এবং বিজ্ঞানসাগরে নতুন কালের ভাবস্পন্দন অনেক গভীরভাবে
 অনুভূত হলেও সেকালের ইংলণ্ডীয় শিক্ষার প্রকৃত পরিণাম কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র।
 রামমোহন এবং বিজ্ঞানসাগরের মধ্যে যে চাকুবি-বিমুক্ত ঋজুতা বঙ্কিমচন্দ্রে তার
 অভাব অবশ্যই বিদ্যমান। রামমোহন এবং বিজ্ঞানসাগর বাবু নন। যে কারণে
 নন সম্ভাব্যত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে সে কারণেই বহু বঙ্কিম
 দুর্বলগাহ শ্রোত। তথাপি বঙ্কিমমানসেব উজ্জ্বল এবং শক্তিশালী দপনে সমকালীন
 ইণ্ডোপ এবং ভাবতের যুগপৎ ছায়াপাত অনুসন্ধিৎসু পাঠককে জিজ্ঞাসা-চঞ্চল
 করে তোলে। ইণ্ডোপ বঙ্কিমের কাছে যাব অনেকখানিই ছিল সমকালীন
 ইংলণ্ড—এবং ভারতবর্ষের ঊনবিংশ শতকীয় অবয়বে যে শক্তি এবং দৌর্বল্য,
 বঙ্কিমের শিল্পে এবং মননে স্বভাবতই তাবও ছায়া পড়েছে। পাঠকের প্রেক্ষা-
 পটেব সামনে গোটা বঙ্কিমচন্দ্রকে উপস্থাপিত করা সেকারণেই কঠিন। আমরা
 অথও বঙ্কিমমানসকে উপলব্ধির পথে অগ্রসর হবার পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশ-
 দৃষ্টিকে প্রথম সূত্র হিসাবে ব্যবহার করব। পবে এই সূত্রকে অবলম্বন করে
 তৎকালীন ইংলণ্ড এবং সেই প্রসঙ্গে তাঁর নিদা দ্বন্দ্বের পরিচয় গ্রহণ করব।
 সমকালীন জীবনের সমস্যা সংক্রান্ত বোধগুলি কথঞ্চিৎ স্পষ্ট হলে তবেই বঙ্কিমের
 শিল্পকর্মেরও অন্ততঃ উপলব্ধি করা যাবে।

এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ১টি প্রবন্ধ বিশেষভাবে ব্যবহার বলে আমরা মনে করি।
 একটি প্রবন্ধ—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা। অপরাট—বঙ্গদেশের
 কৃষক। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা শীর্ষক প্রবন্ধের মূল প্রতিপাত্ত
 প্রবন্ধটির সিদ্ধান্তে স্পষ্টভাবে কথিত হয়েছে—

অনেকে বাগ করিয়া বলিবেন, তবে কি স্বাধীনতা পরাধীনতা তুল্য ?
 তবে পৃথিবীর তাবৎজাতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করে কেন ? যাহা
 একরূপ বলিবেন তাহাদের নিকট আমাদের এই নিবেদন যে, আমরা সে
 তত্ত্বের মীমাংসায় প্রৱণ নহি। আমরা পরাধান জাতি—অনেক কাল
 পরাধীন থাকিব—সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের
 কেবল ইহাই উদ্দেশ্য যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার হেতু তদ্বাসিগণ
 সাধারণত আধুনিক ভারতীয় প্রজাদিগের অপেক্ষা সুখী ছিল কিনা ?
 আমরা এই মীমাংসা করিয়াছি যে, আধুনিক ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়
 অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীস্ব লোকের অবনতি ঘটিয়াছে, শূদ্র অর্থাৎ সাধারণ প্রজাব

একটু উন্নতি ঘটানো আছে।

‘অনেক কাল পরাধীন থাকিব’—এ-কথাটি প্রায় তৎকালীন শাসকদের কাছে আশ্বাসবাণী-তুল্য বলে কাবো কাবো কাছে প্রতীয়মান হতে পারে। ‘সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই’—এ উক্তিও সম্ভবত চাকুবিগত মধ্যবিত্ত মনের অসাহসিকতার অভিব্যক্তি অনেকে খুঁজে পাবেন। কিন্তু এ ধরনের বহিরঙ্গ-বিশ্লেষণে বঙ্কিমমানসের সমগ্র পরিচয় মেলে না। অথচ উদ্ধৃত অংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিকতার সকল বৈশিষ্ট্যের বাহন এ-কথা তখনই বোঝা যায় যখন আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের জায়-সূত্রটিকে যথার্থ অনুধাবন করতে পারি। ‘তদ্বাসিগণ আধুনিক ভাবতীয়া প্রজাগণ অপেক্ষা সুখী ছিল কিনা’—এই প্রশ্নই বঙ্কিমের কাছে মুখ্য প্রশ্ন। যে সামাজিক উপযোগিতার দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র জগৎ এবং জীবনের সকল কিছুই বিচার-সন্ধিস্থ ছিলেন, উক্তিটির মধ্যে সেই সামাজিক উপযোগিতাবাদের সাক্ষা স্পষ্ট।

বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য ছিল—‘সাধারণ প্রজাব একটি উন্নতি ঘটানো আছে।’ একটি উন্নতি greatest good নয়। ‘বাবু দাবকানাথ মিত্র বামবাজ্যে জজ হইতে পারিতেন না। কিন্তু ইংবেজ বাজতে পাবেন।’ সম্ভবত এই ঘটনাকে স্মরণ করাই বঙ্কিমচন্দ্র ‘একটু উন্নতি ঘটানো আছে’ এ-কথা বলেছেন। কেননা greatest good যে ঘটেনি এ সম্বন্ধে বঙ্কিমের নিশ্চিত-দৃঢ়তার প্রমাণ আমরা বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে পেয়ে থাকি। ইংবাজের হাতে স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক ভাবতবর্ষের কৃপান্তরকে ইংবাজই যে বাধা প্রদান করেছে চিবস্থায়ী বন্দোবস্তের আলোচনায় বঙ্কিম সে-মত দ্বিধাবিশুক্ত লেখনীতেই প্রকাশ করেছেন। এবং সে আলোচনাতেও স্ভাবতই সামাজিক উপযোগিতাবাদের জিজ্ঞাসু ছাত্রেরই সাক্ষাৎ মেলে। চিবস্থায়ী বন্দোবস্তের আলোচনাকালে আইন শীঘ্রক অধ্যায়ে বঙ্গদেশের কৃষক গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

প্রজাবাঈ চিবকালের ভূস্বামী। জমিদারের। কস্মিনকালে কেহ নহেন— কেবল সবকাবী তহশীলদার। কনওয়ার্লিস যথার্থ ভূস্বামীর নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারকে দিলেন। ইহা ভিন্ন প্রজাদিগের আর কোনো লাভ হইল না। ইংবাজ বাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকদিগের এই প্রথম কপাল ভাঙিল। এই “চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত” বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র। কস্মিনকালে ফিবিবে না। ইংবাজদিগের এ কলঙ্ক চিবস্থায়ী, কেননা এই বন্দোবস্ত চিবস্থায়ী।

এবং প্রবন্ধের উপসংহারে—

প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে, এই দুই-চারিজন অতি ধনবান ব্যক্তির পরিবর্তে আমরা ছয় কোটি সুখী প্রজা দেখিতাম। দেশস্বত্ব অম্লের কাঙাল আর পাঁচ-সাতজন টাকা খরচ করিয়া ফুরাইতে পারে না, সে ভালো, না—সকলেই সুখস্বচ্ছন্দে আছে, কাহারও নিষ্প্রয়োজনীয় ধন নাই, সে ভালো? দ্বিতীয় অবস্থা যে প্রথমোক্ত অবস্থা হইতে শতগুণে ভালো তাহা বুদ্ধিমানের অস্বীকার করিবেন না। কেহ অধিক বড়ো মানুষ না হইয়া জনসাধারণের স্বচ্ছন্দাবস্থা হইলে সকলেই মনুষ্যপ্রকৃত হইত। দেশের উন্নতির সীমা থাকিত না। এখন যে জন পাঁচ-ছয় বাবুতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ঘরে বসিয়া মূঢ় মূঢ় কথা কহেন, তৎপরিবর্তে তখন এই ছয় কোটি প্রজার সমুদ্র-গর্জন-গভীর মহানিনাদ শুনা যাইত।

আমরা দেখাইলাম যে যাহারা বিবেচনা করেন যে জমিদার দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বা উপকারী তাহাদের তদ্রূপ বিশ্বাসের কোনো কারণ নাই।* পূর্বে উক্ত তিনটি অংশেই দেখা যায় যে বঙ্কিমী-চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে সামাজিক উপযোগিতাবাদের আদর্শই সক্রিয় ছিল। স্বাধীন এবং পরাধীন ভারতবর্ষের প্রশ্নে বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভূমিকা-বিচারে উভয়তই তিনি এই হিতবাদী বিচারদৃষ্টির ব্যবহার করেন। সে বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র ‘ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা’ নামক প্রবন্ধে বর্ণিত ঈশ্বরাজ আমলে ভারতবর্ষের ‘একটু উপকারের’ স্বরূপ বঙ্গদেশের কৃষক জীবনের আলোচনায় উদ্ঘাটিতও করেন। স্তত্রাং আনন্দমঠের শিরোনামায় ‘ঈশ্বরাজ দেশকে অরাজকতার হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছে’ এই উক্তির উদ্ধৃতিতে বঙ্কিমমানসের কোনো যথার্থ পরিচয় নেই। এই সামাজিক উপযোগিতাবাদের আলোকেই বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো কোনো মানসিক অসম আচরণেরও ব্যাখ্যা সম্ভব। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু বিবাহ-নিরোধ-বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনায় বঙ্কিমের বক্তব্যের স্বরূপ এই—

আমাদের বিবেচনায় বহু বিবাহ নিবারণের জন্ত আইনেন প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি প্রজার হিতার্থে আইনের আবশ্যকতা আছে ইহা স্থির হয়, তবে ধর্মশাস্ত্রের মুখ চাহিবার আবশ্যকতা নাই।

* সমসাময়িক ‘সমাজদর্পণ’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘বঙ্গদর্শন ও জমিদারগণ’ নামক দশ-শালা বন্দোবস্তের সমর্থনসূচক প্রবন্ধের উদ্দেশে কটাক্ষ।

প্রজ্ঞাকলাগকামী আইন ধৰ্মশাস্ত্ৰেৰঙ উৰ্ধ্বে এ-কথা। একেবাবে জন স্টুয়ার্ট মিলেৰ আদৰ্শ ছাত্ৰেৰ উক্তি। বিজ্ঞাসাগৰ মহাশয়েৰ উক্ত গ্রন্থেৰ বক্তব্যেৰ বিৰুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্ৰেৰ কোনোও মোট বক্তব্য ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্ৰেৰ আপত্তি ছিল, প্রধানত বিজ্ঞাসাগৰ মহাশয়েৰ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনেৰ পদ্ধতিৰ বিৰুদ্ধে। বঙ্কিমচন্দ্ৰেৰ বক্তব্য ছিল এই যে, প্রজাহিতৈষণাৰ কাছে আৰ কোনো কিছুই অধিকতৰ মূল্যবান নহ। মুসলমানেৰা বঙ্গীয় প্রজাকুলেৰ অৰ্ধেক। তাৰেৰ ধৰ্মশাস্ত্ৰেৰ পাতি সংগ্রহ কৰে কোনো-বিজ্ঞাসাগৰেৰ যেহেতু আবিৰ্ভাব হয়নি সেহেতু বহু বিবাহ হিতকৰ সামাজিক প্রথা হওয়া সত্ত্বেও সে সমাজে প্রচলিত হৰে না এ ব্যাপাৰ বঙ্কিমচন্দ্ৰেৰ কাছে যুক্তিসিদ্ধ মনে হয়নি। শাস্ত্ৰ পদাঙ্ক অনুসাবী সমাজ হিতেৰ বল্লনাথ বাংলা দেশে যে সীমাবদ্ধতাৰ সম্ভাবনা তাৰ কথা স্বৰ্গে বেথেই বঙ্কিম এ উক্তি কৰেছিলেন।*

•• দুই ••

যে সামাজিক উপযোগিতাবাদেৰ বঙ্কিম ছিলেন অভিনিবেশী ছাত্র, জন স্টুয়ার্ট মিল উর্দ্বিংশ শতাব্দীৰ ইংলণ্ডে ছিলেন তাঁৰ প্রধান প্রবক্তা। মিলেৰ এই সামাজিক উপযোগিতাবাদ বা utilitarianism is a direct continuance of eighteenth-century reasonableness — অষ্টাদশ শতাব্দীৰ যুক্তিবাদী চিন্তাধাৰাৰ প্রভাবেই এই সামাজিক উপযোগিতাবাদেৰ জন্ম। জেৰেমি বেন্থাম এৰ কুলগুরু। বঙ্কিমচন্দ্ৰেৰ চিন্তায়, বিশেষত জাতিৰ বৈষয়িক উন্নতি সংক্রান্ত চিন্তায় এই মতবাদেৰ প্রভাব খুবই স্পষ্ট। বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ক গ্রন্থেৰ সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রজাহিতেৰ সূদৃঢ় অভিপ্রায়েই স্বাগতম জানিয়ে সে প্রসঙ্গে ধৰ্মশাস্ত্ৰেৰ ভূমিকাকে প্রত্যাখ্যান কৰতে চেয়েছিলেন এটা একেবাবেই utilitarian method বা সামাজিক উপযোগিতাবাদী চিন্তা-প্রণালী।—

The utilitarians alone felt that human society, like every other institution and belief, could afford to rest squarely upon a rational basis, without bringing in either Nature or God to give it firmer support. To them the question

* বিজ্ঞাসাগৰ মহাশয়েৰ মৃত্যুৰ পৰে পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধটি ধৰে আমবা আলোচনা কৰেছি।

of whether any scheme of society was natural or divine was unimportant, what counted was whether it were reasonable and socially useful. They claimed that the human reason was in itself sufficiently cogent to criticize time-honored and ridiculous traditions in politics as in religion.

জবেমি বেস্থামেব মধ্যেই যে এই চিন্তাদর্শেব সম্যক শ্রবণ ঘটেছিল তাই নয়, লক-এব চিন্তাতেও এব নিদর্শন মেলে। ইংলণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীৰ গণতান্ত্রিকতাবোতিতে লকেব প্রভাব যে চিন্তাসম্প্রদায়ে অবলম্বন কৰে সক্রিয়—To convey knowledge of things—তাব প্রেৰণায় অবশ্যই অষ্টাদশ শতাব্দীৰ যুক্তিবাদেব প্রভাব—সামাজিক উপযোগিতাবাদ যাব অন্তিম সহগামী। বঙ্কিমেবও বাংলাভাষা বিষয়ক প্রবন্ধেব বক্তব্য এই আদর্শানুসরণেব ফল। মনেব ভাব প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত অন্তৰীণ ব্যতীত কাহাকেও ছাডিবে না—বঙ্কিমেব এই চিন্তাতেও উপযোগিতাবাদেব ছায়া। বঙ্কিমেব লিখিত প্রবন্ধেব গঠন বোতিতেও এ-ছায়া দুলক্ষ্য নয়। যুক্তিমার্গেব একমনা পথিক হিসাবেই যেন তিনি প্রবন্ধেব উপসংহাবে স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছনো গেল এ-কথা না বলে শাস্তি পোতেন না। প্রধানত মিলেব ত্রাষণাত্মক ইণ্ডোবোপীয় চিন্তাবাদেব বঙ্কিমেব প্রবেশদ্বার। তাই মিলেব বাল এবং কর্মেব কিছু পৰিচয় আমাদেব প্রয়োজন।

১৮৩০ থেকে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত মিলেব কর্মকাল। ইংলণ্ডেব সামাজিক ও অর্থনীতিক ইতিহাসে এ-কালে মিলেব চিন্তাব স্বাক্ষৰ স্পষ্ট। অন্তৰ্দ্ধিকে ১৮১২ থেকে ১৮৫০ পৰ্যন্ত ইংলণ্ডেব শিল্প বিপ্লবজাত বঙ্কিমান অসন্তোষেব শিখাও এ-যুগেই স্পষ্ট।

There was a good deal of lawlessness in eighteenth-century England, particular grievances, like Enclosure Bills, or dear food, or new machines, excited riots in one place or another. This kind of violence continued in the next century the riots against the raising of prices for the Covent Garden Theatre lasted several days, and succeeded in their object, there were savage

attacks on the Irish quarter in more than one northern town ; in 1816 mobs were moving about in East Anglia with banners inscribed "Bread or Blood" ; the enclosure of Otmoor provoked small farmers and labourers to a kind of guerilla struggle.....The Luddite rising in the Midlands and the North in 1811 and 1812, the agrarian revolt in the Southern countries in 1830, the passionate movement inspired by Owen which collected the energy and enthusiasm of the working classes throughout England for a great constructive idea in 1833, the Chartist agitation in its several forms in the thirties and forties—all these are expressions of a spirit of which there is little trace in eighteenth-century England. (Bleak Age—J. L. & Barbara Hammond).

মিল প্রথম দিকে ব্যক্তি স্বাভাবাদের প্রবল প্রবক্তা ও অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক হয়েও ইংলণ্ডের শিল্প-রূপান্তরের উদ্ভূত চিত্রকে উপলব্ধি করতে ভুল করেননি। তাঁর Political Economy-র তৃতীয় সংস্করণের এই অংশটুকু এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

They have increased the comforts of the middle classes.
But they have not yet begun to effect those great changes in human destiny, which it is in their nature and in their futurity to accomplish.

ভারতবর্ষে বক্ষিমচন্দ্র ও ইংরাজ শাসনের ফলস্বরূপে কিছু মধ্যবিত্তেরই বাস্তব উন্নতির আভাস দেখেছিলেন। ওদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর যুবক ধনতন্ত্র উনবিংশ শতকে প্রৌঢ়ত্ব পৌঁছে যতই আত্মজ সংকটের চেহারাকে স্পষ্ট করে অনুভব করেছিল ইংলণ্ডের চিন্তাশীলদের চিন্তায় ততই সে সংকটের ছায়া হয়ে উঠেছিল দৃশ্যমান। লাসেফেয়ারের প্রবল ঔজ্জ্বল্য তখন চার্টিস্ট আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে হতে বসেছে হত-মহিমা। মিলের চিন্তার শেষদিকে লাসেফেয়ার নীতিকে সীমিত করে আনার দিকে ঝোঁক। মিল বলেছিলেন যে ‘মানুষের পক্ষে সেটাই হল কাম্যাবস্থা যে অবস্থায় কেউ দরিদ্র থাকবে না, কেউ

অধিকতর ধনের জগু চেষ্টিত হবে না ; কারো অপরকে ছাড়িয়ে যাবার প্রচেষ্টায় আর কাউকে আঘাত পেয়ে পিছিয়ে যেতে হবে না ।’

কিন্তু লাসেফেরার বেগকে সীমিতকরণের প্রস্তাবনাতেই মিলের চিন্তাগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত অনুসন্বেয় নয় । যুক্তিপন্থী, নীতিশাস্ত্রবাদী ধর্মবিরোধী মিল শেষ পর্যন্ত ধর্ম প্রসঙ্গেও যে দ্বিধাযুক্ত-মানস হয়ে উঠেছিলেন তার প্রমাণ আছে । উনিশ শতকের পশ্চিমী সভ্যতার সংকটের নানা রূপ । ইংলণ্ড কলোনির সাহায্যেও সেই সংকটের প্রধান তবঙ্গাঘাতকে প্রতিহত করতে পারেনি । এই সমাজ-সংকটের চেহারা যত গভীর হয়েছে মিল প্রমুখের চিন্তাকেও তত অষ্টাদশ শতাব্দীর দৃষ্টিবিন্দু থেকে সরে যেতে হয়েছে । এই প্রসঙ্গে Berker তাঁর স্থবিখ্যাত আলোচনায় বলেছেন .

Yet when all these allowances are made, it still remains true that Mill was the prophet of an empty liberty and an abstract individual. He had no clear philosophy of rights, through which alone the conception of liberty attains a concrete meaning. He had no clear idea of that social whole in whose realisation the false antithesis of ‘state’ and individual disappears.

•• তিন ••

ধনভন্থেব নিজস্ব সংকটের চাপে মিলের চিন্তাগত পরিবর্তনের পাশে পাশে বন্ধিমচন্দ্রের পরিবর্তনের কথা আলোচনা কবাও প্রয়োজন । স্বভাবতই ভাবতবর্ষে উনবিংশ শতাব্দীর সংকটের প্রকৃতি ইংলণ্ড থেকে মূলমূলে পৃথক বন্ধিম সর্বত্র এ-বিষয় সমান মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করেননি । ইংলণ্ড অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক স্বভাবতই হবে—কেননা শিল্প-রূপান্তরের ফসল তার ঘরে, হাতে তার অগাধ ক্ষমতার বশীভূত কলোনির বাজার । বন্ধিম এটা অনুধাবন না করে সংরক্ষণকে বলেছিলেন মহাপ্রমাত্মক নীতি । শিশু শিল্পের যুক্তিকে তিনি ব্যবহার করেননি, এবং দেশজ শিল্পের বিপর্যয়ের ব্যাপারটিও তাঁকে বিশেষ স্পর্শ করেনি । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসঙ্গে তাঁর যে অথও দেশ-দৃষ্টির অভিনিবেশ লক্ষ্য করা যায় এ ব্যাপারে সে দেশ-দৃষ্টি নিষ্ক্রিয় । এ প্রসঙ্গে পূর্ব অধ্যায়ে বাণিজ্যিক আমদানি-রপ্তানির যে তালিকা সমাচার দর্পণ

থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে তা স্ববর্ণীয ।

অবশ্যই জাতীয় জীবনের তৎকালবর্তী অসম্পূর্ণতায় এই খণ্ডিত দেশচেতনা স্বাভাবিক । কেননা জন স্টুয়ার্ট মিল যে-উনিশ-শতকীয় ইংলণ্ডীয় ভদ্রলোক শ্রেণীর প্রতিনিধি সে ভদ্রলোক শ্রেণী নিজ সীমাব (অষ্টাদশ শতাব্দীর তুলনায় স্তিমিত হলেও) মনোও একটা কর্মময় চৰিত্ৰের অধিকাৰী ছিলেন । জাতীয় জীবনের নানা পৰ্যায়ের সঙ্গে, তাৰ স্বাধীন বাজনীতি, ব্ৰিটিশ লিবাৰেলদেব আৰিৰ্ভাব প্ৰভুতিৰ ফলে ইংলণ্ডেৰ পাবলিক লাইফ তখনও কর্মচঞ্চল । সাম্ৰাজ্যেৰ ভোগ মন্ত্ৰৰ প্ৰশাস্তি তখনও শোণিতে আলস্তেৰ স্ৰোতহীনতাকে ডেকে আনেনি । এই ভদ্রলোক শ্ৰেণীৰ সঙ্গে উদীয়মান বাঙালী ভদ্রলোকদেব চৰিত্ৰগত পাৰ্থক্য সহজেই লক্ষণীয় । সৰ্ববিধ শুভ প্ৰচেষ্টা ও সংকল্প সত্ত্বেও অ্যাভাবেজ বাঙালী ভদ্রলোকেৰ জীবন ছিল মিত-পবিসৰ, কর্মচাঞ্চলাহীন । জীবনেৰ অন্তৰে ছিল ভূমিজীবী গ্ৰামীণ মন্যবিভেব সকল জট, এৰং বাইবে স্কুলে কলেজে আপিসে আদালতে অপবেব প্ৰযোজনেৰ দাসত্ব, ইংলণ্ডেৰ পাবলিক লাইফেৰ বিবল্লৈ স্কুল মিউনিসিপালিটি প্ৰভুতিকে ঘিবে চণ্ডীমণ্ডপী ঘোঁট । স্বভাবতই এই জীবনেৰ ব্যৰ্থতায় এৰং ক্লান্তিতে সচেতন এৰং সতৰ্ক মনে প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা দেবে । এৰং সে প্ৰতিক্ৰিয়া ইংলণ্ডেৰ শিল্প-ৰূপান্তৰেৰ ফলে ধনতন্ত্ৰেব সংকটে বুদ্ধিজীবী মহলেৰ যে প্ৰতিক্ৰিয়া তাৰ থেকে পৃথক । ইংলণ্ডে অন্তৰ্ভূত হৰ্ষোছল সন্নিবান সংকট এখানে, উপনিবেশে ছিল সংকটেৰ অপচ্ছায়া ।

জিজ্ঞাসু বন্ধিমেব সম্মুখে বাংলার নতুন কালের এই গ্রন্থিল জটিলতা ছিল একটা দৃক্ৰহ গণিতেৰ মতো । এর সমাধানেৰ পথ খুঁজেছিলৈন তিনি অনুশীলন বমে । বেপাৰী হিতবাদ থেকে মিলেব অন্তিম প্ৰত্যয়গুলি যত দূৰ সেখান থেকে অনুশীলনেৰ আদৰ্শ তদপেক্ষা আৰো দূৰে । বন্ধিম অনুশীলনাৰ্শ প্ৰচাৰকালে বলেছেন যে, “হিতবাদকে আমি যেখানে স্থান দিলাম তাহা আমাৰ ব্যাখ্যাত অনুশীলনতন্ত্ৰেৰ একটি কোণেৰ কোণ মাত্ৰ ।” হিতবাদী ধৰ্মতন্ত্ৰেবই সামান্য অংশ মাত্ৰ । আমাদেবও বিজ্ঞাসাগৰ প্ৰসঙ্গে বন্ধিমেব গ্ৰায ধৰ্মতন্ত্ৰে আপত্তি সম্মতিৰ প্ৰশ্ন নেই । আমাদেব ধাবণায় বন্ধিমেব বক্তব্যেৰ অসঙ্গতি অগ্ৰত্ৰ । বন্ধিমেব ধৰ্মতন্ত্ৰ মানুষেৰ ধৰ্মেৰ তন্ত্ৰ । এ ধৰ্মেৰ লক্ষ্য মনুষ্যত্ব অৰ্জন । মোক্ষ, অমৃত, অথবা পুণ্য প্ৰভুতিকে লক্ষ্যে না লাবহাব কৰে বন্ধিম তদপেক্ষা অনেক বাস্তব (concrete) ব্যাপাবেকে লক্ষ্য বলে অভিহিত কৰেছেন । এৰং

✓ মনুষ্যত্বেরও সংজ্ঞা স্থির কবেছেন স্পষ্ট ভাষায়—“যে অবস্থায় মনুষ্যের সর্বাঙ্গীণ পৰিণতি সম্পূর্ণ হয়, সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলিতেছি।” বলা বাহুল্য এই মনুষ্যত্বের সাধনা ব্যক্তির সাধনা। তীক্ষ্ণদী বঙ্কিমচন্দ্র এটা বুঝেছিলেন যে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্ত মিল কথিত লিবার্টির স্তত্র এখানে অপ্রাসঙ্গিক। ইলবার্ট বিলের পূর্বেই তিনি উপলব্ধি কবেছিলেন যে এখানে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে দৃঢ়ভিত্তিক বৈপৰীত্য বিদ্যমান। এখানে লিবার্টির প্রশ্ন অক্ষমেব শশবিসাণ কল্পনা। অথচ ব্যক্তির বিকাশ যে “সংকীর্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন ইংবাজের”* হাতে, তাদের প্রদত্ত শিক্ষায় সম্ভব নয় এ তত্ত্বও বঙ্কিমের কাছে অস্পষ্ট ছিল না। এদিকে দিনে দিনে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের সংকট, জাতীয়তাবাদের আতিশয্যের চেহারাও তাঁর কাছে উন্মোচিত হচ্ছে। এমন অবস্থায় চিন্তাব সংকট থেকে ত্রাণ-পদ্ম হিসাবে কল্পিত হয়েছে অন্তর্শীলন ধর্ম। স্ববণ বাখা দবকার সকল প্রকার ব্যাপক কর্মময়তা থেকে বঞ্চিত বাঙালী মধ্যবিত্তের তখনকার অসহায়তার কথা। তৎকালীন এদেশী মধ্যবিত্ত যেন একটা অদ্ভুত ইঞ্জিন শিক্ষালব্ধ সকল বাস্পাবেগ সংগ্রহ করা হয়েছে, শুধু ছুটে চলার চাকা ক-খানা তাদের ছিল না। অন্তর্শীলনতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র হযতো তাবই সন্ধানে সচেষ্টি ছিলেন। শুধু দেখতে পেলেন না যে, ব্যক্তি, রাষ্ট্র এবং সমাজের সহযোগে, কখনো বা টানাপোড়েনে, থেকে থেকে বিভিন্ন রূপ ধরে। সে প্রক্ষে অসহায় থেকে এঁও নিচয়ের সামগ্র্যের সাধক ব্যক্তির কল্পনা বঙ্কিমের মনের অনেকখানি ব্যাহিত হযেছে এবং মল সমস্তা থেকে গেছে অস্পষ্ট। উনিশের শতকে বা না দেশে—ব্যক্তির এবং পরিবারের জীবনের ছবে এবং তাব সামাজিক বর্ষের প্যাটানে যে ব্যবধান, ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের মুগ্ধ করা কথা এবং বাস্তবে মধ্যযুগীয় সংস্কারের অন্তর্সরণে যে পার্থক্য এবং ফাঁকি প্রকৃত-পক্ষে সেটাই ছিল এদেশের তৎকালীন মধ্যবিত্ত জীবনের সর্বাঙ্গিক বড়ো অসামগ্র্য। এহ অসামগ্র্যকে কেমন করে দব করা যাবে সেটা এবং-শ বছরের আগেও সমস্তা এবং আজকেরও সমস্তা। ‘প্রীতি সর্বব্যাপিনী প্রীতি ঈশ্বর’ বলে সমাজের আপাতত সকলের সঙ্গে অথগু সম্পর্ক বচনা করা যায় না। সামাজিক সম্পর্কগুলি কোনো মনোভাবের ওপর নির্ভবশীল নয়। তাদের জন্ত অধিকতর বাস্তব ভূমিভিত্তি প্রযোজন। এ-দেশে সে ভূমিভিত্তি নষ্ট হয়েছে

হু-কারণে।* এক, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। দুই, কলকাতার অসম গঠনের ফলে অনাগরিক বাবু সম্প্রদায়ের উদ্ভব। যাদের গ্রাম-সম্পর্কে স্থাপন করলে মনে হবে পরজীবী গ্রামীণ মধ্যবিত্ত, যাদের কলকাতার আলোকে আনলে অন্তত আলাপনে মনে হবে ইউরোপীয় ভাবাদর্শের সন্তান। ফলে সমাজের বৃহত্তর জনজীবন সম্বন্ধে এঁরা হয়ে উঠেছেন নির্বিকার। আর যারা গ্রামীণ অর্থ-নীতিক সম্পর্ক থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন তারা সুবিশাল কৃষিবাংলার পঙ্খ চেহারার কথা অবলীলায় ভুলে গিয়ে কলকাতার মুক্তিকে মনে করেছেন জীবনের মুক্তি। গোটা সমাজ জীবনের এই অসংগঠিত অসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার ছায়া ছিল ব্যক্তির জীবনে। একে দূর কবতে চেয়েছিলেন বঙ্কিম অনুশীলন-দর্শের সাহায্যে। বঙ্কিমের কালের ইংলণ্ডের আকাশে তখন একই আবহাওয়াব ইঙ্গিত ভাসমান।

Craving adjustment amid the peril of change, representative victorians at least until the seventies, sought either in the radiance of God or in the dim consciousness of man some spiritual absolute by which to interpret and control their material advance. whatever misdirections they may frequently have followed their impulse was in essence deeply religious. Victorian Temper (J. H. Buckly).

এই উক্তির সঙ্গে টি-এস এলিয়টের Arnold and Peter নামক প্রবন্ধের শেষ প্যারা প্রায় মিলিয়ে পাঠ করা যেতে পারে। এলিয়ট সাহেবও এই শতাব্দীর প্রচেষ্টাকে Imperfect Synthesis-এর প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করেছেন।

●● চার ●●

অবশ্যই শিল্পী বঙ্কিমকে সন্ধান করতে হবে উনবিংশ শতকের পটভূমিকায়। সেই হেতু উনিশ শতকের স্বদেশ ও জগৎ তাঁর চিন্তাকে কী ভাবে স্পর্শ করেছিল সে-কথা না জানলে তাঁর শিল্পী হিসাবে যন্ত্রণার স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে না। আমরা সে কারণে এতক্ষণ বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার একটি রেখাসীমা অঙ্কন করার

* নষ্ট যে হয়েছে সে কথা বঙ্কিমও জানতেন। ‘শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই’—তাঁরই উক্তি।

চেষ্টা করলাম। এইবাব তাঁৰ উপন্যাসেৰ আলোচনাৰ তাঁৰ ব্যক্তিত্বৰ সৃজনী সমগ্রতাৰ পৰিচয় খোঁজা যাবে। দেখা যাবে যে synthesis-এৰ যে প্রয়াসে তাঁৰ মননশীলতা আজীবন নিয়োজিত ছিল শিল্পীৰূপেও তাৰ বাতায় ঘটেনি। সমগ্র বঙ্কিমী উপন্যাসেৰ বিশিষ্ট লক্ষণ তিনটি—

- (ক) বিষয়বস্তু বা theme-এৰ গুৰুত্ব বা অ-সাধাৰণত্বৰ ওপৰ প্ৰাধান্য আৰোপেৰ প্ৰবণতা।
- (খ) উপন্যাসেৰ কাঠামো নিৰ্মাণে নৈসৰ্গিক শৃঙ্খলা বক্ষাৰ চেষ্টা।
- (গ) মননশীলতাজনিত স্তম্ভতাৰ প্ৰয়াস।

নানানৈৰৱিক পৰিমাণে দুৰ্গেশনন্দিনী থেকে সীতাবাম পৰ্যন্ত সমুদয় উপন্যাসেৰ পৰম্পৰেৰ তাৰতম্য ও পাথক্যেৰ কথা স্বীকাৰ কৰেও সাধাৰণ লক্ষণ হিসাবে ওপৰেৰ তিনটি স্তৰেৰ কথা বলা চলে। এখন এই তিনটি স্তৰেৰ বিষয়ে পৃথক আলোচনা কৰা যাক।

Rajmohon's Wife ইংৰাজিতে লিখিত বঙ্কিমচন্দ্ৰেৰ প্ৰথম উপন্যাস। এই উপন্যাসেৰ বাৰ্থতাৰ কাৰণ সাধাৰণত সন্ধান বৰা হয় ইংৰাজ মাধ্যমেৰ ভিতৰে। কিন্তু সেটা প্ৰধানত ঐতিহাসিক-ব্যৰ্থতা। Rajmohon's Wife একান্তই গঢ় জাতীয় বচনা। ঘটনাপ্ৰবাহ গঢ়গত। উপন্যাসেৰ মানস-দৃষ্টিতে কিছুটা ব্যঙ্গবোধ যেন ক্ৰিয়াশীল। এই গঢ়গত-প্ৰাণত। কখনই বঙ্কিমচন্দ্ৰেৰ স্বপ্নেৰ নয়। আমবা বা বা উপন্যাসেৰ জন্মলগ্ন শীৰ্ষক অন্যায়েৰ শেষ অনুচ্ছেদে বলেছি যে গঢ়ময় বাস্তবতাকে উপন্যাসে প্ৰতিবিস্তিত কৰাব প্ৰয়াসে আলাপেৰ ঘৰেৰ ঢুলাল উনিশ শতকীয় বা'লা সাহিত্যে প্ৰায় একক। এই গঢ়ময় বাস্তবতাকে বঙ্কিম Rajmohon's Wife-এ একবাব এৰ ইন্দিবাতে দ্বিতীয়বাব ধাৰণ কৰতে চেষ্টিত হগেছিলেন। কিন্তু গঢ়ময় বাস্তবতা বঙ্কিমেৰ কল্পনাৰ স্বভাৱকে আক্ৰষ্ট কৰেনি। গঢ়ময় বাস্তবতা একটা জাতিৰ কৰ্মময় যুগেৰ যথার্থ দৰ্শন হতে পাবে। কৰ্মশীল কোনো সামাজিক শ্ৰেণী, নতুন মানুষ বা জাতীয় জীবনেৰ নতুন দিকশেৰ বালে এই Formal Realism অবশ্যই একটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ শিল্পৰ্ম। ইংলেণ্ডেৰ অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাতীয় জীবনেৰ নববিকাশেৰ কালে ডিফো, ৰিচাৰ্ডসন এই বাবাব জনক। আমাদেৰ জীবনে এই নববিকাশেৰ কাল বলে যাকে আমবা মনে কৰি তাৰ ফাঁকি যে বঙ্কিমেৰ কাছে প্ৰথমাবধিই বৰা পড়েছিল সে-কথা আমবা বলেছি। তাই যেখানে প্ৰাত্যহিকে নেই কোনো মুক্তিৰ আকাশ, কোনো বাস্তব কৰ্মেৰ প্ৰচণ্ড আবেগ

সেখানে গল্পময় বাস্তব মনোভঙ্গি কী কাজে লাগবে? তাই, এই বন্ধ্য। জীবনের সীমাবদ্ধতাকে বন্ধিম উপলব্ধি কৰেছিলেন বলেই, বিষয়বস্তুৰ নিৰ্বাচনে তিনি অ্যাভাবেজ ঘটনাকে বা কাহিনীকে পৰিহাৰ কৰেছেন। আলালেৰ ঘৰেৰ ঢুলাল অপেক্ষা দুৰ্গেশনন্দিনীৰ লেখকেৰ কল্পনাৰ উচ্চচুড়াবিহাবী ৰূপ দেখে যাব। ছন্দিত ভাষায় তাৰিফ কৰে সমালোচনাৰ দায়িত্ব শেষ কৰেন তাঁৰ। বন্ধিমী কল্পনাৰ এই নিজস্ব গতিৰ অন্তৰ্নিহিত কাৰণকে উপলব্ধি কৰেন না। অ্যাভাবেজ কাহিনীকে সদা সৰ্বদা পৰিহাৰ কৰেছেন বন্ধিম, আৰু কৰেছেন নাগৰিক মন্যাবিত্ত চৰিত্ৰকে পৰিহাৰ। প্ৰাচীন দুৰ্গ, যুদ্ধ বিগ্ৰহ, নদী বা সমুদ্ৰেৰ নিজস্ব গাভীৰ্য উপন্যাসেৰ পটভূমি হিসাবে প্ৰায়ই ব্যবহৃত হযেছে। ব্যবহৃত হযেছে বাজপ্ৰাসাদ বা সুবম্য জমিদাৰ-ভবন, বিচিত্ৰ উদ্যান প্ৰভৃতি। লক্ষণীয় যে, এই কাৰণেই বজনী এৰু ইন্দিৰাৰ ঘটনা ছাড়া প্ৰায় কোনো কাহিনীৰ ঘটনাস্থল কলকাতায় কল্পিত হযনি। সমসাময়িক যে সব ঘটনা তাৰ উপন্যাসে ব্যবহৃত হযেছে তাৰ সবটো মফস্বল বাংলার পটভূমিকায় বৰ্চিত। সমকালীন বলকাতাই জীবনেৰ ঘণিপাবকে বন্ধিম উপন্যাসে প্ৰায়ই এড়িয়ে চলেছেন। অবসৰ-শিথিলা, জীৱিক। যন্তণা-শল্য গ্ৰানীণ বডোলোকেৰাই তাৰ সমকালান্তৰী উপন্যাসেৰ পাদপাত্ৰ। এই জীবনদাবাৰ বিত্যাঁস থেকে উদ্ভূত সমস্যা বন্ধিমেৰ উপন্যাসে ব্যবহৃত হযেছে।

স্বভাবতই এ অৱস্থায় বোমান্স এৰ বোমান্টিকতাৰ বন্ধিমেৰ শিল্পৰ্শেৰ পৰিপোষক হয়ে উঠবে এটা প্ৰত্যাশিত। বোমান্সেৰ প্ৰসঙ্গে বলা প্ৰযোজন যে বন্ধিমেৰ সৃজিত বোমান্সগুলি সন্দেহে আমবা অতিবিক্ত মাত্ৰায় সশ্ৰদ্ধ। অথচ দুৰ্গেশনন্দিনী এৰু য়ণালিনী দাতীত বন্ধিমেৰ গাঁটি বোমান্স আৰু একখানিও নেই। বোমান্সেৰ উপাদান হযেনে। বপাৰ গুলা থেকে শুক কৰে সীতাবাম পৰন্ত সবত্ৰই উপস্থিত, বিদ্ধ অমিশ্ৰ বোমান্স বচনায় কখনও বন্ধিম-মানস শিল্পীৰ ত্পি পেতে পাবক না—সে বখা বন্ধিমমানসেৰ বেখাসীয়া আলোচনাতে স্পষ্ট। দুৰ্গেশনন্দিনীৰ—বন্ধিমেৰ শিল্পজীবনেৰ ইতিহাস প্ৰসঙ্গ বাদ দিলে—অন্ত তাৎপৰ্য থুঁজে পাওয়া বঠিন। য়ণালিনী সম্পূৰ্ণ তাৎপৰ্যহীন কাহিনী। বোমান্সেৰ সঙ্গে বোমান্টিকতাৰ কোনো বিবোধ অবশ্যই নেই। বোমান্সেৰ আকাশবাতাস এৰু পৰিমণ্ডল বোমান্টিক কল্পনাকে আকৃষ্ট কৰে নিশ্চয়, কিন্তু তাই বলে বোমান্স এৰু বোমান্টিকতা এক কথা নয়। বোমান্টিকতা তাৰ নিজস্ব কল্পনাগামী পদ্ধতিতে উপন্যাসেৰ ক্ষেত্ৰে যে কাজ

করে থাকে রিয়ালিজমের ধারকেরাও তাদের জ্ঞান শৃঙ্খলার সাহায্যে সেই কাজই করে—তা হল চেতনার বিস্তৃতিসাধন। রোমান্সের ক্ষেত্রে এই চেতনার বিস্তৃতিসাধনের জটিলতা পরিহৃত হয়ে থাকে। বঙ্কিম প্রধানত রোমান্টিক। এখানে পুনরায় উনবিংশ শতকীয় utilitarianism-এর প্রসঙ্গ উত্থাপনযোগ্য। এ-কথা আমরা বলেছি যে উক্ত utilitarianism অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদের—(এর ভাবগুরু জেরেমি বেন্থাম যার পূর্ণ বিগ্রহ)—প্রত্যক্ষ ধারাবাহী। নৈয়ায়িক মিল তাঁর নৈয়ায়িক পদ্ধতির জন্য বিখ্যাত। ঐ শতাব্দীর ভাবমণ্ডলও বিখ্যাত হয়ে রয়েছে রোমান্টিকদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায়।*

Beauty is ultimately irrational and basically beyond intellectual perception—এই হল রোমান্টিকদের বিষয়ে ভিক্টোরীয় প্রতিক্রিয়ার সাধারণ সূত্র। রাঙ্কিনের বক্তব্যও এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয় :

Romantic art, he suggested, lacked, the authority of classic art. Since the classic writer set down only what was “known to be true” while the romantic expressed himself “under the impulse of passion” which might or might not lead to new truths. মিলের যুগ অবশ্যই impulse of passion-কে প্রশ্রয় দেবে না। অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলা দরকার—ভিক্টোরীয় যুগের এই সাহিত্য-রুচির পরিবর্তন একমাত্র ক্ষতি করতে পারেনি যার তিনি হলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ।

কিন্তু প্রশ্ন হবে বঙ্কিম উনবিংশ শতকীয় ইংলণ্ডীয় আবহাওয়ায় নিজ সাহিত্য রুচিকে গঠিত করেও উপন্যাসের মেজাজে রোমান্টিকতাকে প্রশ্রয় দিলেন কেন—নিশেষত তখন যখন ইংলণ্ডের উপন্যাস-রাজ্য ডিকেন্স অগ্রতম শক্তিপূর, যিনি উপন্যাসে আবেগময় প্রকৃতিকে গোপনে রেখে লুপ্ত করেছেন বাস্তবালোচনাকে—বারে বারে আক্রমণ করেছেন উপযোগিতাবাদকে। ডিকেন্স যেখানে লণ্ডন শহরকে উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করতে সদাই সচেষ্ট ছিলেন বঙ্কিম সেখানে রজনী এবং ইন্দিরা ছাড়া কলকাতাকে পরিহার করেছেন। কাজেই ডিকেন্সের Hard times-এর পরিণতি বঙ্কিমে আসেনি।†

* The Anti-Romantics শীর্ষক অধ্যায় (Victorian Temper নামক গ্রন্থে) জুড়ে।

† Especially Hard times should be studied with close and earnest care by persons interested in social questions.—Ruskin.

অথচ হিতবাদী বঙ্কিম বেঙ্কামকেও সৰ্বাংশে স্বীকার করে নিতে পারেননি। বেঙ্কাম মানুষের চিরস্থায়ী মানসিক অভিপ্রায়ের বিশ্লেষণে সৌন্দর্য প্রেমকে সে মানসিক-অভিপ্রায়ের অগ্ৰতম অঙ্গ বলে স্বীকার করেননি। মিল তার আত্ম-জীবনীতে এর ক্ষতিকারক প্রভাবের কথা বলেছেন। বলেছেন যে, আশৈশব অনুভূতি-নিরপেক্ষ বুদ্ধিতপ্ত শিখায় শেষ পর্যন্ত তাঁর জ্ঞানবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যে পরিশেষে তিনি খুঁজে পান শান্তি এবং নিরাময়। পরিহাসের সুযোগ নিলে বলা যায় যে মিল হয়তো এইভাবে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ইউটিলিটি খুঁজে পেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অনুশীলনা-দর্শের আলোচনায় দেখা যায় যে, তিনি সৌন্দর্যপ্রেম এবং সৌন্দর্যাস্বাদনকে মানবিক রুতিসমূহের অগ্ৰতম বলে মনে করেন। এবং উপযোগিতাবাদীর মতোই মানুষের সৰ্বাঙ্গীণ বিকাশে এদেরও ভূমিকার প্রয়োজনকে মানেন। যদি সৌন্দর্য-রচনা করার ক্ষমতা থাকে তাহলে লেখনী ধারণের সার্থকতা আছে—বাংলার নব্য লেখকেব প্রতি বঙ্কিমের উপদেশ বাণীতে সৌন্দর্য-রচনাকে সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য বলে অভিহিত করা হয়েছে এই কারণেই।

তথাপি, এর মধ্যে বঙ্কিমের রোমাণ্টিকতার হেতু নিহিত হয়ে নেই। এ শুধু তার রোমাণ্টিকতার ব্যাখ্যা। হেতু সঙ্কানের জগৎ পুনরায় আমাদের কালমুখাপেক্ষা হতে হবে। তবেই বঙ্কিমের অসামান্য বিষয়বস্তুর তাৎপৰ্যও স্পষ্ট হবে।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে বঙ্কিমের কালে রঙ্গলাল থেকে নবীনচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা কাব্যের ইংলণ্ডীয় ভাবপুরুষ ছিলেন বায়বন (এবং স্কট, মুর প্রমুখেরা)। বায়বনের বীরত্ববাজক উক্তি ওজস্বিতা ইংলণ্ডে রোমাণ্টিকদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার যুগেও এক শ্রেণীর পাঠক-জনতাকে আকৃষ্ট করে রেখেছিল। কীটস্ এবং শেলীর সৌন্দর্য-পিপাসা অপেক্ষা বায়বন নব্য বঙ্গীয় কবিরূপকে প্রভাবিত করেছিলেন অধিক। তার কারণ কেবল অতীত-প্রীতিসম্পন্ন দেশাত্মবোধক কাব্য-প্রয়াসের মধ্যেই অনুসন্ধেয় নয়। ঈশ্বর গুপ্তের পর থেকেই বাঙালী কবিরা বিশেষ এ-যুগে রীতিমতো পাবলিক-সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। এই পাঠক-মণ্ডলী সম্বন্ধে সচেতনতা রোমাণ্টিক কবি-বৃন্দের মধ্যে প্রধানত বায়বনেরই ছিল। তাই, কল্পনার সূক্ষ্ম কল্পন অপেক্ষা তার উচ্ছ্বাসময় বাঁধনহারা লীলাকে আঁকা করে তোলাই যখন বাংলা কাব্যের লক্ষ্য ছিল তখন যে বায়বনকেই ছায়া রূপে বারে বারে কবিকল্পনায় দেখা যাবে এটা আশ্চর্য নয়। বিশেষ লক্ষণীয়

যে বাংলা সাহিত্যে বায়রনের এই প্রতিষ্ঠার কালে ওয়ার্ডসওয়ার্থে ছিল বঙ্কিমের আসক্তি এবং অনুরক্তি দুইই।

এই ব্যাপারে কেবল বঙ্কিমের সাহিত্যরুচির অনন্যতাই সূচিত হচ্ছে না, যে- কারণে বঙ্কিম সাধারণত নগর-জীবনকে তাঁর উপন্যাসের বিষয় করেননি সেই কারণটির প্রকৃত রূপও হৃদয়ঙ্গম করা যাচ্ছে। নগর-জীবনাপেক্ষা শান্ত প্রকৃতি, উদ্বেল করোজ্জ্বল নদীবক্ষ, খড়্গোত সমাকুল ঘোর নিশীথিনী, ফুল, গাছ, পাখি বঙ্কিমের কল্পনায় মাড়া তুলেছে অনেক বেশি। প্রকৃতপক্ষে বলা চলে যে মানব জীবনের ওপরে প্রকৃতির নিগূঢ় প্রভাবকে বঙ্কিমই প্রথম বাংলা সাহিত্যে যথার্থ রোমাটিকের দৃষ্টিতে উপলব্ধি করেন। এবং উপলব্ধি করেন মানুষের জীবনের বাখ্যার অগম্যতাকে। কপালকুণ্ডলায় এবং মনোরমায় মানুষের সেই রহস্যের সাক্ষাৎ মেলে। মনোরমাকে দুর্বোধ্য এবং দুজ্জ্বেয় রূপে চিত্রিত করার মনোও সেই রোমাটিক বঙ্কিমেরই পরিচয়। সৌন্দর্য যে বিচারাভীতি, প্রকৃষ্ট অনুভূতিতে তার স্থিতি, এই চরিত্র দুটি তার প্রমাণ। কিন্তু এহু বাহ্য। শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমের সকল উপন্যাসের বিষয়বস্তু কি একই অচরিতার্থ আকাজক্ষার বেদীমূলে আত্মার হাহাকার নয়? আমাদের প্রার্থনা এবং প্রাপ্তিব মনো, বাসনা এবং চরিতার্থতার মনো যে বিরাট ব্যবধান বঙ্কিমের কল্পনাকে তা বারে বারেই স্পর্শ করেছে। বঙ্কিমের সমস্ত নায়ক চরিত্রের বেদনার ও যন্ত্রণার উৎসে এই কল্পনাই বিজ্ঞমান। প্রতাপের মৃত্যু, গোবিন্দলালের সম্মাস, নবকুমারের বিসর্জন, সীতারামের সমাপ্তি এই সকল কিছুর মূলে সেই সত্য ক্রিয়াশীল। প্রসঙ্গে মোহিতলালের ইঙ্গিত যথার্থ। তিনি বলেছেন যে, বঙ্কিম কখনও মানুষকে ছোট করে দেখেননি। স্বভাবতই সে কারণেই মানুষের আকাজক্ষাকেও তিনি কখনো ছোট করে দেখেননি। বঙ্কিমের উপন্যাসের বিষয়বস্তুর যে গুরুত্ব বা অসাধারণত্ব তার মূল এই রোমাটিকতার মনো। ডিকেন্সের মতো ছোট মানুষের জীবনের নাট্যিকরণে (dramatising the foibles and vitality of little men) তিনি তৃপ্ত হতে পারেননি। তাঁর পক্ষে এটা সম্ভবও ছিল না। অন্য প্রসঙ্গে আমরা ‘উপন্যাসে বিষয়বস্তুর তাৎপর্য’ নামক অধ্যায়ে এ-কথা আলোচনা করেছি যে উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে কদাচ বাইরে থেকে বিচার করা চলে না। উপন্যাসের বিষয় সম্বন্ধে লেখকের সচেতনতা প্রকৃতপক্ষে লেখকের জীবন চেতনা, অথবা সমাজ-সভ্যতা সম্বন্ধে চেতনার নামান্তর। একটা উপন্যাসের বিষয়বস্তু অসাধারণ কিংবা সাধারণ

এ-কথা বললে বস্তুত কিছুই বলা হল না। বিষয়বস্তুর মাধ্যমে ঔপন্যাসিক যে জীবন-চেতনার রূপায়ণ ঘটান সেটাই এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য। বঙ্কিমের উপন্যাসের বিষয় সংক্রান্ত আলোচনায় দেখা যায় যে তিনি বিষয়কে কদাচ সরলীকরণের ভিতরে নিয়ে যেতে চাননি। তাঁর সমস্ত উপন্যাসের সমস্তার মূলে রয়েছে নায়ক বা নায়িকার অন্তশোচনার বোধ। এই অন্তশোচনার হেতু অবশ্যই পাপ চেতনায়। এই পাপ চেতনার ফলে সজ্ঞাত অন্তশোচনা ব্যতিরেকে বঙ্কিম! মানুষের যন্ত্রণাকে অন্য কোনোভাবে বুঝতে চেষ্টা করেননি। বঙ্কিম নিঃকালের জীবনের সমস্তাকে অনুভব করেছিলেন এইভাবে : আমাদের প্রাচীন সমাজের এবং সংসারের যেটা আচরণ-বিধি বা ধর্ম তার ব্যত্যয়ে ব্যক্তির জীবনে আসে পাপযন্ত্রণা। এই পাপবোধ বাইরের ঘটনার উদ্দীপন লাভ করলেও একান্ত-ভাবেই মনুষ্য বা subjective। কপালকুণ্ডলা বাস্তবিক কোনো পাপাচরণ করেনি। সে মনে করেছিল যে বিধিলিপি লঙ্ঘন করে পাপ করেছে। গোবিন্দলাল আইনের সাজাকে যথারীতি সম্পত্তিবান ঘরের ছেলের মতো ফাঁকি দিয়েছে বটে কিন্তু নিজের অন্তরকে ফাঁকি দিতে পারেনি। কুন্দনন্দিনী প্রকৃতপক্ষে কোনো পাপই করেনি। বিধবা বিবাহ আইনসম্মত ব্যাপার। কিন্তু সে কারণে কুন্দ পাপ বোধেব প্রতিক্রিয়াকে পরিহার করতে পারেনি। সীতারামের প্রসঙ্গেও তাই। প্রতাপের প্রসঙ্গেও তাই। শ্রদ্ধেয় ডাঃ স্ববোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর বঙ্কিমচন্দ্র আলোচনার ভূমিকায় স্বথ এবং কল্যাণের প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে বঙ্কিমের বিশ্বাস ছিল স্বথ-সম্পাদনী মানুষ যখন স্বথস্পৃহার মূলে কল্যাণকে বিসর্জন দেয় তখনই যন্ত্রণারম্ভ। কিন্তু সেই কল্যাণবোধের সামাজিক ভিত্তি কোথায়? স্বভাবতই বঙ্কিমের উত্তর ছিল ধর্মাচরণের মধ্যে। সামাজিক এবং পারিবারিক আচরণ-বিধির মধ্যেই হিন্দু সমাজের কল্যাণবোধ ক্রিয়াশীল হয়ে রয়েছে। আইন এই ক্রিয়াশীলতাকে ক্ষুণ্ণ করতে অথবা স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু কল্যাণবোধের অধিষ্ঠান বুদ্ধিতে। অথচ বাসনার নিধান প্রবৃত্তিতে। সেক্ষেত্রে এই অবস্থার মধ্যে যে সম্ভাবনা বঙ্কিম তাকেই ব্যবহার করেছেন তাঁর বিষয়রূপে। মানুষের আত্যন্তিক দুঃখের সঙ্গে তার মনোলোকের আলোড়নের একটা সম্পর্ক জড়িয়ে থাকে। যে অবস্থাতেই হোক না কেন জীবনের স্থিতিবস্থা যখন ব্যাহত হয়, খণ্ডীভূত হয় জীবনের ধ্রুব রূপ, তখনই মানুষের কল্পনালোকে শুরু হয় ব্যাপক আলোড়ন। তখনই সে সাস্থনা খোঁজে অন্তরে, সাড়া পেতে চায় প্রকৃতিতে। এটাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের

নৈতিক সমস্যা। বঙ্কিমের বিষয়বস্তুর মধ্যে এই গুঢ় সম্ভাবনার বীজ স্থপ্ত ছিল। এই বীজকে সফল করার তাগিদে বঙ্কিম অ্যাভারেজ মানুষকে বাদ দিয়েছেন নায়ক মণ্ডলী থেকে।

•• পাঁচ ••

এই আলোকেই বঙ্কিমের উপন্যাসের গঠন-বৈশিষ্ট্য আলোচ্য। আমরা বঙ্কিমের উপন্যাসের দ্বিতীয় লক্ষণে নির্দেশ করেছি—উপন্যাসের ঘটনা-সংস্থান রীতিতে নৈসর্গিক শৃঙ্খলা। পূর্ব পরিচ্ছেদে আলোচিত বিষয়ের মধ্যেই এই দ্বিতীয় লক্ষণের বীজ নিহিত। আমরা একবার ডিকেন্সের সঙ্গে সামান্য প্রতিতুলনায় এ-কথা বলেছি যে সাধারণ মানুষের জীবনের অন্তর্গত নাট্য সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করা এবং ব্যবহার করা ডিকেন্সের অগ্রতম বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমও বাঙালী জীবনের অন্তর্নিহিত নাটকীয় গুণকে ব্যবহার করেছেন। বঙ্কিম সাধারণ মানুষকে বিষয়ীভূত করতে অবশ্যই ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু “উনবিংশ শতাব্দীর পোস্তপুত্র” বঙ্কিমের নাথকেরা যে জীবন যন্ত্রণাকে ভোগ করতে পারত বঙ্কিম তাকে বিষয়ীভূত করেছেন।

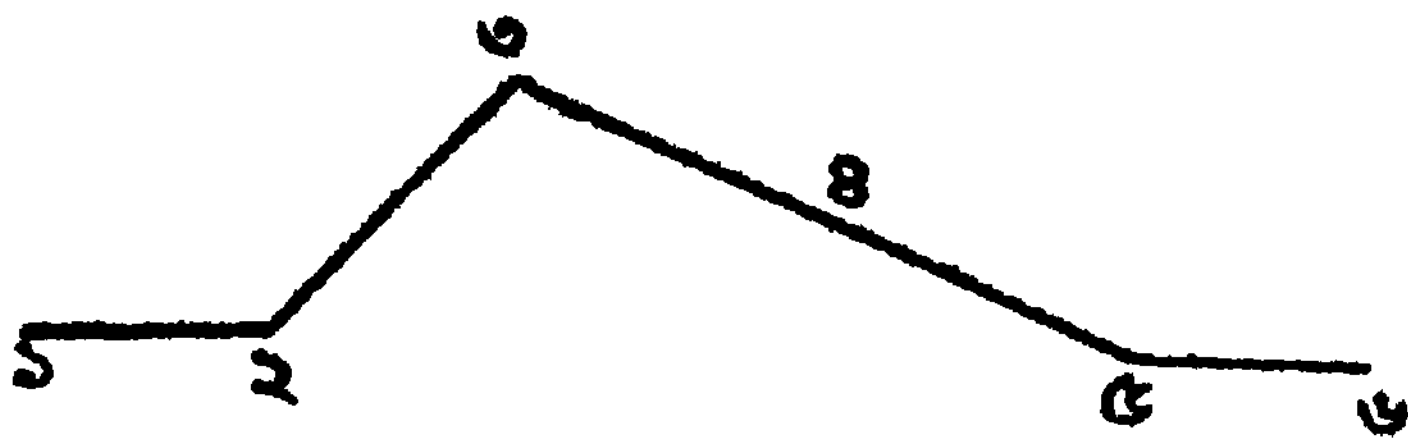
বঙ্কিমের প্রধান শিল্পসৃষ্টিগুলিতে নাট্যবস প্রচুরভাবে বিদ্যমান। সে নাট্যবস মাঝে মাঝে যে অতিনাটকীয়তায় পয়বসিত হয়নি তাও নয়। এই নাট্যবস প্রবণতার জগুই বঙ্কিমের উপন্যাসের দৃশ্য-পরিবর্তন, পবিচ্ছেদ-বিভাগ, ঘটনা-গতি সমস্তই নাট্যানুগ পবিকল্পনায় বিধৃত। বঙ্কিমের ক্ল্যাসিক-শুদ্ধ মন এই নাট্যানুগামিতার জনক মাত্র এই কথা বললে সমস্তটার ব্যাখ্যা হয় না। আমাদের চরিত্রের মধ্যে আমাদের অদৃষ্টের বীজ নিহিত থাকে। কেমনভাবে এবং কী করে বাইরের ঘটনার সংস্পর্শে এসে সেই বীজ পরিশেষে মহীকুহে পরিণত হয় ঘটনা-সংস্থানের গায়-শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে বঙ্কিম সে কথাটিই স্পষ্ট করে তুলতে চান। কাজেই বঙ্কিমের কাছে ঘটনা-সংস্থানের একটা নিজস্ব অর্থ আছে। একটা পূর্ব-স্থিত স্থির জীবনের প্যাটানে বহিঃনিষ্কিপ্ত উপাদান—ব্যক্তিই হোক বা ঘটনাই হোক—একটা বিপদ বা সংকটের ভূমিকা রচনা করে। এই initial incident বা প্রাথমিক ঘটনাই ধীরে ধীরে rising action এবং climax-এর দিকে ঘটনা প্রবাহকে নিয়ে যায়। বঙ্কিমের উপন্যাস-রীতির এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নাট্যকারের সংক্ষিপ্তবোধ। বিষয়বস্তুর বৃহদায়তনের মধ্যে কিছু পরিমাণ এই সংঘম বিনষ্ট হয়েছে তাও

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। উপন্যাসের শেষে denouement-এর স্বযোগে শেক্স-
পীরীয় রীতিতে ট্যাজেডির গভীর ঘনঘটার পর স্থসমতা আনয়নের প্রয়াসের
লক্ষণেও নাট্যরীতির, বিশেষ শেক্সপীয়রের প্রভাব লক্ষণীয়। প্রতাপের মৃত্যু
দৃশ্য অথবা ক্লষ্ণকান্তের উইলের পরিশিষ্ট এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমী উপন্যাসের নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা নিজস্ব তাৎপর্যে বিশিষ্ট। কেননা
বঙ্কিমের এই উপন্যাসের গঠন-রীতি সম্বন্ধে বিশিষ্ট ধারণা বস্তুত বঙ্কিমের
জীবনদর্শন থেকেই উদ্ভূত। আমাদের জীবন-ধর্মাচরণের ব্যত্যয়ে যে সংঘাত
বা দ্বন্দ্ব উনিশের শতকের মধ্যভাগে সূচিত হয়েছিল—যে দ্বন্দ্বের মূল নিঃসন্দেহেই
নবকালের উপাদানগুলির মধ্যে—(যে দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে হিতবাদী, অনুশীলনাদর্শী
বঙ্কিমের নিজস্ব ধারণাই তাঁর মানসদৃষ্টি—সেই দ্বন্দ্ব তাঁর উপন্যাসে নাট্য-
প্রবণতাব উৎস। লক্ষণীয় যে সমকালান্তরী যে দুটি রচনায় বঙ্কিম নাট্যানু-
গামিতা পরিহার করেছেন, রজনী এবং ইন্দিরা—সেখানে বঙ্কিমের এই বিশিষ্ট
জীবন সমস্কারও সমাক্ষ ব্যবহার ঘটেনি। কলকাতার তাৎকালিক জীবনের
মধ্যে আমাদের জীবন নিহিত দ্বন্দ্ব এক ধরনের বাবু-জীবনের সরলীকরণ লাভ
করেছিল। শ্রীশ-কমলমণির সংসার যাত্রাব মতোই তা ছিল বর্ণবিরল, আত্মমুখী।
কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের এই সীমিত পরিসরকে বঙ্কিম নিজ গায় অনুসারে
চিনতেন বলেই রজনীর আঙ্গিক-রীতিতে ওই জাতীয় আত্মকথনের রীতি
অনুসরণ করেছেন। বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাসের মতো রজনীতে সেই বিখ্যাত
কারণ পরম্পরায় গ্রথিত ঘটনাদারার সাক্ষাৎ মেলে না। অমরনাথের উপস্থাপনা
এবং উপসংহার যে পরিমাণে কাব্যময় সে পরিমাণে যুক্তিসিদ্ধ নয়।
লবঙ্গলতাদেব বাড়ি উপন্যাসের প্রধান ঘটনাস্থলী। রজনীর মিজাপুরের থাপরার
ঘরের পরিবর্তে এই স্থানে ঘটনা-কল্পনায় কোনো আপত্তিই থাকত না যদি
লবঙ্গলতার সংসারের নিজস্ব ছন্দটিও বিকশিত হত। রজনীর আত্মকথনে
সকলেই নিজের কথা বলেছে বটে, কিন্তু সবটা মিলিয়ে সকলে পরিস্ফুট
হয়নি। আরো বলা চলে যে রজনীর গল্প কলকাতায় ঘটেছে শুধু নামে।
কলকাতা—এই শব্দটির এই উপন্যাসে কোনো অর্থ নেই। আমাদের জাতীয়
জীবনের অসংলগ্নতায় এবং অসমবিকাশে কলকাতা শুধু বিভ্রাটালীর মৌখিক
আশ্রয় হয়েই সাধারণ মানুষের কাছে রইল। সাধারণ ভাবে মানুষের জীবনের
ছন্দে কোনো পরিবর্তন এল না। কলকাতায় তৎকালীন গ্রামীণ জীবনের
সংঘাত ছিল না, নগর-জীবনের প্রচণ্ড গতিশীলতাও ছিল না। এই নিরাবেগ

জীবনে বঙ্কিমের ইঙ্গিত নাটকও নেই, ওদিকে গঠন-রীতির নৈরাসিক শৃঙ্খলাও নেই। রজমীব আঙ্গিক-রীতির মূল ব্যাখ্যা এইখানে।

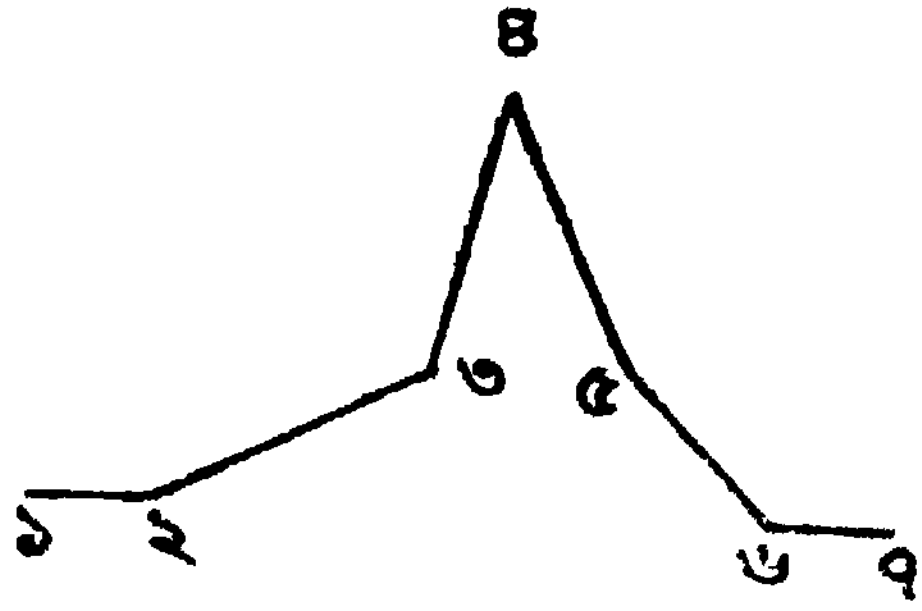
গঠন-রীতির এই নৈরাসিক শৃঙ্খলা বঙ্কিমের ক্লাসিক-শুদ্ধ মনের প্রসাদে পুষ্ট। বঙ্কিমের উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মের সর্বত্রই এই শৃঙ্খলাব পরিচয় মেলে। কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকান্তের উইল এবং শেষদিকে বাজসিংহ এ-প্রসঙ্গে সর্বোত্তম নিদর্শন। কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসের সমগ্র গঠন-বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। উপন্যাসটিকে বঙ্কিম দুটি খণ্ডে ভাগ করেছেন। প্রথম খণ্ডে আছে একত্রিশটি পরিচ্ছেদ, ঘটনাকাল বৎসব খানেকের মতো। দ্বিতীয় খণ্ডে পবিত্রের সংখ্যা পনেরো—সময়কাল আট বৎসব। প্রথম খণ্ডে ঘটনাগতি দ্রুত এবং জটিল। দ্বিতীয় খণ্ডে ঘটনা সবলরেখা সম্পন্ন। প্রথম খণ্ডে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ঘটনাজাল, একটি পূর্ণাঙ্গ পটভূমিকার রূপায়ণ। দ্বিতীয় খণ্ডে শুধু ট্রাজেডির নির্মম আকর্ষণে নিম্নাবতরণ। ঘটনাব বীজ উদ্ভূত হয়ে গাছে পরিণত হতে লেগেছে এক বছর। তাবপব সে বিষবৃক্ষের ফসল সকলে মিলে আহরণ কবেছে দীর্ঘ জীবন ধবে। কাজেই প্রথম খণ্ডের দ্রুত লয় দ্বিতীয় খণ্ডে বিলম্বিত হয়েছে। ঘটনাবিরল দ্বিতীয় খণ্ডে বোহিনী হত্যাই একমাত্র ঘটনা। বাকি দীর্ঘকালের অসহনীয় শূন্যতাকে ছেকে শুধু প্রয়োজনীয় কথাগুলিই মাত্র বলা হয়েছে। কাজেই এই কালের মন্বন্তরতাকে মন্বন্তর লয়ে পনেরোটি পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। নিচের বেখাচিত্রটি অন্তর্ধানযোগ্য। এক, উইলের কথা, দুই, বোহিনীর চৌর্য ও লাঞ্ছনা, তিন, বাকগী পুষ্কবিণীর ঘটনা এবং গোবিন্দলালের ভ্রমবের সঙ্গে বিচ্ছেদ, চার, বোহিনী হত্যা, পাঁচ, ভ্রমবের মৃত্যু, ছয়, গোবিন্দলালের সম্মান।



সময়কালের দিক দিয়ে বিচার করলে এক থেকে তিন পর্যন্ত ঘটনাকাল এক বছর, এবং তিন থেকে চার পর্যন্ত ঘটনাকালও এক বছর। এক থেকে তিন পর্যন্ত যে ক্ষেত্রে একত্রিশটি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে, তিন থেকে চার পর্যন্ত আসতে সেক্ষেত্রে লেগেছে নয়টি পরিচ্ছেদ। কেননা তিন থেকে চার—

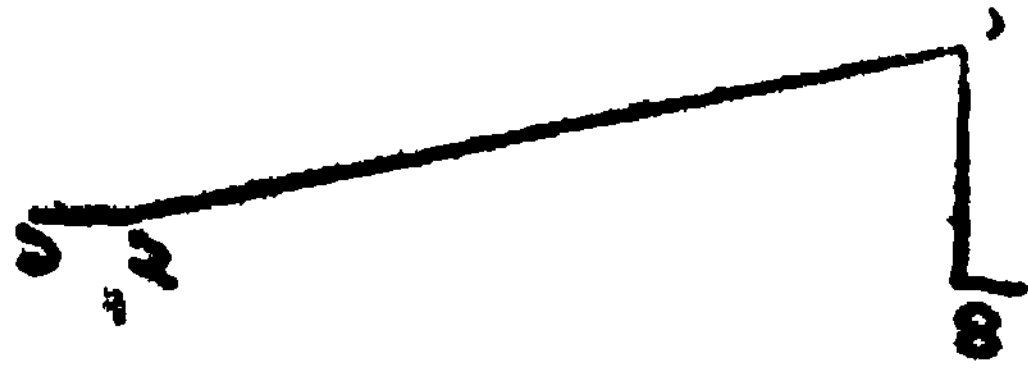
কেবলমাত্র প্রথম খণ্ডের ঘটনার তাড়নায় সংঘটিত পৰিণাম। নতুন ঘটনা কিছু নয়। চাব থেকে ছয় সময়কালের দিক থেকে সৰ্বাপেক্ষা দীৰ্ঘ। ছয়টি পৰিচ্ছেদে এই গভীর বেদনাবহ কালকে সংঘমের সঙ্গে বৰ্ণনা কৰা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। বৰ্ণনাকালে লেখকের সংঘম, চিঠিপত্রে-বাচনে-আচৰণে পাত্রপাত্রীদের পৰিমিত্তিবোধ টাঁজেডিব দারুণ দুঃখভাবের মৰ্যাদা সৰ্বত্র বক্ষা কৰেছে।

বিষয়বস্তুর কাঠামোবও অন্তৰূপ বিশ্লেষণ সম্ভব। এবং সেখানেও দেখা যাবে যে উপন্যাসের গঠন-বিষয়ের অন্তৰ্ধান্যে বন্ধিম কী পৰিমাণে যত্নশীল ব্যক্তি ছিলেন। নিচের বেখাচিত্রটি লক্ষণীয়



এক থেকে দুই পযন্ত মাত্র exposition বা ঘটনাভাস। নবম পৰিচ্ছেদে কুন্দব বৈবদ্য থেকে প্রকৃত ঘটনাবলি। দুই থেকে তিন কুন্দব বৈবদ্য থেকে নাগেন্দ্র ও কুন্দব পৰস্পর আকর্ষণ ও কুন্দব হীবার কবলে পতন। তিন থেকে চাব, একবিংশ পৰিচ্ছেদ থেকে সম্প্রদায় পৰিচ্ছেদ নাগেন্দ্র-স্বয়মুখীর সম্পর্কের জটিলতা, কুন্দ-নাগেন্দ্রের বিবাহ, স্বয়মুখীর সংসার ত্যাগ। চাব থেকে পাঁচ সম্প্রদায় পৰিচ্ছেদ থেকে চতুঃচত্বিংশতম পৰিচ্ছেদ পযন্ত নাগেন্দ্রের অন্তঃশোচনা এবং স্বয়মুখীর প্রত্যাবর্তন। পাঁচ থেকে ছয়, ঊনপঞ্চাশতম পৰিচ্ছেদ পযন্ত কুন্দব বিয়োগান্ত সমাপ্তি। সাত দেবেন্দ্র-হীবার উপসংহার জ্ঞাপন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে দুই থেকে ছয় পযন্ত উপন্যাসের ঘটনাকাল। নাগেন্দ্র কুন্দনন্দিনী স্বয়মুখী উপন্যাসের ঘটনাবলি মূখ্য বাবক হলেও কুন্দনন্দিনীই উপন্যাসের কেন্দ্র-বিন্দু। কুন্দব জীবনের এই প্রধান ঘটনাবলি অংশের সময়কালও পৰিমিত। সেই সময়কালকে সমানভাবে চল্লিশটি পৰিচ্ছেদে বন্টিত কৰে, কখনো চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতিতে, কখনো দৃশ্যাঙ্কণ পদ্ধতিতে এবং কখনো নাট্যবস্তুত্বে উপন্যাসের পটকে পূর্ণ কৰে তোলার চেষ্টা কৰা হয়েছে নানাভাবে। এ ব্যাপারে লেখক কতটা সফল হয়েছে তা পৰে আলোচ্য। কপালকুণ্ডলাৰ পরিকল্পনা অধিকতর

নাট্যাশ্রয়ী বলে এর গতি আরো সরল। কপালকুণ্ডলার গঠন-কৌশলকে এইভাবে কল্পনা করা যায় :



এক থেকে দুই, নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ ও বিবাহ। দুই থেকে তিন, মতিবিবি আখ্যান, নবকুমারের দাম্পত্য জীবনের সংকট, কাপালিকের পুনর্বারিষ্ঠা। তিন থেকে চার, অতিদ্রুত ঘটনাস্রোতের catastrophe-র মোহানায় অবতরণ। বাজসিংহ প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, পবিচ্ছেদাশ্রিত ঘটনাগুলি শোভাযাত্রা কবিতা চলিয়াছে। বাজসিংহে ঘটনার শোভাযাত্রা বর্ণিত এইমাত্র। নতুবা, বঙ্কিমের সমস্ত উপন্যাসেই ঘটনার গতিপ্রাবল্য প্রথমাবধি অন্তর্ভূত হয়। এই ঘটনাগতির স্বরূপ কী এবং বঙ্কিমমানসের কোন্ সূত্র থেকে এই ঘটনাধারা-প্রবণতার জন্ম সে কথা কিছু পূর্বে আমরা আলোচনা কবেছি। এই সূত্র যেখানে শিথিল সেখানে উপন্যাসেও বঙ্কিম শিথিলতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন মৃণালিনী। মৃণালিনীর জটিল আখ্যায়িকা এক প্রকার তাৎপৰ্যহীনতায় শেষ পর্যন্ত শিল্পকর্মকেই হানিগ্রস্ত কবেছে। কেন কবেছে সে-কথা পরবর্তী পবিচ্ছেদে বলা হচ্ছে।

•• ছয় •

মননশীলতা-জন্মিত স্নসমতার প্রয়াসকে আমরা বঙ্কিমের উপন্যাসের ক্ষেত্রে তৃতীয় লক্ষণ বলে আখ্যাত কবেছি। বঙ্কিমের বহু জনপ্রিয় উপন্যাসগুলিতে এই স্নসমতার অভাব এবং প্রথম দিককার শিল্পোৎকর্ষ সমন্বিত সৃষ্টিগুলিতে উক্ত স্নসমতার সার্থকতা এই দুটি বিষয়ই এ প্রসঙ্গে লক্ষ্যীয়। স্বভাবতই আমরা জানি যে মননশীলতা এবং মননশীলতা-জন্মিত স্নসমতা এক কথা নয়। স্নসমতা একটা শিল্পশ্রী। মননশীলতা মাত্র বুদ্ধিচর্চার ফসল। বঙ্কিমের রচনায় তথাকথিত বোমাটিকতার উপাদান সহজেই সন্ধান করা যায়। কিন্তু জিজ্ঞাস্য বঙ্কিমের যে পরিচয় আমরা জানি তাতে স্বভাবত বোঝা যায় যে বঙ্কিমের কল্পনার পবিমণ্ডলেও যুক্তি বা হেতু-জ্ঞানের অসম্ভাব হবে না। কল্পনার ভববগাই লীলাকে তিনি সদাই কল্পনা-রসিকের মতো ধ্যানে ধারণ করতে চাইতেন। কিন্তু

কোম্বুতে-ৰ উপযুক্ত ছাত্র হিসাবে কল্পনাৰ স্বাধীন স্বেচ্ছাবিহাৰকে হেতুৱহিত
 বুলে স্বীকাৰ কৰতেও পাবতেন না। সেই কাৰণে দেখা যায় যে ৰোহিণীৰ
 বেদনা তাঁৰ কল্পনাকে স্পৰ্শ কৰে। তিনি সেখানে জীৱনেৰ বণস্থলীতে শক্তি-
 সমূহেৰ ক্ৰিয়া-প্ৰতিক্ৰিয়াগুলিকে কল্পনায় অনুভৱ কৰাব চেষ্টা কৰেন—সঙ্গে
 সঙ্গে বুদ্ধিতে বা যুক্তিতে তাৰ ব্যাখ্যা কৰাব চেষ্টা কৰেন। বঙ্কিমৰ সমুদয়
 উৎকৃষ্ট উপন্যাসে—কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তেৰ উইল, বাজসিংহ সৰ্বত্ৰই
 এই ৰীতি ৰক্ষিত হয়েছে। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্ৰনাথৰ আচৰণেৰ ব্যাখ্যা দানেৰ
 প্ৰয়াস অথবা বজনীতে অমবনাথৰ আত্মচেতনামূলক স্বগত কথনে এই
 বিশ্লেষণেৰ সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বঙ্কিম নাযক-নাযিকাৰ আচৰণে যেন কোনো
 অস্বাভাবিকতা না সঞ্চারিত হয় সে বিষয়ে খুবই সচেতন। বঙ্কিম উপন্যাসেৰ
 ঘটনা-সংস্থাপনেৰ বেলাতেই এ বিষয়ে স্পষ্টত অবহিত থাকতেন। সে কাৰণে
 বঙ্কিমচন্দ্ৰেৰ উপন্যাসে আকস্মিক ঘটনাৰ ব্যৱহাৰ বিজ্ঞমান বটে, কিন্তু আচৰণেৰ
 অসঙ্গতিতে কখনই তাঁৰ প্ৰধান উপন্যাসেৰ পাত্রপাত্রীবা দুষ্ট নয। বুদ্ধিদীপ্ত
 এই যুক্তিপ্ৰবণতা বঙ্কিমৰ উপন্যাসেৰ ভাষাতেও ছায়াপাত কৰেছে। লক্ষণীয়
 যে বঙ্কিমৰ উপন্যাসেৰ ভাষা এবাৰ তাঁৰ প্ৰবন্ধেৰ ভাষাৰ মধ্যো তফাত কেবল
 এইখানে যে উপন্যাসেৰ ভাষা অলংকৃত, তীব্ৰ বিশেষণ সচকিত উচ্চগ্ৰামেৰ
 কল্পনাৰ জগত সদাপ্ৰস্তুত। তা না হলে প্ৰবন্ধেৰ ভাষায় যে সতৰ্ক যুক্তিশীল
 নৈয়ায়িকতা তাঁৰ উপন্যাসেৰ ভাষাও আত্মাৰ দিকে তাবই আত্মীয়। বিষবৃক্ষ
 উপন্যাসেৰ নিম্নোক্ত অংশটি পৰীক্ষাৰ যোগ্য

কাৰ্পাস বস্ত্ৰ মধ্যস্থ তপ অঙ্গাবেৰ গায়, দেবেন্দ্রেৰ নিকপম মূৰ্তি হীৰাৰ
 অন্তঃকবণকে স্তবে স্তবে দক্ষ কবিতৈছিল। অনেকবাব হীৰাৰ ধৰ্মভীতি
 এবং লোকলজ্জা, প্ৰলয়বেগে ভাসিষা যাইবাৰ উপক্ৰম হইল। কিন্তু
 দেবেন্দ্রেৰ স্নেহহীন ইন্দ্ৰিয়পৰ চৰিত্ৰ মনে পড়াতে আবাব তাহা বন্ধমূল
 হইল। হীৰা চিত্ত সংযমে বিশেষ ক্ষমতাশালিনী এবং সেই ক্ষমতা ছিল
 বলিয়াই সে বিশেষ ধৰ্মভীতা না হইয়াও এ পৰ্যন্ত সতীত্বধৰ্ম সহজেই ৰক্ষা
 কৰিয়াছিল। সেই ক্ষমতা প্ৰভাবেই সে দেবেন্দ্রেৰ প্ৰতি প্ৰবলানুৰাগ
 অপাজ্ঞান্ত জাৰিয়া সহজেই শমিত কৰিয়া বাখিতে পাবিল। বৰং চিত্ত
 সংযমেৰ সতুপায়-স্বৰূপ হীৰা স্থিৰ কবিল যে পুনৰ্বাব দাসীৱত্তি অবলম্বন
 কৰিবে। পৰ গৃহেৰ গৃহকৰ্মাদিতে অনুদিন নিরত থাকিলে, সে অন্ত মনে
 এই বিফলানুৰাগেৰ বৃশ্চিক দংশনস্বৰূপ জালা ভুলিতে পাৰিবে। নগেন্দ্ৰ

যখন কুন্দনন্দিনীকে গোবিন্দপুরে রাখিয়া পৰ্যটনে যাত্রা করিলেন, তখন হাঁরা ভূতপূৰ্ব আত্মগত্যেব বলে দাসীত্ব ভিক্ষা করিল। কুন্দনের অভিপ্ৰায় জানিয়া নগেন্দ্ৰ হীবাকে কুন্দনন্দিনীৰ পৰিচৰ্যায় নিযুক্ত রাখিয়া গেলেন।

অনুচ্ছেদটিৰ শেষ বাক্য হীবাব দাসীত্বে নিয়োগ-বার্তা জ্ঞাপন। লক্ষণীয় যে, অনুচ্ছেদটিৰ প্ৰথম বাক্য থেকে শেষ বাক্য পৰ্যন্ত সমস্ত বাক্যাংশলিৰ মধো কী পৰিমাণ নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা বিদ্যমান। উপন্যাসেও বন্ধিম সদাসৰ্বদাই যেন সম্মুখে কোনো জিজ্ঞাসু প্ৰতিপক্ষকে কল্পনা কৰে বাখতেন। বাক্য-বিজ্ঞাসে সেই প্ৰতিপক্ষৰ সঙ্গ বিতৰ্কৰ ঠাট স্পষ্ট। তিনি যে শুধু তাঁৰ বাক্যবীতিকে বার্তাজ্ঞাপক বা সংবাদবহ কৰে তুলতে চাইতেন তাই নয়—কেন ঘটল ঘটনাটি তাৰও একটা কৈফিয়ত যেন দিতে ব্যস্ত হতেন। পাঠকেৰ গল্প জিজ্ঞাসায় “তাৰ পৰেব” যে উত্তৰ, এৰ সমালোচকেৰ প্ৰটেৰ প্ৰশ্নে “কেন”—ৰ যে উত্তৰ—এই দুই প্ৰশ্নেবই তিনি এক সঙ্গ উত্তৰ প্ৰদান কৰতে চাইতেন। অবশ্যই উল্লেখ্য যে এ-পদ্ধতিৰ একটা সমূহ বিপদাশঙ্কা হল লেখকেৰ নিবাসক্তি বক্ষা কৰা সব সময় সম্ভব নাও হতে পাবে। বোহিণীৰ মৃত্যুৰ পৰে বন্ধিমেৰ প্ৰদত্ত কৈফিয়ত এই কাৰণেই শিল্পসম্মত হয়নি। তাই বোহিণী অত শীঘ্ৰ মৰিল—এ উপন্যাসিকেৰ প্ৰদত্ত ব্যাখ্যা কদাচ হতে পাবে না। সমালোচকেৰ ব্যাখ্যায় এ উক্তি যদিবা সম্ভব। এই ভঙ্গিই আবার লেখকেৰ অনধিকাৰ প্ৰবেশেৰ সহায়ক হতে পাবে। যেমন সীতাবাম উপন্যাসে ললিতগিৰিৰ বৰ্ণনায় প্ৰাচীন হিন্দু ও বৰ্তমান হিন্দুৰ তুলনা।

বন্ধিমেৰ উপন্যাসেৰ নায়ক-নিৰ্বাচন উপন্যাসেৰ স্ৰসমতা বক্ষায় যথেষ্ট কাৰ্যকৰী হয়েছে। বন্ধিমেৰ কোনো নায়ক বা নায়িকা ভাবাতিৰেক-দৃষ্ট নয়। যদিও প্ৰবল স্বাক্ষৰাত্ম্যৰ মতো প্ৰচণ্ড বাসনাবেগে তাৰা আন্দোলিত হতে পাবে—তথাপি শান্ত বা স্বাভাবিক অবস্থায় তাৰা প্ৰশান্ত সমুদ্ৰেৰ মতোই স্থিতিৰ। সেদিক থেকে সমুদ্ৰেৰ সঙ্গিই বন্ধিমচন্দ্ৰেৰ নায়ক-নায়িকাদেৰ তুলনা কৰা চলে। এ-প্ৰসঙ্গে আৰো বলা চলে যে, কোনো বন্ধিমী নায়ক যেমন ভাবাতিৰেক-দৃষ্ট নয়, তেমন প্ৰথব মননশীল বা বুদ্ধিবাদীও নয়। অমৰনাথই হয়তো কিছুটা এৰ ব্যতিক্ৰম। তাৰা শিক্ষিত বুদ্ধিমান মধ্যবিত্ত সমাজেৰ প্ৰতিনিধি। সাধাৰণ স্তৰেৰ মাতৃষ নয় মাত্ৰ এ-কাৰণে যে, সাধাৰণ জীবন থেকে তাৰেৰ আহবণ কৰা হয়নি। এ বকম নিৰ্বাচনেৰ ফলে বন্ধিমেৰ জীবন-বিষয়ক নিবীক্ষণ লেখকেৰ দিক থেকে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হয়েছে। প্ৰথব মননশীল নায়ক, যিনি বন্ধিমেৰ চিন্তাৰ

প্রতিভা হতে পারেন তিনি বঙ্কিমী উপন্যাসের অসাধারণ ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে পতিত হয়ে অসাধারণ ব্যবহার করতেন। বঙ্কিমের লক্ষ্য কখনই তা ছিল না। বরঞ্চ সাধারণ বুদ্ধিমান শিক্ষিত মানুষের সমস্ত বহির্বিবরণের অন্তর্নিহিত যে মানুষ, তাকে যত্নসামিতি অবস্থায় আবিষ্কার কবাই তাঁর ঔপন্যাসিক বাসনা ছিল। সে কাবণেই অমবনাথের আত্মসচেতনতার আতিশয্যকে বঙ্কিম যথার্থ শিল্পবিহীন কবতে পাবেননি। দঃখদহনের যন্ত্রণা-উত্তীর্ণ মানুষই যথার্থ আত্ম-ত্যাগের শক্তিসম্পন্ন—এই বিষয় অমবনাথের আত্মকথনের ফলে হালকা হয়ে গেছে এবং সেই লঘুকরণের জন্য একদিক থেকে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উপন্যাসের আঙ্গিক-বীতি অপর দিকে তেমনি অমবনাথের ত্যাগজনিত বেদনাও হয়েছে ফিকে। বঙ্কিম বিষয়বস্তুর অসাধারণত্ব পরিহার কবে নায়ককে অসাধারণ কবতে প্রয়াসী হয়েছেন বঙ্গনীতে, আর এই ক্রটিই আবে। শিল্প-বিবহিত হয়ে দেখা দিয়েছে যুগালিনীতে, যেখানে মনোবমাকে তিনি কবে তুলতে গেছেন অনন্ত কাব্যময় বহুস্বর্গবাসিনী, অসাধারণ। মনোবমার বহুস্বয়মত। উপন্যাসের নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতার বাহিনীতে অসঙ্গত। উপন্যাসের সুসমতাকে সব দিক দিয়ে ব্যাহত কবেছে মনোবমা চরিত্রের উচ্চমার্গী বহন।। শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনোবমার চরিত্রের বহুস্বয়মত দুর্বলগাহতার কাব্যবাজনার বিষয়ে প্রশংসোক্তি কবেছেন। কিন্তু উপন্যাসের বিচারে কোনো কিছুই ভালো মন্দ হওয়া-না-হওয়ার একক অধিকার নেই। সামগ্রিকতা ব্যতীত উপন্যাসের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশেরও বিচার সম্ভব হয়। কাজেই মনোবমার চরিত্রেরও বিচার উপন্যাসের সমগ্রত্ব পরিপ্রেক্ষিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। মনোবমাকে বহুস্ব-স্বর্গবাসিনী কবে তুললে সে আর পশুপতি প্রসঙ্গে কোনো তাৎপর্যই সঞ্চার করতে পারে না—উপন্যাসেও কোনো উদ্দেশ্যসাধন তার দাবা হয় না। যুগালিনী উপন্যাসের জটিল আখ্যায়িকাতে মনোবমাই জটিলত্বের গ্রন্থি—কোনো শিল্প-উদ্দেশ্য ব্যতিবেকেই। অমবনাথ এবং যুগালিনীতে বঙ্কিমের অথও ঔপন্যাসিক সত্তা বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। কাব্য এবং উপন্যাসের প্রতি দ্বৈত আনুগত্য বাথতে গিয়েই এই উপন্যাস দুটিতে সুসমতার হানি ঘটেছে।

সুসমতা বঙ্কিমের উপন্যাসের প্রধান গুণ। উপন্যাসের লজিক্যাল স্ট্রাকচার বা যুক্তিসিদ্ধ গঠন-বীতি থেকেই এই সুসমতার জন্ম। বঙ্কিম যত ধর্মবাদী হয়ে উঠছিলেন—যত তিনি অনুশীলনাদর্শকে মানব-মুক্তির অন্যতম পন্থা হিসেবে অনুভব কবছিলেন, ততই বঙ্কিমের উপন্যাসে এই গুণের অভাব স্পষ্ট হচ্ছিল।

যত্নের মুহূর্তে। ‘আমি তোমার কেহ নহি’—এই উক্তির মধ্যই রোহিণীর জীবনের সকল ট্রাজেডি নিহিত হয়ে রয়েছে। রোহিণী বলেছিল, যতদিন পায়ে রাখেন ততদিন দাসী। এ আর প্রেমপিপাসিতার কথা নয়। দেহজীবা নারীর কথা। কৃষ্ণকান্তের উইলের অন্য দুটি প্রধান চরিত্রের মতো রোহিণী রিত্রও বন্ধিম প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। রোহিণী প্রথম উপস্থাপনা থেকে শেষ পরিণাম পর্যন্ত এক অখণ্ড ত্রায়-পরম্পরায় গঠিত। সে ত্রায়-পরম্পরাকে খণ্ডিত করার ক্ষমতা বুঝি বিধাতারও ছিল না।

•• দর্শ ••

রাজসিংহ বন্ধিমের এমন একখানি গ্রন্থ যার আলোচনায় সমালোচকের বিপথে যাবার আশঙ্কা স্বল্প। রবীন্দ্রনাথের আলোচনা এ-ক্ষেত্রে পথ বেঁধে দিয়েছে। এবং রবীন্দ্রনাথের রাজসিংহ প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথেরও উপন্যাস আলোচনার এমন একটা উচ্চতম নিদর্শন যে তাবপবে আব রাজসিংহ সম্বন্ধে নতুনতর কিছু বলার প্রয়াস দুশ্চেষ্টা মাত্র। কেননা সে আলোচনা রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি নিয়ে শুরু করতে হবে এবং রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দিয়েই শেষ করতে হবে। রাজসিংহ উপন্যাসের গঠন, তার ঘটনাগতি, চবিত্র-নির্মাণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথই সুন্দরতম ব্যাখ্যাতা।

আমরা তাই এ আলোচনায় রাজসিংহ উপন্যাসের ইতিহাসবস বিষয়েই আমাদের বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখব। আলোচনাকালে রবীন্দ্রনাথেরই অপর একটি প্রবন্ধ ‘ঐতিহাসিক উপন্যাসের’ সহায়তা আমরা গ্রহণ করব। ঐতিহাসিক রস নামটি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। ঐ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা করেছেন যা প্রণিধানযোগ্য। তার মধ্যে একটা কথা হল ইতিহাস বনাম জনশ্রুতির সম্পর্ক। ইতিহাসতত্ত্ব ইতিহাসরস নয়। উপন্যাসের কারবার রসকে নিয়ে, তত্ত্বকে সে সাহায্যার্থে আহ্বান করতে পাবে মাত্র। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে আজ যদি নবীন ঐতিহাসিক মহাভারতের কৃষ্ণ-বলরাম বিষয়ে সমস্ত নবীন তত্ত্বসমূহ আবিষ্কার করে তাহলেও বেদব্যাসের মহাভারতের সমগ্রানুপ্তি ঘটবে না। ইতিহাসবেত্তা নিঃসন্দেহেই ইতিহাসের তথ্যের নিয়োগমাণিক্যকে সবচেয়ে বেশি সম্মান দেবেন। ইতিহাসবেত্তার তথ্য বিশ্বতিকে যুগানুগত করা করবে না এও সত্য কথা। কিন্তু যখন কোনো ঐতিহাসিক ইতিহাসের গভীর কোনো খণ্ডাংশকে বিষয়ীভূত করে উপন্যাস রচনা করেন তখন তার কাছে

ঐতিহাসিক বিষয়ানুগত্য আশা করি কি না? এই প্রশ্নের মীমাংসায় অক্ষম হয়ে সার ফ্রান্সিস পালগ্রেভ বলেছেন যে ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসের এবং গল্পের উভয়েরই শত্রু। অর্থাৎ ইতিহাসকে রক্ষা করতে গিয়ে গল্প এবং গল্পকে বাঁচাতে গিয়ে ইতিহাস এই শত্রুরকুল পিতৃকুল উভয়েরই সর্বনাশ ঘটে।

স্বভাবতই এ আলোচনায় স্কটের আইভানহো আদর্শ নয়। কেননা যারা নাকি ইওরোপের ধর্মযুদ্ধযাত্রা যুগের সম্বন্ধে কিছু জানতে চান তাঁরা যেন স্কটের আইভানহো পড়া থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু ওঅর অ্যাণ্ড পীস নিশ্চয়ই সে জাতীয় উপন্যাস নয়। একটা জাতির উত্থান-পতন, ভাগ্য বিপর্ষয়ের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির ক্ষুদ্র জীবনের পতন অভূতায় কেমন করে বিজড়িত হয়ে যায় ওঅর অ্যাণ্ড পীস নিশ্চয় তারই প্রমাণ। এবং ইতিহাসের মূল স্রবকে বিকৃত না করে ইতিহাসের ঘূর্ণ্যমান চাকাব রন্ধ্রপথে কেমন করে 'ঔপন্যাসিক স্বীয় কল্পনাকে বিকশিত করে তুলতে পারেন ওঅর অ্যাণ্ড পীস তারও প্রমাণ বটে। বলা বাহুল্য ওঅর অ্যাণ্ড পীস ইতিহাস-রসামিশ্রিত উপন্যাসের ক্ষেত্রে এখন ধ্রুপদী মযাদার অধিকারী। কটর ঐতিহাসিক ও গৌড়া সাহিত্য প্রেমিক (জানি না এ দুই বস্তুই সম্ভব কিনা) উভয়েই টলস্টয়ের এই শত্রুরকুল-পিতৃকুল রক্ষার (কথাটা রবীন্দ্রনাথের) অপূর্ব ক্ষমতায় ও মহাভারতকল্প ঐশ্ব্যে মুগ্ধ হয়ে থাকেন। সেই টলস্টয় ইতিহাস ও ব্যক্তির সম্পর্ক সম্বন্ধে ওঅর অ্যাণ্ড পীস উপন্যাসে বলেছেন :

The life of man is twofold—one side of it is his own personal experience, which is free and independent in proportion as his interests are lofty and transcendental, the other is his social life as an atom in the human swarm which binds him down with its laws and forces him to submit them. For although a man has a conscious individual existence, do what he will, he is but the unconscious tool of history and humanity.

এইটুকুর জন্য অবশ্যই টলস্টয়ের সাক্ষ্য প্রয়োজনে লাগে না। কিন্তু ঠিক এর পরের বাক্য অনুবাবন করলেই দেখা যাবে যে মানুষের জীবনে অদৃষ্টের এবং অনিবার্যতার বিষয়টিকে টলস্টয় কীভাবে বাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন :

The higher he stands on the social ladder, the more

numerous the fellow being whom he can influence, the more clearly do we perceive the predestined and irresistible necessity of his every action.

টলস্টয়েব জীবনদৰ্শনৰ ব্যাখ্যা তিনি নিজেই কৰেছেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কীৰ্তি বা যে কাৰণেই হোক না কেন মানুষৰ স্বাধীন সত্তা যতহ সামাজিক ভাবে বড়ো জীবনকে আঁকড়ে ধৰে ততই তাৰ জীবন অনিবাৰ্য ইতিহাসেৰ নিয়মেৰ বশীভূত হয়। এই নিয়মেৰ বাহিৰে স্বাধীন মানবিক সত্তাৰ অস্তিত্ব সে পৰিমাণেই বিদ্যমান যে পৰিমাণে তাৰ interests are lofty and transcendental. ওহৰ অ্যাণ্ড পীস উপন্যাসে বোৱহয় এ বৰনেৰ স্বাধীন মানবিক সত্তাৰ উজ্জলতম নিদৰ্শন প্লেটো ক্যাবাটিয়েভ—যে স্থূল সাধাৰণ মানুষটিৰ সঙ্গে নাযক পিয়োবেব বন্দাযাত্ৰাৰ কালে বন্ধুত্ব হৰিছিল।

টলস্টয়েব ইতিহাস ব্যাখ্যায় একটা প্রশ্ন স্বতঃই উত্থাপনযোগ্য। সামাজিক জীবন এবং মুক্ত ইচ্ছাময় জীবন বলে যে দুই ভাগ তিনি কৰেছেন তা বাস্তবে কতখানি সম্ভাব্য। বিৰাট ঐতিহাসিক ঘটনাচক্ৰেৰ ঘূৰ্ণনেৰ বালে ব্যক্তিৰ স্বাধীন বিমুক্ত অভিজ্ঞতাৰ ক্ষেত্ৰ বি এনেবাবে অস্পষ্টে থকা সম্ভব? উক্ত ক্যাবাটিয়েভ চৰিত্ৰটিৰ সাহায্যে প্রত্যক্ষ ভাবে এবং পৰোক্ষে আৰো নানাভাবে টলস্টয় হযতো এ কথা বোঝাতে চেবেছেন কিন্তু বায়বাবণ পৰম্পৰাৰ শ্ৰোতে যে ব্যক্তি এবং সমাট সৰগেই ভেসে যায় এ কথাৰে টলস্টয় অৱশ্যে উপন্যাসে পান্নাতে পাবেননি।

বলা বাহুল্য বন্ধিমেৰ এ জাতীয় কোনো ইতিহাসদৃষ্টি ছিল না। তিনি মানুষেৰ দ্বৈত জীবনেৰ স্বৰূপকে স্পষ্টত উপলব্ধিৰ বোনা চেষ্টা বৰেনান বটে, কিন্তু তাহলেও উপন্যাসেৰ সাক্ষ্য থেৰে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে যে বন্ধিমেৰও শক্তিশাস চেতনা অনুরূপ খাতেই প্রবাহিত হৰিছিল। যেমন মৰাবৰ-দৰিযাৰ উপাখ্যান। জেবউন্নিসাৰ আখ্যান। জেবউন্নিসা যতক্ষণ অহংসবস্থ অন্তঃপূৰ্ণচাবী লোভেৰ, সংকাৰ্ণতাৰ এবং শক্তিদমন্ত্ৰতাৰ প্ৰতিভা ততক্ষণ সে ইতিহাসেৰ চালক এবং ইতিহাসেৰ দ্বাৰা চাৰ্ণিত বটে। যে গৃহতে জীবনেৰ আঘাতে ভাগ্য বিপয়যেৰ নিদাৰুণ দুঃখ বজনাতে তাৰ সৰণ অহংবাবেৰ, প্ৰতিপাঁও প্ৰিয় অতীপ্সাৰ মূলে টান পড়েছে—সে যেখানে চায়াৰ মেয়েৰ মতন বঁাদছে—সেখানে সে আৰ ইতিহাসেৰ ঘটনাৰ নিয়ামক জেবউন্নিসা নয়। প্রকৃতপক্ষে সে তখন সাধাৰণ নাবী। নিবৰ্ত্তমান সাধাৰণ অনুচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষকে ইতিহাস

ক্ষম করতে পারে না—যদি না বাইরের ঘটনার জাল তাব ওপৰ বিস্তৃত হয়। যেমন চন্দ্রশেখর। জেবউন্নিসাৰ কান্নার মুহূর্তে ইতিহাসের বৃহৎ দায় থেকে তার মুক্তি ঘটেছে। এটা তার মনুষ্যত্বেরও মুক্তি বটে।

টলস্টয় এবং বঙ্কিম উভয়েই ইতিহাসকে নিজ ব্যাখ্যায় আলোকিত করার পক্ষপাতী। সে ব্যাখ্যা তথাকথিত কল্পনা-শাসিত বলে তাকে ছোট কৰা যাবে না। কেননা এ-ক্ষেত্রে কল্পনা উৎকৃষ্ট মননসজ্জাত বুদ্ধিব বা অন্তর্দৃষ্টির নামান্তর নেপোলিয়নের চেহারা। টলস্টয় যেমন দেখিয়েছেন ঐতিহাসিকেবা সে বিষয়ে সকলেই কি একমত? ঐতিহাসিক প্রশ্ন বাদ দিয়েও বলা চলে যে অ্যাৰট-এব লেখা নেপোলিয়নের জীবনীতে যে নেপোলিয়নকে পাই তাব সঙ্গে বোবো-দিনোর যুদ্ধক্ষেত্রে টলস্টয়ের আঁকা নেপোলিয়নের সাদৃশ্য কোথায়? সেনাপতি কুটজভেব ভূমিকা নেপোলিয়নীয় যুদ্ধে কী ছিল তাব সঙ্গে টলস্টয়ের সিদ্ধান্ত কোন্ ঐতিহাসিকের সঙ্গে মেলে, কাব সঙ্গে মেলে না তার কি কোনো স্থিরতা আছে? আসলে এ সমস্ত ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকের অনুশাসনের মৰ্যাদা ঔপন্যাসিক সদাই মেনে চলবেন এ-বকম প্রত্যাশা কেউ কবেন না। নিজ অন্তর্দৃষ্টি তথা কল্পনায় ঔপন্যাসিক এ-ক্ষেত্রে স্বাধীন। প্রশ্ন—কতখানি স্বাধীন? ইতিহাসের সত্যে যে কাঠামো তাব ব্যত্যয় না কৰা পৰ্যন্ত স্বাধীন কতক্ষণ স্বাধীন? যতক্ষণ ইতিহাসের মূল সিদ্ধান্তগুলিকে তিনি লঙ্ঘন না কৰছেন নেপোলিয়ন ভীক্স অথবা যুদ্ধবিমুগ্ধ, কুটজভ দেশদ্রোহী এমন কোনো সিদ্ধান্ত অচল। কেননা এখানে লোক-মানব-বিধৃত সত্যকে তিনি আঘাত করলেন। সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে বলা যায় যে ঔপন্যাসিকের স্বাধীন কল্পনা ইতিহাসের বৃহৎ সত্যেব তটভূমিতে বাঁধা। নদী যেমন স্বেচ্ছাগামিনী হয়েও তটবন্দী, ঐতিহাসিক উপন্যাসের কল্পনাও তাই। সুতরাং বাজসিংহ উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা বিচাৰও হবে সেই দৃষ্টিতেই। ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় যে পদ্ধতিতে বাজসিংহ উপন্যাসের ইতিহাস-বিষয়ক ক্রটি নির্দেশ করেছেন তাতে ইতিহাসের বিষয়ে বঙ্কিমের জ্ঞান আৰো উন্নতির অপেক্ষা বাখত এ-কথা বোঝা গেল। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনাথের প্রশ্নটি খুবই সমীচীন। কবে জানা যাবে যে একটা বিষয় সম্বন্ধে ইতিহাসবেত্তাদের শেষতম কথা বলা আজই হয়ে গেল? কোনোদিনই না। কাজেই প্রশ্নটি অন্তর্দিক থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে কৰি। কী ইতিহাস বঙ্কিম পৰিবেশন করেছেন সেটা বিবেচ্য নয়—কী পদ্ধতিতে ইতিহাসের মূল সুরকে তিনি

মানব জীবনের ব্যক্তিত্বরূপের সঙ্গে মিলিয়েছেন—সেটাই বিচার্য। বলা যেতে পারে যে ঔরঙ্গজীবের সময়কাল থেকেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণাবলী সক্রিয় হতে শুরু করল। বলা যেতে পারে যে ঔরঙ্গজীবের চরিত্রের মধ্যেও সে কারণের অনেকখানি নিহিত ছিল। মনে হতে পারে যে ঔরঙ্গজীবের জ্ঞান প্রবলপ্রতাপ মুঘল সম্রাটকে যেন বেশ কিছুটা অসহায় করে অঙ্কিত করা হয়েছে কিন্তু তার জ্ঞে খ্যাতনামা ঐতিহাসিকদের উদ্ধৃতি সংগ্রহে কোনো লাভ নেই। বোরোদিনোর যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়ন এবং কুটজভ উভয়কেই মনে হবে যুদ্ধের ব্যাপারে এ দুটো লোক একেবারেই বাহুল্য। যে বিপুল জনসমষ্টি সেই প্রাস্তরে জডো হয়েছে তাদের প্রতিটি অংশের সম্মিলিত ও সমষ্টিগত চেহারাকে যেমন সেই বিপুল জনসমাবেশ চেনে না, তেমনি ঐ সেনাপতি এবং সম্রাটও চেনেন না। এব দ্বার। নেপোলিয়নকে হেয় করা হচ্ছে না। ইতিহাসেব কোনো অধ্যায়ের পরিণতি যখন ঘটতে থাকে তখন তার সুবিপুল ঘূর্ণাবেগে সে অধ্যায়ের বচয়িতারাও কেমন অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায় সেটা দেখানো টলস্টয়ের উদ্দেশ্য ছিল। ঔরঙ্গজীবকে মুঘল অন্তঃপুরে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সেভাবে বক্ষিমচন্দ্রও উপস্থাপিত কবেছেন। ঔরঙ্গজীবের প্রতিশোধাকাজ্ঞা বাজসিংহ উপগ্রাসের জনক। এই জনকেবও আর উপগ্রাসটি দুই পবিচ্ছেদ অগ্রসর হবার পর মাধ্য ছিল না যে ঘটনা প্রবাহ প্রত্যাহার করে নেয়। জেবউন্নিসা উদিপুবী প্রমুখের ব্যাপারেও তাই। একটি বিশাল সাম্রাজ্যের পতনের ব্যাপারে স্বভাবতই নানা উপাদান সক্রিয় হতে থাকবে। তারই সূত্রপাত জেবউন্নিসায় ও উদিপুবীতে। মুঘল হারেমও অন্তঃপুরের নানামুখী বিভিন্ন জটিলতার ব্যাপাবকে স্পষ্ট করে বক্ষিমচন্দ্র উপগ্রাসি-কেব কল্পনাকে কার্যকরী করেছেন। বক্ষিমচন্দ্রের প্রধান ক্রটি অবশ্যই জেবউন্নিসায়। জেবউন্নিসাকে এখনকার আলোকে বিচার না করে বক্ষিম-সৃজিত চরিত্রের পৃথক মর্যাদায় বিচার করলে ইতিহাসেব জেবউন্নিসাকে হার্বিয়ে উপগ্রাসের জেবউন্নিসাকে লাভ করা যায়। তাতে নিঃসন্দেহেই ইতিহাসের ক্ষতি।

যে রাজপুত-নীতি ঔরঙ্গজীবের সাম্রাজ্যের পতনের জ্ঞান অনেকখানি দায়ী সে রাজপুত-নীতিও ঔরঙ্গজীবের উগ্র অহং-এর ফল—বক্ষিম এই রকম বুঝেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে সম্রাটের প্রতাপাতিশায্যে ঔরঙ্গজীব বিদ্রোহীকে কিছুই সহ্য করতে পারতেন না। তিনি যোগপুরীকে দেবার্চনা করতে দিতেন কারণ তিনি সম্রাটের মহিমায় সেটা মঞ্জুর করতেন বলে। ইতিহাসের ব্যাখ্যায় যে মুঘল সম্রাটকে ধর্মাক্ষবলে পাই তাকে বক্ষিম এইভাবে রূপায়িত করেছেন। বলা যায় না

কি ইতিহাসের প্রদত্ত ব্যাখ্যাকে অমান্য না কবে বঙ্কিম মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের একটি নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন? একগুঁয়ে এবং জেদী ঔবঙ্গজীবকে, ধূর্ত ঔবঙ্গজীবকে বাজসিংহ উপন্যাসে ঠিক ভাবেই ব্যবহার করা হয়েছে। এবং নানা কিছু মধ্যে যেমন মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ অনুসন্ধান করা হয় বঙ্কিমের ব্যাখ্যায় তার কোনোটিকেই অস্বীকার করা হয়নি। বরং নেপোলিয়নের মতোই মহামান্য মুঘল সম্রাটও কেমন ইতিহাসের ক্রীড়নক সাধারণ মানুষ সেটাই দেখানো হয়েছে।

অবশ্য, বঙ্কিম সমকালীন ইতিহাসসূত্র ব্যবহার করেছিলেন, এবং সে সূত্রগুলির তৎকালীন সীমাবদ্ধতার কথাও স্বরণে রাখতে হবে।* কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য হল সেই সীমাবদ্ধতার মাঝখানেও বঙ্কিমচন্দ্র কেমনভাবে নিজ কল্পনায় বা অন্তর্দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক সত্যকে নতুন ভাবে আলোকিত করেছেন তা দেখানো। বাজসিংহে বঙ্কিমের একটি অনন্যসাধারণ ক্রটি আত্মপ্রকাশ করল এবং শেষদিকের উপন্যাসাবলীতে সে ক্রটি ক্রমশ ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। সে ক্রটি হল উপন্যাসের কাহিনীশ্রোতের মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষভাবে লেখকের অবতারণ। ঔবঙ্গজীবের অন্তঃপূর্ব বর্ণনায় উদীপুবীকে বিবাহ করার কাহিনী প্রসঙ্গে বঙ্কিমের নিজ কণ্ঠে উড়িয়াব গল্প বলা এই শ্রেণীর মহৎ দোষ। চন্দ্রশেখর প্রতাপের উদ্দেশ্যে শেষ বক্তৃতা যদিবা ক্ষমাহ, উড়িয়াব গল্পের কোনো কৈফিয়ত নেই। মিলের লজ্জিক-পড়া ছাত্রদের এবাধিগ illogical বাজের ব্যাখ্যা একমাত্র এই যে তার প্রতি পাঠকের বিশ্বাসেরও যে একটি সীমা আছে সেটা তিনি বিশ্বাস করতেন না।

●● এগারো ●●

চন্দ্রশেখর, বজনা, আনন্দমঠ, সীতাবাম প্রমুখ বঙ্কিমের অন্য সৃষ্টিগুলি সম্বন্ধে আমরা পৃথক আলোচনা করলাম না। এর কারণ এগুলিকে আমরা অনালোচ্য বলে মনে করি এমন নয়। আমরা বঙ্কিম-প্রতিভাকে প্রধানত বুঝতে চেয়েছি উপন্যাসের শিল্পশ্রুতি হিসাবে। যে চারখানি উপন্যাস আমরা আলোচনা করলাম বঙ্কিমের শিল্পী-জীবনের সম্যক শক্তির (এবং দুর্বলতার) দিক থেকে তারা প্রতিনিবিশ্চিনায়। বঙ্কিম যে কারণে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে বসন্তশ্রুতি হিসাবে

* সেক্ষেত্রে টলষ্টায়ের হাতে ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান ছিল। Segur-এর Napoleon & Russian Campaign-এর মতো পুস্তকের পূর্ণ ব্যবহার টলষ্টায় করেছিলেন।

চিরস্থায়ী মর্যাদা পাবেন সে কারণগুলির সবকটিই আমাদের আলোচিত গ্রন্থে উপস্থিত।

আমরা যা আলোচনা করলাম তার মূল কথা এই যে, বঙ্কিম ভারতবর্ষের জীবনকে, তার বহুকালগত জীবনাচরণকে নবকালের ঘাত-প্রতিঘাত সমেত উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন ও করতে চেয়েছেন। তাঁর প্রায় সকল উপন্যাসের সমস্তারম্ভের মূলে রয়েছে জীবনযাপনের মূলসূত্রগুলিতে কোনো না কোনো প্রকার ব্যতায়। বঙ্কিমের কালে এই বিষয়বস্তুর যে মূল্য ছিল তার সীমার বাইরে এসেও যে বঙ্কিমের সাহিত্যকর্মের মূল্যহানি হয়নি এর কারণ জীবনকে শেষ পর্যন্ত বঙ্কিম হু-হাতে ছুঁয়েছিলেন। মানুষের যন্ত্রণাকে, বাসনাকে, বাসনার অচরিতার্থতা-জনিত অশ্রুকে বঙ্কিম কখনও ছোট করে দেখেননি। বরং মানুষের জীবনযাপনে, কর্মে, ধ্যানে এদের প্রভাব কতখানি বস্তুত অপরিহার্য সে-কথাই বলেছেন তাঁর সৃজিত চরিত্রের মাধ্যমে। জীবনই সত্য এবং জীবনাতীত জীবনাতীতই থাকে তা নিয়ে জীবনের কোনো সাস্থ্য নেই—সচেতন ভাবে বঙ্কিম এ-কথা বলেছিলেন। তাই “তিনিই আমার ভ্রমব, ভ্রমরাধিক ভ্রমর” গোবিন্দলালের সন্ন্যাস-জীবনের এই উক্তিতে পৃথিবীর ভালবাসার অমর স্মৃতিই প্রতিধ্বনিত হয়। তাই শৈবলিনীকে ভালবাসে কি না সন্ন্যাসীর এই জিজ্ঞাসায় প্রতাপ যখন ভীমগর্জন কবে বলে ওঠে—তাহা তুমি কি বুঝবে সন্ন্যাসী—তখনও সেই জীবন-স্মৃতিই শেষবার কথা কয় প্রতাপের কণ্ঠে। জীবনকে বোঝবার অনলস বুদ্ধিদীপ্ত চেষ্টায় বঙ্কিমের শিল্প প্রচেষ্টার ও নৈতিক সচেতনতার মূল্য।

●● বারো ●●

আমরা আগেই বলেছি যে উপন্যাসের সঙ্গে তার পাঠকমণ্ডলীর সম্পর্ক নিবিড়। পাঠকের বিশিষ্ট জীবনাগ্রহের প্রভাব উপন্যাসের একটা নিয়ামক উপাদান বটে। স্ব-কাল এবং স্বায় সমাজ সম্বন্ধে পাঠকমণ্ডলীর কৌতূহলের মূলে রয়েছে নিজেরই জীবন-বিষয়ক জটিলতার নানা প্রশ্নের সচক্ৰ প্রার্থনা। যে উপন্যাস পাঠকমণ্ডলীর জীবন-বিষয়ক চেতনাব পরিপোষক সে উপন্যাস সাধারণত জনপ্রিয়। বঙ্কিমের কালে আমাদের পাঠকমণ্ডলীর জীবনাগ্রহের মূল ব্যাপার ছিল জানবার পিপাসা। জগৎ সংসারে আমাদের প্রত্যহের চেনা অভিজ্ঞতার বাইরে যা ঘটে তার জ্ঞান একটা আগ্রহ এ-যুগে পাঠকমণ্ডলীর

মধ্যে গড়ে উঠেছিল। এ-যুগের লেখকেরা উপন্যাসের শিল্পকর্মে পাঠকদের এই আগ্রহকে প্রধানত স্ফূর্ত করতে চাইতেন না। পাঠকদের এই জানার ইচ্ছাকে গড়ে তুলেছিল এ-যুগের সংবাদপত্রগুলি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ থেকে সংবাদপত্রগুলিতে পাঠকদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ একটা রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। এই আগ্রহেই প্রকৃতপক্ষে নব্যযুগের সমকালীন জীবন-বিষয়ক আগ্রহের প্রাথমিক রূপ। সংবাদপত্রের এই পাঠকমণ্ডলীই ধীরে ধীরে বাংলা উপন্যাসের পাঠকমণ্ডলীতে রূপান্তরিত হল। সেকালের নানা সংবাদপত্রে পাঠকমণ্ডলীর প্রেরিত নানা পত্র প্রকাশিত হত। পত্রগুলির অধিকাংশই প্রেরকদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখিত থাকত। দীর্ঘ উদ্ধৃতির সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে সাংবাদিক লক্ষ্য পত্রগুলির সর্বস্ব ছিল না। বহু পত্রে প্রেরকদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সমাজ সমালোচনায়, ব্যঙ্গ, কারুণ্যে শ্রীমণ্ডিত হবার প্রবণতা দেখিয়েছে এ-নিদর্শন বিরল নয়। পত্রগুলির বাহ্যিক এ-কথাও প্রমাণ করে যে পাঠকমণ্ডলীর কাছে সংবাদ সমন্বিত পত্রগুলির যথেষ্ট চাহিদা ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্লট-প্রধান উপন্যাসের জগৎ মনোভূমি রচনায় সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা নূন নয়। কিন্তু আমাদের ঔপনিবেশিক জীবনে ঘটনার চেহারায় ও প্রকৃতিতে কত বৈচিত্র্য সম্ভব? আইন আদালতাত্মক জীবন গড়ে উঠতে যে সংবাদ স্ফূর্ত উদ্রেক হল তা নিঃসন্দেহে দেখতে দেখতে বিচিত্রের চেহারা হারিয়ে ফেলে মিশে গেল বর্ণছূট আভ্যন্তরীণ দলে। উপন্যাসকারেরা উজ্জ্বল এবং আদর্শ শিল্পকর্মে সাহায্যে ঘটনাকে ব্যক্তিব সঙ্গ্রে গ্রথিত করে ব্যক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে নতুন আলোকসম্পাত করলেন। প্লট-প্রধান উপন্যাসের ঘটনাগত গাঁথুনিও ধীরে ধীরে শিল্পের দাবিকে হারিয়ে ফেলতে লাগল সংবাদ কৌতূহলের কাছে। কপালকুণ্ডলার শেষ অবধি কী হল জানতে চাওয়া শিল্প-পিপাসা নয়, সংবাদ-পিপাসা। এইভাবে প্লট-প্রধান গল্পের জের নৌকাডুবি এবং নৌকাডুবির অসুখকরণে জাহাজডুবি প্রভৃতি উপন্যাস পর্যন্ত চলেছিল।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কালেই ধীরে ধীরে অসাধারণ মানুষদের অসাধারণ ঘটনা সমন্বিত ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং সামাজিক ঘটনাবলি উপন্যাস সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া পাঠকমণ্ডলীতে জেগে উঠেছিল। স্বর্ণলতা তার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। স্বর্ণলতার লেখক তাঁর ভূমিকার স্বাভাব্য সম্বন্ধে যে খুব সচেতন ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে স্পষ্ট বিদ্রোহ ও বঙ্কিমের রচনাভঙ্গির

প্যারডিতে তার প্রমাণ মেলে। স্বর্ণলতার বৈশিষ্ট্য দুটি। এক, ঘটনাবাহুল্য পরিহাৰ, দুই, গ্রাম সমাজের ব্যাপকতর রূপাঙ্কনের প্রচেষ্টা। গ্রামের সাধাৰণ মানুষের চিত্র হিসাবে শ্যামা ও নীলকমল অবিস্মৰণীয়। লেখকের হাশ্বৰ্ষ চেষ্টনায় সমগ্র বচনাটি হীবক খণ্ডেব অন্তর্নিহিত দ্যুতির মতো আলোকোজ্জ্বল। স্বর্ণলতাব কোনো কেন্দ্রীয় লক্ষ্য না থাকায় এ কেবলমাত্র পাবিবাবিক আলেখা হয়ে উঠেছে। লেখকের মনন ও কল্পনার অভাব সে কাবণে দায়ী। বইখানির তাৎপৰ্য শুধু বঙ্কিমের সাহিত্য যুগেব বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াব প্রথম প্রকাশে। এই প্রতিক্রিয়াই ববীন্দ্র কথাসাহিত্যে প্রকাশিত হবার আগে কথা বলেছিল ছিন্ন-পত্রে। বলেছিল যে “উনিশ শতকের পোষ্যপুত্র বাঙালীব” ছবি বঙ্কিমচন্দ্র ংকে থাকলেও “চন্দ্রশেখর, প্রতাপ প্রভতি কতগুলো বড়ো বড়ো মানুষ ংকেছেন, কিন্তু বাঙালী ংকতে পাবেননি। আমাদেব এই চিবপীড়িত, বৈযশীল স্বজনবংসল, বাস্তবভিটাবলম্বী, প্রচণ্ড কর্মশীল পৃথিবীব এক নিভৃত প্রান্তবাসী শাস্ত্র বাঙালীব কাহিনী কেউ ভালো কবে বলেনি।” কিন্তু সেই নিভৃত প্রান্তবাসী বাঙালীব কথা ববীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তাব গল্পগুচ্ছে। তাঁব উপন্যাসেব কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।



রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা উপন্যাসের নবনিরীক্ষা

•• এক ••

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-সংক্রান্ত আলোচনা সাধারণত এইভাবে আমাদের দেশে শুরু হয়ে থাকে যে তাঁর কলম কবির হয়েও উপন্যাসিকের বটে। যেন রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তায় এবং উপন্যাসিকের সত্তায় একটা বিরোধ আছে। অথবা প্রতি কথায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে কল্পনার সম্পদ, তার সূক্ষ্ম লীলা সম্পর্কে আমরা বাগবৈভবের সমারোহ দেখিয়ে থাকি—যেন রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসও তাঁর কবিকীর্তিরই আর এক শাখা। এই সমস্ত তর্কমূল থেকে যাত্রা শুরু করলে সরলীকরণের সুবিধা ব্যতীত আর কোনো বৃহত্তর লাভের আশা করা যায় না। আবার বিপরীত প্রকারের বিপদও কম নয়। যেহেতু তিনি কবি কাজেই ভাবময়তার আতিশয়া, অবাস্তব আদর্শবিলাস তাঁর উপন্যাসে ঘন ঘন আবিস্কৃত হবে। গোবা এবং চতুরঙ্গ সম্বন্ধে এই বিচার-বিভ্রাটই এখানে স্থায়ী হয়ে রয়েছে। এই বিচার-বিভ্রাটগুলির কারণ এই যে সমাজ ও সভ্যতার যে পয়ায়ে উপন্যাসের জন্ম অনিবার্য হয়ে উঠেছিল সেই পর্যায়ের জীবনাগ্রহেব বিশিষ্ট চেহারা সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই। উপন্যাস আলোচনা যে কেবল গল্প-চরিত্র এবং প্লটের গাঁথুনির বিবরণী প্রদান নয়—জীবনের নিবিড় সম্পর্কে বিশিষ্ট শিল্প বলেই সমাজ এবং সভ্যতার বিভিন্ন আকর্ষণ ও চাপের প্রশ্নটা উপন্যাস আলোচনার ক্ষেত্রে অপরিহার্য, স্থগের বিষয় বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে ধীরে ধীরে সে বোধ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে বিশিষ্ট আগ্রহ তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে তার আলোচনার ভিতরেই রবীন্দ্র-উপন্যাস পাঠের ভূমিকা

প্রস্তুত হবে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য-বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থে একস্থানে বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবনী শক্তি দুর্বল ছিল। এ কথার উত্তর আমরা গোরা উপন্যাস আলোচনাকালে দেবার প্রয়াস পাব। আপাতত কার্যারম্ভকারী অনুমান সূত্র হিসাবে আমরা কথাটা মেনে নিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যটাই এখানে। ঘটনা ব্যতীত বঙ্কিম অগ্রসর হতে পারতেন না। ব্যক্তি এবং ঘটনার পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় উপন্যাসের গতি নির্ভরশীল—বঙ্কিম এ-রকম ধারণার পোষকতা করতেন। সেই জগৎ তাঁর শেষ দিককার সৃষ্টিতে ব্যক্তিত্বের সমস্যা অপেক্ষা ব্যক্তির সমস্যাই প্রধান হয়ে উঠেছিল। অবশ্য ঘটনা ব্যতীত রবীন্দ্রনাথও (এমন কি জেমস জয়েসও) অগ্রসর হতে পারেন না। অথচ সে ঘটনার চেহারা অন্য। রবীন্দ্রনাথ বৌ ঠাকুরানীর হাট থেকেই ক্রমশ এই ঘটনানির্ভর উপন্যাসিক পদ্ধতিকে পরিহার করতে সচেষ্ট হন। রাজসিঁতে ঘটনানির্ভরতা থাকলেও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব জীবন-বিষয়ক চিন্তা আশ্রয় আশ্রয় স্পষ্ট হচ্ছিল সে-কথা সহজেই বোঝা যায়। চোখের বালিতে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস যাত্রার প্রকৃত ধারম্ভ। আমাদের সূত্র অনুযায়ী চোখের বালি তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ রচনা। চোখের বালির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নিজ শিল্পাদর্শের কিছুটা ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন :

সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা-পবস্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাঁদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।

অর্থাৎ মানুষের অন্তরাঙ্গার প্রতিফলনই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্তরবাসী মানুষকে যিনি জানেন-চেনেন তিনি যে মানুষের সমগ্র সত্তাকেই উপলব্ধি করেন তাই নয়, তিনি সর্ববোধে আংশিকতা-দৃষ্ট মানুষের চিত্রাঙ্কন পরিহার করে চলেন। মানুষ মনোময় নয়, দেহময় নয়, অন্নময় নয়—এমন কি মানুষ আত্ম-সর্বস্বও নয়। সমগ্র সত্তার প্রতিফলনই কাম্য। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-বিষয়ক নানা আলোচনায়—বিশেষ জোড়ার সাহিত্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এ সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় মত ব্যক্ত করেছেন। গোতীয়ের মাদ্রোয়াজেল দু মোপ্যা প্রসঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ এ-জাতীয় আংশিকতার ত্রুটি দেখিয়েছেন। বলেছেন :

গ্রন্থটির রচনা যেমনই হোক তার মূলতত্ত্বটি জগতের যে অংশকে সীমাবদ্ধ করেছে সেটুকুর মধ্যে আমরা বাঁচতে পারিনে। গ্রন্থের মূল ভাবটি হচ্ছে

একজন যুবক হৃদয়কে দূরে রেখে কেবলমাত্র ইঞ্জিয়ার দ্বারা দেশদেশান্তরের সৌন্দর্যের সন্ধান করে ফিরছে। সৌন্দর্য যেন প্রস্ফুটিত জগৎ-শতদলের উপর লক্ষ্মীর মতো বিরাজ করছে না, সৌন্দর্য যেন মণিমুক্তার মতো কেবল অন্ধকার খনি গহ্বরে ও অগাধ সমুদ্রতলে প্রচ্ছন্ন, যেন তা গোপনে আহরণ করে আপনার ক্ষুদ্র সম্পত্তির মতো রূপণের সংকীর্ণ সিন্ধুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখবাব জিনিস। এইজন্য এই গ্রন্থের মধ্যে হৃদয় অধিকক্ষণ বাস করতে পারে না।

স্বতবাং শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের জগৎ-বিষয়ক চেতনায় যে সমগ্রতার সন্ধান আমরা অপরিহার্যভাবে লক্ষ্য করে থাকি রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সেই চেতনাই উপস্থিত ছিল। কোনো নাম বা উপাধির আবরণে মানুষকে খণ্ড কবে দেখা তাঁর শিল্পী স্বভাবে ছিল না। আমরা যে অসীম অনন্ত প্রভৃতি বাক্যচ্ছটা রবীন্দ্রকাব্য প্রসঙ্গে সময়ে অসময়ে ব্যবহার কবে থাকি—সম্ভবত সমালোচনাকে ভারী দেখানোব চেষ্টায়—সেখানেও রবীন্দ্রনাথের অখণ্ড জীবন চেতনার প্রেরণা বা আকর্ষণই প্রধান কথা। এই সমগ্রতা-সন্ধানী শিল্পীমানস উপন্যাসেও মানুষকেই খুঁজেছে সমগ্রভাবে। সেই জগৎই মনুষ্য সমাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সজীব চেতনা গোটা মানুষকে খোঁজাব কাজে রবীন্দ্রনাথকে সদাই সাহায্য কবেছে। “চতুর্দিগবর্তী মনুষ্য সমাজ তার সমগ্র উত্তাপ প্রয়োগ করে আমাদের প্রত্যেককে প্রতিক্ষণে ফুটিয়ে তুলছে”—এ বিশ্বাসকে রবীন্দ্রনাথ শিল্পীর দৃষ্টিতে পরীক্ষা কবেছেন তার উপন্যাসে। “মানুষের লক্ষ লক্ষ সম্পর্ক সূত্র আছে—যার দ্বারা প্রতিনিয়ত আমরা শিকড়েব মতো বিচিত্র রসাকর্ষণ করছি”—তাকে পরিচয় করা, এক কথায় সে সম্বন্ধে সচেতন থাকা সাহিত্যের কাজ বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। স্বতবাং সমাজ এবং সভ্যতার গোটা চেহারাকে এবং গূঢ়ার্থকে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ধরতে চেয়েছেন এটা স্বাভাবিক।

তাই বঙ্কিমের উপন্যাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পৃথক পথগামী। বঙ্কিমের কার্য-কারণ পরম্পরা রবীন্দ্রনাথে পৃথক অর্থবহ। বঙ্কিমের চরিত্রচিন্তা রবীন্দ্রনাথের চরিত্র-চিন্তা এক নয়—ব্যক্তি-স্বরূপের সমগ্রতা সন্ধানের চেষ্টায় সে চিন্তা স্বতন্ত্র। কারণ বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনের মানেও ছিল পৃথক। স্বাভাবিক, দুজনে উত্তীর্ণ হতেও চেয়েছেন স্বতন্ত্রভাবে—দুজনের গ্রাম অনুসারে। তাই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের বহির্লক্ষণ মিলিয়ে সমস্ত উপন্যাসগুলির সাধারণ সূত্র

আবিষ্কার করতে যাওয়া হচ্ছে। এভাবে শুধুই অগ্রামজিক কতকগুলি বাইরের কথা বলা যায় মাত্র। হয়তো বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবনী শক্তি দুর্বল। হয়তো বলা যায় গোবা বডো বেশি তार्কিক উপন্যাস। প্রশ্ন করা চলতে পারে রবীন্দ্রনাথের নায়ক-নায়িকাবা ওই গল্পে কথা বলে কেন, যে গল্প সদাই মনে হয় রবীন্দ্রনাথের গল্প? কিন্তু যে-কোনো জিজ্ঞাসু পাঠকই জানেন এ-সবের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের প্রচণ্ড টানকে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই তাঁরা যথাসম্ভব শীঘ্র বহির্লক্ষণগুলির উল্লেখ কবেই বিপরীতার্থক বাক্যে সেগুলিকে আবার সামলে নিয়েছেন।

চোখের বালি, গোবা, চতুর্ভঙ্গ এবং যোগাযোগ এই চারখানি প্রধান উপন্যাসের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-সাহিত্য আলোচনা কবলে আমাদের স্থিবীকৃত পূর্ব-সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয় যে, তিনি অথও মানুষকে উপন্যাসে ধারণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি জানতেন যে ব্যক্তি-মানুষের জীবন আগন্ত একখানা জীবন। একটা ঘটনা শুক হবার পব থেকে সে জীবন উপন্যাসিকের কাছে আগ্রহোদ্দীপক হয় না। জীবন আগন্ত সমগ্রতাকে নিয়ে উপন্যাসিকে আকর্ষণ কবে। তাই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে জীবনের যে প্রচণ্ড টান অনুভূত হয় তা কদাচ বাইরের ঘটনার সাহায্যে উদ্দীপিত ব্যাপার নয়। জীবন-চরণের প্যাটার্নের মধ্যেই সে টানের বীজ নিহিত থাকে। বঙ্কিমের উপন্যাসে আমবা ঘটনার ঘোড়ায় চেপে নায়ক-নায়িকাকে উপস্থিত হতে দেখি। সেই ঘটনার পূর্ববর্তী জীবনটা উপন্যাসিকের পক্ষে অতীত। এবং যেন অতীত বলেই উপন্যাসের পক্ষে তা বাহুল্য এবং অপ্রয়োজনীয়। নগেন্দ্রনাথ এবং গোবিন্দলালের অতীত ইতিবৃত্ত আমবা জানি না। তাদের শিক্ষা-দীক্ষার বা জীবন সম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গির কোনোও খবর আমবা বাখি না, বাখলেও কী ভাবে কোন্ বাস্তব পরিবেশের চাপে তারা গড়ে উঠেছে তাও আমবা জানি না। ভ্রমব বলেছে বটে যে তার শিক্ষা গোবিন্দলালের কাছে—কিন্তু সেই শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ কী ভ্রমের আচরণে তাব পরোক্ষ প্রমাণ মিললেও গোবিন্দলালের কাছে তার কোনো প্রত্যক্ষ সমর্থন নেই। নাট্যধর্মী বঙ্কিম উপন্যাসে উপন্যাসের অতীতে যেন কোনো ঘটনা ঘটে না। অথচ চোখের বালির মহেন্দ্রর জীবনে এবই বিপরীত প্রকরণ লক্ষ্য করা যায়। মহেন্দ্রর জীবনের যে সংকট তাব মূল মহেন্দ্রর জীবনের মধ্যেই। সে যেভাবে গোটা জীবনটা এ পর্যন্ত (উপন্যাসের কাল পর্যন্ত) কাটিয়ে এসেছে, যা সে পেয়েছে, বিশ্বাস করেছে,

সেই গোটা জীবনব্যাপী আচরণ মনন এবং চিন্তার মধ্যেই তার বিপদের জট
লুকিয়ে ছিল। | গোরা জন্মাবধি ধীরে ধীরে যা হয়ে উঠেছে বা হয়ে উঠতে

চায় তার সংঘর্ষ এবং প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে অপরের সঙ্গে তারাও যা হয়েছে
বা হয়ে উঠতে চায় তার সঙ্গে। যোগাযোগের কুমুর ক্ষেত্রেও ঘটনা কিছু
নেই। সে যা আশৈশব, তার সঙ্গে আর একজনের আশৈশব জীবনধারা
মিলছে না। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে জীবনটাকে কেটে নিয়ে তা
থেকে একটা টুকরোব ওপরে উপন্যাসের শিল্পকর্মকে রবীন্দ্রনাথ দাঁড় করাননি।

সে কারণে রবীন্দ্রনাথের নায়ক-নায়িকা পরিকল্পনার স্বতন্ত্র পদ্ধতিও স্ববর্ণীয়।
বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক কল্পনার ক্ষেত্রে যে বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথ সে
ক্ষেত্রেও তাঁর বিপরীতগামী। বঙ্কিম বিষয়বস্তুর অসাধারণত্বের ওপর নির্ভরশীল
ছিলেন বলেই নায়ককূলকে উচ্চশ্রেণীর জীবন থেকে আহরণ করলেও তাদের
অসাধারণ করে গড়ে তুলতেন না। হত্যা, যুদ্ধ, নদীতে ঝাঁপ প্রভৃতি অসাধারণ
কার্যাবলীর অন্তর্গত। তারা হলেও মানুষ হিসাবে তারা সাধারণ মনন-চিন্তনের
উর্ধ্বে নয়। বঙ্কিমের উপন্যাসের মননশীলতাজনিত সুসমতার আলোচনায়
এ-কথা আমরা স্কারণ ব্যাখ্যা কবেছি। হত্যা, যুদ্ধ, নদীতে ঝাঁপ রবীন্দ্রনাথের
নায়কদের নেই। তাঁর নায়কেবা অসাধারণ কার্যাদির স্রষ্টা নয়। কিন্তু মানুষ
হিসাবে তারা কেউ সাধারণ মনন, সচরাচর অনুভূতির মানুষ নয়। চোখের
বালির মহেন্দ্র ছাড়া, গোরা, কুমু, শচীশ, নিখিলেশ এমন কি যদি ধরতেই
হয় অমিতও বুদ্ধি, অন্তর্দৃষ্টি, কল্পনাব মননে রীতিমতো অগ্রসর মানুষ। এরা
কেউ সাধারণ মানুষ নয়। চোখেব বালিব প্রধান চরিত্রদ্বয়ের মধ্যে বিহারী-
লাল আর বিনোদিনী এই অগ্রসর মানুষের পর্যায়ে পড়ে। মহেন্দ্র-আশা
দম্পতিই শুধু ব্যতিক্রম। তা বলে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে অসাধারণ মানুষের
মেলা বসে যায় না। এমন আশ্চর্য আভাবেজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করতে
পারেন যাব তুলনা একমাত্র রবীন্দ্র সাহিত্যেই। বিনয়, মহেন্দ্র, শ্রীবীলাস,
এদের কথা এ প্রসঙ্গে স্ববর্ণীয়।

নায়ক পরিকল্পনার এই বিশিষ্টতায় রবীন্দ্রনাথের জীবনাগ্রহের বিশিষ্টতা
প্রতিফলিত। একটা গোটা জীবনের সমগ্রতার পটভূমিকায় যখন ভিতর
এবং বাইরের চাপ নানা দিক থেকে অস্তিত্বের মূলে-স্থূলে টান সৃষ্টি করে,
তখন সেই অস্তিত্বের যন্ত্রণায় শুদ্ধতাকাজক্ষী জীবনেই রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ।
বৃহৎ ঘটনার এজ্ঞা কোনোও অবগুস্তাবী প্রয়োজন নেই। কিন্তু সেই মনের

প্রয়োজন, যে মন সাড়া দিতে পারে সহজে। যে-মন নিজেকেও পরীক্ষার মধ্যে ফেলে নিবিষ্ট নিরীক্ষায় রত হতে পারে। যে-মন সমাজ-সংসারের জটিল অঙ্ক-রাশির মধ্যে নিজেকে একটা রাশি হিসাবে জেনেও গাণিতিকের মীমাংসামুখী শুদ্ধ নিরাসক্তির অধিকারী হতে পারে, আবার কখনও ঝটিকা-দীর্ঘ সমুদ্রের বুকে কূল-সন্ধানী নাবিকের মতো উদ্বেগক্লান্ত কিন্তু স্থির কম্পাস-লক্ষ্য হতেও সেই মন প্রস্তুত। কেননা এই মন বাতীত অস্তিত্বের ঐ যন্ত্রণাকে ধারণ করা সম্ভব নয়। খুব সাজানো বা মাপাজোখা পদ্ধতিতেও যখন রবীন্দ্রনাথ এ-রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন তখনও এক ধরনের সাফল্য অর্জন করেছেন যার মূল্যও একান্ত কম নয়। ঘরে বাইরের নিখিলেশ চরিত্র এর একটা বড়ো নিদর্শন। নিখিলেশ নিজেকে যে নিরীক্ষার মধ্যে স্থাপিত করেছে তার শিল্পমূল্যকে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত গভীর করে তুলতে না পারলেও যে পদ্ধতিতে তিনি নিখিলেশকে বারে বারে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন তা যথেষ্ট ইঙ্গিতবহু। তিনি এখানে নায়কের সমস্ত মানসিক টানাপোড়েনকে মোটা ও সূক্ষ্ম নানা ঝংকারে নানাভাবে রূপময় ভাবময় কবে তুলেছেন। ঘটনার জোর বা সমর্থনের জন্য পুর্বনো পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস নেই।

তাই বলে এ-কথাও আবার ঠিক নয় যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ঘটনার কোনো ভূমিকা নেই। এখানে ঘটনারও মানে রবীন্দ্রনাথের উপকরণ এবং রূপায়ণের মধ্যেই খুঁজতে হবে। ঘটনা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে স্থূল অর্থে কিছু ঘটে যাওয়া নয়। ঘটনার অর্থ এখানে এই . যে-ব্যক্তি যে-জীবন বিচারের অন্তর্ভুক্ত সেই জীবন বিচারে অপর একটা ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষে সুগভীর একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ঘটনা এবং নাটক দুই-ই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এই পথে প্রবেশ করে থাকে। সূচরিতা এবং গোরার প্রেমের বিষয়ে দেখা যায় যে উভয়ে উভয়ের মর্মের গভীরে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তা প্রেমের গল্পের প্রেমজ্ঞ আলোড়ন নয়। এ আলোড়নের উৎস উভয়ের ব্যক্তিত্বে—যে ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে তাদের নিজেদেরই ব্যক্তি জীবনের নানা কিছুব সমাহারে ও প্রতি-ক্রিয়ায়। প্রেম, রিরংসা, স্নেহ-ভালবাসা কোনো কিছুকেই রবীন্দ্রনাথ কেবল স্বাধীনা প্রবৃত্তি বলে ব্যাখ্যা করে ছেড়ে দেননি। বা এদের আকস্মিকতার কোনো সুষোগ তিনি উপন্যাসে গ্রহণ করেননি। সমস্ত প্রবৃত্তিকে তিনি সমগ্র ব্যক্তিত্বের পটে রেখে পরীক্ষা করার পক্ষপাতী ছিলেন। সে কারণে এ জাতীয় উপন্যাসে যা হওয়া স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতা অনুসারে স্নেহ-

ভালবাসা-প্রেম-ঈর্ষা সব কিছুই বিশিষ্ট বলে এরা সদাই আগ্রহোদ্দীপক হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য গল্প এবং গাঁথুনি বা প্লটের ওপর এ-আগ্রহ নির্ভর করে নেই। এ-কৌতূহল বা আগ্রহ সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিত্বের মুখাপেক্ষী। নায়ক নায়িকার ব্যক্তিত্বের সমস্তাই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের সমস্তা। নিখিলেশের পরিস্থিতিতে নিখিলেশ যে-কোনো স্পষ্ট উপসংহার জোর করে টেনে দিতে পারে না সেটা নিখিলেশের ভীকতা নয়। ভীক চরিত্রের ব্যক্তি নায়ক হলে উপন্যাসে কী পরিস্থিতি সৃজিত হয় এটা রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষার বিষয় নয়। কোনো বহিরারোপিত উপসংহার সৃজনে নিখিলেশের বিমুখতা নিখিলেশের ব্যক্তিত্বের ফল। যে বিশিষ্ট চিন্তায় এবং ভাবনায় সে নিখিলেশ হয়ে উঠেছে সেই নিখিলেশই অনুরূপ উপসংহারের প্রতিবন্ধক। কুন্দনন্দিনী বিষ খেতে প্রথম থেকেই প্রস্তুত ছিল না। সে কেমন করে বিষ খেল অথবা ভদ্র-শাস্ত্র গোবিন্দলাল কেমন করে হত্যাকারী হল এটা বন্ধিমের গল্প। বন্ধিমকে মেনে চলতে হয়েছে ঘটনা এবং চরিত্রের পরস্পর প্রতিক্রিয়ার লজিক। রবীন্দ্রনাথকে মেনে চলতে হয়েছে পুরো ব্যক্তি মানুষটার জায়। এবং সেই জায় ক্রমানুসারে রবীন্দ্রনাথের নায়ক-নায়িকাদেরও একটা কিছু হয়ে ওঠা আছে। তা নইলে গোরাব উত্তরণকে কী বলে ব্যাখ্যা করা যাবে। কিন্তু এই হয়ে-ওঠার সম্মুখের বাধাগুলি, পিছনের পিছুটানগুলি বাইবে কোথাও বিশেষ নেই। বাধা এবং পিছুটানগুলো মানুষটার ব্যক্তিস্বরূপে। সাধারণ মানুষ হলে গোরার স্ফূর্তিতাকে গ্রহণ করতে বা কুমুর মধুসূদনের সঙ্গে কোনো একটা মীমাংসা করে ফেলতে বেশি সময় লাগে না। ব্যক্তিস্বরূপের বনিয়াদ এদের জীবনে এত বেশি বলিষ্ঠ-ভিত্তিক যে সে-জাতীয় প্রশ্ন ওঠেই না। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে সে কারণে রবীন্দ্রনাথ এক অগ্ৰতর শক্তি যিনি খুব অল্প উত্তরসূরী সৃষ্টি করতে পারলেন। তাঁর বাকসম্পদের অনুকারী অনেক, তার নায়ক-নায়িকাদের মতো ভঙ্গিও অনেক, কিন্তু এগুলিকে বাদ দিয়েও যা থাকলে বাংলা উপন্যাসে রবীন্দ্র সাধনা সম্পূর্ণ হত, নেই সেই বলিষ্ঠ বুদ্ধিদীপ্ত গরীয়ান উত্তরাধিকার।

থাকা সম্ভবও নয়। কেননা রবীন্দ্রনাথই বাংলা দেশের সর্বপ্রথম সেই লেখক (পরবর্তীকালে উপন্যাসে অন্নদাশঙ্কর এবং ধূর্জটিপ্রসাদ এবং কাব্যে স্বধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে মহাশয়ের কথা বলা চলে) যিনি স্পষ্ট অর্থে নাগরিক মনের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। এ-নাগরিকতা কলকাতা শহরের ইট-কাঠ-পাথর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি শিক্ষা থেকে সংগৃহীত হয়নি। এ-নাগরিকতা নগরবাসী

ভদ্রলোক শ্রেণীর কতকগুলি মানসিক বন্ধিমতাও নয়। সৌন্দর্য ও ক্রটিবোধ, মানসিক সাহস এবং মানুষের সম্ভার বন্ধনহীনতাকে অঙ্গীকার এ-নাগরিকতার একদিকে, আর নিয়ত অগ্রসরতা এবং সভ্যতা সম্বন্ধে সদাজাগ্রত চেতনা এর আর একদিকে। মানুষের সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে নগর-জীবনের ক্রমবৃদ্ধির একটা যোগ আছে। সৌন্দর্যের উপকরণ এবং প্রকরণ যাই হোক না কেন সৌন্দর্য সৃষ্টির মৌল প্রেরণায় জনপদের জীবন নানাভাবে সাড়া তোলে। সারা দেশটা যখন গ্রামীণ কাঠামোয় গাঁথা—সামন্ত-কেন্দ্রিক সে জীবনে সৌন্দর্যের জিজ্ঞাসা স্বাধীন হতে পারে না। যখন গ্রামীণ কাঠামোয় আঘাত পড়ে নানা দিক থেকে তখনই জীবনের দ্বন্দ্বিক চেহারা ধরা পড়ে ধ্যানী মননে। এখানেই সৌন্দর্য বোধের স্বাধীন ছন্দিত বিকাশের প্রারম্ভ। আমরা আগে বলেছি (বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্ন অধ্যায়ে) যে এ-দেশের নগর-জীবন, শিল্প-যুগে রূপান্তরের ঐতিহাসিক অনিবার্য নিয়মে গড়ে ওঠেনি। গড়ে উঠেছে কলোনি গডার তাগিদে। ফলে এ-দেশে গ্রামীণ কাঠামোর পূর্বনো কঙ্কালখানা রয়ে গেল ঠিকই—নতুন জীবনবোধকে স্বীকরণের চেষ্টায় বইল নানা ব্যাঘাত। প্রতিভার নিজস্ব নিয়মে এই জীবনাবস্থা ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের হাতে, জীবনের সমস্ত হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিস্তৃত দেশপটের ব্যবহারও তিনি কবেছেন এই প্রসঙ্গেই। পুরনো জীবনের গ্রামীণ জট এবং আধুনিক ভারতবর্ষের বামন চেহাবার অপূর্ণ নাগরিক জট—এই দুয়ের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রাগ্রসব নায়ক-নায়িকাদের আমরা সদাই দেখি যন্ত্রণা-মথিত। নিখিলেশ, কুমু এবং গোরা তার উজ্জ্বল এবং অভ্রান্ত নিদর্শন।

আসলে যন্ত্রণাটা যে অনুভব করছে সে তো অনুভব করছে খণ্ডায়নের যন্ত্রণা। তার মনের মধ্যে কোথাও একটা অভ্রান্ত পূর্ণতার বা সমগ্রতার আদর্শ আছে বা তাকে উপলব্ধি করার সক্রিয় প্রচেষ্টা আছে। বহু ভগ্নাংশ পবিকীর্ণ জীবনের মাঝখানে পূর্ণমানের বোধ যার আছে তার যন্ত্রণাই খণ্ডিত চতুষ্পার্শ্বের যন্ত্রণার রূপ-কে যথার্থ আলোকিত করে। সে যন্ত্রণাকে ঐ খণ্ডিত চতুষ্পার্শ্ব ঠিকভাবে চেনে না। এ-কারণেই দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের সমুদয় নায়ক-নায়িকা নাগরিক। এবং ঘরে বাইরে ছাড়া কলকাতা হল তাঁর সকল উপন্যাসের ঘটনাস্থল। তার মানে কিন্তু এ নয় যে গ্রামের মানুষকে তিনি ব্যবহার করেননি। প্রয়োজন হলে এ ব্যাপারে তিনি মোক্ষম উদাহরণ ব্যবহার করতে পারেন। হরিমোহিনী এবং কৈলাস তার প্রমাণ। গল্পগুচ্ছের অসংখ্য সৃষ্টি না

হয় এ-প্রসঙ্গে ছেড়েই রাখলাম। তথাপি তাঁর নাগরিক নায়ক-নায়িকার সংখ্যাধিক্য আমাদের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছে যে আধুনিক ভারতবর্ষের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতার ব্যাপারটি তিনিই যথার্থ অনুধাবন করেছিলেন।

•• দুই ••

সে-কারণেই, এই মননদীপ্ত অন্তর্দৃষ্টির প্রসাদেই তাঁর উপন্যাসের কাঠামোতেও যথেষ্ট শিল্পী সংযম। মানুষের অন্তরাত্মাকে, ঘটনার “আঁতের কথাকে” টেনে বের করার কাজ উপন্যাসিকের এ-কথা তিনি বলেছিলেন বটে, কিন্তু তাই বলে মনস্তাত্ত্বিক লেখক হতে গিয়ে তিনি কদাচ এক দল মনশ্চিকিৎসকের গবেষণার বিষয়ে উপন্যাসে জড়ো করেননি। দেহে-মনে সুস্থ ব্যক্তির কথাই বলেছেন। উপন্যাসের সংস্থানগত সৌন্দর্যের বিষয় সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন এই মনোভাব থেকেই। তাঁর উপন্যাসের কাঠামো বিজ্ঞানের দোষগুণের বিচারও হবে সেই মনোভাবের প্রসঙ্গেই। কবি এবং উপন্যাসিকের বিরোধের ব্যাপারটিরও মীমাংসা হবে এই পথেই।

পূর্ব পরিচ্ছেদে কথিত কারণে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো, কাঠামো বিশ্লেষণ সম্ভব নয় এ-কথা পাঠক মাত্রই উপলব্ধি করেন। উপন্যাসের তাৎপর্য সম্বন্ধে দুই লেখকের পৃথক চিন্তার জগতই এটা সম্ভব নয় আশাকরি সে কথাও আমরা পরিক্ষা করে বলেছি। তথাপি কয়েকটি সাধারণ সূত্র রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেরও আছে। যেমন ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বন্ধুদের ভূমিকা। এ ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত। বিনয়, বিহারী, শ্রীবীলাস এবং যোগাযোগের নবীন এর প্রমাণ বটে। এই বন্ধুবর্গের অধিকাংশের ভিতরেই একটা সাদৃশ্য বিদ্যমান। এদের ব্যবহারে তাদৃশ প্রচণ্ডতা নেই, নেই সকল ঘটনায় প্রবল ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হবার শক্তি। এরা যাদের বন্ধু—যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নায়ক—সে তুলনায় গোরার মতোই প্রবল। কিন্তু তাই বলে লক্ষ্য করার বিষয় যে, এই বন্ধুরা শ্রীকান্ত-ইন্দ্রনাথের শ্রীকান্তের মতো কেবল ইন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী নয়। নায়ক বন্ধুরা যতই প্রবলচরিত্র হোক না কেন তাতে তাদের স্বকীয়তাটুকু হারিয়ে যায় না। গোরার জন্ত বিনয়কে আমরা হারিয়ে ফেলি না। সীমিত পরিসরে হলেও বিনয়ের ব্যক্তিত্ব বিনয়ের নিজের। গোরার সঙ্গে মতানৈক্যে এবং ঐকমত্যে সে নানাভাবে স্পষ্ট। এমনই নবীন, এমনই শ্রীবীলাস। এবং এরা কেউই পথের দাবির সবাসাচীর কাছে অপূর্বের মতো মাত্র নেতিবাচক

একটা উপস্থিতি নয়। সব্যসাচী যা অপূর্ব তা নয়—এই ধরনের বিচিত্র বৈপরীত্য বোঝানোর জন্য রবীন্দ্রনাথের পাত্রপাত্রীরা কেউই কখনো ব্যবহৃত হয়নি। বিনয়ের গুণাবলীর সাহস গোরার থেকে ন্যূন কি অধিক এ প্রশ্নের ওপরে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-সাহিত্যের মীমাংসা হবে না। বরঞ্চ বিনয়কে আপনার আমার মনে হতে পারে অনেক স্বাভাবিক। অনেক সময়ই আমরা গোরা এবং বিনয়ের যুদ্ধে বিনয়ের পক্ষাবলম্বন করে থাকি। এখানেও আগেই বলেছি ব্যক্তি-পুরুষ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণাই কার্যকরী হয়েছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ব্যক্তি-জীবনের প্যাটান থেকেই উপন্যাসে চলে ফেরে, ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, প্রভাবিত হয় এবং প্রভাবিত করে। সেখানে গোরার চলাফেরা একরকম এবং বিনয়ের চলাফেরা আর একরকম। এখানে আর একটা ব্যাপারের দিকে আমাদের দৃষ্টি না পতিত হয়ে যায় না যে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গে পরিবেশের ত্রায়কে স্বীকার করেও, কী ভাবে ব্যক্তিত্বের নিজস্ব ত্রায়কেও মর্যাদা দিয়েছেন। বিনয় গোরার সঙ্গে আশৈশব অতিবাহিত করলেও সে গোরার নিকল্প নয় কখনই।

সেই কারণে ব্যক্তিত্বের মুখাপেক্ষী উপন্যাসে কাঠামোর প্রশ্নটা অনেকখানিই গৌণ। এটার দায় রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের ওপরে চাপিয়ে যারা নিশ্চিন্ত থাকেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের প্রতি যে পরিমাণে অন্ধাশীল সে পরিমাণে তাঁর সমগ্র জীবনের সাহিত্যকর্মের মূল সূত্র সম্বন্ধে সচেতন নন। তা না হলে তাঁরা দেখতে পেতেন যে আমাদের শ্রেষ্ঠ রোমাঞ্চিক কবি কেমন করে আমাদের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবাদী উপন্যাসের জনক হন। বুদ্ধদেব বসু “রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য” শীর্ষক গ্রন্থে বলছেন :

তাহলে মোটের ওপর দাঁড়াচ্ছে কী? দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ কবি আর কথানিশ্চীনের সম্পূর্ণ সঙ্গতি ঘটাতে পারেননি—এত বড়ো কবির কাছে সেটা আশা করাও অশ্রুয় হয়। দুয়ের বিরোধে ক্ষতি হয়েছে উপন্যাসের, কবিত্ব যখন দমিত হয়েছে তখন এসেছে নোকাড়ির কৃত্রিমতা, আর যখন প্রশ্রয় পেলে তখন দোঁখ ঘরে বাইরের আতিশয্য। শেষের কবিতার বিষয়বস্তুতে যথার্থ্যের অভাব। আবার সেই সঙ্গে এও দেখি যে তাঁর কথাসাহিত্যের একটি বড়ো রকমের প্রতিপত্তির কারণই তাঁর কবিত্বগুণ।

হুঃখের বিষয় এর কোনোটাই সত্য নয়। বুদ্ধদেববাবুর মতো সুরসিক কবির বিচারে যে এ-জাতীয় ভ্রান্তি দেখা দেয় তার কারণ সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন

শাখাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিশ্লিষ্ট করে দেখার প্রচেষ্টা। প্রথাবদ্ধ আলোচনাসমূহেই এ-ক্রটি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু বুদ্ধদেববাবুদের কাছে স্বভাবতই আমাদের প্রত্যাশা একটু ভিন্ন থাকে। উক্ত অমুচ্ছেদাংশের সমস্ত মন্তব্যগুলি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তবাচক।

এক ॥ “ববীন্দ্রনাথ কবি আর কথাশিল্পীর সঙ্গতি ঘটাতে পারেননি।” কথাটি হবে সম্পূর্ণ বিপবীত। কবি হিসাবে তাঁর লক্ষ্য বিষয়ের আন্তর সত্তাকে বিষয়ীর নিজের গ্ৰায়ে আবিষ্কার, ঔপন্যাসিক হিসাবেও তাঁর লক্ষ্য বিষয়-ব্যক্তি-ঘটনার অন্তরকে নিজ মননের গ্ৰায়ে প্রতিফলিত করা। একই লক্ষ্যের পদ্ধতি কাব্যে কবির গ্ৰায়ে, উপন্যাসে ঔপন্যাসিকেব গ্ৰায়ে। তাঁর সারা জীবনের সাহিত্যকর্মের মূল সূত্রই হল জগৎ-জীবনের সমগ্রতাকে শুদ্ধভাবে ধারণ। এই প্রয়াসে একমাত্র অন্তর্দৃষ্টিই তাঁর সহায়। কবিত্ব বা ঔপন্যাসিকত্ব এ সমস্ত একেবারে এ প্রসঙ্গে বাইরেব কথা। এই অন্তর্দৃষ্টি বুদ্ধদেববাবু গ্ৰাযতই বলতে পাবেন কল্পনা। কিন্তু এ-কল্পনা বিষয়ান্তবঞ্জিনী নয়। বিষয়-স্বরূপ উন্মাদিনী। ববীন্দ্রনাথ যে versatile হবার জন্মই কখনও ছবি, কখনও গান বা কখনও গল্প, কখনও উপন্যাসে হাত দেননি, তাঁর কোনো কিছুই যে একটা কিছু হয়েও আব একটা কিছু হবার জন্ম নয়, জানি না এ-কথা আমবা কবে বুঝব। কবে বুঝব শিল্পসূত্রে জীবনের সমগ্র নিহিত শুদ্ধ স্বরূপকে ধারণ কবাব যন্ত্রণাবেগেই তাঁর বাব বাব সমুদ্রাভিযান এবং সে সমুদ্র জীবন? তাঁর উপন্যাসেব ক্রটি আবিষ্কারে এই যে সবলীকরণ—কবি আর কথাশিল্পীর অসঙ্গতি—এব উদ্ভব হচ্ছে ঔপন্যাসিক হিসাবে ববীন্দ্রনাথের জীবন-দৃষ্টিকে না বোঝা থেকে। ব্যক্তির জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে তাব অস্তিত্বের যে যন্ত্রণা—সেটাকে সমাজ সভ্যতা নিরপেক্ষ ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। ববীন্দ্রনাথ সেই শুদ্ধতাকাজক্ষী যন্ত্রণাকে উপন্যাসে ধবতে চেয়েছেন। তাই বুদ্ধদেববাবু যখন বলেন—“ভিতবকাব কবিটি যাতে প্রশ্রয় পায়, কবিত্ব সহযোগী হয় কথাশিল্পে” তাই ছিল ববীন্দ্রনাথের লক্ষ্য—তখন বিস্মিত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। গোবাব টানাপোড়েব সহযোগী কি ববীন্দ্রনাথের কবিত্ব? চতুরঙ্গের শচীশ ও দামিনীর অবলম্বনে ববীন্দ্রনাথের দুঃসাহসিক নিরীক্ষণ ও প্রশ্রয় পাচ্ছে কবিত্বের কাছ থেকে? কুমু গান জানে এবং বিপ্রদাস সেতার বাজায় বলেই কি যোগাযোগের জীবন-নাট্যের অপরিহার্য টানকে কবিত্বের টান বলব? ববীন্দ্রনাথের নায়ক-নায়িকারা ববীন্দ্রনাথের বাংলায় স্বগত চিন্তা করেছে শুধু এই দেখেই কি মনে কবব যে তাঁর উপন্যাস কবি-স্বভাবের অনুকূল? নাকি

দেখব যে বাংলা উপন্যাসে উপন্যাসের একটা নতুন মানে তিনি নিয়ে এলেন জীবনোৎসারিত ঘটনার মানসিক তাড়নায় পাত্রপাত্রীর নানা আক্ষেপে, নানা মোচড়ে, নানা মোড় ফেরায়—যেখানে হয়তো ঘটনার রূপ পাণ্টেছে (এ-বিষয়ে আমরা পূর্বে বলেছি) কিন্তু তা “ছল” (বুদ্ধদেববাবুর উক্তি) নয় ।

দুই ॥ “কবিত্ব যখন দমিত হয়েছে তখন এসেছে নৌকাডুবির কৃত্রিমতা ।” যেন নৌকাডুবিতে কবিত্বকে যদি রবীন্দ্রনাথ আর কিছুটা উদ্দীপিত করতে পারতেন তাহলেই কেটে যেত উক্ত উপন্যাসের কৃত্রিমতা । অথচ একটু মনোযোগী হলেই বুদ্ধদেববাবু দেখতে পেতেন যে নৌকাডুবিব ব্যর্থতার কাবণ তার কাহিনীর ঘটনা-বাহুল্যের মধ্যে বা কাহিনী-রসের মধ্যে নেই । বাইরের দিক থেকে জটিল এই কাহিনী অন্তরের দিক থেকে কোনো জটিলতা সৃজন করেনি । অথচ রবীন্দ্রনাথের কাহিনী বাইরের দিক থেকেই সরল—ভিতরে ভিতরে এর প্রক্রিয়ার নানামুখী জটিলতায় উপন্যাসের প্রাণ, সেখানেই এ কৌতূহলের স্রষ্টা নৌকাডুবিতে এটি ঘটেনি । এখানে ‘আকস্মিক ঘটনা’ থেকে যে সমস্তা উদ্ভূত হল তার মূল ব্যক্তিত্বমানসের গভীর উৎসে নয়, ব্যক্তিত্বের গোটা সমস্তার সঙ্গে তাব কোনো যোগ আছে কিনা তাও উপন্যাসে স্পষ্ট হয়নি । এ-কারণেই এটা খুব সীমিত ব্যাপার ।

তিন ॥ “আর যখন প্রশ্ন পেলো তখন দেখি ঘবে বাইরের আতিশয্য ।” রবীন্দ্রনাথের গঞ্জে নিখিলেশের আত্ননাদকে অথবা বিমলার স্বভাবানুযায়ী উচ্ছ্বাসময় আত্মকথনকে বুদ্ধদেববাবু মনে করেন কবিত্বের আতিশয্য । তিনি ভুলে গেলেন যে এখানে তিনজন পাত্রপাত্রী আত্মকথনে রত । তারা তাদের চরিত্রের গায় রক্ষা করে নিজেদের ব্যক্ত করবে এখানে এটাই কাম্য । নাটকের উদ্দিষ্ট ভাবপ্রবণ কোনো চরিত্রের জন্ম আমরা নাট্যকারকে ভাবপ্রবণ বলি না । বরঞ্চ ঘরে বাইরের ব্যর্থতার মূল সন্ধান আর একটু অভিনিবেশের সঙ্গে করলেই দেখা যায় যে প্রস্তাবিত বিষয় থেকে পশ্চাদপসরণের ফলেই এই উপন্যাসের সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে । যে ত্রিমুখী চাপে উপন্যাসের ভারসাম্য ঠিকমতো বজায় থাকত, রবীন্দ্রনাথ নিখিলেশের বেলায় সে ভারসাম্যের ব্যত্যয় ঘটালেন । ফলে এই উপন্যাস নষ্ট হয়েছে । উপন্যাস নষ্ট হওয়ার পর তাকে বাঁচানোর জন্ম রবীন্দ্রনাথ কবিত্বের শুষ্কতা প্রয়োগ করেছেন । আমরা জানি যে কবিতা সর্ব রোগহর বিশল্যকরণী নয় । সর্বোপরি, বিশল্যকরণীও অমূল-লতা নয় । কাজেই উপন্যাসের দৃঢ়বদ্ধ মৃত্তিকায় কবিত্বকে প্রোথিত করে, উপন্যাসের সমগ্র তাকে

মিলিয়ে দিতে পারেননি। শিল্পের গৃঢ় নিয়ম যে নিয়তির মতোই ছয়তিক্রম্য। রবীন্দ্রনাথের কবিত্বকেও আত্মবলি দিয়ে তার অবহেলার খেসারত পোয়াতে হয়।

চার ॥ ঠিক সে কারণেই “তার কথাসাহিত্যের একটা বড়ো রকমের প্রতিপত্তির কারণ তাঁর কবিত্বগুণ” এ-কথাটার অর্থও খুব পরিষ্কার নয়। এই লক্ষ্যহীন, দুর্বল বাক্যে বুদ্ধদেববাবু যে ‘প্রতিপত্তি’ কথাটি ব্যবহার করেছেন তার অর্থ কী? তিনি যদি বলতেন যে তাঁর কথাসাহিত্যের প্রধান মূল্যের কারণ তাঁর কবিত্বগুণ, তাহলে তাঁর বক্তব্যের যা হোক একটা অর্থ বোঝা যেত। কিন্তু তিনি বলেছেন ‘বড়ো রকমের প্রতিপত্তি’। কার কাছে প্রতিপত্তি? বুদ্ধদেববাবুদের মতো অগ্রণী পাঠকদের কাছে? আমার ধারণা তাঁর শ্রেণীর পাঠকেরা কেউই তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-সাহিত্যের প্রতিপত্তির কারণ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের প্রধানত কবিত্বের উল্লেখ করবেন না। আর প্রতিপত্তি কথাটি তো আশ্চর্য কথা। শেক্সপীয়রের কালে তাঁর নাটকেরও একটা বড়ো রকমের প্রতিপত্তির কারণ ছিল—অন্তত সে আমলের প্রাকৃত দর্শকমণ্ডলীর কাছে,—শেক্সপীয়রীয় নাটকের খুনজখম, ভূত প্রেত, ডাইনী প্রভৃতি। নিশ্চয় এই প্রতিপত্তির কারণটাই শেক্সপীয়রীয় নাটকের সাফল্যের কারণ নয়। বুদ্ধদেববাবু কি সে জন্মই সাফল্য কথাটি পরিহার কবে প্রতিপত্তি কথাটি ব্যবহার করেছেন?

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের শেষবক্ষাবও ব্যতায় যেখানে যেখানে ঘটেছে গোড়ায় গলদই সেখানে একমাত্র কারণ। কবিত্ব সেই গোড়ায় গলদেব ফল। কারণ নয়। চোপের বালি, চতুরঙ্গ, যোগাযোগ—বলা যায় গোবা ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রধান উপন্যাসেই শেষরক্ষা হয়নি। উপন্যাসের সমাপ্তিতে এই দুর্বলতার জন্ম আমরা রবীন্দ্রনাথকে নিশ্চয় দায়ী করব। কিন্তু তাঁর সমস্ত উপন্যাসেব যে স্বভাব তাকে ভুলে যাব না। ভুলে যাব না রবীন্দ্রনাথের নিরীক্ষার স্বভাবকে। বিষয়কে—অন্তত উপন্যাসে—নিরীক্ষাশালায় নিক্ষেপ করতে রবীন্দ্রনাথ সদাই ইচ্ছুক ছিলেন। সেই জন্ম দেখা যায় যে ব্যক্তি-স্বরূপকে রবীন্দ্রনাথ যে রকম পরীক্ষার মধ্যে ফেলেন আর কোনো বাঙালী উপন্যাসিকের সে রকম সাহস নেই। এই পরীক্ষার প্রমাণ নিখিলেশ, কুমু, শচীশ। সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রলেই বরং বলা যায় যে শরৎচন্দ্র-বিষয়ক জনশ্রুতিটা ভুল। প্রকৃতপক্ষে সমস্তা রবীন্দ্রনাথই উত্থাপন করেছিলেন—শরৎচন্দ্র ধামাচাপা

দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, সব নিরীক্ষা ববীন্দ্রনাথের শেষ হয়নি। সব নিরীক্ষা শেষ করার ক্ষমতাও ববীন্দ্রনাথের ছিল না। বেগলো অসমাপ্ত সে-গুলিতে ববীন্দ্রনাথের দুর্বলতাও যেমন প্রকট সবলতাও তেমন। যে বলিষ্ঠতায় তিনি যোগাযোগের বিষয়কে ধবেছেন, বিষয়বস্তু সেই উচ্চাভিলাষী বলিষ্ঠতা সদাই স্ববর্ণীয়। পরে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। আমাদের ধারণা, জটিলতার দিক থেকে উচ্চাকাঙ্ক্ষায় গোবা ন্যূন বলেই গোবাব উদ্দিষ্ট সাফল্য ববীন্দ্রনাথের কবতলগত হয়েছে। যোগাযোগ এবং চতুবঙ্গে বিষয় ছিল শিল্পীর কাছে দুবতিক্রমা গৌরীশৃঙ্গ। তাই সেখানে এসেছে ব্যর্থতা। পবিসমাপ্তিতে দুর্বলতা। কিন্তু এটাও তো ঠিক কথাই যে স্কুগোল এবং নিখুঁত পবিসমাপ্তিই শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের সার কথা নয়। জীবনের মতো শিল্পেও ব্রাউনিঙের আপ্যবাক্য ব্যর্থ নয়। প্রচেষ্টাব গভীরতায় ও তাংপর্যেও শিল্পীর একটা বডো বকমের বিচার বটে। আব ববীন্দ্রনাথের ব্যর্থতাও সেই কাবণেই আধুনিক বাঙালী ঔপন্যাসিকদের কাছে যথেষ্ট শিক্ষাদাতা—যাকে বর্তমানের বাঙালী কথাশিল্পীর বৃহৎ অংশ সাফল্য-ব্যর্থতাসমেত এডিয়ে চলেছেন। তাবা বুঝলেন না যে ববীন্দ্রনাথ আমাদের শিখিয়েছেন ব্যক্তিত্বের নিগূঢ় প্রশ্নকে বিশিষ্ট রূপে উত্থাপিত কবতে।

•• তিন ••

এই আলোকেই ববীন্দ্রনাথের উপন্যাসের বাণী-ভঙ্গিমাও আলোচিত হওয়া উচিত। যেহেতু উপন্যাসের ভাষা শীর্ষক অব্যায়ে ববীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ভাষা বিষয়ে কিছু আলোচনা আমবা কবেছি এবং পবে গোবা প্রমুখ উপন্যাসের বিষয়ে এ-আলোচনা বিস্তৃত ভাবে কবাব বাসনা বইল সেহেতু এখন শুধু এ-আলোচনার প্রসঙ্গটুকু ধবিষে দিয়েই ক্ষান্ত হব। আমবা জানি যে ববীন্দ্রনাথের গড়ে কাব্য-ধর্মিতা বিদ্যমান। এবং এও জানি যে কাব্যধর্মিতা ও কাব্য এক কথা নয়। শ্রীযুক্ত সূধীন্দ্রনাথ দত্ত ‘ছন্দোমুক্তি ও ববীন্দ্রনাথ’ শীর্ষক প্রবন্ধে লিপিকাব গদ্য এবং ক্ষুধিত পাষাণের গদ্যের প্রতিতুলনা কবে দেখিয়েছেন যে লিপিকাব সবল গদ্যের মধ্যেও যে কাব্য তার মূল খুঁজতে হবে লিপিকাব আত্মা। আমবা যখনই কোনো গদ্য-রচনায় কবিত্বের কথা বলে থাকি সের্ট এই আত্মাব ব্যাপাব। কাব্যধর্মী ছোপের ব্যাপাব নয়। অতিথি গল্পের বিষয়বস্তুতে বযেছে কবিত্ব। কপালকুণ্ডলাব মতো কাব্য সেখানে সমস্ত শিল্পসৃষ্টি প্রক্রিয়াবই নিয়ামক। যে

প্রেরণায় ও নিষ্ঠায় সেখানে শিল্পকর্মকে ধারণ করা হয়েছে সে প্রেরণা-নিষ্ঠা কাব্যোৎসারিত। এই প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নয়। সেখানে পুরোদস্তুর ব্যক্তিস্বরূপের পরীক্ষা-নিরীক্ষার নানা স্তর-পরিক্রমা বিদ্যমান।

সে কারণে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ভাষায় যেমন মুড অনুযায়ী বহু-চারিতা, উপন্যাসের ভাষার আদর্শ তা নয়। কোতুকে, ব্যঙ্গ, রহস্য-ঘনতায়, রসোচ্ছলতায় ছোট গল্পে রবীন্দ্রনাথ নানা চাল দেখিয়েছেন। কখনো কৃত্রিম গাঙ্গীর্ষ্যে কোতুকময় (প্রায়শ্চিত্তে), কখনও সরল নিরলংকার কাব্যে সমৃদ্ধ (মণিহারী)। ছোটগল্পের নানা মুড অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের গল্পের এক আশ্চর্য বিকাশ ঘটেছে—বুদ্ধদেব বস্তুর গল্পগুচ্ছের আলোচনা এ প্রসঙ্গে বার বার স্মরণীয়। কিন্তু উপন্যাসের ভাষায় দেখা যায় অন্য গুণ। উপন্যাসিকের নিরাসক্তির সঙ্গে অপূর্ব আত্মীয়তা রক্ষা করে চলে এই ভাষা। উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর প্রয়োজনে এ-ভাষা উচ্ছ্বাস এবং পাশনকে প্রশ্রয় দিয়েছে বটে, কিন্তু কাব্যধর্মিতায় প্রাবৃত হয়নি। বরঞ্চ উপন্যাসিকের দৃঢ় অন্তঃশাসন এর সর্বত্র উপস্থিত। উপন্যাসের প্রয়োজনেই এ হতে পারে উপমাময়। শ্রীযুক্ত স্বধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেন—

সকলে দেখেছেন যে রবীন্দ্রনাথের গল্প তাঁর পছন্দের মতোই উপমাবহুল, কিন্তু তাঁর গল্পোপমার সঙ্গে তাঁর পছন্দোপমার কোনোও মিল নেই। গল্পে তিনি উপমা প্রয়োগ করেন সাধারণত অর্থের খাতিরে, সেখানে উপমার সাহায্যে তাঁর বক্তব্য স্পষ্টতর। পক্ষান্তরে তাঁর কাব্যে উপমার উৎপত্তি ভাবসঙ্গতির প্রয়োজনে অথবা ধ্বনি মাধু্যের তাগিদে।

এবং আমরাও দেখেছি যে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উপমাময়তা কতখানি অর্থবহ হতে পেরেছে। (পরবর্তী অধ্যায়ে গোরা আলোচনা দ্রষ্টব্য) এবং এটাও ঠিক কথা যে রবীন্দ্রনাথের গল্পোপমা তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্টতর করে তোলে। তাহলে উপন্যাসে নিশ্চয় উপন্যাসের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করাই তাঁর কাজ। কিন্তু জানি এ-বক্তব্যে বাইরের ঘটনা প্রধান নয়। কাহিনীগামিনী চিন্তা নয় তাঁর। বরং মনেরই বিচিত্র আক্ষেপ, তাড়না, যন্ত্রণা, মোচড় তাঁর বিষয় বা বক্তব্য। কাজেই এখানেও তাঁর ভাষায় উপমাপ্রদানের পদ্ধতিতে মনেরই সূক্ষ্মতার অভিব্যক্তি ঘটে। পাত্র-পাত্রীর মনের টান ফুটে ওঠে ভাষায়। যেখানে সে টান কৃত্রিম, সেখানে ভাষাও কৃত্রিম। যেমন শেষের কবিতা। যেখানে সে টান জোরালো সেখানে ভাষাও বেগময়। যেমন চতুরঙ্গ।

চোখের বালি রবীন্দ্রনাথের প্রথম শক্তিমান সৃষ্টি। ❶ এই উপন্যাসেই তিনি প্রথম উপন্যাসের ক্ষেত্রে সমসাময়িক সমাজের পাত্র-পাত্রীকে ব্যবহার করলেন। ❷ এই উপন্যাসেই তিনি প্রথম কাহিনীর ভার পরিহার করে ব্যক্তিত্বের ফলস্বরূপ নানা সংকটকে উপন্যাসের বিষয় হিসাবে ব্যবহার করলেন। ❸ এই উপন্যাসেই তাঁর শক্তি এবং শক্তির সীমা দুয়েরই আভাস পাওয়া গেল। অথচ এর জন্তে রবীন্দ্রনাথকে আগাগোড়া নতুন হতে হয়নি। এমন কি রবীন্দ্রনাথের দুঃসাহসিকতম লেখাও নয় চোখের বালি। সেদিক দিয়ে বরঞ্চ নষ্টনীড় অনেক সাহসিক পদক্ষেপ। তথাপি চোখের বালিতেই জানা গেল রবীন্দ্রনাথ আর বৌ ঠাকুরানীর হাট, রাজর্ষি লিখবেন না। জানা গেল যে বাংলা উপন্যাসের তখনও-পর্যন্ত-প্রচলিত ছক ভেঙে তিনি এবার এগুবেন।

তাই বন্ধিমচন্দ্রের দীর্ঘ ছায়া চোখের বালিতে দৃশ্যমান, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে সে ছায়া বিলীযমান এবং অবসন্ন। যদি পুরনো কালের অনুসরণে আমরা বিষয়বস্তুর আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাই ক্রমবিকাশের উইলের সঙ্গে চোখের বালির বিষয়ের সাদৃশ্য বর্তমান। ~~একটি~~ বিবাহিত দম্পতির জীবনে একটি নারী, যে বিধবা, সে কেমন প্রতিক্রিয়া সৃজন করল এবং নিজের প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হল এটাই দুই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। কিন্তু আমরা আগেও বলেছি যে এভাবে বিষয়বস্তু বিচার সম্ভব নয়--এখানেও আলোচনা করে দেখাব যে এই দৃশ্যত সাদৃশ্যেও কোনো অর্থ নেই। যদিও ক্রমবিকাশের উইলের বেডাল গারতে গিয়ে ভ্রমরের নিজের মাথায় লাঠি মেবে বসার মতো এ-উপন্যাসেও খাঁচার ভিতর থেকে মরা পাখি আবিষ্কারে ইঙ্গিত দানের চেষ্টা বিদ্যমান; যদিও মুন্না নায়িকা আশার সঙ্গে বিনোদিনী-ভাবাতুর মহেন্দ্রের দাম্পত্য প্রেমের লীলায় মুন্না ভ্রমর ও গোবিন্দলালের চুসনদুশের কথা মনে পড়বে, যদিও বিনোদিনীর আচারে-ব্যবহারে লজ্জাশীলা গ্রাম্য বধূর চেয়ে প্রেমবাসনাতুরা প্রগল্ভা রোহিণীর ছায়া অধিক স্পষ্টতর, তথাপি এ সমস্তই বাইরের ব্যাপার। বিধবা হলেই ক্ষুধিতহৃদয়া হবে—বিশেষ যদি যুবতী হয়—এ হল বাংলা নভেলের ত্রিকালগত ধারণা। রোহিণী থেকেই সে ধারণা চলে আসছে। এবং সেই সব উপন্যাসসম্ভব বিধবাদের উপন্যাসে উপস্থাপিত করার কৌশলটিও লক্ষণীয়। ভ্রমরের সুখ দেখে রোহিণীর মনে ক্ষুধার জ্বালা জাগ্রত হয়েছে। তারও মনের মধ্যে, সম্মুখে এক দম্পতির পূর্ণ জীবন দেখে, সুখ বাসনার

সঞ্চার হয়েছে। বিনোদিনীর ক্ষেত্রেও তাই—

ক্ষুধিতহৃদয়া বিনোদিনীও নববধূর নবপ্রেমের ইতিহাস যাতালের জালাময় মদের মতো কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল। তাহার মস্তিষ্ক যাতিয়া শরীরের বক্ত জলিয়া উঠিল।

তাহার শিরায় শিরায় যেন আগুন ধরিয়া গেল। সে যে দিকে চায় তাহার চোখে যেন ফুলিঙ্গ বর্ষণ হইতে থাকে। এমন সুখের ঘরকন্না—এমন সোহাগের স্বামী। এ-ঘরকে যে আমি রাজার রাজত্ব, এ স্বামীকে যে আমি পায়ের দাস করিয়া রাখিতে পাবিতাম। আমার জায়গায় কিনা এই কচি খুকি, এই খেলার পুতুল।

স্মরণীয় যে রোহিণী এই ভাবেই চিন্তা করেছিল—গোবিন্দলালবাবুর স্ত্রী আমাপেক্ষা কোন্ গুণে গুণবতী? সুতরাং এখানেও বিনোদিনীর উপস্থাপনাতে রোহিণীর ছায়া মনে আসে। আবার গিলটির গয়নার প্রসঙ্গে রোহিণীর যে ব্যাপিকা মনোভাব—মহেন্দ্রব সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবহারে বিনোদিনীতেও তারই স্মৃতি। রোহিণীর নির্লজ্জতা আর বিনোদিনীর নির্লজ্জতা একই সূত্রে যেন বিধৃত হয়ে রয়েছে এ-কথা কখনো কখনো না মনে হয়ে যায় না। রোহিণীর অপরের সর্বনাশের ইচ্ছা এবং বিনোদিনীর সকল কিছুর ধ্বংস বাসনা তুলনীয় :

ক্লুদা মধুকরী যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই দংশন করে, ক্লুদা বিনোদিনী তেমনি তাহাব চারিদিকেব সমস্ত সংসারটাকে জ্বলাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। যে যাহা চায় তাহাতেই বাধা? কোনো কিছুতেই কি সে ক্লতকার্য হইতে পারিবে না। সুখ যদি না পাইল তবে যাহারা তাহার সকল সুখের অন্তরায়, যাহারা তাহাকে ক্লতার্থতা হইতে ভ্রষ্ট, সমস্ত সম্ভবপর সম্পদ হইতে বঞ্চিত কবিয়াছে, তাহাদের পরাস্ত ধূলি-লুণ্ঠিত করিলেই তাহার ব্যর্থ জীবনের কর্ম সমাধা হইবে।

লক্ষণীয় যে রোহিণী এবং বিনোদিনী উভয়েই নিজ জীবনের নিরুপায় তৃষ্ণার কথা স্মরণ এবং স্বীকার করেছে। বারে বারে বিভিন্নভাবে। বিনোদিনী এবং মহেন্দ্রের সংসার ছেড়ে যুগল যাত্রায় রোহিণী-গোবিন্দলালের প্রসাদপুর যাত্রার কথা স্মরণীয়।

শুধু এইটুকুতে নয়, আকস্মিক ঘটনার প্রভাবে উপস্থাসের জটিলতায় গ্রন্থিবৃদ্ধির ব্যাপারে কিছু কিছু গত শতাব্দীর জের তখনও রবীন্দ্রনাথে বর্তমান। চিঠি ধরা পড়া, অসতর্ক প্রেম-ঘন-মুহুর্তে অপরের দৃষ্টিগোচর হওয়া এ-সবই সেই আকস্মিক

ঘটনার উপর নির্ভরশীলতা এ-কথা সকলেরই জানা। কিন্তু এ-সমস্ত ঘটনা লক্ষণ একান্ত ভাবে বাইরের ঘটনা ও লক্ষণ। ছায়া যেটুকু বন্ধিমের তা যত দীর্ঘ হোক উপন্যাসের স্বাধীন চন্দকে প্রভাবিত করতে পারেনি। কিন্তু তৎপূর্বে রবীন্দ্রনাথ নিজে চোখের বালি সম্বন্ধে এবং এই সাহিত্যকর্মের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে যা বলেছেন সেটির ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখার নিজেই ব্যাখ্যা করতেন এ-কথা সুবিদিত। বন্ধিম যেমন উপন্যাসের গতিকে থামিয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে কৈফিয়ত দিতেন—কেন এরূপ ঘটিল, রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই সেভাবে ব্যাখ্যা দিতেন না, কিন্তু গুরুনির্ভর দেশে গুরুব্যাখ্যা না হলে বোধহয় আশ মেটে না। অথচ প্রতি ক্ষেত্রেই যে এ-ব্যাখ্যা নির্ভুল হতে পারে না এ-নিদর্শনও কম নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত চোখের বালির টীকা গ্রহণেও এই গোলমাল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

চোখের বালির গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা। সেই ঈর্ষা মহেন্দ্রের সেই রিপুকে কুংসিত অবকাশ দিয়েছে যা সহজ অবস্থায় এমন করে দাঁত নখ বের কবত না। যেন পশুশালাব দবজা খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংযত হয়ে।

এই ভ্রান্তিসৃজনী বিরূতিটির জন্যই চোখের বালিকে বহু অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়। এখনি আমরা আলোচনা করব যে এই বিরূতিটির একটি কথাও সত্য নয়। এই ক্ষুদ্র মন্তব্যের ফলে চোখের বালি সম্বন্ধে আমাদের আকাঙ্ক্ষা উচ্চাশার পাহাড়ে চড়ে বসে। অথচ চোখের বালিতে তার সমর্থন নেই। মহেন্দ্রের জীবনে বিনোদিনীর সূত্রে যে-সব অভিজ্ঞতার সঞ্চার হল মায়ের ভূমিকা সে অভিজ্ঞতা-রচনায় কতটুকু? রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বলেছেন যে মায়ের ঈর্ষা সমস্ত ব্যাপারটাকে দারুণ করে তুলেছে—ঈর্ষার সে জাতীয় কোনো স্থায়ী ভূমিকা ছিল কিনা? চোখের বালি দুটি প্রশ্নেরই না-বাচক উত্তর দেবে। রাজলক্ষীর গ্রাম-বাসে গমনের পশ্চাতে অবশ্যই পুত্রের প্রতি বিরক্তি, এবং আশার পুত্রবধু হিসাবে অক্ষমতা প্রধানত তার মূলে। এখানে রাজলক্ষীর ঈর্ষার ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই দেখিয়েছেন, বিশেষ বিনোদিনীর আতিথেয়তায়-সেবায় আশার বিপরীত তুলনা রাজলক্ষীর মনে ক্রিয়াশীল হয়েছে। ঈর্ষার ভূমিকা এইটুকুই। বিনোদিনীকে রাজলক্ষী গ্রাম থেকে প্রত্যাগমনের সময় কলকাতার বাড়িতে নিয়ে এলেন। কেন নিয়ে এলেন, নিয়ে আসার পশ্চাতে কোনো জালা, কোনো উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল ছিল এমন কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং মায়ের ঈর্ষায় বিনোদিনীকে আশার

বিকল্প হিসাবে (মহেন্দ্রের বধূর বিকল্প নয়, পুত্রবধূর বিকল্প) কলকাতার বাড়িতে আনা হল এ-কথা কী সাক্ষ্যে বিশ্বাস করা যায় । যদি ধরা যায় যে তখনও মায়ের ঈর্ষা কার্যকরী ছিল, কেননা বিনোদিনীকে মহেন্দ্র দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা বলাতে রাজলক্ষ্মী বললেন—‘ও বেহারি তুই একবার মহিমকে বুঝাইয়া বল । বিপিনের বউ আছে বলিয়াই এই বৃদ্ধ বয়সে আমি একটু বিশ্রাম করিতে পাই । পর হউক যা হউক আপন লোকের কাছ হইতে এমন সেবা তো কখনও পাই নাই ।’ তা হলেও এ ঈর্ষার মূল্য কতটুকু ? প্রথম কথা এটা ঈর্ষা না অভিমান ? বৃদ্ধবয়সে সেবা-বাসনাতুরা শাশুড়ীর অভিমানের সুরই এর মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে অধিকতর । এ অভিমানের ভূমিকা এ-উপন্যাসের জটিল পরিস্থিতি সৃজনে একটা সামান্য অংশ দাবি করতে পারে—তার বেশি নয় । কেননা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—মায়ের ঈর্ষা । মায়ের ঈর্ষা হলে পুত্রের ওপর অপরের অধিকারকে—এখানে বধূর অধিকারকে বিচলিত করার একটা সচেতন প্রয়াস, অথবা অচেতন বাসনা সদাই লক্ষ্য করা যেত । রাজলক্ষ্মীর উদ্ধৃত উক্তি থেকে দেখা যায় এ জাতীয় কোনো উদ্দেশ্যই তাঁর ছিল না । শাশুড়ী হিসাবে পুত্রবধূর ওপর একটা অধিকার মনে মনে সাব্যস্ত করে আছেন । আশা সেদিক দিয়ে তাঁকে ক্ষুণ্ণ করেছে । বিনোদিনীকে দিয়ে তিনি সেই সাধটুকু মেটাতে চান । শাশুড়ী হিসাবে পুত্রবধূর ওপর তাঁর অধিকার-চেতনাই এখানে ভূমিকা গ্রহণ করেছে । যা হিসাবে নয় । বিনোদিনী আশা-মহেন্দ্রের মধ্যে কোনো ছায়া বিস্তার করে এ-জাতীয় চিন্তা, কাজেকাজেই, রাজলক্ষ্মীর ছিল না । রাজলক্ষ্মী যে বিনোদিনীকে আশার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে বলেছিলেন—(‘তুমি পাভাগাঁয়ের গৃহস্থঘরে ছিলে—আজকালকার চালচলন জানো না । তুমি বুদ্ধিমতী, ভালো করিয়া বুঝিয়া চলিও’)—তার মধ্যেও রাজলক্ষ্মীর ব্যর্থ শাশুড়ীর অধিকার-চেতনাই প্রকট । বিনোদিনী একমাত্র তাঁরই অনুগত থাকুক । আশার ব্যাপারে তার যেন আকর্ষণ না থাকে এই ছিল রাজলক্ষ্মীর অভিপ্রায় । পুত্রবধূ হিসাবে আশার ব্যর্থতা, ভ্রাতুষ্পুত্রবধূর সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে এই ভূমিকাটুকু মাত্র রাজলক্ষ্মী পালন করেছিলেন । ‘মায়ের ঈর্ষা’ কথাটা অনেক বড়ো কথা । সে ঈর্ষাকে উপন্যাসে ব্যবহার করতে হলে যে জাতীয় মর্মদাহী সহ্যাতীত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়তে হত রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই তার পক্ষপাতী ছিলেন না । এ-উপন্যাসে তাঁর লক্ষ্য তা ছিল না । তাঁর ব্যাখ্যাই এই বিচার-বিভ্রাট ডেকে এনেছে । কাজেই বিনোদিনী যখন বলেছে যে নিজের মনকে সবাই চেনে না রাজলক্ষ্মীও

চিনতেন না, যখন বলছে—‘নিজের মনও সবাই জানে? তুমি কি কখনও তোমার বউয়ের ঘেঁষ করিয়া এই মায়াবিনীকে দিয়া তোমার ছেলের মন ভুলাইতে চাও নাই? একবার ঠাওর করিয়া দেখ দেখি’—তখন বিনোদিনীর অভিযোগের জন্ত উপগ্রাস প্রস্তুত নয়। কেননা পূর্বে বিনোদিনী যখন আশার অবর্তমানে মহেন্দ্রের সেবার ভার গ্রহণে অনিচ্ছুক হয়েছিল, তখন রাজলক্ষ্মী বিরক্ত হয়েছিলেন, বিনোদিনীর কথায় সমাজ নিন্দার আভাস দেখে। মহেন্দ্রের মতো ভালো ছেলে কোথাও নেই, এবং তার সম্বন্ধে যদি কেউ কিছু বলে তো জিভ খসে যাক—এমনই গভীর পুত্র-গৌরব তাঁর ছিল। কাজেই বিনোদিনী মহেন্দ্রের সে জাতীয় কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা এ-ধরনের দৃঢ় বিশ্বাস থেকেই বিনোদিনীকে তিনি মহেন্দ্রের সেবাব ভাব নিতে বলেছিলেন। এরই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাজলক্ষ্মীর পরের আচরণটিও লক্ষণীয়। মহেন্দ্র যখন বিনোদিনীর সঙ্গে একাকী লাভ করার জন্য ব্যাকুল, এবং বিনোদিনী মহেন্দ্রকে এড়িয়ে যাবার জন্য কাজের চল সৃষ্টি করে উঠে যেতে চাচ্ছে তখন মহেন্দ্র মাকে বলছে ‘মা এইমাত্র অনুতাপ করিতেছিলে উঁহাকে খাটাইয়া মারিতেছ, আবার এখনই কাজে টানিয়া লইয়া চলিলে?’—উত্তরে তখন রাজলক্ষ্মী বলছেন—‘আমাদের লক্ষ্মীমেয়ে যে কাজ করিতেই ভালবাসে।’ বিনোদিনীও অভিযোগ সত্য হলে নিঃসন্দেহে রাজলক্ষ্মীর আচরণ অন্তরূপ হত। এবং সে আচরণ মহিনের যাতে কষ্ট না হয় এ-বোধ থেকে উৎসাহিত হত না।

তাছাড়া অন্তর্দিক থেকেও দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। বিনোদিনীর অভিযোগ সত্য হলে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা সত্য হয় নচেৎ নয়। বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীকে বোঝাল যে মানুষ তার নিজের মনকে সবসময় জানে না, সবটা জানে না। রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকে অজ্ঞাতে ছেলের মন ভোলানোর জন্যই ব্যবহার করেছেন—এটা বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীকে স্পষ্ট করে অবিচলিতভাবে বলেছিল। আমরা তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি বিনোদিনীর অভিযোগ সত্য। তাহলে এটা স্বাভাবিক যে রাজলক্ষ্মীর আচরণে বিনোদিনীর উক্তির পর একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এবং মহেন্দ্রের ও বিনোদিনীর পরবর্তী জটিলতর পরিস্থিতির জন্য রাজলক্ষ্মী (নিজের কাছে নিজে ধরা পড়েছেন বলেই) সমুদয় ঘটনার জন্য নিজেকে দায়ী করবেন অথবা নিজের মনের সঙ্গেই যুদ্ধ করবেন নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করার জন্য। রাজলক্ষ্মীর আচরণে ব্যবহারে তিলমাত্র সে লক্ষণ নেই। তাঁকে মরণাপন্ন দেখেও মহেন্দ্র বিনোদিনীর

সন্নিধানে চলে গেল এই অভিমানাহত মূর্তিতেই বরঞ্চ তাঁকে আমরা দেখতে পাই।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কথিত মায়েৰ ঈর্ষা এই উপন্যাসের নিদাক্ষণতার স্ৰষ্টা নয়। অথচ এই ব্যাখ্যাকে বাদ দিয়ে উপন্যাসের নিজস্ব গ্ৰায় অনুসরণ করে চললে উপন্যাসটির প্রকৃত চেহারা আমাদের নজরে পড়ে। তখন হয়তো আর মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের যাবতীয় চাহিদা—যথা ঈর্ষা-জট প্রভৃতির দাবি—চোখের বালি মেটায় না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাস হিসাবে এ-উপন্যাসের মর্যাদার কিছুমাত্র লাঘব হয় না। সে কাবণেই কোনো উপন্যাসকে কোনো প্রকার লেবেল মেরে বিচার করে বা বিচার কবে লেবেল মেরে দেওয়া অসঙ্গত। যে উপন্যাসই হোক না কেন জীবনের একটা সমস্যা—তা সে অভিজ্ঞতাকে যাচাই করার সমস্যাই হোক, বা চবিত্বেব নিজেব কোনো উপলব্ধির সমস্যাই হোক—সেখানে উপস্থিত থাকবে। উপন্যাসেব শিল্পবিচার সেই সমস্যার সঙ্গে গ্রথিত করে কবা বাঞ্ছনীয়।

জিজ্ঞাসাহীন সমালোচনায় এক কথায় এ-সমস্যা কী তা ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায়। মহেন্দ্রেব জীবনে বিনোদিনীঘটিত সংকটই এই সমস্যার উপন্যাসম্বৃত চেহারা। কিন্তু এ-ব্যাখ্যা আমরা জানি যে একেবারে বহিরঙ্গ-বিষয়ক। বিস্তৃত রসসন্ধানী আলোচনায় ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর জীবনের ঘটনাবলির কেন্দ্র বলে আখ্যাত কবেছেন মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সম্পর্কের টানা-পোড়েনকে। প্রকৃত ব্যাখ্যার কাছাকাছি গেলেও, এ-মন্তব্যও জিজ্ঞাসা-সাপেক্ষ। মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সম্পর্ক উপন্যাসের ঝড়ের কেন্দ্র না উপন্যাসের ঝড়ের পরিণাম? অর্থাৎ এই কেন্দ্র থেকে ঝড় উদ্ভূত হয়নি। ঝড় উদ্ভূত হয়েছে অন্তর। সেই ঝড়ের ফলে সৃজিত হয়েছে মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সমস্যা। এরা উপন্যাসের মূল ঘটনার পাত্রপাত্রী। কিন্তু ঘটনার স্ৰষ্টা নয়। ঘটনার সৃজন। বাস্তবিক পক্ষে এইখানেই উপন্যাসের মূল শিল্পবহুতা নিহিত বয়েছে। ঘটনা-প্রবাহের স্ৰষ্টা বিনোদিনী। এবং বিনোদিনীকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিচ্ছে বিহারী। বিনোদিনীর সংকটের ফলেই মহেন্দ্রকে সংকটাপন্ন হতে হয়েছে।

এ-কথাটির আর একটু বিস্তৃত আলোচনা করা দরকার। শুধুমাত্র চরিত্র ব্যাখ্যা করে উপন্যাস আলোচনা কদাচ সমাপ্ত হতে পারে না। যে জীবন উপন্যাসে বিস্তৃত হয়েছে সেই জীবনের বিশিষ্টতাও ব্যক্তিবৃন্দের পরস্পর সম্পর্কে সেই জীবন-বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলনের ব্যাখ্যা ব্যতিবেকে উপন্যাস সংক্রান্ত কিছুই

ব্যাখ্যাত হতে পারে না। উক্ত জীবন-বৈশিষ্ট্যের ধারক শেষ পর্যন্ত মানুষের মন। তাই সেটা স্থিতিধর্মী নয়। অন্তর-বাহির, উভয়ের আঘাতেই তা পরিবর্তনমুখী হতে পারে। তখন সে তার জীবন-বৈশিষ্ট্যকে যাচাই করে নিতে চায়। উপন্যাসের আলোচনায় এই সমগ্রের আলোচনা দরকার। মহেন্দ্রকে শুধুমাত্র আত্মাভিমानी মূঢ় (ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি) বললে এই কারণেই তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হল না।

মহেন্দ্র যেভাবে এই উপন্যাসের মূল ঘটনা পর্যন্ত, অর্থাৎ বিনোদিনী-বৃত্তান্ত পর্যন্ত জীবন যাপন করেছে, সে অবধি তার জীবনকে বলা চলে মোটামুটি পরিবার-কেন্দ্রিক জীবন। তার মা, তার বন্ধু, তার বো—এই অধিকার চেতনাই এই জীবনযাত্রার ফল। এখানে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন যে কোনো কিছুর জন্মই তাকে কষ্ট কবতে হয়নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে এব ফলে মহেন্দ্রের মনে অনায়াস-লব্ধ অধিকারের সামগ্রীগুলোর ওপর একটা দারুণ অবহেলাবোধও আছে। অধিকার-স্বীকৃত বিভ্রাটালী ব্যক্তির যেমন অনায়াসে অর্জিত ধন সম্বন্ধে অপ্রকাশ্যে একটা অবহেলাবোধ থাকে, মহেন্দ্রেরও মা, বো সম্বন্ধে সেই ধারণাই ছিল। এদিক থেকে মহেন্দ্রের মনে আমাদের কিছুতকিমাকার মধ্যবিত্ত অধিকার-বোধের ছায়া পড়েছে। সে, অবলীলাক্রমে শিশু যেমন সন্দেশ দেখে আবদার ধবে, সেইভাবে আশাকে দেখেই বিবাহ করার সংকল্প ঘোষণা করেছে। সে অবলীলায় আশাব জন্ম মাকে, বিনোদিনীর জন্ম আশাকে এবং বিনোদিনী ও আশার জন্ম বিহারীকে পরিহার করেছে অথবা করতে চেয়েছে। জগৎ সংসার যেন তার জন্মই সৃজিত হয়েছে—এই অণ্ডায় অধিকার-বোধই মহেন্দ্রের চরিত্রের মূলকথা। এবং এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রকৃত পক্ষে তার জীবন-বৈশিষ্ট্যেরই ফল। সে যে অবলীলাক্রমে বিনোদিনীকে বিয়ে করব না বলেছিল সেই ভাবেই অবলীলাক্রমে আশাকে বিয়ে করব বলে। কারো রাজী-অরাজীর প্রশ্ন সে মানে না, সম্মত খোঁজও রাখে না সে প্রশ্নের। মহেন্দ্রের জীবনের এই ছকে বিনোদিনী একটা প্রথম এবং প্রবল প্রতিক্রিয়া। বিনোদিনী শুধু আত্মীয়া নয়, নারী নয়, সে একটা ব্যক্তি। আর সকলে যেখানে স্নেহাতিশয্যে তার আতিশয্যকে সৃষ্টি করেছে—সৃষ্টি করেছে তার অধিকার বোধকে—আর সকলে যেখানে ব্যক্তিত্ব বিবজ্জিত হয়ে মহেন্দ্রের প্রসাদপ্রার্থী—বিনোদিনী সেখানে তার কৃপাকণা-ভিখারিণী নয়। সে অনায়াসে কাছে আসতে পারে, অনায়াসে দূরে যেতে পারে। সে অতি সহজে নিষ্ঠুর কৌতুকে মহেন্দ্রের

মাথাধরার ব্যথাকে যথাস্থানে আঘাত করতে পারে। এই বিনোদিনী মহেন্দ্রের অভিজ্ঞতার মানুষগুলো থেকে পৃথক বলেই বিনোদিনী সম্বন্ধে তার মূল্য বোধের প্রশ্ন ওঠে। এবং মহেন্দ্রের বিনোদিনীর প্রতি মনোভাবের অন্তত একটা নৈতিক ব্যাখ্যা না থাকলে মহেন্দ্র গোবিন্দলাল থেকে পৃথক হবে কী করে। মহেন্দ্র বিনোদিনীকে মূল্য দিতে গিয়ে চারিদিকের মূল্যহীনতাকে পরিহার করে যেতে চেয়েছে। আত্মসম্বিতের অভাবে এই মূল্যহীনতা যে তারই প্রজ্ঞারূপ, তারই রাজ্যপাট এই কথাটা শুধু সে বোঝেনি। ফলে তার যাত্রাও হয়েছে উদ্দেশ্য-হীনতায় খণ্ডিত।

এই প্রসঙ্গে আমরা আর একবার ডাঃ বন্দোপাধ্যায়ে উক্তি স্মরণ করব। তিনি বলেছেন, “সে (মহেন্দ্র) যে সত্য সত্যই আন্তরিকতার সহিত চিত্তজয়ের চেষ্টা না করিয়াছে তাহা নহে, এবং বিনোদিনী যে অনিবার্য বেগের স্রোত তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল তাহাও ঠিক নয়”--স্বতরাং বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর অনুরাগের সম্ভাবনাতে সে ঈশা-কাতর হয়ে আত্মদমনেচ্ছাকে বিসর্জন দিয়েছে এমন সিদ্ধান্ত অনিবার্য। তাহলে এই প্রতিযোগিতা-পরায়ণ ঈর্ষাকেই মহেন্দ্র-বিনোদিনীর ঘটনা সমন্বিত উপন্যাসের মূল চালিকাশক্তি বলতে হয়। আমাদের মনে হয় উক্ত তাৎপ্যের শেষাংশ সত্য নয়। মহেন্দ্র চিত্তজয়ের চেষ্টা করেছে সত্য, বিনোদিনীর আকর্ষণও অনিবার্য মনে হয়েছে তার কাছে এও সত্য। বিনোদিনীর জীবনোৎকর্ষে এবং একটা কারণ অনুসন্ধান করা চলে। আশার চাকুপাঠ এবং বিনোদিনীর কপালকুণ্ডলার মধ্যে এই জীবনগত তার-তমোর ব্যাপারটির ইঙ্গিত হয়তো আছে। বিনোদিনীর মাজিত বাগবৈদগ্ধ্য যে সূক্ষ্ম কুচি ও অনুভূতিশীলতারই পরিচায়ক এ-ইঙ্গিতও বিদ্যমান। এইগুলো যখন বিনোদিনীর তারুণ্যশ্রীর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে মহেন্দ্রের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছে তখনই মহেন্দ্র বিনোদিনীর মূল্যকে আবিষ্কার করবে এ-রকম একটা আশা বিনোদিনীর ছিল। কিন্তু আমরা জানি যে বিনোদিনীর আকর্ষণ তার কাছে তার পূর্বেই অনিবার্য হয়ে উঠেছে। মনে রাখা দরকার যে বিনোদিনী নিজে বাস্তবিকপক্ষে তাকে আকর্ষণ করেনি। কেননা বিনোদিনীর মহেন্দ্রের সম্বন্ধে ব্যঙ্গবোধ প্রেমিকার পরিহাস-রসিকতা নয়। ওডিকলোন-কাহিনীতে বিনোদিনীর ব্যবহারে সেই ব্যঙ্গ, মহেন্দ্র সম্বন্ধে বিনোদিনীর উক্তি—মাটি হইবার ক্ষমতা থাকা চাই—এবং আরো নানাবিধ সংখ্যাভীত আচরণে ও উক্তিতে বিনোদিনীর এই শানিত ব্যঙ্গের মনোভাব স্পষ্ট। মহেন্দ্রের জীবনের প্রতি,

জীবনধারা ও পদ্ধতির প্রতি বিনোদিনীর সমালোচনা থেকেই এই ব্যক্তির মনোভাবের জন্ম। এটাই প্রথমে মহেন্দ্রকে আকর্ষণ করেছে। মহেন্দ্রের কাছে এ-ব্যাপার অভিনব। কেউ যে তাকে সাধারণ বলে মনে কবে, কেউ যে তার সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকে, এই রকম ব্যঙ্গ করে, এ-অভিজ্ঞতা তার ইতোপূর্বে হয়নি। অথচ বিনোদিনী যদি নিশ্চেষ্ট না থাকত, যদি সে সত্যি সাধারণ হত তাহলে মহেন্দ্রই বরং অচিরে তাকেও বিহারী, আশা ও বাজলক্ষ্মীর মতো তার বাজাপাটের একজন মনে কবে শান্ত হয়ে যেত। মহেন্দ্রের সাম্রাজ্যে জিজ্ঞাসাহীন আনুগত্যে বিনোদিনীও মিশে থাকত। বিনোদিনী তা থাকেনি।

কেন থাকেনি? মহেন্দ্রের জীবনযাপনের ধারা ও পদ্ধতিকে সে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখত বলে। বিনোদিনীর দীর্ঘ ব্যবহারে এ-সমালোচনা যেমন ফুটে উঠেছে, তাব পত্রে এ তেমনি সাপের মতো তীর বোম্ব বিধ ছড়িয়েছে। মহেন্দ্রের আশৈশব জীবনযাত্রা প্রণালীকেই সে সর্বত্র আঘাত করেছে। এব কাবণকপে ব্যাখ্যা কবাহয় বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর অনুবাহকের সম্ভাবনা বা অনুরাগবোধ। ঈর্ষা বা অনুবাহকবোধকে একটা উপগ্রাসের ঘটনাসমূহের চালিকাশক্তি বলে আখ্যাত কবা আব বোগ লক্ষণকেই বোগ বলে ঘোষণা সমান ভ্রান্তিকর। স্মরণ্য বিনোদিনী মহেন্দ্রে আশ্রয় খুঁজে পেল না কেন এর জবাবে শুধু বিহারীকে দেখিয়ে দিলেই চলবে না, দুটো ব্যাপারই এক মূল থেকে উৎসারিত হচ্ছে। বিনোদিনীর স্বতন্ত্র মর্যাদাকে কেউ উপলব্ধি করুক বিনোদিনীর জীবনোৎকর্ষের ফলে এ পিপাসা বিনোদিনীর মধ্যে সদাজাগ্রত ছিল। মহেন্দ্রের রাজাপাটের মধ্যে সে সম্ভাবনা ছিল না। মহেন্দ্র বিনোদিনীর বশ্যতা স্বীকারেই সূখী হবে এমন ধারণাই মহেন্দ্রের প্রথমে ছিল। কিন্তু বিহারী বিনোদিনীর শান্ত স্বাতন্ত্র্যকে প্রথমাবধি মূল্য দিয়েছে। দমদমে চড়ুইভাতির দিনে বিহারী-বিনোদিনীর আলাপনে বিহারীর কাছে বিনোদিনীর এতদিনের অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক মূল্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এবং আবিষ্কৃত যে হয়েছে সেটা বিনোদিনীর কাছে অজানা ছিল না। মহেন্দ্রের জীবনযাত্রার মধ্যেই এই নারীর পৃথক স্বতন্ত্র মূল্যকে উপলব্ধি না করার অভ্যাসটুকু সঞ্চিত হয়েছে। নিঃসম্পর্ক বিহারীর সে ক্ষেত্রে কোনো দাবি বা অধিকার—(মহেন্দ্র যে সম্বন্ধে প্রথমে ভ্রান্তভাবে সচেতন সে জাতীয় দাবি) ছিল না। পরস্পরকে শ্রদ্ধার এবং উভয়ের ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করার ভিতর দিয়ে বিহারী-বিনোদিনীর সম্পর্কের সূত্রপাত। মনে রাখতে হবে এর আগেই বিহারী বিনোদিনীকে বলেছে যে সে তাকে সাধারণ বলে মনে করে

না। সে সমস্ত ভিড়ের মধ্যে বিনোদিনীর কাছেই নতুন পথের আশা করে।
সময়মের চড়ুইভাতির শৈশব স্মৃতিচারিণী বিনোদিনীকে দেখে বিহারীর মনোভাব
লক্ষণীয় :

(ক) বিনোদিনীর চক্ষে যে কৌতুক-তীব্র কটাক্ষ দেখিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিহারীর
মনে এ পর্যন্ত নানা প্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই উজ্জল কৃষ্ণ
জ্যোতি যখন একটি শান্ত সজল রেখায় ম্লান হইয়া আসিল তখন বিহারী যেন
আর একটি নতুন মানুষ দেখিতে পাইল।

(খ) বিহারী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, 'প্রকৃত আপনাকে মানুষ
আপনিও জানিতে পারে না, অন্তর্যামীই জানেন, অবস্থাবিপাকে যেটা বাহিরে
গড়িয়া ওঠে সংসারের কাছে সেইটাই সত্য। বিহারী কথাটাকে থামিতে
দিল না—প্রশ্ন করিয়া করিয়া জাগাইয়া বাথিতে লাগিল। বিনোদিনী এ পর্যন্ত
এ সকল কথা এমন করিয়া শোনাইবাব লোক পায় নাই—বিশেষ কোনো
পুরুষের কাছে সে এমন আত্মবিস্মৃত স্বাভাবিক ভাবে কথা কহে নাই—আজ
অজস্র কলকণ্ঠে নিতান্ত সহজ হৃদয়ের কথা বলিয়া তাহাব সমস্ত প্রকৃতি যেন
নব-বারিধারায় স্নাত, স্নিগ্ধ ও পবিত্র হইয়া গেল।

উদ্ধৃতাংশেব দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। শেষ বাক্য
একটি উপমা। আমরা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের গঢ়-ভঙ্গির আলোচনায় বলেছি
যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ব্যবহৃত উপমা উপন্যাসের অন্তর্নিহিত বিষয়ার্থকেই
স্পষ্ট কবে। 'নব বারিধারায় স্নাত প্রান্তরের' উপমা এর একটি সার্থক উদাহরণ।
প্রান্তরের বিশুদ্ধতা বোধে তার এত দিনের মহেন্দ্রের সাহচর্য সম্বন্ধে সমালোচনার
মনোভাবটি স্পষ্ট। নব বারিধাবায় বিহারীর কাছে নিজ ব্যক্তিত্বের সহজ
অভিব্যক্তির প্রশ্নেই ইঙ্গিত ঘোঁতিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য বিহারীর কাছে নিজ
ব্যক্তিমূলের উপলক্ষি বিনোদিনীকেই আত্মাবিকাশে প্রবুদ্ধ করেছে। স্বভাবতই
এই পর্যায় থেকেই বিনোদিনীর আত্মার যন্ত্রণার আরম্ভ। নইলে এ পর্যায়ের পূর্ব
পর্যন্ত মহেন্দ্র-বিনোদিনীর অধ্যায়ে বলা যায় বিনোদিনীতে রোহিণীর ছায়াই কিছুটা
উপস্থিত। বিনোদিনী মহেন্দ্রকে মাত্র পুরুষ হিসাবেই তার ছলাকলা বিস্তারের
উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে মনে করেছে। নিশাকর প্রসঙ্গে রোহিণীর যা মনোভাব ছিল
মহেন্দ্র প্রসঙ্গে বিনোদিনীর মনোভাব প্রথমে তার থেকে পৃথক কিছু নয়।
লক্ষণীয় যে এ-প্রসঙ্গে উপন্যাসের প্রথম দিকে মহেন্দ্র এবং বিনোদিনী উভয়ে
উভয়কে যে দৃষ্টিতে দেখত তার একটা সাধর্ম বিদ্যমান। বিনোদিনী শুধুই নারী,

শুধু পুরুষ। দমদমে চডুইভাতিব পর বিহাৰীলালের কাছে নিজ মূল্য আবিষ্কাবের পর বিনোদিনী আত্মসচেতন হয়েছে। এবং মহেন্দ্ৰও এইবার বুঝতে পেরেছে যে বিনোদিনী তাৰ কাছে অনাস্থাসলভা ব্যাপার নয়। এইবার ঈৰ্ষা প্রভৃতিৰ কথা ব্যবহাৰ কৰা যেতে পাৰে। কিন্তু মহেন্দ্ৰ, বিনোদিনী, বিহাৰীলাল এই তিনজনেৰ ব্যক্তিত্বৰ মৌল প্ৰশ্নেৰ সঙ্গ উপন্যাসেৰ সমস্ত সমস্তাকে ব্যক্তিত্বগুলিৰ পৰস্পৰ সংঘাত সম্পৰ্কজাত এবং স্বনিয়ম সম্বৃত বলে উপলব্ধি না কৰে ঈৰ্ষাৰ প্ৰশ্ন অবান্তৰ।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে মহেন্দ্ৰকে আকৰ্ষণ কৰাব কোনো প্ৰয়োজন বিনোদিনীৰ ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এব পৰ থেকেই বিনোদিনীৰ আকৰ্ষণ মহেন্দ্ৰেৰ কাছে অনিবাৰ্য হয়ে উঠেছে। এই ব্যাপাৰ এবং মহেন্দ্ৰ-বিনোদিনীৰ ব্যাপাৰ এ উপন্যাসেৰ ঘূণ-বায়ুৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নয়, এ ঢটো ব্যাপাবেৰই মূল বিনোদিনীৰ ব্যক্তিত্বে। অপৰেৰ কাছে নিজেৰ প্ৰকৃত মূল্যৰ উপলব্ধি হোক এই প্ৰাণময়ী পিপাসা তার মূল কথা। সে মূল্য কেবল মিঠাই প্ৰস্তুত কৰায় নয়, কুমালে নাম তোলায় নয়, পশমেৰ গলবন্ধ বোলায় এবং সেবাময় ব্যবহাৰে নয়। বিহাৰী যখন এইভাবে বিনোদিনীৰ স্নেহবোধকে জাগ্ৰত কৰল তখন থেকেই বিহাৰী এই উপন্যাসেৰ ঘটনাৰ বা ঘটনাজাত মানসিক ব্যঙ্গবাত্যাব স্ৰষ্টা। এখন দেখা যাক যে মহেন্দ্ৰেৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ স্বৰূপ কী?

এবও যদি এক কথায় ব্যাখ্যা কৰা যায় যে ঈৰ্ষা—তাহলে শুধু লক্ষণ-বিচাৰই হবে। এ-ক্ষেত্ৰেও মহেন্দ্ৰেৰ গোটা জীৱনেৰ প্ৰসঙ্গে মিলিয়ে তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ স্বৰূপকে বুঝতে হবে। প্ৰথম দিকে তাৰ মনোভাব যাই হোক ধীৰে ধীৰে সে বিনোদিনীৰ মূল্য অনুভব কৰেছে। এবং মহেন্দ্ৰ নিজেৰ ভালোত্বেৰ অহংকাৰকে সগৰে আঘাত কৰে বলেছে যে ‘আমি ভালো নই, কিন্তু আমি ভালবাসি’। এ ভালবাসায় আন্তৰিকতা নেই এ-কথা মিথ্যা। বৰঞ্চ বিনোদিনীৰ প্ৰেমে সে সৰ্বস্ব বিসৰ্জন দিতে পাৰে এ-কথা মনে বাখলে তাৰ আন্তৰিকতাকে ভুল বোঝাব অবকাশ থাকে না। তাৰ সঁকট এইখানে যে এই প্ৰেম তাকে কোথাও উত্তীৰ্ণ হতে দিল না। এ-কথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু দিল না কেন এই প্ৰশ্নেৰ উত্তৰে দেখা যায় যে তাৰ সারা জীৱনই এ-পথে বাধা। বিহাৰী সম্বন্ধে জাগ্ৰত মনোভাব বিনোদিনীকে যতই যত্নগায় টেনে নিয়েছে—যতই সে-যত্নগাব শুদ্ধতাকাজীৰূপ মহেন্দ্ৰেৰ কাছে স্পষ্ট হয়েছে ততই মহেন্দ্ৰ নিজেৰ অক্ষমতা বুঝতে পেরেছে এবং এই অক্ষমতায় বিনোদিনীৰ ব্যক্তিত্বৰ কাছে গিয়ে বাৰে বাৰে নিজেৰ পদু

চেহারার উপলব্ধিই মহেন্দ্রের উদ্দেশ্যহীন কার্যাবলীর স্রষ্টা। কাজেই এলাহাবাদের ঘটনায় যখন মহেন্দ্রের কাছে তার পরাজয় স্পষ্ট হয়েছে তখনও সে সমান উদ্দেশ্যহীন থেকে গেছে। উপন্যাসের এই পর্যায়ে দেখা যায় মহেন্দ্র এইবার বাড়ি ফিরবে। অমিতব্যয়ী সন্তান এইবার অন্ততপ্ত হৃদয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। কিন্তু প্রশ্ন—মহেন্দ্রের কোনো পরিবর্তন হল কি? যেমন বিহারীর জীবনে একটা সঠিক নতুন সুর এল, বিনোদিনী উত্তীর্ণ হল তার যন্ত্রণা থেকে, মহেন্দ্র সে ক্ষেত্রে কী লাভ করল তার সমুদয় অভিজ্ঞতা থেকে? কিছুই না। গোবিন্দলাল যেমন বলেছে যে তুমি কে রোহিণী যে তোমার জন্ম আমি ভ্রমরকে ত্যাগ করেছি, মহেন্দ্রেরও তেমনি মনে হল বিনোদিনী স্ত্রীলোক মাত্র। এবং এই জন্ম সে মাকে কাঁদিয়েছে, স্ত্রীকে কাঁদিয়েছে। এব পরে নতমস্তকে স্বস্থানে প্রস্থান। এইটাই উপন্যাসের ক্রটি। মহেন্দ্র পাপকর্মের চেতনা নিয়ে ফিরে গেল। সঙ্গে রইল অন্তশোচনাবোধ। বড়ো জোব সে আর এমন কর্ম করবে না। কিন্তু কোন্ বিশ্বাস তার ভাঙল, কোন্ বিশ্বাস তার গড়ল এ-সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত নেই। ফলে বিনোদিনীঘটিত অব্যয় যেন তার জীবনে একটা দৃঃস্বপ্নের মতো কেটে গেল মাত্র। আগেই বলেছি যে গোবিা ছাড়া ববান্দ্রনাথ কোনো উপন্যাসেই শেষরক্ষা করতে পারেননি। এখানে সেই ক্রটি মহেন্দ্রকে ঘিরে সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়েছে। অনেকে ওপব ওপব আলোচনায় এ-কথা বলে দিতে পাবেন যে বিনোদিনীর বিধবা বিবাহে অসম্মতিটাও ববান্দ্রনাথের আর এক ক্রটি। কিন্তু সেটা ক্রটি বলে পরিগণিত হত অন্য উপন্যাস হলে। বিনোদিনীর চবিত্ত্রের সঙ্গে এই অসম্মতিটা বরং আশ্চর্যভাবে মিলে গেছে সেটা যে-কোনো সমালোচকেরই চোখে পড়ার কথা। এখানে মোটেই ত্যাগজনিত উচ্ছ্বাস নেই। বিনোদিনী আজীবন ব্যবহৃত হয়েছে। আশা তাকে ব্যবহার করেছে, বাজলক্ষ্মী তাকে ব্যবহার করেছে, মহেন্দ্র তাকে ব্যবহার করেছে। আজীবন বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়ে ব্যবহারের সঙ্গে স্বার্থের চেহারা সে মিশিয়ে ফেলেছে। কাজেই নিজের পরম স্বপ্নকে সে আর ব্যবহার করতে চাইল না। এব সঙ্গে জীবনের বিস্তৃত যন্ত্রণা তাকে একটা প্রশান্ত নিরাসক্তির মাঝখানে নিয়ে গেল। কিন্তু এ জাতীয় কোনো উত্তরণ মহেন্দ্রের নেই। তার কারণ মহেন্দ্রের অন্তশোচনা হৃদয়যন্ত্রণার স্তরে উঠেও নেমে গেল। মহেন্দ্রের একটা দৃঢ় ধারণা ছিল যে সব কিছুর মতো ক্ষমাও চাইলেই পাওয়া যাবে। আশার ব্যক্তিত্বহীনতা এর প্রথম কারণ। বিনোদিনীর ব্যক্তিত্ব এর দ্বিতীয় কারণ। আশাকে যদি কৃষ্ণকান্তের

*বিষয়বস্তুর দিক থেকে গভীর মূল্যের অধিকারী হয়েও চোখের বালি, যোগাযোগ, চতুরঙ্গ প্রভৃতি উপন্যাস অপেক্ষা জটিলতার দিক থেকে উচ্চাভিলাষী নয়। শচীশ-দামিনী এবং কুমু-মধুসূদনে, এমন কি নিখিলেশ-বিমলাতেও রবীন্দ্রনাথের নিরীক্ষার বিষয় ছিল অত্যন্ত জটিল। এই উপন্যাসগুলিতে কেউ না কেউ প্রচলিত জীবন-বিজ্ঞাসের কতকগুলো ধারা-ধরনকে আঘাত করেছে। এবং স্বাধীন মুক্ত ব্যক্তিসত্তার পক্ষ থেকেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। কুমু প্রশ্ন, নিখিলেশের প্রশ্ন সে দিক থেকে ব্যক্তির নিজস্ব জীবন ধারণা প্রসূত স্বাধীন প্রশ্ন। এ-প্রশ্ন যেমন জটিল তেমনি দেশ-কালের নিয়মে অন্তর্ভুক্ত। গোরায় সমস্তার এই জাতীয় জটিলতা নেই। সেদিক থেকে এ অনেকাংশে সরল। তার কারণ গোরার সমস্তা তার ব্যক্তি জীবনের সমস্তা হলেও সে সমস্তার একটা জাতীয় মূল বিদ্যমান। সমস্তার একটা সর্বজনীন চেহারা গোরা উপন্যাসে উপস্থিত রয়েছে। সেই জন্তই এই উপন্যাসে দেখা যায় যে গোরার সমস্তা কোনো না কোনো ভাবে প্রত্যেকেই স্পর্শ করেছে। নিজের জন্ম নয়, গোরা বিনষ্ট মূল্য-বোধের উদ্ধার সাধন চেয়েছে সকলের জন্ত। তার ফলে প্রত্যেকেই গোরাকে বুঝতে চেয়েছে, গোবাব অসামান্য যন্ত্রণাকে, তীব্র আবেগকে সকলেই কম বেশি করে সহানুভূতির চোখে দেখেছে। এটা রবীন্দ্রনাথের অন্য উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য থেকে কিঞ্চিৎ পৃথক। কুমকে মধুসূদন কুমু গ্রায়ে উপলব্ধি করতে চাইলে যোগাযোগ উপন্যাসের টানাপোড়েন সৃজিত হতে পারে না। নিখিলেশকে সন্দীপ উপলব্ধি করতেই চায়নি। মহেন্দ্রের পক্ষে বিহারীর ভূমিকা উপলব্ধি করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অথচ গোবা উপন্যাসে অন্তত পক্ষে আনন্দময়ী-পরেশবাবু-সুচরিতা-বিনয়-ললিতা এদের সকলেরই মধ্য গোরাকে উপলব্ধি করার সচেতন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। উপন্যাসটি শেষ অবধি সমান আগ্রহোদ্দীপক থেকেছে এই কারণে যে প্রত্যেকেরই প্রত্যেকে উপলব্ধি করার পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখা দিয়েছে তাদের নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব, নিজ নিজ জীবনচরণ। কেমন করে গোরা সকলকে উপলব্ধি করল এবং সকলে গোরাকে উপলব্ধি করল এটাই এ-উপন্যাসের সমস্তা। সেদিক থেকে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথের অন্য উপন্যাসের তুলনায় গোরা জটিলতার দিক দিয়ে উচ্চাভিলাষী নয়। নিরীক্ষার বিষয়ের দিক থেকে উচ্চাভিলাষের কথাই অবশ্য বলা হচ্ছে। নতুবা অন্যদিক থেকে আবার গোরার ব্যক্তি সমস্তার মূলরূপের এইভাবে সরল ব্যাখ্যা করে তাকে অগভীর বলা যাবে না। বলা যাবে না বেগহীন। বরঞ্চ এ সরল বলেই তীব্রতায় এবং

মানসিক আক্ষেপ ও টানাপোড়েনে অন্ত সমস্ত উপভাসকে ছাড়িয়ে গেছে। গোৱাৰ যন্ত্ৰণাৰ বলিষ্ঠতায় এই গুণগত সমৃদ্ধি ঘটেছে। বলাই বাহুল্য যে ৰবীন্দ্ৰনাথ নিজে এই যন্ত্ৰণাকে উপলক্ষি না কবলে গোৱা চৰিত্ৰে এৰ প্ৰতিফলন সম্ভৱ হ'ত না। আমবা গোৱা আলোচনায় প্ৰথমে দেখাবো যে ৰবীন্দ্ৰনাথেৰ মন নানাভাবে এই যন্ত্ৰণাকে তখন উপলক্ষি কৰছিল। তাৰপৰ দেখাবো যে এই যন্ত্ৰণাকে উপযুক্ত আধাবে স্থাপন কৰাৰ প্ৰস্তুতিও তখন ৰবীন্দ্ৰমানসে নানাভাবে সমাপ্ত হয়েছে। জীবনগত প্ৰস্তুতি এবং শিল্পগত প্ৰস্তুতিৰ এই উপযুক্ত মাহেদ্ৰুপে 'গোৱা'ৰ জন্ম। বলা যেতে পাবে যে ১৮৯০ থেকে গোৱাৰ প্ৰস্তুতি ৰচনা শুৰু হয়েছে। দেশ নামক বৃহৎ ব্যাপাবটা অবশ্য ছিন্নপত্ৰেৰ কালেই ৰবীন্দ্ৰনাথেৰ কাছে স্পষ্ট হতে আবন্ত কৰেছিল। কিন্তু দেশেৰ সমগ্ৰতা থেকে বিচ্ছিন্নতাৰ বোধ এবং তজ্জনিত যন্ত্ৰণা সৰ্বপ্ৰথম বৃহৎ আকাৰে দেখা দিল মেঘ ও ৰৌদ্ৰ গল্পে। যে একাকিত্বেৰ যন্ত্ৰণা গোৱায় শিল্পসুন্দৰ ভাবে দেখা দিল তাবই পৰোক্ষ প্ৰস্তুতি এই গল্পে। এই গল্পটিৰ বিষয়বস্তুৰ এবং শিল্পকৰ্মেৰ বিশ্লেষণ আমবা ৰবীন্দ্ৰনাথেৰ দেশবোধকে উপলক্ষিৰ জন্তুই প্ৰয়োজন মনে কৰি।

বলা বাহুল্য ছিন্নপত্ৰেৰ কালে গ্ৰাম বাংলাৰ ৰূপটি ৰবীন্দ্ৰনাথেৰ কাছে নানাভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গ্ৰামীণ প্ৰকৃতি এ-কালে ৰবীন্দ্ৰনাথেৰ কল্পনাকে বহু স্ত্ৰে স্পৰ্শ কৰে। কিন্তু শিল্পী হিসাবে ৰবীন্দ্ৰ প্ৰতিভাৰ স্বভাব অনন্তসাধাৰণ বলে বোমান্টিক কল্পনাচাৰিতায় তিনি শুধু সেই প্ৰকৃতি চেতনাকে সঞ্চিত কবলেন না, প্ৰকৃতি এবং মানুষকে মিলিয়ে নানা প্ৰশ্নেৰ সৃজন কবলেন নিজেৰ মধ্য। এই প্ৰশ্ন সৃজনেৰ মাধ্যম তাঁৰ শিল্পী স্বভাবেৰ সমগ্ৰতা সন্ধানী বোধ উপস্থিত। তাবই ফলে দুই বিঘা জমিৰ ভূমিহাৰা ৰুশকেৰ যন্ত্ৰণা, চিবস্থায়ী বন্দোবস্তেৰ চেহাৰা তাঁৰ কাব্যেৰ বিষয় হতে বাধে না। পুৰাতন ভূত দুই বিঘা জমিৰ মতো এ-জাতীয় অভিজ্ঞতাৰ বিষয় নিয়ে লেখা কাহিনী কবিতা বা কবিতায় গল্পকে ধাৰণ কৰাব চেষ্টা এ যুগে আব লক্ষিত হয় না। গল্পগুচ্ছেৰ বৃহৎ পৰিসৰে তাৰেৰ সকলেবই ঠাই মিলেছে। পলাতকাৰ কালে গল্প লেখা যখন স্তিমিত হয়ে এসেছে তখন আবাব দৈনন্দিন জীবনেৰ আটপৌৰে ৰূপকে ছন্দে ধৰতে চেয়েছেন পলাতকায়।

দুৰ্বুদ্ধি গল্পগুচ্ছেৰ যুগেৰ আব একটি গল্প যাতেও ৰবীন্দ্ৰনাথ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ একটি বিশেষ চেহাৰাকে ৰূপায়িত কৰেছেন জলন্ত স্পষ্টতায়। এই সমস্ত গল্পে-কবিতায় মধ্যবিত্ত জীবনেৰ নানা বিকাৰ, তাৰ সীমাবদ্ধ জীবন-

চেতনা এবং জীবনের বিচিত্র সম্পর্ক সূত্রগুলির বাধ্যতায় তার অসহায় পুরুষকারের কথা ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চেতনাও নানা ভাবে প্রকট হয়েছে এ-সময়ে। ছবু'ন্ধি গল্পের কথা এ-প্রসঙ্গে অসহায়তার ব্যঞ্জনা য় তাৎপর্যপূর্ণ। পুলিশের দারোগা এই গল্পের একটা প্রধান চরিত্র। স্টেট নামক একটি বৃহৎ যন্ত্রের পুলিশ একটি যন্ত্রাংশ। এবং সে স্টেটও যেহেতু আমাদের সমাজ-বহির্ভূত একটা ব্যাপার (আত্মশক্তির প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) তাই এই দারোগা কোনো অর্থেই মানুষ নয়। না স্বদেশী সমাজের অর্থে, না বিদেশী অর্থে। সাধারণ মানুষ হিসাবে গল্পের নায়ক—এখানে গল্পের ‘আমি’—দারোগার সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষার যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। কিন্তু মানুষের নিজ জীবনের দুঃখের মূল্য মানুষের কাছে অসীম। এই দুঃখ তার চিৎরতির বিস্তার সাধন করে। দুঃখের হোমানলে পুড়িয়ে তাকে শুদ্ধতার দিকে নিয়ে যায়। ছবু'ন্ধি গল্পের নায়কের কত্যা-বিয়োগ গল্পের সুবিধাবাদী মেরুদণ্ডহীন নায়ককে সেই দুঃখের প্রসাদ খানিকটা এনে দিল। ফলে নিজ দুঃখে আর্দ্র মনের সহানুভূতিতে সে একদিন সর্পদৃষ্ট মৃত সন্তানের পিতাব ওপরে অত্যাচারপরায়ণ দারোগার হৃদয়হীন নৃশংসতার তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠে। এইটাই তার ছবু'ন্ধি। কেননা বহু কালের অনভ্যাসে মধ্যবিত্ত পৌরুষ যে পরিমাণে ফোঁস করে উঠল—সে পরিমাণেই দ্রুত দারোগার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে বিরোধ মিটিয়ে নিতে চাইল। মধ্যবিত্তের ক্ষণিক শুভেচ্ছাব ক্লীব চেহারা পরিস্ফুট হল। মেঘ ও রৌদ্র এর চেয়ে অনেক বিস্তৃত পটে ধৃত গল্প। যে দেশ-দৃষ্টি, খণ্ডিত অস্তিত্বের যে চেতনা গৌরা উপন্যাসে আরো সুগভীর তাৎপর্যে বিকশিত এই ছোট গল্পে তারই অঙ্কুর। বস্তুত মেঘ ও রৌদ্র গল্পটি তার না-হোক দশটি পরিচ্ছেদ, কিছু ঘটনা-বাহুল্য এবং মনোবেদনায, ব্যঙ্গ ও ভাবাতিরেকে রবীন্দ্রনাথের গল্প সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অক্ষুণ্ণ গৌরবের স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো এ-কথা ঠিক যে ছোট গল্পের কাঠামোর কঠিন অনুশাসনের মর্যাদা গল্পটি রাখতে পারেনি, হয়তো এও সত্যি যে এই গল্পে লেখক বহুবাব গল্পের ভিতরে প্রবেশ কবেছেন, তার মধ্যে দু-একবার হয়তো অনধিকার প্রবেশ, তবু গল্পের সঙ্গে আমাদের এক সময়ের জাতীয় চরিত্র ও দেশকালের চেহারা এমনভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের এই বহুপঠিত গল্পটির আলোচনা করা বোধ হয় কেবলমাত্র লেখনী কণ্ডুয়ন নয়। এই গল্পের মাধ্যমেই বোঝা যাবে যে মধ্যবিত্ত জীবনের খণ্ডায়নের ব্যাপারটিকে রবীন্দ্রনাথ কী রূপে দেখেছিলেন। মেঘ ও রৌদ্র রবীন্দ্রনাথের

সেই শ্রেণীর গল্প যেখানে কবি মানবিক আবেগের তাড়নায় গল্পের শিল্পধর্মকে ক্ষুণ্ণ করেছিলেন। তবুও রবীন্দ্রনাথের যে শ্রেণীর গল্প, অর্থাৎ গল্পের মূল লক্ষ্য ঘটনার মানবিক মর্যাদাস্থিকতা বর্ণনা, মধ্যবিত্ত জীবনের ঔপনিবেশিক নিঃসহায়তার আক্ষেপ অঙ্কন—মেঘ ও রৌদ্রও সেই ধরনের অনন্য গল্প।

গল্পটির রচনাকাল বাংলার তের-শ দুই সাল। সময়টি জাতীয় ভাবাকাশে নবগ্রহ সমাবেশের যুগ। কংগ্রেসের জন্ম হোক বা না হোক, সিপাহী-বিদ্রোহের অতি প্রত্যক্ষ প্রভাবেই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিবাদী সন্ত্রাসবাদে আসক্ত হয়ে পড়েছিল। সিপাহী-বিদ্রোহে গণ-বিস্তৃতি কল্পনা করা এঁদের পক্ষে যদিও সম্ভব ছিল না, তথাপি সশস্ত্র অভ্যুত্থান ব্যতীত উদ্ধার নেই, এ-সত্য মধ্যবিত্ত সমাজের কল্পনাপ্রবণ অংশ অন্তর্ভব করেছিল।

কিন্তু এ-আলোচনার পূর্বে মেঘ ও রৌদ্র গল্পের কাঠামো সূত্রাকারে বর্ণিত হওয়া দরকার বোধ হয়। শশিভূষণ গল্পের নায়ক। ক্ষীণজীবী, স্বল্পদৃষ্টি বাঙালী ইন্টেলেকচুয়ালের চরিত্র। টুর্গেনিভের নিহিলিস্ট ইন্টেলেকচুয়ালের মতো সেও গ্রামবাসী। গিরিবালা, দশম বর্ষীয়া নায়িকা, শশিভূষণের . . . সখি বলাই সম্ভব। এই সংবেদী কাহিনী গল্পটিতে একটি করুণ আবহ সঙ্গীতের মতো সর্বদাই বেজে চলেছে। আর এই সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইংরেজ সাম্রাজ্যগর্বীর ঔদ্ধত্য, পরজাতিক বণিক শক্তির হাতে দেশী গ্রামীণ সমাজ প্রেক্ষিজের ও স্বল্পোন্নত যন্ত্রশক্তির নির্মম, নিষ্ঠুর পরাজয়, এবং জনসাধারণের বিমূঢ়তা তৎসহ দেশী সামন্তবর্গের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভূমিপ্রণত সেলাম গল্পটির মধ্যে একের পর এক বা একসঙ্গে ছায়াপাত করেছে।

এদিক দিয়ে গল্পটি আমাদের জীবনের এক বিমূঢ় আত্মির আর তজ্জনিত চাকুলোর প্রতীক হয়ে রইল। বলা যেতে পারে গল্পের জাতীয় পটভূমির বিস্তারে এবং ঋজুবাচনের সঙ্গে অসহায় দেশপ্রেমিকের বার্থতার যাতনায় গল্পটির ভিতরে ‘গোরা’ রচনার বীজ নিহিত। একই দেশকালের ধারণা এখানে সবে অঙ্কুরিত। ওখানে তা বনস্পতির মর্যাদায় পূর্ণ। মেঘ ও রৌদ্র গল্পে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী বিচারবত্তার প্রতি কবির মনোভাব মোটে অপ্রকট থাকেনি। নীলদর্পণ রচনার সময়েও বাঙালী বুদ্ধিজীবীর ব্রিটিশ গবনমেন্টের সেন্স অফ জাষ্টিসের প্রতি আস্থা ছিল এ-প্রমাণ পাওয়া যায়। মহারানীর হৃদয় প্রজাপুঞ্জের দুঃখে সতত কাতর, এক্সিকিউটিভ যাই হোক না কেন, এই সিপাহী-যুদ্ধোত্তর ভাবনায় লেখকবর্গ কিছুটা আচ্ছন্ন ছিলেন এ-কথা ঠিক। বলা বাহুল্য চাকুরি-প্রাণ মধ্যবিত্তের

আর্থিক নির্ভরতাই এর একমাত্র মূল নয়—ইংরাজি পাঠশালার বাধ্যতামূলক শিক্ষানবিশীও এর মূলে। তবে সেই সেন্স অফ জাষ্টিসের প্রতি বিশ্বাসের ভিত টলেছে এ-সাক্ষ্যও নীলদর্পণে পাই।*

মধ্যবিত্ত কংগ্রেসী আবেদন-নিবেদনের পালা শুরু হবার আগে—অনেক আগে থেকেই জাতির শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে সশস্ত্র প্রতিরোধের ধারা বয়ে চলেছিল এ-কথা ঐতিহাসিক সত্য। নীলকরদের বিরুদ্ধে নদীয়ার দিগম্বর বিশ্বাস ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাসের সশস্ত্র আন্দোলন সংগঠন (১৮৬০) এবং আরো খণ্ড খণ্ড ঘটনা এর সাক্ষ্য। ‘জ্যোতি-দাদা’র উদ্যোগে স্থাপিত সঞ্জীবনী হিন্দুমেলায় সাহেব পুলিশদের সঙ্গে ইষ্টক যুদ্ধ বা সভার কাহিনী এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয়।

১৮৭৪-৮০ সালের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটক ‘শরৎ-সরোজিনী’র বা ‘সুরেন্দ্র-বিনোদিনী’র যে পরিচয় শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন মারফত আমরা পাই তাতেও দেখি সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ব্যতীত সাফল্য নেই এমন দেশপ্রেমাত্মক ইঙ্গিত। এব মধ্যে দ্বিতীয় নাটকের অভিনয়ের জন্মই ইংরাজ সরকার দেশীয় রজ্যালয় নিয়ন্ত্রণ আইন পাস করে। এ-কথা দুটি বলাব উদ্দেশ্য এই যে সে-সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিত্তবৃত্তি এবং জনতার প্রতিরোধবৃত্তি কোন পন্থার পন্থী হয়েছিল তা বিবৃত করা। দিগম্বর বিশ্বাস এবং বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস যে ভাবে বাস্তবে অভ্যুত্থান সংগঠিত করেছিলেন আর উপেন্দ্রনাথ যে ভাবে নাটকে রোমাণ্টিক বিপ্লবী উন্মাদনার সন্ত্রাসবাদিতার উদ্গাতা হয়েছিলেন, লক্ষ্য করলেই তার মধ্যে একটি পার্থক্য নজরে পড়বে। তা হল এই যে আন্দোলনের স্বাক্ষর ও বেগবত্তা নির্ণয়ে উপেন্দ্রনাথ দাস, তথা বাঙালী মধ্যবিত্তের অক্ষমতা। নিশ্চয় এ-কথা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে অসহায় বিক্ষোভের পাদপীঠে সন্ত্রাসবাদের জন্ম, উপেন্দ্রনাথ তার প্রথম লেখক। এভাবে সে-সময়ে বাস্তবে ও সাহিত্যে, ঘটনার তির্যক ও ঋজু দুই রূপ আমরা দেখি।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গল্প মেঘ ও রৌদ্র সাহিত্যে জাতীয় বেদনার উৎস-সন্ধানের প্রথম সার্থক চিহ্ন—কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার আংশিকতা সত্ত্বেও। এবং এ-আংশিকতা নানাভাবে দূর হয়েছে পরবর্তীকালে গৌরা উপাঙ্গাসে।

নৈবেদ্যের কবিতা রচনার কাল এই গল্পটির রচনাকালের কাছাকাছি। লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের জাতীয় যন্ত্রণার মৌল ভাবভূমিতে সৃজিত কবিতার সঙ্গে ঐ একই ভাবভূমিতে গঠিত গল্পের একটি স্বাভাবিক পার্থক্য

* সভ্যতার সংকটে রবীন্দ্রনাথের এ-বিষয়ে উক্তি স্মরণীয়।

আছে। দেশপ্রেমাত্মক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অনেকখানি abstract ভাবাদর্শী এবং ভগবৎনির্ভর। কিন্তু এ-শ্রেণীর ছোট গল্পে এক কথায় বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ সার্বজনীন জাতীয় বাস্তবতার স্বরূপ-ব্যাখ্যাতা। এ সকল ক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথকে অনেকখানি প্রত্যক্ষ, ব্রিটিশ প্রজার প্রাকৃত ঘৃণার প্রদীপ্ত ভূমিকায় পাই। দেশপ্রেমী কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মধ্যবিত্তের আত্মিক প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ ঋষি। নৈবেদ্যের যে-কোনো সনেটই এর প্রমাণ। কবির গল্প উপন্যাসে ফরাসদাঁরকে দেখি, (গোরা-চরঘোষপুরে) সে সটান লাঠি চালিয়ে নীলকর সাহেবের হাত ভেঙে দিয়েছিল। এই রক্তমাংস সমন্বিত ক্রোধকে লিরিকে বা লিরিকাল সনেটে ধরা যায় কিনা—সে প্রশ্ন না তুলেও বলা যায় রবীন্দ্রনাথ ধরেননি। মেঘ ও রৌদ্রে সেই জাতীয় ক্রোধ-বিক্ষোভ ঠাঁই পেয়েছে।

এখন আমরা শশিভূষণ, মেঘ ও রৌদ্রের নায়কের পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করব। শশিভূষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধর। সে যুগের ইন্টেলেকচুয়াল। তাব স্বল্পদৃষ্টি অকুণ্ঠনকে লোকে ভাবত ঔদ্ধত্য। ইংরাজি শিক্ষা জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে কেমন করে সম্পর্কশূন্য কবে ফেলেছিল, শশিভূষণের একক নৈঃসঙ্গ্য তারই চিহ্ন। শশিভূষণ জনতাকে এড়াতে চাইতেন—‘বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণাই বর্তমানে স্বাভাবিক’ এই মনোবৃত্তিতে। তাঁর আইনজ্ঞান ছিল। শুধু ছিল যে তা নয়, আইনের সর্বশক্তিমতায় ঊনবিংশ শতকেব এই বিচ্ছিন্ন ইন্টেলেকচুয়াল প্রথমে বিশ্বাসীও ছিলেন। হয়তো আদালতেব ধর্মাবতারকে তার সাধনার জায়াধিকরণ বলেই মনে হত। স্বভাবতই সকল প্রকার ইহ-কর্মের প্রতি অনাস্থাশীল, নব্য ইতিহাসের পানপাত্রের ফরাসী-বিপ্লবের ভাবমন্ত্রের আসব-পায়ী এই যুবক তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমে সকল ঔপনিবেশিক বিক্ষোভের যুক্তি খুঁজবে এতে আশ্চর্য কী। শশিভূষণ হয়তো হিতবাদী, বা বন্ধিমচন্দ্রের কৃষকের কথা পড়া মধ্যবিত্ত যুবক। ফলে কৃষকজনতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ-ভাবে সংযুক্ত না থেকেও সে জমিদারী জটিলতার শিকার এই বিমূঢ় মানুষগুলি সম্বন্ধে মানবিক সমবেদনা অনুভব করত। এই মানবিকতাবাদ ঊনবিংশ শতকের বুর্জোয়া শিক্ষালব্ধ পাশ্চাত্য মানবতাবাদ। এই শিক্ষার আলোকেই সে নিজের বিষয় সম্পত্তিতেও নিস্পৃহ ছিল।

শশিভূষণের কাব্যবোধ কিন্তু জীবন থেকে প্রয়াণের মাধ্যম। কেননা যে জ্ঞানচর্চার আড়ালে নিজেকে উদ্ধ করে রাখার দিকে তার আগ্রহ, তার ভিতরেও আমরা এক যুগবৈশিষ্ট্য-চিহ্নিত মধ্যবিত্তের সাক্ষাৎ পাই। টুর্গেনিভের নিহিলিস্ট চরিত্র

বাজারভেও এমন ধারাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আসক্তি, বিরক্তি কেবল তার কাব্যে। আমাদের শশিভূষণ কাব্যের ভক্ত এবং গিরিবালায় প্রীতি-মুগ্ধ।

গল্পের উদ্দিষ্ট এবং অভীপ্সিত ঘটনাজাল বিস্তৃত হবার আগেই শশিভূষণের শাস্তদৃঢ় নিষ্পৃহতার ফলস্বরূপ নায়েব হরকুমারের সঙ্গে প্রজ্ঞাশাসন নিয়ে বিবাদ হল। এইখান থেকে মেঘ ও রৌদ্রের ঐতিহাসিক ঘটনাত্রয় ও শশিভূষণের প্রতিক্রিয়া শুরু। শশিভূষণ গ্রাম ছাড়ি-ছাড়ি করছে এমন সময় জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের তাঁবু পড়ল গ্রামে। ব্যাপারটি যেন নিস্তরঙ্গ ডোবায় প্রকাণ্ড একটি প্রস্তর থণ্ড। তারপর সাহেবের মেথরের সঙ্গে নায়েবের সংঘাত—সাহেবের কুকুরের জ্ঞা চারিসের ঘৃত-আবদার এবং সাহেবের হুকুমে প্রকাশ্য জনারণ্যে মেথরের হাতে হরকুমারের লাঞ্ছনা, মেঘ ও রৌদ্রের পাঠকেবা সবই জানেন।

শশিভূষণ এই অত্যাচার প্রত্যক্ষ কবল। ব্রাহ্মণ্যের জাত্যভিমান অসং ঘুষখোর সাহেবের কাছে কিছু নয়, অত্যাচারের এই চারিত্র্য ও এই স্বরূপাই তখনকার মতো আমাদের আর শশিভূষণের ভরসা। প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রতীক অবশ্যই হরকুমার হোন এ-অভিপ্রায় রবীন্দ্রনাথের ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যের জাত্যভিমান সাহেব লোকেব সহজেই অসহ্য বোধ হয় এই উক্তির মধ্যে ভারতীয় বা-কিছুর প্রতি সাহেব-লোকদের মনোভাবে যে ঔপনিবেশিক স-বুট দাপটের দেখা মিলত তার ছবি যথায়থ হয়ে ফুটেছে। মেথব যে হরকুমারের বিরুদ্ধে সাহেবের কাছে নালিশ কববেই এব মধ্যে উচ্চবর্ণের প্রতি ‘অন্যাজে’ব ঘৃণা না হোক সহানুভূতির অভাবের সাক্ষাৎ পাই। নালিশের চবিত্রটি অন্তত বর্ণবিভক্ত ধর্মীয় সমাজের ব্যর্থতাব পরিচয় এতে সন্দেহ নেই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যগর্বী দাপটের যে বৈশিষ্ট্য এখানে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তা কিন্তু অত্যাচারেব একটা প্রাথমিক রূপ। এই অমানবিক লাঞ্ছনার চোট দেহে যতটা তাব থেকে অনেক বেশি মনে। কাপুরুষ হরকুমার হয়তো দ্বিধায় এ-লাঞ্ছনা পকেটস্থ করতেন। কিন্তু শশিভূষণ তখন গ্রামের তিলমাত্র বিবেক। স্বভাবতই শশিভূষণেব ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যজনিত মর্ষাদাবোধ হরকুমারকে উত্তেজিত কবল। লক্ষ্য করলেই এটা ধরা পড়ে যে প্রতিবাদের বা প্রতিরোধের যে বীজ অঙ্কবিত হল তা যেন একান্তই আইনাশ্রয়ী। ঈর্ষাজের বিচারবস্তার প্রতি মে আস্থা শশিভূষণেব তা এককালের সমস্ত শেক্সপীয়র-বার্ক-মেকলে-বায়রন পড়া বাঙালীর। তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার প্রাথমিক সাধনা আরম্ভ কবেছিলাম, কিন্তু অন্তরে ছিল ইংবাজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। কিন্তু এই ‘law and order-এব

দয়োনানিতে' বিশ্বাস যে বেশিদিন আব বাখা চলে না শশিভূষণেৰ অভিজ্ঞতা
থেকে তখনকাৰ দিনেৰ অসংখ্য শশিভূষণ এই কথাই শিখল। এই ব্ৰাহ্মণ-ঘটিত
আখ্যানেৰ কিছুকাল পৰে ববীন্দ্রনাথ অনুৰূপ বিষয়েৰ ওপৰ স্থাপিত 'ভাবতবৰ্ষ'
গ্ৰন্থেৰ 'ব্ৰাহ্মণ' প্ৰবন্ধ লেখেন। তাতে সামাজিক প্ৰেক্ষিত্তেৰ স্বৰূপ ব্যাখ্যা কৰেন।*
আইনেৰ বৃহৎ যন্ত্ৰেৰ বন্ধগত শনি শশিভূষণেৰ ন্যায়পিপাসা অকালে মিটিয়ে দিল,
যেমন গোবায় গোবাব আইনেৰ কাছে সুবিচাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ আশা অচিৰে মিটে
গিয়েছিল। এই নব্য-ইতিহাস পড়া যুবক এই কথাটি বোঝেনি যে চিবস্তায়ী
বন্দোবস্তেৰ দাসানুদাস জমিদাৰ নন্দন বিদেশী পণ্যপতিৰ স্বাৰ্থবক্ষী ম্যাজিষ্ট্ৰেটেৰ
ইন্ধিতৈৰ অপেক্ষা বাগেন মাত্ৰ। আব শশিভূষণেৰ আইনজ্ঞান যথেষ্টই ছিল,
কেবল বাণিজ্যানেৰ একটু অভাব ছিল। কাৰণ হবকুমাৰ তোৰাপ নয বা
ফকুসদাৰ নয়—সুতৰা* হবকুমাৰ শঙ্কৰেৰ মতো গুটিয়ে গেলেন।

এ-ঘটনা যখন ঘটছে তাৰ পৰবৰ্তীকালই বাঙালী মধ্যবিত্ত যুবকদেৰ সন্মাসবাদী
কাৰ্যকলাপেৰ যুগ। জাতীয় চেতনাৰ ক্ৰমবিকাশেৰ যে অভিজ্ঞতাৰ স্তৰগুলি
পাৰ হযে গিপ্ত মধ্যবিত্ত ব্যক্তি স্বাভাব্যবাদী চিন্তায় সন্মাসেৰ আশ্ৰয় নেয এখানে
তাবই সুস্পষ্ট কয়েকটি স্তৰ চিহ্নিত হযেছে। জানলাৰ কাছে দাড়িয়ে হাত-পা
নেডে বন্ধতা ভেঁজে বাতাবাতি বাকু হবাৰ প্ৰযাসে চিত্তেৰ যে চাঞ্চল্যেৰ প্ৰকাশ
তাই বাৰ্থতাৰ পৰ বাৰ্থতাৰ ভিতৰ দিয়ে সন্মাসবাদী বিক্ষোভেৰ আশ্ৰয় নিল।

স্বিমাবেৰ সঙ্গে নৌকাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ যে ঘটনা পৰবৰ্তী পৰিচ্ছেদে ব্যবহৃত
হযেছে তাও সনিশেষ ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যেৰ দ্বাৰা চিহ্নিত। দেশী গ্ৰামীণ
অনুন্নত যন্ত্ৰ ইওবোপেৰ পণ্যবিল্পেৰেৰ অভূতপূৰ্ব যন্ত্ৰশক্তিৰ সঙ্গে কী অসম প্ৰতি-
যোগিতাৰ মধ্য পডল মেঘ ও বোদেৰ এই ঘটনাটি তাৰই প্ৰতীক। দেশী নৌকা
গুলি বৰে ডুবিয়ে দেওয়াৰ সঙ্গে দেশী তাতিদেৰ বুডো আঙুল কেটে দেওয়াৰ
খুব বেশি পাৰ্থক্য নেই। এই সঙ্গে দেশী শিল্প প্ৰচেষ্টাৰ যে-কোনো বাৰ্থতাৰ কথাই
হযতো ববীন্দ্রনাথেৰ মনে ছিল। 'জীৱন স্মৃতি'তে বৰ্ণিত সেই নবোদ্ভাবিত
গামছাৰ কলেৰ, বা জ্যোতিৰিন্দ্রনাথেৰ স্তিমাব কোম্পানিৰ সঙ্গে ইংৰাজ
কোম্পানিৰ বাৰ্থ প্ৰতিযোগিতাৰ কাহিনী এ-প্ৰসঙ্গে স্ববৰ্ণীয়। ববীন্দ্রনাথ

* কোনো মহাবাহীৰ ব্ৰাহ্মণৰ পৃষ্ঠে কোনো সাত্ৰেৰ পাছুকাষাত কৰেছিলেন। মফস্বল বাংলায়ও
হয়তো এ-জাতীয় ব্ৰাহ্মণ অবমাননাৰ দৃষ্টান্ত দুৰ্লভ ছিল না। ববীন্দ্রনাথ বলেন যে প্ৰেক্ষিত্ত কৰ্মনিৰ্ভৰ।
ব্ৰাহ্মণেৰ কৰ্ম-চাতিৰ পৰ প্ৰেক্ষিত্তজবও অবমান ঘটেছে। তাই অপৰেৰ পক্ষে অপমান সহজ
হযেছে।

তাঁৰ শুদ্ধ তেজস্বী মানবতাব জন্ম এই অসম প্ৰতিযোগিতাৰ যেনেকৈ প্ৰভুত্বৰ^{*} মদগৰ্ব সেনিকৈ ক্ৰুদ্ধ দুৰুপাত কৰেছিলেন।

গল্পে প্ৰভুত্বগৰ্বী ইঙ্গ-শক্তিৰ এই দ্বিতীয় অত্যাচাৰেৰে ৰূপ প্ৰথমটি অপেক্ষা অনেক বেশি ইঙ্গিতবহু, অনেক বেশি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। স্বাভাৱিক, ফ্লোটিলা ষ্টিমাৰ কোম্পানিৰ সঙ্গ উক্ত অক্ষম প্ৰতিযোগিতাৰ কথা কৰিব মনে এ-ক্ষেত্ৰে কাজ কৰেছিল। কেবল সামন্তযুগীয় মযাদাবোধই ধূলাবলুষ্ঠিত হ'ল তা নয়, এই পাশ্চাত্য সাম্ৰাজ্যশক্তি তাৰ চেয়ে বড়ো এক ইতিহাসেৰ হাতিয়াৰ হয়ে এদেশে এসেছে—এই তত্ত্বৰ আভাসও এই ঘটনায় আছে। শশিভূষণেৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও লক্ষ্য কৰাব মতো। এখানেই ঘটনাৰ ক্ষব্ধাৰ স্পৰ্শে সে প্ৰথম অনুভব কৰল যে ক্ষুধাৰ সঙ্গ খাণ্ডেৰ মতো, ক্ৰোধেৰ সঙ্গ শাস্তিৰ একটা আশু সম্বন্ধ থাকা দৰকাৰ। আইনেৰ মন্দ গতিতে শশিভূষণেৰ শাস্ত বক্ত টগবগিয়ে উঠল। এই আইনেৰ পৰিণামে সে বিস্মিত না হয়ে এবাৰে বিচলিত হ'ল।

এব পৰেৰ ঘটনা সংক্ষিপ্ত কিন্তু কেন্দ্ৰীয় গুণসম্পন্ন। জেলেদেৰ জাল খেতাঙ্গ সাম্ৰাজ্যবাদী প্ৰভুপ্ৰবৰ কেটে দিলেন। যা তাৰ বাছে কীড়া তা অপৰেৰ কাছে পীড়া। শশিভূষণ এই তৃতীয় ঘটনায় আব আইন খুঁজলেন না, পুলিসে গেলেন না—সাহেবকে প্ৰহাৰ কৰলেন। প্ৰহাৰ ক্ৰিয়াৰ বিশেষণে বদান্ধনাথ বলেছেন 'বালকেৰ মতো, পাগলেৰ মতো, শশিভূষণ মাৰিতে লাগিলেন।' (গোবাও মোকদ্দমায় বার্থ হয়ে অন্য ঘটনায় পুলিসকে প্ৰহাৰ কৰিছিল।) বালকেৰ মতো, কেননা তোৰাপ, বিশ্ব বিশ্বাস, দিগম্বৰ বিশ্বাস ফকসদাবেৰ আন্দোলন ও সংগ্রামেৰ শিক্ষা যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গ্ৰহণ কৰেনি। বালকেৰ মতো, কেননা বিক্ষোভেৰ জলন্ত মুহূৰ্তেৰ অবাজনীতিক পদক্ষেপে শশিভূষণ, ক্ষুদিৰাম কানাই সকলেই যে একক। বালকেৰ মতো, কাৰণ আঘাতেৰ প্ৰাথমিকতায় সকলেই যে অক্ষম।

আব পাগলেৰ মতো, যেহেতু বিক্ষোভেৰ চণ্ডমুহূৰ্তে ঔপনিবেশিক দাসবক্তাও ভাবসাম্য হাবিয়ে ফেলে। সন্তাসী মাত্ৰেই সে উদ্দীপনায় পাগল। ক্ৰোধেৰ সঙ্গ শাস্তিৰ নিকট-সম্পর্ক চিন্তা আবেগ-কম্পিত মুহূৰ্তেৰ চিন্তা। তাৰ মৰ্য্যে বয়স্কৰ মননেৰ স্থৈৰ্য নেই, ফলে তোৰাপেবা মাৰে এবং বৰা পড়ে না—শশিভূষণেৰ মাৰে এবং My mission is over বলে ধৰা পড়ে। তোৰাপেৰ মাৰ দৰ্শকে প্ৰবুদ্ধ কৰে, শশিভূষণেৰ মাৰ বালকেৰ এবং পাগলেৰ মতো বলেই শুধু সহানুভূতি আনয়ন কৰে আব কিছু নয়। তাই সন্তাসবাদকে লোকে সমবেদনা জানিয়েছে কিন্তু এ-বাজনীতিকে জনতা জীৱনস্থ কৰেনি। জেলে যাওয়াৰ কালে

শশিভূষণেব যে নৈবাস্তম্যমণ্ডিত উক্তি তাও সন্ত্রাসবাদী বা মিহিলিস্টেরই নৈরাশ্রের সদৃশ। ‘অপবোধীৰ সংখ্যা জেলে পৰিমিত, জেলের বাইরে অপৰিমিত’ এ সিদ্ধান্তে শশিভূষণেব বিক্ষুব্ধ নৈরাশ্রের পরিচয় মেলে। অবশ্যই শশিভূষণ চার অধ্যায়েব অতীনেব মতো সংগঠিত সন্ত্রাসবাদী দলভুক্ত নয়—কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, যে-ঐতিহাসিক ঘটনাস্তব পাব হয়ে বাঙালী যুবক সন্ত্রাসবাদী হল শশিভূষণে তাব নিশ্চিত স্বাক্ষর। গোবার কাবাববণের সঙ্গে এই অংশের গভীর সাদৃশ্য বর্তমান তা সহজেই নজবে পড়ে। গল্পেব সঙ্গে সোনার স্মৃতিব মতো জড়িয়ে আছে গিৰিবালাব কাহিনী। কিন্তু প্রশ্ন এই যে গল্পেব সঙ্গে গিৰিবালাব যোগাযোগ কতখানি অনিবার্য এবং কতখানি আরোপিত। এক অজ্ঞাত-যৌবনা, দশমী কণ্ঠাব অকাল বিবাহ শশিভূষণেব সাহেব প্রহাবেব পূৰ্বেকাব বিচলিত চিত্ততাৰ জনক এ-কথা বললে শশিভূষণকে সবটা ব্যাখ্যা কৰা হয় না, না বললেও আবাব ব্যাখ্যা অসম্পূৰ্ণ থাকে। শশিভূষণ ও গিৰিবালাব অসম সাথীত্বও বাল্যপ্রণয়েব অভিশাপকে এড়াতে পাবেনি। গিৰিবালা ও শশিভূষণেব পুনর্দর্শনেব অধ্যায় যদি চেখভের হাতে পড়তো তাহলে চেখভ নিশ্চয়ই লিখতেন যে জটিলতাৰ এবাব থেকেই শুরু। ববীন্দ্রনাথ তা না কবে একেবাবে বিপুল লিবিৰ ভাবাবেগে শশিভূষণেব টেববিজ্ঞমেব পবেব অনিবায সিনিসিজমেব হাত থেকে তাকে বাচাতে চেযেছেন।

বিধবা গিৰিবালাকে দেখে শশিভূষণেব অশান্ত নৈবাশ্রের উপশম হল। গল্পেব এই অংশে নিঃসন্দেহে শিল্পবুদ্ধিৰ ব্যত্যয় ঘটেছে এবং ববীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে বাস্তবকে পৰিহাৰ কৰে উৰ্ব্বপ্রয়াণ কৰেছেন। গিৰিবালা ও শশিভূষণেব পুনর্মিলন হৃদয়েব কোন ধৰ্মেব ভিত্তিতে হল তা গল্পেব পবেও অবোধ্য থাকবে। গিৰিবালা বিধবা। কিন্তু তাব সংসাব-ভূমিকা আমাদের কাছে স্পষ্ট হল না। গিৰিবালাব বাড়িতে কাবামুক্তিৰ পৰ শশিভূষণেব আশ্রয়েব স্বৰূপই বা কী তাও ঠিক বোঝা গেল না। মিলনেব অশ্রু-বাপ্পোচ্ছ্বাসে গিৰিবালা, গল্পেব প্রথম থেকেই যেমন জানলাব বাইবে, গল্পেব শেষেও তেমনি গল্পেব বাইবেই বয়ে গেল।

কিন্তু জ্ঞাতে অজ্ঞাতে শশিভূষণেব বিক্ষোভেব মুহূর্তে যেমন সন্ত্রাসবাদিতাব জন্মকাল সূচিত হযেছে, গল্পেব উপসংহাবে তেমনি তাব গবণও সংকেতায়িত হযেছে। কেননা গিৰিবালাব আস্থানে আব যাই থাক সংগ্রামের সংকেত নেই—শুশ্রূষা বা সান্ত্বনা থাকতে পাবে। সেই শুশ্রূষায় এবং সান্ত্বনায় শশিভূষণেব ব্যক্তি-জীবনেব আৰ্তিই লক্ষণীয়—জাতীয় মানসের বিক্ষুব্ধ পটভূমিকা হিসাবে

ব্রিটিশ কলোনি সেখানে স্থান পায়নি। ফলে শশিভূষণ গল্পের শেষে কিছুটা নওর্থক না হয়ে গিয়ে পাবেনি।

এর কাবণ এই যে শশিভূষণ কর্মময় জীবনে কিংবা সে-জীবনের ক্রমপরিণতি ও বিস্তৃতিতে আস্থাশীল ছিল না। গোবাব প্রবল পুরুষকার শশিভূষণেব নয়। তাই গোবা যেমন চব্বোমপুবেব মুসলমান প্রজাদের সক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের সশ্রদ্ধ-সংবাদ রাখত শশিভূষণ তা রাখত না। ফলে শশিভূষণেব আইনামুগ প্রতিবিধান-প্রয়াসে হিতবাদ এবং শাবীবিক বিক্ষোভ প্রদর্শনে মধ্যবিত্তেব একক সন্তাসবাদী প্রচেষ্টা। প্রচেষ্টা যখন বিডম্বিত হল তখন সে অতটা নিবাস হয়ে পড়ল।

নিহিলিস্টদেব-অ্যানার্কিস্টদেব একটা 'যেনতেন' দর্শন ছিল। বাষ্ট্র, প্রেম, ব্যক্তি সম্বন্ধে তাদের একটা সংজ্ঞা নির্দিষ্ট বাখাব চেষ্টা ছিল। শশিভূষণবা সেই শ্রেণী-ভুক্ত বাজনৈতিক সন্তাসবাদী নয়। এ-উপনিবেশেব কেবানী-উকিল-মাস্টার অধ্যুষিত মধ্যবিত্তেব স্বাধীনতা যুদ্ধেব প্রথম স্তর মাত্র। স্ততবাং এব যেমন দুর্বলতা তেমন আস্তবিকতা। শশিভূষণে তা সর্বদাই প্রতিফলিত হয়েছে। গোবা উপন্যাসে গোবাকেও বাষ্ট্র ভাবনায় বিশেষ ভাবিত দেখা যায় না। তাব কাবণ পবে ব্যাখ্যা কবা হবে।

মেঘ ও বৌদ্রেব গল্প বচনাব সময় থেকেই গোবা বচনাব মানসিক প্রস্তুতি পর্ব। এই গল্পে যেমন ঘটনাব বিস্তার, যেমন বিলম্বিত লয়, যেমন প্রকৃতি-মানুষ-সমাজ ও ব্যক্তিব একত্র প্রতিফলন তা উপন্যাস বক্ষণাক্রান্ত। সর্বোপরি এখানেই প্রথম জাতীয় বেদনা, তাব পবানীনতাব স্থল ও স্তম্ভ রূপ সাহিত্যভাত হয়েছে। গোবায় যে মহাকাব্যোচিত বিস্তার এবং গোটা ভাবতেব মর্ম ও কর্মেব প্রতিনিবিত্তেব পরিচয় মেলে তাব স্তত্রপাত মেঘ ও বৌদ্রে। সেদিক দিযে গল্পটিব সার্থকতা অনন্ত। মেঘ ও বৌদ্রেব শৈথিলা মহাকবিব জাতীয় বেদনায় অতি উত্তেজনা-জনিত। এই বেদনাকে গড়ে পিঠে সাজিয়ে গোবা-বচনা। গোবায় যা সূর্য বা মণীকহ, ১৩০২ সালেব অনবিকার প্রবেশ ও মেঘ ও বৌদ্র গল্পে তাই উদীয়মান বা অঙ্কবিত।

গল্পে শশিভূষণেব উপসংহাবে যে শিল্পগত ক্রটি গোবা তা থেকে অনেকটা বেঁচেছে এ-কথা কিছুতেই সম্পূর্ণ পবিস্কাব হতে পাবে না যদি না আমবা ঐ শিল্পগত ক্রটিব মূলীভূত কাবণটি তুলে ধরি। ব্যক্তি হিসাবে শশিভূষণেব সমস্তাব উৎস আমাদের নিশ্চয় সন্ধান কবতে হবে তাব ব্যক্তিত্তেব মধ্যে।

শশিভূষণ গ্রামবাসী ব্যক্তি হয়েও গ্রামের সমাজ-জীবনের সঙ্গে অঙ্গান্বী যুক্ত নয়। সে শহরের শিক্ষিত যুবক। সেদিক থেকে উনিশের শতকের ইংরাজি শিক্ষার ফলস্বরূপ গ্রামের মানুষের সঙ্গে তার মর্মগত সম্পর্ক একেবারেই শূন্য। সেই শূন্যতাব বোধ তার মধ্যে উপস্থিত। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতাব জন্তু তার কোনো যন্ত্রণা আছে কি না তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। শূন্যতাটাকে ভরাট কবাব জন্তু সে দুটো বস্তুর আশ্রয়ী, এক বই, দুই গিবিবালা। এর ফল হয়েছে এই গিবিবালার প্রেম তার কাছে তার বই-এবই মতো আশ্রয়প্রার্থনার শিবিব। তাই সে যখন বৃহৎ ঘটনাচক্রে মধ্যস্থলে গিয়ে দাঁড়ালো তখন গিবিবালা বইল মূলতুবী। আবার সে যখন বৃহৎ ঘটনাবর্তের উপসংহারে কাবাগৃহ থেকে ফিরে এল তখন গিবিবালাও পরিশিষ্টের মতো ফিরে এল। গ্রামে গিবিবালার বৈশ্য-প্রেমেরও যেমন স্থিতিশীল রূপ, সেই প্রেম শশিভূষণকে যেমন কোথাও উত্তীর্ণ কবেনি, উপসংহারে গিবিবালার বাড়িতেও শশিভূষণ এবং গিবিবালা যে কোথায় উপনীত হল তাও তেমন বোঝা গেল না। তার কারণ শশিভূষণের সমস্ত জীবনটাই উদ্দেশ্যহীন। সে গ্রামের জীবনের দিকে তাকিয়েছে ক্লান্ত হয়ে, সে গ্রামের ঘটনাচক্রে ঝাপিয়ে পড়েছে ক্রুদ্ধ হয়ে, এই দুয়েবই মূল্য শেষ পর্যন্ত খুব বেশি নয়।

অথচ গোবা সেদিক থেকে পরিণত কল্পনার সৃষ্টি। গোবা বিচ্ছিন্নতাব যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করেছে। এবং লেখকের পক্ষ থেকে উপলব্ধি মূলটা রয়েছে ১৯০৫-এর বাংলা দেশের দেশব্যাপী আলোড়নে। এই বিচ্ছিন্নতাব এবং ব্যবধানের মাঝখানে যে সেতুবন্ধন প্রয়োজন ববান্দনাথ সেটা সে-সময়ে উপলব্ধি করেছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন

আমি যে এক। আমি নহি, আমার যেমন এই ক্ষুদ্র শবীর তেমনি আমার যে একটি বৃহৎ শবীর আছে, আমার দেশের মাটি জল আকাশ যে আমারই দেশের বিস্তার, তাহাবই স্বাস্থ্য যে আমারই স্বাস্থ্য, আমার সমস্ত স্বদেশীদের স্তম্ভঃখময়চিত্ত যে আমারই চিত্তের বিস্তার, তাহাবই উন্নতি যে আমারই চিত্তের উন্নতি, এই একান্ত সত্য আমবা যতদিন না উপলব্ধি কবিযাছি ততদিন আমবা দুৰ্ভিক্ষ হইতে দুৰ্ভিক্ষে, দুর্গতি হইতে দুর্গতিতে অবতীর্ণ হইযাছি—ততদিন কেবলই আমবা ভয়ে ভীত এবং অপমানে লাঞ্চিত হইযাছি। একবার ভাবিয়া দেখুন, আজ যে বহুদিনের দাসত্বে পিষ্ট অম্মাভাবে ক্লিষ্ট কেবানী সহসা অপমানে অসহিষ্ণু হইয়া ভবিষ্যতের বিচার

বিসর্জন দিয়াছে তাহার কারণ কী। তাহার কারণ তাহাৰা অনেকটা পরিমাণে আপনাকে সমস্ত বাঙালীৰ সহিত এক বলিয়া অনুভব কৰিয়াছে।

লৈখিক ক্ৰিয়াপদগুলি সবিয়ে দিলে এটিকে গোবাব বক্তৃতা বলা যেতে পাবে। গোবাব মধ্যো প্রথমাবধি দেখা যায় সে নিজেকে বিস্তারিত কবতে চাইছে। জীবনের ভগ্নাংশরূপ তাৰ কাছে স্পষ্ট হযেছে বলে সে বুঝেছে যে আমাদের সমাজের প্রাচীন প্রাণশক্তির পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন। তবেই আবার জীবন ভগ্নাংশতাকে পৰিহাৰ কৰে বিস্তৃত পূৰ্ণতাৰ সঙ্গে যুক্ত হতে পাববে। এই কাৰণে গোবাব নিজের মূল মেলে দিতে চেযেছে ভাবতবর্ষের যা কিছু প্রাচীন তাৰ মধ্যো। সঙ্গে সঙ্গে কৃষক, কামাৰ, মুটে-মজুব, হিন্দু-মুসলমান নিচুতলাৰ লোকজনদের সঙ্গে নিজের আত্মীয়তা স্থাপন কবতে চেযেছে। দেশের সেই বৃহৎ স্বৰূপের সন্ধানই গোবাব সন্ধান। এই সন্ধানের পথে নানা বাঁক, নানা বন্ধিম ভবতিক্রম্যতা। গোবাব ঐষ্টান দাসী লছমিযাৰ হাতে জল খায় না। কিন্তু চবঘোষপুৰে গিয়ে মাধব চাটুজ্যো, যে দাবোগাব বন্ধু, তাৰ বাড়িতেও জল খায় না। বিমূঢ় বমাপতিকে ফেলে বেখে সে চলে যায় সেই নাপিতের বাড়ি জল খেতে, যেখানে পিতৃহাৰা মুসলমানের ছেলে মানুষ হচ্ছে—যে নাপিত হিন্দুব হবি ও মুসলমানের আল্লাব মধ্যে কোনে তফাত দেখে না। কিন্তু মানব চাটুজ্যো আৰ ফক্সদাবের তফাতটা যে জানে। গোবাব অবশ্য ওখানেও নাপিতের হাতে জল খায়নি। ঘটিমেজে নিয়ে নিজের হাতে জল তুলে খেযেছে। কিন্তু মানব চাটুজ্যোৰ জ্ঞান যে অস্পৃশ্য এটা সে বুঝেছে। লাক্ষিত দেশবাসীৰ পক্ষালঘনে ও তাৰ জন্ত কাৰাবৰণে গোবাব ক্ষোভ নেই, কিন্তু গোবাব বদাচ বাষ্ট্রনৈতিক বক্তৃতা দিল না—এটাও আবার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষণীয়। বাষ্ট্রের থেকে সমাজ আমাদের কাছে অনেক বেশি তাৎপৰ্য-পূৰ্ণ। সেই স্বদেশী সমাজ বাইবের বাষ্ট্রশক্তির দ্বাৰায় ভেঙে পড়েছে। শক্তির আয়োজনটা শুরু কবতে হবে সমাজের শক্তি উদ্ধাবের ভিতৰ দিয়ে। এবং সমাজকে পুনরুজ্জীবিত কবাব প্রথম শর্ত তাকে চেনা, জানা, ভালবাসা। সেই সমাজের ব্যৰ্থতায় চতুর্দিকে পৰিকার্ণ ভাঙাচোৰা মানুষগুলোকে কাছে টানা। গোবাব যাত্রা এইপথে। সে আহত মুসলমান ডিমুঘালাৰ দুঃখে একাত্ম হতে চেযেছে। সে ছুতোৰ-কামাবেৰ ছেলেদের নিয়ে ক্রীডাসংঘ কবেছে। সে হিন্দু-হিন্দু কবলেও পবেশবাবুব পায়েৰ কাছে চলে যাবাব বীজ তাৰ মধ্যোই ছিল। সে বীজ শুধু তার জন্মবহন্তে নেই।

এই প্রবল কর্মপরায়ণ এবং প্রবল তর্কপৰায়ণ ব্যক্তিটিকে এই আলোকেই অনু-
ধাবন করতে হবে। মানুষ যে কেবল হজম কববার যন্ত্র এবং কাপড় টাঙাবাব
আলনা নয় বিজ্ঞানাগর-চবিত আলোচনা প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনাথ সে কথা বলেছেন।
Hero কে? এই কথার জবাবে কার্লাইলের উদ্ধৃতি ব্যবহার কবে ববীন্দ্রনাথ
বলেছেন যে “তিনিই বীর যিনি বিষয়পুঞ্জের অন্তরতর বাজ্যে সত্য এবং দিব্য
এবং অনন্তকে আশ্রয় কবিয়া আছেন—যে সত্য, দিব্য ও অনন্ত পদার্থ অধি-
কাংশের অগোচরে চাবিদিকেব তুচ্ছ এবং ক্ষণিক ব্যাপাবের অভ্যন্তবে নিত্যকাল
বিরাজ কবিতেছেন, সেই অনন্তবাজ্যেই তাঁহার অস্তিত্ব, কর্ম-দ্বাবা অথবা বাক্য-
দ্বাবা নিজেকে বাহিবে প্রকাশ কবিয়া তিনি সেই অনন্তবাজ্যকেই বাহিবে
বিস্তার কবিতেছেন।”* গোবাব প্রচণ্ড তর্কপৰায়ণতা চাবদিকেব তুচ্ছতা,
ব্যর্থতা এবং মূঢ়তাৰ মাঝখানে একটি সজীব মনের আলোডনের অভিব্যক্তি।
তর্কেব জন্তই গোবাব কখনও তর্ক কবেনি। যন্ত্রণামথিত পুরুষকাবের হাহাকাব
গোবাব সমস্ত কর্মে এবং বাক্যে প্রতিফলিত।† চাবদিকেব এই ভগ্নাংশৰূপেব
যন্ত্রণাব মূল খুঁজতে গিয়ে সে নিজেব ভগ্নাংশৰূপকেও আবিষ্কাব কবেছে সূচবিতাব
সংস্পর্শে এসে। যে তিনটি লোকেব কাছে সে স্পষ্ট হতে চেয়েছে এবং যে তিন
জন তাকে ভালবেসেছে তাবাব হলেন আনন্দময়ী, পবেশবাব এবং সূচবিতাব।
এব মধো সূচবিতাব প্রশ্ন স্বভাবতই তীক্ষ্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। উপন্যাসেব এই
অধ্যায়েই গোবাব সমস্ত যন্ত্রণা চড়া স্পর্শ কবেছে।

এই উপন্যাসেব সমস্ত শিল্পকর্মেব অংশে উপন্যাসেব মৌল কল্পনাব প্রসাদ কেমন-
ভাবে উপস্থিত ও কেমন কবে নানা দিক থেকে উপন্যাসটি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে এবাব
তাবই আলোচনা কবা যাক। আমবাব এই গ্রন্থেব উপক্রমণিকায বলেছি কোনো
উপন্যাসেব শিল্পকর্মেব মহিমা একমাত্র সে উপন্যাসেব নৈতিক তাৎপৰ্যেব সম্পর্কেই
উপলব্ধি কবা যায়—অন্ত কোনো ভাবেই নয়। সে কারণেই উপন্যাসে উত্থাপিত
নৈতিক প্রশ্নাবলী বা নৈতিক গভীরতাৰ বিষয়টিব পৃথক অনুসন্ধান অথবা
উপন্যাসটিব শিল্পমহিমাৰ স্বতন্ত্র সূত্রানুসন্ধান দুইই ভ্রান্ত কাজ। প্রকৃত সমালোচক
কদাচ এই খবিত পথেব পথিক হন না। কেননা তিনি জানেন যে উপন্যাসে
উত্থাপিত নৈতিক আগ্রহেব গভীরতা আছে অথচ উপন্যাসেব আঙ্গিকৰূপে তার

* আত্মশক্তিব স্বদেশী সমাজ-বিষয়ক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানাগর চবিত্তেব অনন্ততন্তুতাৰ স্মৃতি আমাদেব মনে আসা স্বাভাবিক। কথেক
বহুৰ পূর্বে “সাহিত্যপত্র” পত্রিকায় বোধায়ন চট্টোপাধ্যায়েব গোরা-বিষয়ক প্রবন্ধ উল্লেখ্য।

কোনো অভিব্যক্তি ঘটল না, কিংবা আদিকল্পের উজ্জল সৌন্দর্য সত্ত্বেও উপন্যাসে কোনো নৈতিক গভীরতার সাক্ষাৎলাভ হল না, এই উভয় ক্ষেত্রেই (যদি এতাদৃশ অসম্ভব ঘটনা ঘটেই) শিল্পহীনতার নিদর্শনই বিদ্যমান। পক্ষান্তরে কোনো উপন্যাসের শিল্পবান রূপ যদি যথেষ্ট চিত্তগ্রাহী হয় তবে তা জীবনের অমেয় সম্ভাবনা সম্বন্ধে পাঠককে সচেতন করেই হতে পারে—নচেৎ নয়। নৈতিক প্রশ্নের বেলায় শূন্যতা অথচ শিল্প-কৌশলে সম্পন্নতা—এ শশবিষাণ অলীক কল্পনাতেই সম্ভব। তার কল্পনাতেই ত্রুটি আছে। আদিকল্পের ত্রুটি বা গুণ নিয়ে আমরা যখন আলোচনা করি তখন পরিশেষে সে আলোচনা লেখকের জীবনবোধের অপূর্ণতার বা পূর্ণতার দিকেই অঙ্গুলি সংকেত করে।

এ-কারণেই সম্ভবত এমন কথা বলা হয় যে উপন্যাসের প্রতিটি অংশে, স্তরে এবং পর্যায়ে তার সমগ্রতারই প্রতিফলন ঘটে থাকে। অর্থাৎ যেহেতু লেখকের জীবন সচেতনতা বা নৈতিক বোধ উপন্যাসের চিত্র, চরিত্র, নাটক, কাব্য ইত্যাদির মাধ্যমেই রূপান্তরিত হয়ে থাকে সেই হেতু কোনো একটিরও পৃথক আলোচনাতে উপন্যাসের সামগ্রিক বক্তব্যের আলোচনা প্রাসঙ্গিক। এ প্রাসঙ্গিকতা না মানলে কনরাড কেন জাতীয়তায় পোল এবং ভাষাভিজ্ঞতায় ফরাসীর কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও ইংবাজিকে তাঁর উপন্যাসরাজির ভাষা হিসাবে নির্বাচন করলেন তা বোঝা যাবে না। বোঝা যাবে না কেন কমল (শেষ প্রশ্নে) এবং গোরা তথাকথিত তার্কিক চরিত্র হয়েও এত পৃথক। কেনই বা একটির ক্ষেত্রে আমাদের পাওনা বাস্তবতার সঙ্গে ভাবপ্রবণতার অসম সংযোগের শিল্প-বিনাশী প্রয়াস, আর একটির ক্ষেত্রে বাস্তবতার সঙ্গে আদর্শের যোগ্য মিলন।

গোরা উপন্যাসের শিল্পকর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে এ-কথাগুলো আরও গভীরভাবে বিবেচ্য। আমাদের পণ্ডিতী আলোচনার ক্ষেত্রে গোরাকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে আলোচনা কদাচ হয়নি। সেই জন্তই বোধহয় যখন অন্ত কোনো বসিক মহল থেকে বলা হয় গোরা সার্থকতম বাংলা উপন্যাস তখন সাধারণ বাঙালী উপন্যাস-পাঠক ঈষৎ বিব্রত বোধ না করে পারেন না। বস্তুত গোরা সার্থকতম বাংলা উপন্যাস এই উক্তির সঙ্গে ‘গোরার চরিত্রে জীবন রহস্যের প্রকাশ ঘটেনি’ অথবা ‘পরেণবাবু এবং আনন্দময়ী পিঙ্গল এবং রক্তহীন’ এই সমস্ত উক্তি-নিচয়ের মাঝখানে পাঠকের দিশাহারা হবার কথা। এ-ক্ষেত্রে আমরা “গোরা বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসই শুধু নয়, বাংলা জীবনের ও সংস্কৃতির চু-ধারার ব্যর্থ সমন্বয় চেষ্টায় আমাদের জাতীয় রূপকও বটে”—এ-কথা মেনে

নিম্নে এর শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব।

গোরা উপন্যাসে শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কালে প্রথমেই গোরা-র প্রধান মৌল প্রশ্নগুলির কিঞ্চিৎ পবিচয় প্রদান কর্তব্য। এই মৌল প্রশ্নগুলির সঙ্গে উপন্যাসকাব্যের বাস্তবতাবোধের দোষ-গুণের প্রশ্নও বিজড়িত। প্রতিটি মোটামুটি সার্থক উপন্যাসই আমাদের বাস্তব জীবন সম্বন্ধে সচেতন করে। কিন্তু মোটামুটি সার্থক উপন্যাসের সঙ্গে একটি মহৎ উপন্যাসের তফাত এইখানেই যে মহৎ উপন্যাসের কাজ শুধু উপন্যাসকাব্যের বাস্তব-জ্ঞানের পবিচয় প্রদান নয়, পাঠকের বাস্তব-সচেতনতার পবিধিকে সম্প্রসারিত করা, তাকে শুদ্ধ করাও তার কাজ বটে। এ-কাজে ব্যর্থ হলে সে বচনা মহৎ উপন্যাসের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়। এবং উপন্যাসের বনিয়াদী পাঠক সমাজ জানেন যে বাস্তব সচেতনতার এই শুদ্ধীভবন ও সম্প্রসারণ উপন্যাসের ব্যবহৃত চবিত্রের বাস্তব, ইতিবাচক এবং ইতোপূর্বে অনাবিষ্কৃত কোনো গূঢ় তাৎপর্য সৃজন ব্যতিবেবে ঘটতে পারে না। এখন প্রশ্ন এই গোরা চবিত্রে ইতোপূর্বে অনাবিষ্কৃত কোন্ বাস্তব ইতিবাচকতা উপস্থিত ?

গোরা চবিত্রের মেরুদণ্ড তার “দেশপ্রেম”(এই শব্দটিকেই সমালোচকেরা ব্যবহার করেছেন)। কিন্তু এ-কথাও আমাদের জানা আছে যে এই দেশপ্রেমের স্বরূপ বাংলা উপন্যাসে ব্যবহৃত দেশপ্রেম থেকে পৃথক। গোরা-র আগে পর্যন্ত বাংলা নাটক-নভেলে দেশভক্তি ছিল দেবীভূত মাতৃভক্তিরই নামান্তর। গোরা-র বচনাকাল ও প্রকাশকালও এই বন্দেমাতরম্ প্রসঙ্গে অতিভক্তির কাল। কিন্তু গোরা-র দেশপ্রেম দেশমাতৃকা সম্বন্ধে কোনো ভাবানুভূতি নয়। দেশের মানব-গোষ্ঠী সম্বন্ধেই তার আগ্রহ। এবং এটাই তার দেশপ্রেম। সেই কারণে গোরা কখনই সন্দীপের মতো দেশজননী-র কথা বলেনি। সে সূচবিতা অথবা পান্ডুবাবু এদের সকলের কাছে ভাবতবর্ষের কথা বলেছে। গোরা-র যন্ত্রণাটা আসলে ভাবতবর্ষের সন্ধানে যন্ত্রণা। বাবু কালচা-বাবু অপবিহায ফল হিসাবে গোরা এ কথাটা ঠিকই উপলব্ধি করেছিল যে সে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন। যেটাকে বঙ্কিমচন্দ্র অস্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন, বলেছিলেন শিক্ষিতে-অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই সেই খণ্ডীভবনের যন্ত্রণার পূর্ণ নিদর্শন গোরা।

সেই খণ্ডীভবনের পবিণামস্বরূপ জীবনচবণের অসঙ্গতি মহিম এবং পান্ডুবাবুতে যেমন গোরাতেও তদপেক্ষা কম কিছু নয়। সে চব্বোষপুরের মুসলমান প্রজাদের পক্ষ নিয়ে পুলিশী জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অথচ লছমির হাতে জল

থেতে তার আপত্তি। সে সমগ্র ভারতের সন্ধানী অথচ ব্রাহ্মদের জাতিভেদহীন জীবনাদর্শকে পশ্চিমী অনুকরণ বলে মনে করে। কিন্তু পান্থবাবু বা মহিমের অসঙ্গতি থেকে এটা পৃথক এই কারণে যে তার মধ্যেই একমাত্র এই অসঙ্গতির যন্ত্রণা বিদ্যমান এবং এই অসঙ্গতি থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্ত নিজের অজান্তে সত্তার জন্ত সে অনলস। তার উত্তরণই গোরা উপন্যাসের বিষয়। এই উত্তরণের পথে এসেছিল সূচরিতার প্রেম। গোরার দেশাত্মভূতির সঙ্গে সূচরিতা সংক্রান্ত প্রেমের বোধের প্রথমে সংঘাত ও পরে সমন্বয় গোবার জীবনের প্রধান সমস্যা ছিল। গোবার কাছে গোরার জন্মরহস্যের রক্তান্ত উন্মোচিত হওয়ার পবে একই পথে তার দুটো প্রণেবই মীমাংসা হল।

এইভাবে আবো দেখা যায় যে এই উপন্যাসেব সকল কিছুই উপন্যাসের চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত প্রশ্ন হিসাবে দেখা দিবেছে। স্বরূপ উপন্যাসেব এই অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য তার বহিরঙ্গ নির্মাণেও নানাতাবে ছায়াপাত করেছে। নানা দিক থেকে সেটিকে আলোচনা কবাই আমাদের উদ্দেশ্য।

এই উপন্যাসের আলোচনায আমরা প্রথমেই যেটিকে গুরুত্ব প্রদান করবো সেটি হল উপন্যাসের গঠনে গোরা উপন্যাসে ব্যবহৃত সময় বা কালখণ্ডের তাৎপর্য। এখানে অবশ্য প্রথমেই ব্যক্ত কবা প্রয়োজন যে সময় বা কালখণ্ড বলতে লেখক বাংলা দেশেব ইতিহাসের কোন্ অংশকে গোরা উপন্যাসে ব্যবহাব কাবছেন সে কথা বোঝানো হচ্ছে না। এখানে প্রশ্ন অধিকতর সহজ। গোবা উপন্যাসের ঘটনা ঘটতে কত সময় ব্যয়িত হয়েছে এবং তা উপন্যাসের দিক থেকে কোনো তাৎপর্যবহ কি না। উপন্যাসের ঘটনায় ব্যয়িত সময়কালেব বৈশিষ্ট্যগুলি এই :

(ক) এই স্বরূপ উপন্যাসের সমুদয় ঘটনার সময়কাল ছয়মাস মাত্র। শ্রাবণ মাসের এক সকালে উপন্যাসের ঘটনার প্রারম্ভ এবং মাঘ মাসের মধ্যেই উপন্যাসের সমস্ত ঘটনার উপসংহার ঘটেছে।

(খ) এর মধ্যে বর্ষা থেকে হেমন্তের এই কয়-মাসের জন্ত একবিংশ পরিচ্ছেদ বা ১৮৪ পৃষ্ঠা ব্যয়িত হয়েছে। একবিংশ পরিচ্ছেদে গোবার আত্মচিন্তায় হেমন্ত-রজনীর উল্লেখ আছে। (“আজ এই হেমন্তের রাত্রে নদীর তীরে নগরের অব্যক্ত কোলাহলে এবং নক্ষত্রের অপরিষ্কৃত আলোকে গোরা বিশ্বব্যাপিনী কোন্ অবগুষ্ঠিতা মায়াবিনীর সম্মুখে আত্মবিস্মৃত হইয়া দণ্ডায়মান হইল।”) উপন্যাসের বাকি পঞ্চাশটি পরিচ্ছেদ বা ৪৩১ পৃষ্ঠা হেমন্ত থেকে শীতের মধ্যভাগের অন্তর্বর্তী কালে ঘটেছে। এই অতিপরিমিত সময়ই উপন্যাসের মূল ঘটনার কাল।

(গ) 'এবং পূর্বে কথিত কালখণ্ডের শেষাংশে একমাস গোরা উপন্যাসে প্রত্যক্ষ ভাবে উপস্থিত ছিল না।

(ঘ) উপন্যাসের এই অতিপরিমিত কালখণ্ডে প্রত্যক্ষ ঘটনাই উপন্যাসের সম্বল। উপন্যাসের ক্ষীত কলেবর নায়ক-নায়িকার অতীত ইতিবৃত্ত কথনের জন্য বা চিন্তাসূত্রের অতীতানুসরণের জন্য হয়নি। একমাত্র হরিমোহিনীর কাহিনী ছাড়া কোথাও সে আয়োজন দেখা দেয়নি। এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি হয়তো সাধারণভাবে দেখতে গেলে এমন কিছু মূল্যবান নয়। কিন্তু উপন্যাসিকের শিল্পগত প্রয়োজন সিদ্ধিতে এরা নানাভাবে সহায়ক হয়েছে। সেগুলি এই :

(ক) ঘটনাকালের পরিসর সীমিত বলেই উপন্যাসের গতিতে এক সাবলীল খরশ্রোত সদাসর্বদা বিজ্ঞমান। অথচ ঘটনাকালের পরিসর-স্বল্পতা উপন্যাস পাঠকের দৃষ্টিতে সহজে ধরা পড়ে না। গোরার জীবনে উপন্যাসের অতিরিক্ত কোনো অতীত ঘটনা উপন্যাসে নেই তা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসে শুরু থেকেই প্রত্যক্ষভাবে বর্ণিত ঘটনাবলীর ছক পেরিয়ে গোরা যখন উপসংহারে সূচরিতাব হাত ধরে পরেশবাবুর দিকে অগ্রসর হল তখন এ-কথা না মনে হয়ে যায় না যে গোরা যেন এক দীর্ঘ যাত্রাপথের শেষে উপনীত হল। মাত্র কয়েক মাসের পরিসরে তথাকথিত হিরোয়িক ঘটনা সমাবেশ পরিহার করেই অগাধ জীবনের এই বিপুল প্রতিবিম্ব রচনা করা হয়েছে।

(খ) এবং এইভাবেই গোরা যথার্থ এপিক উপন্যাসে পরিণত হতে পেরেছে। কল্পনার একমুখী গতি রসপরিণামশীল বলে এপিক উপন্যাসে ভাষাগত অখণ্ডতা এবং সংহতি সর্বদাই নিখুঁতভাবে রক্ষিত হয়ে থাকে। এপিক উপন্যাসে হিরোয়িক ইম্প্রেশন প্রধান কথা। এই ইম্প্রেশন, অনুপ্রাণিত ও প্রাণবন্ত ভাষা ব্যতীত সম্ভবপর নয়। গোরা উপন্যাসে ঘটনাকালের পরিসরস্বল্পতা কল্পনার একমুখী অনুপ্রাণিত গতির পক্ষে সহায়ক হয়েছে। ফলে উপন্যাসকে কোনো পরিচ্ছেদে বা কোনো চরিত্রের ক্ষেত্রেই শিথিল বা শ্লথ হতে হয়নি। উপন্যাসের ভাষায় যে কবিত্ব এবং যে চিত্রকল্পরাজির সাক্ষাৎ মেলে যা আমরা এখন আলোচনা করব তা আসলে পূর্বোক্ত কল্পনার সংহতি এবং তার একমুখী রস-পরিণামশীল গতিরই ফল। ঘটনাকালের পরিসর স্বল্পতা এই কল্পনাগত সংহতি ও অখণ্ডতা নির্মাণে সাহায্য করেছে এবং তারই ফলে এপিক উপন্যাসের উপযুক্ত ভাষা-সম্পদে গোরা উপন্যাস অনন্ত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত—বর্তমান পরিচ্ছেদের প্রধান বক্তব্য এটাই।

গোরা যে মহাকাব্যোচিত বা এপিক জাতীয় উপন্যাস এ-কথা গোরা সম্বন্ধে বিকল্প মন্তব্যের সময়েও সমালোচকেবা মনে রেখেছেন। কিন্তু সম্ভবত মহাকাব্যোচিত উপন্যাসের চরিত্র সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা তাঁদের আছে তা আংশিক বলেই গোরার বিচারে নানা ভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। মহাকাব্যোচিত ঘটনা সমাবেশই কোনো উপন্যাসকে (বা কোনো কাব্যবস্তুকে) মহাকাব্যোচিত বা মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত এই আখ্যায় ভূষিত কবে না। বস্তুত মহাকাব্যের সার্থক ইম্প্রেশন সৃষ্টির জন্য দান্তের আশ্চর্য বচনা থেকে সমালোচকেবা যে শিক্ষা গ্রহণ কবেছেন তার কথা স্মরণে রাখলে কোনো এপিক সৃষ্টির কাছ থেকে প্রকৃতপক্ষে আমাদের কী চাওয়া উচিত সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। মহাকাব্যের ফলশ্রুতি পাঠকমানসে সঞ্চারিত কবাই যদি এপিক উপন্যাস লেখকের কর্তব্য হয় তাহলে বিষয়ের বিচারের দিকে লেখককে অধিক দৃষ্টিশীল হতে হয়। নিশ্চয় টলস্টয়ের ওঅব অ্যাণ্ড পীস উপন্যাসে যুদ্ধবিগ্রহ বাজারাজডা প্রভৃতির কাহিনী বর্ণিত আছে বলেই বা বহু বর্ণাঢ্য ঘটনাব শোভাযাত্রায় উপন্যাসটি পবিপূর্ণ বলেই ওঅব অ্যাণ্ড পীস মহাকাব্যোচিত উপন্যাস নয়। সমগ্র উপন্যাসের ফলশ্রুতিতে মহাকাব্যের আন্বাদ লভ্য বলেই উক্ত উপন্যাস মহাকাব্যোচিত।

এ-ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে যে কী এই মহাকাব্যোচিত ফলশ্রুতি? এ-প্রসঙ্গে ভাবতীয় মহাকাব্য (যেমন মহাভারত) সম্বন্ধে পণ্ডিত সমালোচকেবা অলংকার শাস্ত্রসম্মত যে আলোচনার পস্থা নির্দেশ কবেছেন তা অনুধাবনযোগ্য। মহাকাব্য শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রবসপবিণামী। মহাভারতের মহাপ্রস্থানের ট্রাজেডির মধ্যেও (ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত) সেই শাস্ত্র বসেবই জাগরণ। বস্তুত মানবজীবনের বিশাল উত্থান পতন, তার ব্যাপকতা এবং গভীরতা সম্বন্ধে সচেতনতার বোধ থেকেই এই শাস্ত্রবসপবিণামী ফলশ্রুতির জন্ম। অনেক রুঢ়তা, ক্রুরতা তামসিকতা বাজসিকতার পবে, বহু অশ্রু এবং বক্তের শেষে মহাপ্রস্থানের অধ্যায়ে না পৌঁছলে, আত্মনিগ্রহের যন্ত্রণায় না উপনীত হলে, জীবনের সুসমতায় প্রত্যাবর্তন সম্ভবপর হত না। পূর্ণ জীবনবোধই এই সুসমতার জনক। এবং এইখানেই নৈতিক গভীরতার নিধান।

মহাকাব্য যেমন, মহাকাব্যোচিত উপন্যাসেও তেমনি ঘনীভূত নৈতিক চেতনা শিল্প-কর্মের অতিবিস্তৃত, অথবা বাইরে থেকে সংযোজিত কোনো বস্তু নয়। উপন্যাসের শিল্পকর্মেই এর অভিব্যক্তি। অগ্ন্যাগ্নি নানা বিষয়ের সঙ্গে উপন্যাসের ভাষার ভূমিকাও এ-ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যময়। টিলিয়াড সাহেব তো এ-বিষয়ে সুকঠিন নিয়মের

পক্ষপাতী। মহাকাব্যোচিত উপন্যাসের উপযুক্ত ভাষা ব্যতিরেকে কোনো রচনাই (বিস্ময়-মহিমা থাকলেও) ‘মহাকাব্যোচিত’ এই মর্যাদায় চিহ্নিত হতে পারে না। টলিয়ার্ড বলেছেন—

If an author treats his subject ‘heroically’, if he can maintain the pressure of his will, he will densify his language and persuade us in so doing that his work was conceived and carried through with intense energy and application. And, in the easy and fluid medium of prose fiction it is a lack of intensity that so often presents itself as the reason why a work, admirable in other ways, can not be considered as an epic.

গোবা উপন্যাসেব ভাষায় এই অন্তপ্রাণিত ঘনবদ্ধতাব সাক্ষাৎ মেলে। অবশ্যই এই অন্তপ্রাণিত ঘনবদ্ধতাব মূলে বয়েছে পূর্বকথিত অন্তনিহিত গতিবেগ। গোবাব চবিত্র, তাব যন্ত্রণা, নবকালের ভাবতবষ এবং গোবাব অগ্রণী মনে খণ্ডিত অস্তিত্বের বেদনা—জীবনের স্থায়ী সূত্রানুসন্ধানেব জগত তাব তীব্র আকুলতা এই অন্তপ্রাণিত ঘনবদ্ধতাব জন্মদাতা এবং গোবাব ইতিবাচকতা যে আমাদের স্বকালীন ফ্রাসট্রেশনের অনেক দূরের ব্যাপার, বিশ্বাসভঙ্গের নয়, গোবাব যন্ত্রণা যে বিশ্বাস অর্জনেবই যন্ত্রণা গোবা উপন্যাসেব আলোচনাকালে সে কথাও স্মরণীয়। কল্পনাব সেই সূদৃঢ় অনুশাসন, যাব বিজয়মানতায় আমবা (অন্য সব দিক বজায় থাকলে) একটা উপন্যাসকে মহাকাব্যোচিত এই আখ্যা দিতে পারি গোবা উপন্যাসেব ভাষায় সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ কবেছে। ববীন্দ্রনাথের প্রধান প্রধান কাব্যপুস্তকের বেলায় যেমন আমবা দেখেছি যে কবিজীবনের বিভিন্ন পর্ষায়ে কবি ভাবনাব বিশিষ্ট অনুষঙ্গে একটি বিশেষ চিত্রকল্প পর্ষায়েব প্রতি কবির পক্ষপাত দৃষ্ট হয়। গোবা উপন্যাসেব ভাষায় উপন্যাসিকেব কল্পনাব সেই তাৎপর্যপূর্ণ একটি চিত্রকল্পের প্রতি পক্ষপাতেব সাক্ষাৎ মেলে। এই চিত্রকল্পটি নদী, সমুদ্র, তরী, তরঙ্গ এবং কূল উল্লঙ্ঘন সংক্রান্ত কোনো চিত্রকল্প। গোবা উপন্যাস থেকে আমাদের বক্তব্যের পক্ষে কতকগুলি প্রমাণ দেওয়া যাচ্ছে।—

(ক) কম্পাস ভাঙা কাণ্ডারীর মতো তোমার পূর্ব-পশ্চিমের জ্ঞান লোপ পেয়ে যাবে—তখন মনে হবে জাহাজ বন্দরে উত্তীর্ণ করাই কুসংস্কার, সংকীর্ণতা—কেবল না হক ভেসে চলে যাওয়াই যথার্থ জাহাজ চালানো। (১৮ পৃঃ)

(খ) এই দুইটুকু অঙ্ককাৰেব মহাসমুদ্রের মধ্যে একটা বৃষ্টিদেৱ মতো মিলাইয়া গেল। (৩১ পৃঃ)

(গ) ডুবে মবতে পাৰি কিন্তু আমাৰ সেই লক্ষ্মীৰ বন্দবটি আছে। (৩২ পৃঃ)

(ঘ) আৱ সমস্ত ভুলে কেতাবেব বিগে, খেতাবেব মায়া, উজ্জ্বলিত্বৰ প্রলোভন সব টান মেৰে ফেলে দিযে সেই বন্দবেব দিকেই জাহাজ ভাসাতে হবে। (৩৩ পৃঃ)

(ঙ) এই জনসাধাৰণেব সঙ্গে এক কবিতা মিলাইয়া দেশেব একটা বৃহৎ প্রবাহেব মধ্যে আপনাকে সম্পূৰ্ণ কৰিতে ও দেশেব হৃদয়েব আন্দোলনকে আপনাৰ হৃদয়েব মধ্যে অনুভব কৰিতে চায়। (৩৭ পৃঃ)

(চ) এই একটা বাঁধ ভাঙিয়া যাওতেই বিনয়েব হৃদয়েব নতন বগা যেন আবও উদ্দাম হইয়া উঠিল। (৫০ পৃঃ)

অবশ্য এইভাবে যদি নদী, তবঙ্গ, তবী সংক্ৰান্ত উপমা বা চিত্ৰকল্পেব তালিকা কৰা যায় তাহলে তাৰ সংখ্যা শেষ পৰ্যন্ত নিকপণ কৰা মুশ্কিল। যখনই এই উপন্যাসে ঘটনাস্রোত জটিল এবং বন্ধিম হয়ে উঠেছে লেখকেব ভাষা হয়ে উঠেছে আবেগান্বিত, তখনই এই জাতীয় চিত্ৰকল্পেব আধিক্য লক্ষ্য কৰাৰ বিষয়।

(ক) ছ-নৌকায পা দেওয়া যাব স্বভাব আমাৰ নৌকা থেকে তাকে পা সবাতে হবে। এতে আমাৰই কষ্ট হোক আৰ তাৰই কষ্ট হোক। (১০৮ পৃঃ)

(খ) হোক অনাথ আৰ তা ঠেকাইয়া বাখা যায় না। এই স্রোতেই যদি কোনো একটা কূলে তুলিয়া দেয় তো ভালো, আৰ যদি ভাসাইয়া দেয় তলাইয়া দেয় তবে উপায় কী। (১১০ পৃঃ)

এবং উক্ত দুই উদ্ধৃতিব মধ্যবর্তী চাৰ পাঠ্য ‘আকাশ ভাঙিয়া যাওয়া’ ‘পৰিপূৰ্ণ বেগে বন্ধনমুক্ত মন’ ‘পথিক প্রবাহ’ প্রভৃতি চিত্ৰকল্পেব ব্যবহাৰও উল্লেখযোগ্য। এবং এৰ পৰেই ১৪৪ পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত অনুরূপ চিত্ৰকল্প লক্ষণীয়

স্বদেশেব সেই সত্যমৃতি যে কী আশ্চৰ্য অপৰূপ, কী স্নানিচিত স্তগোচর তাৰ আনন্দ, তাৰ বেদনা যে কী প্রচণ্ড প্রবল যা বগাব স্রোতেব মতো জীবন মৃত্যুকে এক মুহূৰ্তে লঙ্ঘন কৰে যায়, তা আজ তোমাৰ কথা শুনে মনে মনে অল্প অল্প অনুভব কৰতে পাৰছি।

এই নদী-প্রাসঙ্গিক চিত্ৰকল্পগুলিব সঙ্গে গোৰা উপন্যাসেব শিল্পপ্ৰাণেব একটি নিবিড় যোগ বিদ্যমান। গোৰা-চৰিত্ৰেব মৌল গতিবেগ—যা নদীবই মতো দীৰ্ঘ-পথবাহী, আবর্তসংকুল, এবং সমুদ্রসন্ধানী—স্বভাবতই নদী প্রাসঙ্গিক চিত্ৰকল্প-

জগিতে আপন সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছে। নিজের চতুর্দিককে অভিক্রম করে
যাওয়ার পথের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বেদনা, যন্ত্রণা, বারম্বার ফিরে ফিরে নিজেরই সম্মুখীন
হওয়া, তাই গোরা উপন্যাসের বীজ-কল্লনা। যেহেতু মহাকাব্যোচিত উপন্যাসের
চরিত্রসৃষ্টি, ভাষা ব্যবহার, চিত্রকল্পস্বজন, এবং সব কিছুই, একটা অখণ্ড কল্লনাবিন্দু
থেকে, এক অনাহত প্রয়াসে উৎসারিত ব্যাপার তাই গোরা উপন্যাসের স্থায়ী
চিত্রকল্প পর্যায়েও নদী প্রাসঙ্গিক চিত্রকল্পেরই সুপ্রয়োগ ঘটেছে।*

এবং এই সঙ্গেই আখ্যানভাগের কোনো অংশের পটভূমিকা হিসাবে নদীর
ব্যবহারও বিশেষ লক্ষ্য দাবি করতে পারে। উপন্যাসের একবিংশ পরিচ্ছেদ এবং
অষ্টবিংশ-উনত্রিংশ পরিচ্ছেদের কথা এ-ক্ষেত্রে স্মরণীয়। উক্ত দুটি পরিচ্ছেদের
প্রথমটিতে গোরার আত্মচিন্তা এবং দ্বিতীয়টিতে বিনয় ও ললিতার ষ্টিমারে
কলকাতা প্রত্যাবর্তন বাণত হয়েছে। উপন্যাসের দিক থেকে দুটি পরিচ্ছেদই
ঘটনাধারার নবরূপান্তরের স্রষ্টা।

একবিংশ পরিচ্ছেদের বিষয় গোরার আত্মজিজ্ঞাসা। এই আত্মজিজ্ঞাসারই
পরিণতিতে দেশের আত্মার সন্ধানে গোরা কলকাতার বাইরে কিছুদিনের জন্য
পরিভ্রমণে বেরুবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল। গোরার জীবন-জিজ্ঞাসার সঙ্গে
নদীর পটভূমিকাগত সংযোগ এবং সংঘাত সমগ্র পরিচ্ছেদে এক নানা রাগে মিশ্র
আবেগের সৃষ্টি করেছে। আবেগের এই ঘনত্ব গোরার নিজেকে উপলব্ধি
সমস্তার সঙ্গে জড়িত বলেই নদী এবং গোরা এই পরিচ্ছেদে একার্থক হয়েছে।

—আজ কিন্তু নদীর উপরকার ওই আকাশ আপনার নক্ষত্রলোকে অভিষিক্ত
অন্ধকার দ্বারা গোরাব হৃদয়কে বারম্বার নিঃশব্দে স্পর্শ করিতে লাগিল।
নদী নিস্তরঙ্গ। কলিকাতার তীরের ঘাটে কতকগুলি নৌকায় আলো
জ্বলিতেছে আর কতকগুলি নিস্তরঙ্গ। ওপারের নিবিড় গাছগুলির মধ্যে
কালিমা ঘনীভূত। তাহারই উর্ধ্বে বৃহস্পতি গ্রহ অন্ধকারের অন্তর্যামী মতো
তিমিরভেদী অনিমেষ দৃষ্টিতে স্থির হইয়া আছে।

—আজ এই বৃহৎ নিস্তরঙ্গ প্রকৃতি গোরার শরীর মনকে যেন অভিভূত করিয়া
দিল। গোরার হৃৎপিণ্ডের সমান তালে আকাশের বিরাট অন্ধকার স্পন্দিত
হইতে লাগিল। ...

* গোরা উপন্যাসের উপসংহারের কিছু পূর্ব পর্যন্ত এ-জাতীয় উপমার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তার
পৃথক তালিকাও দেওয়া যায়—সম্ভবত তার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ-উপমার বোধকরি সর্বাপেক্ষা
যোগ্য ব্যবহার ঘটেছে বিনয়কে লিখিত পরেশবাবুর পক্ষে।

—নদী তাকে লোকালয়ের অশান্ত কর্মক্ষেত্র হইতে কোন্ অনির্দেশ্য
সুদূরের দিকে আঙুল দেখাইয়া দিল। সেখানে নির্জন জলের ধাবে গাছগুলি
শাখা মিলাইয়া কী ফুল ফুটাইয়াছে, কী ছায়া ফেলিয়াছে। সেখানে নির্মল
নীলাকাশের নিচে দিনগুলি যেন কাহাব চোখের উন্মীলিত দৃষ্টি এবং
রাতগুলি যেন কাহাব চোখের আনত পল্লবের লজ্জাজড়িত ছায়া।

—আজ এই হেমন্তের বাত্রে, নদীব তীবে, নগরের অব্যক্ত কোলাহলে এবং
নক্ষত্রের অপবিস্মৃষ্ট আলোকে গোবা বিশ্বব্যাপিনী কোন্ অবগুষ্ঠিতা
মায়াবিনীর সম্মুখে আত্মবিস্মৃত হইয়া দণ্ডায়মান হইল।

নদীব রূপবতী পটভূমিতে গোবাব নবাজিত অভিজ্ঞতার সংযোগ-সংঘাতেই এ
অধ্যায়ের ভূমিকা নিঃশেষিত নয়। নিজের অন্তরে এবং বাহিরে আত্মবিস্তার ও
সমন্বয় সাধনের চেষ্টাই গোবা চবিত্রের মূল কথা। সেইজন্য ‘প্রকৃতিকে গোবা
স্বীকার কবিয়া লইল’ উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের বক্তব্য এই। কিন্তু প্রেম ও প্রকৃতি
চেতনা সঙ্গাত এই নবাজিত অভিজ্ঞতা একটু পবেই এক প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া
সম্মুখীন হল অবিনাশের আগমনে এবং এইখান থেকেই গোবা গ্রাম বাংলা
পবিক্রমণের সিদ্ধান্তে আসে। সুতরাং নদী যে শুদ্ধ অনুভূতির সৃষ্টি করছে
গোবাব মনে, পবিবেশের বাস্তবতা তাকে আঘাত করে। বৃদ্ধি এবং অনুভূতির
টানাপোড়েনই শুধু লক্ষণীয় নয়। মানুষ প্রতি মুহূর্তে নিজের অজানিতে নিজের
সৃজিত মূর্তির সম্মুখীন হয়। আধুনিক মন নিজের এই প্রতি মুহূর্তের নবরূপান্তরের
বেদনা ও বিষ্ময়ের বেথায় দীর্ঘ। গোবাব যন্ত্রণা তাবই প্রতিনিধি। তাই
এইখানে গোবা একক। চাবদিকে যখন ‘শশকের সংহতি’ তখন ‘সিংহের
নৈঃসঙ্গ্য’ যন্ত্রণাময় অথচ সত্তাব অশান্ত রূপের সন্ধানও ক্ষান্তিহীন। ব্যক্তি মানুষের
এই সমস্তায় প্রকৃতির ভূমিকা সম্বন্ধে মহৎ শিল্পীবা সদাই ঐকমত্যে পৌছান।
প্রকৃতির ভূমিকা পবিত্র শুশ্রূষাকাবিণীর ভূমিকা নয়। প্রকৃতি ববং ব্যক্তিত্বের
সামনে গৃচ থেকে গচতব প্রশ্নই সদাসর্বদা তুলে ধবে। উদ্ধৃত অনুচ্ছেদে নদীব
ভূমিকাও তাই।*

আবাব ২৮-২৯শ পরিচ্ছেদেও বিনয় ও ললিতাব ষ্টিমার ভ্রমণের পটভূমিকাও
নদী। কিন্তু ২১শ পরিচ্ছেদে সে পটভূমিকাব যে তাৎপৰ্য ২৮-২৯শ পরিচ্ছেদে
তথা বিনয়-ললিতাব একত্র প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে সে তাৎপৰ্য অন্তরূপ। ললিতাব

* হেমচন্দ্রের সেই জানে প্রকৃতির প্রাঞ্জল মুরতি’ . . প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিকে নিজের প্রতিধ্বনি
করে তোলা। বড়ো কবির কাছে প্রকৃতি গভীর জিজ্ঞাসাকে সূচিত করে।

প্ৰেমের অনুভূতিতে গোরার অতিপ্ৰভাব থেকে বিনয়ের মুক্তি পৰবৰ্তী ঘটনা। কিন্তু জাগ্ৰত বুদ্ধিৰ তাড়নায় জীবনের প্ৰচলিত ছক থেকে ললিতাব মুক্তি-প্ৰয়াসেৰ মধ্যে যে অস্বাভাবিক আবেগ বিद्यমান তাকে স্বাভাবিক স্তমতায় স্বচ্ছন্দ কৰে তোলাৰ জগ্ৰই নদীৰ ভূমিকা অপরিহার্য ছিল। উপন্যাসেৰ এই অংশটুকুকে নদীবক্ষ ছাড়া কল্পনাই কৰা যায় না। বিনয়ের জীবনেৰ এই চডান্ত মুহূৰ্ত তাৰ মধ্যে যে দাৰ্শনিকতাটুকু সৃষ্টি কৰল একমাত্ৰ নদীব মধ্যেই তাৰ প্ৰতিৰূপ।—

—আজ একই বাত্ৰ বিনয় তাহাৰ একদিকেৰ শয়ত। এৰ আৰ একদিকেৰ পগতাকে একসঙ্গে অনুভব কৰিয়া জীবনেৰ সৃজন প্ৰলয়েৰ সন্ধিকালে শুদ্ধ হইয়া অন্ধবাৰেৰ দিকে তাকাইয়া বহিল।

কিন্তু এই সন্ধিবালৈৰ সংশয়কে পৰিহাৰ কৰে বিনয় এৰ ললিতা প্ৰভাত আলোক কম্পিত নদীকূলেৰ গ্ৰাষ এক নতন অনুভূতিৰ উপকূলে উপনীত হল। নদী সেই উপনায়নেৰ উপযুক্ত সহায়।

—ইহাৰ পৰে দুইজনে আৰ কথা হইল না। শিশিৰসিক্ত কাশবনেৰ পৰ-প্ৰান্তে আসন্ন সূৰ্যোদয়েৰ স্বৰ্ণচ্ছটা উজ্জল হইয়া উঠিল। ইহাৰ দুইজনে জীবনে এমন প্ৰভাত আৰ কোনোদিন দেখে নাই। আলোক তাহাদেৰ এমন কৰিয়া কখনও স্পৰ্শ কৰে নাই। আকাশ যে শূন্য নহে, তাহা যে বিশ্বয় নীৰব আনন্দে সৃষ্টিৰ দিকে অনিমেষ চাহিয়া আছে, তাহা ইহাৰ এই প্ৰথম জানিল। এই দুইজনেৰ চিন্তেৰ চেতনা এমন কৰিয়া জাগ্ৰত হইয়া উঠিযাছে যে সমস্ত জগতেৰ অন্তৰ্নিহিত চৈতন্তেৰ সঙ্গে আজ যেন তাহাদেৰ একেবাৰে গাষে গায়ে ঠেকাঠেকি হইল।

বস্তুত ললিতাব আচৰণে আপাত অস্বাভাবিকতা সত্ত্বেও এই অংশে যা আমাদেৰ অভিভূত কৰে তা হল সমস্ত ঘটনাংশটিৰ নৈতিক তাৎপৰ্য। ব্ৰাউনলো সাহেবেৰ ঘটনা এৰ সঙ্গে জড়িত না থাকলে ললিতাব বিনয়েৰ সঙ্গে কলকাতা গমন এতটা লক্ষ্যভেদী হত না। এই নৈতিক তাৎপৰ্যকে অধিক ঘনীভূত কৰাৰ কাজে নদী-প্ৰকৃতি একটি প্ৰধান ভূমিকা গ্ৰহণ কৰেছে। এইভাবেই একটা সাৰ্থক উপন্যাসে লেখকেৰ নৈতিক সচেতনতা ৰূপ বীজেৰ পৰিণতি ঘটে তাৰ ঘটনা, ঘটনাংশ, চৰিত্ৰ, বৰ্ণনা, এৰ ভাষাৰ সহিত তুলনীয় শাখাপ্ৰশাখা পল্লবকুণ্ডি এৰ ফুলে।

এইভাবেই যদি উপন্যাসেৰ মূল বক্তব্যেৰ সঙ্গে মিলিয়ে উপন্যাসেৰ সৰ্বাংশেৰ

বিচার করি তাহলে দেখা যাবে যে গোরা উপন্যাসের যেগুলি ক্রটি বলে প্রতিভাত হয়েছে সেগুলি অংশত বিচারের ফলেই হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দুর্বল উদ্ভাবনী শক্তি, অথবা ‘জীবন রহস্যের যেটা প্রধান কথা বিস্ময়কর অতর্কিততা’ গোরাই নেই এ-কথাগুলি সেই আংশিক বিচারেরই সাক্ষ্য দিচ্ছে। গোরা উপন্যাস-শিল্পের পরীক্ষায় দেখা যায় যে এ-ধরনের ‘বিস্ময়কর অতর্কিততা’ লেখকের শিল্প অন্বেষার অঙ্গীভূত নয়। বরঞ্চ বিস্ময়কর অতর্কিততায় যে নাটকীয়তার সম্ভাবনা রয়েছে লেখক তাকে বরাবর পরিহার করতে চেয়েছেন। যদি গোরা প্রধান ঘটনাংশগুলিকে অথবা পরিচ্ছেদগুলিকে নিরীক্ষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে উপন্যাসের কোনো অংশ থেকেই নাট্যরস নিকাশনের চেষ্টা লেখক করেননি। যদিও এই উপন্যাসে একটা আশ্চর্য গতি আছে, যদিও কোথাও এ-উপন্যাস অতীত সূত্রসন্ধানে পশ্চাদভ্রমণ করেনি, তথাপি গতির ফলস্বরূপে অনুভূত সেই আবেগের জ্ঞান উপন্যাসের ঘটনাবলীতে কোথাও নাট্যরসসম্মত কৌশলের প্রয়োজন হয়নি—যে প্রয়োজন বঙ্কিমের উপন্যাসে ঘন ঘন হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে গোরা জন্মরত্নাস্ত্রের কথা বলা যেতে পারে। এ নিয়ে একটা ভুলো নাটকীয় কৌতূহল রচনার প্রয়াস উপন্যাসের কোথাও নেই। উপন্যাস আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক জানেন যে গোরা মেমসাহেবের সন্তান। কিন্তু তাতে উপন্যাসের আকর্ষণের কোনো হানি হচ্ছে না। কেননা উপন্যাসটা সত্যিই গোরা কাছে গোরা জন্মরত্নাস্ত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার গল্প নয়। সমস্তটা একটা যুগের। একটা দেশ বা জাতির চঞ্চল জীবনে যখন স্বীয় সত্তার নিগূঢ় প্রশ্নগুলিই নানা আকারে মৃতি গ্রহণ করতে থাকে তখনকার প্রশ্নগুলিই এ-উপন্যাসের প্রধান কথা। গোরা প্রতি মুহূর্তই গোরা কাছে জিজ্ঞাসার নব নব চিহ্ন—সে জিজ্ঞাসা তার নিজেরই কাছে। এই প্রতি মুহূর্ত পেরিয়ে নিজের জন্মরত্নাস্ত্রের মুখোমুখি হয়ে তবে সে পরম উত্তরের কাছে উপনীত হয়। এখানে উপন্যাসের ছকে বিস্ময়কর অতর্কিততার কোনো স্থান নেই। উদ্ভাবনী শক্তিরও কোনো ভূমিকা নেই।*

* রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবন শক্তিতে দৌর্বল্য রয়েছে গোরা থেকেই এ-উদাহরণ আরো দেওয়া যায়। যেমন উপন্যাসে পানীয় জলের ভূমিকার কথা বলা যায়। লছমির হাতের জল, রামদীনের দুধের জল এবং চরঘোষপুরের পুকুরের জলের কথা বলা চলে—কিন্তু বস্তুত এ-জাতীয় উপন্যাসে উদ্ভাবন নৈপুণ্যের ভূমিকাই অকিঞ্চিৎকর।

আর এই প্রসঙ্গ (গোরার জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে লেখক অথবা কোনো কৌতূহল রচনা করতে চাননি) স্মরণে রাখলে আনন্দময়ীর সমুদয় ব্যবহারের একটা উপযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব, নচেৎ তাঁকে পিঙ্গল এবং রক্তহীন বলেই মনে হবে।* আনন্দময়ী এবং পল্লীসমাজের বিশেষজ্ঞের প্রতিলিপনায় বিশেষজ্ঞকেই বরং সেই জাতীয় আদর্শ জীব বলে মনে হয় যারা পিঙ্গল এবং রক্তহীন। কেননা বিশেষজ্ঞের আদর্শীভূত মূর্তির কোনো বাস্তব ভিত্তিভূমি নেই, কিন্তু আনন্দময়ীর মুখ থেকে উপন্যাসের ৪৪ পৃষ্ঠায় গোরার জন্মবৃত্তান্ত শোনবার পর আনন্দময়ীর সমস্ত আচরণের এবং উক্তি-প্রত্যাতির একটা মানে খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর কথাগুলোকে কেবল কোনো আদর্শ চরিত্রের মুখ-নিঃসৃত বাণী বলে মনে হয় না। মনে হয় জীবনের এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা থেকে এর জন্ম। ঠিক তেমনি পরেশবাবুর প্রহেলিকাকে আর প্রহেলিকা বলে মনে হবে না যদি পরেশবাবুর নিঃসঙ্গতার বিষয়ে আমরা অবহিত থাকি। সূচরিতা, ললিতা এবং শেষ পর্যন্ত পরিজনবর্গ-পরিহৃত এই ব্যক্তিটির একাকীত্ব সাধারণ স্তরের নয় বলেই এই ব্যক্তিত্বের বিপুল যন্ত্রণার সূক্ষ্ম কম্পন সহজে ধরা পড়ে না। তাই সূচরিতাকে ‘ললিতা আমার ঘর থেকে একেবারে বিদায় নিয়ে এসেছে’ এ-কথা বলতে গিয়ে ‘পরেশবাবুর কণ্ঠস্বর কম্পিত হইয়া যায়’ অথবা আনন্দময়ীর কাছ থেকে ললিতা সম্বন্ধে আশ্বাস পাবার পর ‘ললিতার বিবাহের আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর হইতে এই প্রথম পরেশবাবু চিত্ত সংসারের মধ্যে এক জায়গায় একটা কূল দেখিতে পাইল এবং যথার্থ সাহুনা লাভ করিল’ এই সমস্ত অংশ আমাদের অগোচর থেকে যায়। অগোচর থেকে যায় এই সাধারণ তথ্যটি যে গোরার সমস্ত অস্তিত্বের পটভূমিতে পরেশবাবুর শান্তদৃঢ়তা উপন্যাসের ছকে একটা সুসমতা আনয়ন করেছে। হয়তো পরেশবাবুর সঙ্গে বরদাসুন্দরীর দাম্পত্য জীবনে যে অসঙ্গতি তার দিকে অধিকতর আলোকসম্পাত করলে পরেশবাবুর নিঃসঙ্গতাকে আরো বাস্তব করে তোলা যেত এমন ধরনের একটা অভিযোগ তোলা যায়। এবং এও হয়তো বলা যায় যে কৃষ্ণদয়াল এবং আনন্দময়ীর মধ্যে গোরাজনিত ব্যবধানকে যতটা প্রত্যক্ষ করানো হয়েছে বরদাসুন্দরী এবং পরেশবাবুর সম্পর্কে ততটা প্রত্যক্ষ না করানোর ফলেই পরেশবাবুকে শুধুই আদর্শ-

* সে ভাবে না দেখলে রবীন্দ্রনাথের আলোচিত বিদ্যাসাগর জননী ভগবতীদেবীকে পিঙ্গল বলে মনে হয়। কিন্তু তা যে হয় না, তার কারণ সে চরিত্র বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গেই সত্য। আনন্দময়ীও তাই।

সিদ্ধ পুরুষ বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে সর্বপ্রকার নাটক পরিহার রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য, এবং মহাকাব্যোচিত উপন্যাসের আংশিক যথার্থ্যের আতিশয্য অপেক্ষা টোটালিটির বা সামগ্রিকের অনুভূতি সৃজনই বড়ো কথা। পরেশবাবু এবং বরদাসুন্দরীর পরস্পর সম্পর্কে লেখকের শৈথিল্য এই সামগ্রিকতার অনুভূতি সৃজনে প্রতিবন্ধক হয়নি এটাই বড়ো কথা।

কেননা এ-আলোচনায় দেখা যায় যে উপন্যাসে পরেশবাবুর ভূমিকা আনন্দময়ীর মতো প্রত্যক্ষ নয়। ললিতা বা সূচরিতা-নিরপেক্ষ ভূমিকা পরেশবাবুর নেই যেমন আনন্দময়ীর আছে। সম্ভবত সে কারণেই পরেশবাবু এবং আনন্দময়ীর একত্র বিচার সঙ্গত হবে না।

আসলে গোরার যন্ত্রণাই এই উপন্যাসের সমুদয় ঘটনার জনক। গোরার চরিত্রে এবং আচরণে সে যন্ত্রণার নৈতিক রূপ স্পষ্ট। তাই গোরার তार्কিকতা গোরা থেকে বিগ্নিষ্ট কোনো ব্যাপার নয়। তার অনন্ত-সাধারণ দৈর্ঘ্য, ঝড়ের গতিতে হাঁটা, বাঘের থাবার মতো পাঞ্জা, চণ্ডা হাড়, টেবিলে ঘুষি-মারা এবং তार्কিকতা তার চরিত্রেরই বিভিন্ন রূপ। তেমনি এই উপন্যাসের সময়কালের পরিসর স্বল্পতায় অথচ গতির উত্তেজনায়, ভাষার ঘনবদ্ধ রূপে, চিত্রকল্পে এবং ঘটনাংশ নিয়ন্ত্রণের কৌশলে, বে-কল্পনায় গোরা বিধ্বত সে কল্পনারই নানা প্রকাশ ঘটেছে।

এবং এইভাবেই একটা উপন্যাসের শিল্পকর্মের সঙ্গে সেই উপন্যাসের নৈতিক সচেতনতার প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত থাকে। আবার এইভাবেই গোরা উপন্যাসের গঠন বৈশিষ্ট্যের আর একটি দিকের ব্যাখ্যা সম্ভব। আপাত বিচারে দেখা যায় যে এই উপন্যাসে আশ্চর্য সব বৈপরীত্যের সমাবেশ। বুদ্ধিমান পাঠক দেখে থাকেন এদিকে কৃষ্ণদয়ালবাবু, ওদিকে পরেশবাবু, এদিকে আনন্দময়ী, ওদিকে বরদাসুন্দরী। গোরা এবং পানুবাবু। ললিতা এবং সূচরিতা। আবার আনন্দময়ীর স্বামী কৃষ্ণদয়ালবাবুতে যে বৈপরীত্য, পরেশবাবুর স্ত্রী বরদাসুন্দরীতে ঠিক ততখানি বৈপরীত্য। গোরায় প্রচণ্ড আবেগের প্রচণ্ড অভিব্যক্তি, সূচরিতায় শাস্ত সমাহিত ভাব। বিনয় স্থিরবুদ্ধি, ললিতা চঞ্চল এবং আবেগপ্রবণ। স্বভাবতই এ-ব্যাপার অল্প ক্ষমতাসম্পন্ন কারো হাতে ঘটলে সীমাবদ্ধ কল্পনায় সমস্তটা হয়ে দাঁড়াত যান্ত্রিক পরিকল্পনা। এখানে অগ্রপক্ষে, ধরিয়ে না দিলে এই বিপুল বৈপরীত্যের সমাবেশ দৃষ্টিপথে আসে না। পরেশবাবুকে পৃথকভাবে পিঙ্গল, রক্তহীন যদি বা বলা চলে—এই পুরো কাঠামোর

যশো তাঁর স্থান সেই কারণে সম্পূর্ণ শোভন এবং সজ্জত। রমিক পাঠক তাঁর অস্তিত্বের সাহায্যে ত্রাণ্যতাই বলেন, যে, গোরার সমস্তার বিস্তৃত গভীরতা গোটা উপন্যাসে সেই শক্তি, যার ফলে পটের বিশালতার বোধ পাঠকের মনে সদা জাগরুক থাকে। এই বিশালতাবোধের জন্ম এই বৈপরীত্যেই মনে হয় সুসমত। এবং ভারসাম্য।

গোরা আলোচনার উপসংহারে গোরার উত্তরণের বিষয়ে কিছু আলোচনা অবশ্য কর্তব্য। গোরা সূচরিতার হাত ধরে পরেশবাবুর কাছে গিয়ে শরণ নিল। তার বক্তব্য এই যে পরেশবাবুর কাছেই সেই মুক্তির মন্ত্র আছে। পরেশবাবুর নির্ভীক সত্যনিষ্ঠতায় একদিক থেকে পরেশবাবুরও মুক্তি ঘটেছে। বরদাসুন্দরীর কলকাতা ত্যাগ এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে পরেশবাবুর সম্পর্কচ্ছেদ সেই মুক্তির পূর্ণরূপ। গোরার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কারাবরণের সংবাদ শুনে ব্রাউনলো সাহেবের কুঠির নাটকের পূর্বেই বিনয়ের এবং ললিতার কলকাতা আগমনে যে আলোড়ন সৃজিত হল তা পরেশবাবুকেও নানাভাবে স্পর্শ করেছে। গোরা সেই বিমুক্ত সত্তাটির উদ্দেশ্যেই প্রণাম জানিয়েছে। অবশ্য পরিমাপের দিক থেকে ছোট কিন্তু বাঙ্গলায় বলিষ্ঠ অথচ তাৎপর্যপূর্ণ এমন একটি চরিত্রের দেখা গোরা চরঘোষপুবে পেয়েছিল, যে তার কাছে অবিস্মরণীয় থাকা উচিত ছিল। সেই সাধারণ মানুষটিও জানে হিন্দুর হরি এবং মুসলমানের আল্লা সমান। সে তার অসামান্য লৌকিক বুদ্ধির সাহায্যেই এই পরম মানবিক উপলব্ধিতে পৌঁচেছিল এবং মুসলমানের ছেলেকে অস্পৃশ্যতার দোহাই দিয়ে দূরে ঠেলে দেয়নি। সে অবশ্য ভারতবর্ষের দেবতাকে সন্মান করেনি। সন্মান কবেছে স্বগ্রামের মানুষকে। কিন্তু গোরার জীবনে, এক মুহূর্তের জন্ম হলেও, সে পরিণামগত সাক্ষাতের ফলেই গোবাব কারাবরণের ব্যাপার পর্যন্ত ঘটেছে। অথচ গোরা কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার পরে প্রায়শ্চিত্তের চিন্তার মুহূর্তে অথবা পরেও এ-প্রমাণ একবারও দিল না যে সেই চরঘোষপুরের অধ্যায় তাকে কোনো বৃহত্তর জিজ্ঞাসায় নিয়ে গেল কিনা।

গোরার যাত্রা শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের দেবতার সন্মানে—গোরাকে আমরা ভালবাসি বলে এ-কথাটা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হই। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এ-ব্যাখ্যা দিতেই পারেন যে সে-দেবতা মানুষের মধোই। কেননা পরেশবাবুর কোনো সমাজে স্থান নেই এ-কথার মানে হচ্ছে সকল দেবালয়ের দ্বার বন্ধ যখন, তখন মানুষের মাঝেই তাকে সন্মান করতে হবে। হয়তো লছমির হাতে জল খেতে

চাওয়ায় তারই ইঙ্গিত। এমনও হতে পারে যে সে ইঙ্গিতকে আমরা স্বীয় কল্পনার সাহায্যে বড়ো করে তুলছি মাত্র—কিন্তু সেটাও কি গোরা আমাদের ভালবাসাকে কতখানি আকর্ষণ করেছে তার প্রমাণ নয় ?

•• ছয় ••

গোরার দেশ-সম্মানের যে স্পষ্ট ভূমিকা উপন্যাসে উপস্থিত তারই একটা অন্তরূপ ঘরে বাইরে উপন্যাসের সমস্তা। ঘরে বাইরে রবীন্দ্রনাথের নিরীক্ষাশীল উপন্যাসগুলির অন্ততম এবং এই নিরীক্ষার ব্যর্থতার কথাও স্মরণিত। ঘরে বাইরে উপন্যাসের কবিত্বের আতিশয্য অথবা সন্দীপ চরিত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অন্তায় ব্যবহার—এই প্রকার নানা কিছুকে ঘরে বাইরের ব্যর্থতার কারণরূপে অভিহিত করা হয়। কিন্তু আমরা পূর্বে বলেছি যে ব্যক্তিত্বের সমস্তা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ। বাইরের দিক থেকে এই সমস্তাকে বিচার করতে যাওয়া এক রকম নিরর্থক। বিমলা নিখিলেশের স্বাধীন ব্যক্তিসত্তাটিকে স্বাধীন ব্যক্তি হিসেবে উপলব্ধি করুক, নিখিলেশের এই ছিল অভিপ্রায়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উদ্দীপ্ত আলোকে উদ্ভাসিত নিখিলেশ সমাজ শৃঙ্খলমুক্ত বিমলাব কাছে নিজেকে যাচাই করতে চেয়েছে। স্বভাবতই এই পরীক্ষায় অভিনবত্ব বিদ্যমান। কিন্তু পরীক্ষাব সূচনাতেই আমরা দেখি যে বিমলা নিখিলেশের গভীরতা অপেক্ষা সন্দীপের ফেনিলতাতে যখনই আসক্তির লক্ষণ প্রকাশ কবেছে, তখনই নিখিলেশের আত্ম শাহাকার কাব্যময় ভাষায় প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। নিখিলেশের পরীক্ষার দুঃসাহসকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যে বাস্তব-নিষ্ঠ পরিপূরক অবস্থার সৃষ্টি করতে পাবলে এই হাহাকার পরাজয়মুখী পুরুষকারের হাহাকারে পরিণত হতে পাবত ঘরে বাইরে উপন্যাসে তার একান্ত অভাব।

এই ত্রুটির মূল খুঁজতে হবে প্রধানত সন্দীপ চরিত্রে। সন্দীপের কোনো ব্যাপারই আমাদের কাছে স্বচ্ছ নয়। সন্দীপের চরিত্রের লোভাভর্ত স্কুলতার ব্যাখ্যা কোথায় সম্মান করব আমরা ? রবীন্দ্রনাথ তথা নিখিলেশের সন্দীপের সমালোচনাটি কোথায় প্রযোজ্য তা বোঝাও মুশকিল। সন্দীপের রাজনীতি তার চরিত্রের ফলে বিকৃত, না তার চরিত্র তার রাজনীতির বিকারের পরিণতি ? যদি এমন হয় যে সন্দীপের রাজনৈতিক মন্তব্য লেখকের মতে তার চরিত্রেরই নয় লোভা-তুরতার পরিণাম তাহলে বইখানি হয়ে ওঠে প্রতিনায়ক বনাম নায়কের দ্বন্দ্ব-

কাহিনী। আব যদি এমন হয় সন্দীপের স্থলতা এমন একটা অভ্যাস, ভ্রান্ত রাজনৈতিক আদর্শ পালনের জগুই যা দেখা দিয়েছে তাহলে যেমনই হোক আদর্শের একটা বোধ সন্দীপে উপস্থিত থাকতই। সে ক্ষেত্রে শিল্পরূপের অন্ত পবিণতি আয়বা লাভ কবতাম। ববীন্দ্রনাথ সে জায়গায় দু-ভাবে সন্দীপকে দুর্বল করেছেন। সন্দীপের রাজনীতি ভ্রান্ত। সন্দীপের চবিত্রে স্থলতা। এ-অবস্থায় উপন্যাসের ঈঙ্গিত যন্ত্রণা সৃষ্টি কবা দুর্লভ। এখানে “বাগ্মীকিব দোহাই” অগ্রাসঙ্গিক।

এমন যদি হত একটা বলিষ্ঠ চবিত্রের ব্যক্তি একটা ভ্রান্ত রাজনীতির শিকার হয়েছ, তাহলে উপন্যাসে সন্দীপকে নিরীক্ষার যন্ত্র, বিমলাকে নিবীক্ষাশালাব গিনিপিগ এবং নিখিলেশকে বিভ্রান্ত বৈজ্ঞানিকের বেশে আমাদের দেখতে হত না। নিখিলেশের সন্দীপের ঘোষিত রাজনীতি সম্বন্ধে বিমুখতাকে ঈর্ষা মনে হত না। বিমলাকেও শেষ পর্যন্ত টাকাব থলিব প্রসঙ্গে সব বুঝতে হত না। এবং ববীন্দ্রনাথের নাটকের স্বভাবানুযায়ী নায়কের আত্মদানে জটিলতাব মীমাংসাসামানও প্রয়োজন হত না।

●● সাত ●●

চতুবঙ্গ ঘবে বাইবের আগে বচিত। চতুবঙ্গের প্রাবণ্ডে ববীন্দ্রনাথ বলেছেন—
“এই বইখানির নাম চতুবঙ্গ। জ্যাঠামশাই শচীশ দামিনী ও শ্রীবিলাস ইহার চাবি অংশ।” কিন্তু বইখানিব এই চাবি অংশের জগুই একে চতুরঙ্গ নাম দিয়েছেন ববীন্দ্রনাথ এ-কথা মেনে নিলে বইটির প্রতি স্তুবিচাব কবা হয় না। বরঞ্চ নায়ক-নায়িকাব জীবনের দিকে তাকালে চতুবঙ্গ আখ্যাব তাৎপর্য বোঝা যায়। এবং সেদিক দিয়ে জগমোহন সম্বন্ধে শ্রীকুমারবাবুব যে অভিযোগ একটা—জগমোহন অংশ অনাবশ্যক দীর্ঘ—তাব উত্তরও মেলে। বইখানিব প্রধান পাত্র-পাত্রী শচীশ ও দামিনী। শচীশের জীবনের স্তম্পষ্ট চারটি পর্ষায়। জ্যাঠামশাই, লীলানন্দ, দামিনী এবং সর্বোত্তীর্ণ অবস্থা। দামিনীৰ জীবনেও অমুরূপ চাবটি ভাগ বা পর্ষায়—গুরু লীলানন্দ, গুরু বিদ্রোহ, শচীশ এবং (শ্রীবিলাস। চতুবঙ্গ নাম এই দিক দিয়ে সার্থক।)

(এই উপন্যাসে ববীন্দ্রনাথের শিল্প কৌশলের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ঘটনার মুখাপেক্ষী ববীন্দ্রনাথ কোনো দিনই নন। তবু অন্যান্য উপন্যাসে ঘটনার একটা স্বাভাবিক গতিকে তিনি বজায় রেখেছেন। ঘটনার মূল প্রবাহকে স্তম্ভ কবার

দরকার সে সব ক্ষেত্রে তাঁর হয়নি। এ-উপন্যাসে দেখা যায় যে ঘটনা-প্রবাহকে একেবারেই রবীন্দ্রনাথ প্রশ্রয় দেননি। চতুরঙ্গের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করলে এর কারণ কিছুটা অনুমান করা চলে। চতুরঙ্গের প্রধান পাত্র-পাত্রী শচীশ ও দামিনীর জীবনের বিভিন্ন ছকে ঘুবছে। প্রতি ছকের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার ধাক্কা ছকগুলোই একটা একটা করে ভেঙেছে। এই ভাঙার ক্রিয়া রবীন্দ্রনাথ অতি নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন। ছকগুলো গড়ে উঠেছে কেমন কবে এটা রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেননি। জগমোহনের মৃত্যুর পর লীলানন্দ স্বামীর কাছে শচীশ কী ভাবে উপনীত হল, কী ভাবে সে আবিষ্ট হয়ে পড়ল রসকীর্তনে তার কোনো ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে উপন্যাসে দেওয়া হয়নি। মধ্যবর্তী স্তরটিকে লেখক সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে, উপেক্ষা করে এগিয়ে গেছেন। আবার শচীশের ফের মতের বদল হওয়া ব্যাপারটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়নি। ফের মতের বদল হইয়াছে—এই মন্তব্যেই এ-প্রসঙ্গ শেষ করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে এই মধ্যবর্তী স্তরগুলি এই উপন্যাসে ততটা প্রয়োজনীয় নয়, যতটা প্রয়োজনীয় একটা ছক থেকে আর একটা ছকে উপনীত হয়ে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পাত্রপাত্রীদের মথিত করেছে তাকে রূপায়িত করা। সে দিক থেকে অস্তিত্বের ভিন্নমুখী সমস্তার টানাপোড়েনে শচীশ ও দামিনী কাভাবে জলেছে এবং নিভেছে সেটাই এ-উপন্যাসে বড়ো কথা। মধ্যবর্তী স্তরগুলোকে উপেক্ষা করার জন্যই এ-উপন্যাসকে আংশিকতা ছুঁ বলে কাবো কাবো কাছে মনে হয়েছে।

এই ভুল ধারণা থেকেই জগমোহন অধ্যায়কে ভুল বোঝা হয়। জগমোহন যে উপন্যাসে একটা দীর্ঘ স্থান অধিকার করে বসেছে সেটা শুধু শচীশের ওপর তার প্রভাব প্রদর্শনের জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে চতুরঙ্গের চারতলার জগমোহনই হচ্ছে ভিত্তিভূমি। এই ভিত্তিভূমিটিকে শক্ত না করলে উপন্যাসের চাবতলা বাড়িটি তাসের প্রাসাদের মতো গুঁড়িয়ে যেত। জগমোহন আখ্যায়িকা এই কথা বোঝায় যে উপন্যাসের কাঠামো সম্বন্ধে, সংস্থান-কৌশল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান কত গভীর ছিল। প্রকৃত পক্ষে জগমোহনেই উপন্যাসের সমস্তার আরম্ভ। জগমোহনের নীরস নাস্তিক্য বুদ্ধির মধ্যে যে মানুষের সমস্ত শৈশব কৈশোর যৌবনের প্রথমাংশ অভিবাহিত সে সেখান থেকে কী আহরণ করল এটা লক্ষণীয়। নীরস বুদ্ধিচর্চায় জীবনের পাত পূর্ণ হতে পারে না—এবং জীবন যে ঢকে-ফেলা ব্যাপার নয় জ্যাঠামশাই জগমোহন অধ্যায়ে সেটা পরিস্ফুট। জগৎসংসার

যে সত্যি নিউটনের গাণিতিক নিয়মে চলে না, সেটা যে শুধু মিল্ বেঙ্হামের তত্ত্ব পরীক্ষার ল্যাবরেটোরি নয়, এটা এই অধ্যায়ে স্পষ্ট। অসহায় আশ্রিতা ননীকে সামাজিক মঙ্গলের নিমিত্ত বিয়ে করতে চাইলেই যে তাকে বিয়ে করা যায় না, এবং মানুষের মন যে যুক্তি পরম্পরাকে অনুসরণ করেই সর্বত্র চলে না সেটা ননীর আত্মহত্যা এবং শেষ চিঠিতে পরিস্ফুট। নীরস বুদ্ধিচর্চার ভাঙন আরও কোন্ কোন্ দিক থেকে আসে শচীশের সঙ্গে জগমোহনের বিচ্ছেদে এবং ননীকে জগমোহনের আশীর্বাদ করতে চাওয়ায় তা পরিস্ফুট হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে জগমোহনের উক্তি, জগমোহনের তৈরি করা ছকের ভাঙন কোনদিক থেকে আসছে তার ইঙ্গিতবহ :

মা, আমি স্পষ্টই দেখিতেছি বুড়োবয়সে তুমি এই নাস্তিককে আস্তিক করিয়া তুলিবে। আমি আশীর্বাদে সিকি পয়সা বিশ্বাস করি না, কিন্তু তোমার ওই মুখখানি দেখিলে আমার আশীর্বাদ করিতে ইচ্ছা করে।

জগমোহন যে নিজের খণ্ডিত অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে শুরু কবেছিলেন এই উক্তি তাবই ইঙ্গিত। ননীর মৃত্যু জগমোহন এবং শচীশ উভয়ের কাছে তাদের তৎকালীন জীবনধারার ভয়াবহ আংশিকতাকে স্পষ্ট কবে তুললে। জগমোহনও যে এদিক থেকে হরিমোহনের উন্টোপিঠ এটাও এখানে পরিস্ফুট। জগমোহনের মৃত্যুটা বাইবের ঘটনা। স্বভাবতই এব জগা রবীন্দ্রনাথের কোনো মাথা-ব্যথা নেই। ননীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জগমোহনের ছক ভেঙে পড়েছে। এর পবেব অধ্যায়ে আমরা শচীশকে দেখছি লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যরূপে। নাস্তিক শচীশ পুর্বোদস্তব গুরুবাদী। কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে জগমোহনের ছক ভেঙে পড়ার প্রতিক্রিয়াতেই শচীশের লীলানন্দ অধ্যায়ের জন্ম। এই প্রতিক্রিয়াকে সবেজমিনে দেখানো হয়নি। শ্রীবিলাসের মতো আমরাও হঠাৎ খবর পেয়েছি যে শচীশ পৌছে গিয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত এক ছকে। মরুভালু থেকে স্খাশ্যামলিম ক্লে পৌঁছনোর স্তর পর্যায়ের পরম্পরা আমরা জানি না। বাস্তবিকপক্ষে এ-উপন্যাসের পক্ষে জানাটা খুব প্রয়োজনীয়ও নয়। লীলানন্দ স্বামীর কীর্তন বাসরের অধ্যাত্মরসের স্রোতও অচিরে শচীশের কাছে তার ভগ্নাংশ স্বরূপ নিয়ে প্রকট হল। এ ছকও দেখা গেল শচীশের মনের মধ্যে ভেঙে গেল। মনের মধ্যে ভেঙে যাওয়াটাই আসল কথা এখানে। কেননা ছকগুলোর অস্তিত্বও প্রকৃতপক্ষে মনের মধ্যেই।

শচীশের পক্ষে এই দ্বিতীয় পর্যায় সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে ননী

যেমন শচীশের কাছে প্রচুরতম লোকের প্রভূততম উপকারসাধনের একটা সংখ্যা-
মাত্র—দামিনীও তেমনি লীলানন্দের মাতোয়ারা অসংখ্য জীবকুলের একটি
জীব মাত্র—শচীশ প্রথমটা এই রকম মনে করতে চেয়েছিল কিন্তু দামিনী ননী
নয় বলেই সে ভবিতব্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায়নি। সে যে আশ্রমবন্দী
হয়েছিল এটা প্রকৃত পক্ষে তার বিবাহিত জীবনেরই জের। আশ্রমের ছককে
যখন দামিনী ক্রমশই ভাঙতে লাগল তখন দামিনীর নিজস্ব চেহারা ক্রমশই ফুটে
উঠতে লাগল শচীশের কাছে। শচীশও ননীবালা এবং দামিনীর প্রতিতুলনা
করেছিল। এ-সম্বন্ধে তার দিনলিপির খাতায় সে লিখে রেখেছিল—

ননীবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি...যে নারী মরিয়া
জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল। দামিনীর মধ্যে নারীর আর এক
বিশ্বরূপ দেখিয়াছি। সে নারী যত্নের কেহ নয়, সে জীবন রসের রসিক...
সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ, সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি-পয়সা
খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়াছে।

দামিনীর এই মর্ত্য-বসন্তের ধাক্কায় রসের স্বর্গলোকের লীলানন্দী ছক ভাঙতে
লাগল শচীশের মনে। কপের সঙ্গে রূপকের ঠোকাঠুকিতে রূপকের পাত্রটাই
যে কাত হয়ে পড়েছে এ-কথাও স্পষ্ট হতে লাগল। শচীশ যে মুহূর্তে দামিনীকে
দূরে সরিয়ে রেখে সাধনাকে নিপদমুক্ত করতে চেয়েছে সে মুহূর্তেই শচীশ
দ্বিতীয় ছকের ভগ্নাংশরূপকে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। এব পর নবীনের
দ্বী—দামিনীর মতো সেও আশ্রমবাসিনী—বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল। নবীনের
দ্বীর আত্মহত্যা প্রচলিত দৃষ্টিতে একটি ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ সে ঘটনার স্রবোণ
নিলে অবশ্যই উপন্যাসের দিক থেকে ক্রটি বলে পরিগণিত হত। কিন্তু এ
ঘটনাও জগমোহনের মৃত্যুর মতো বাইরের একটা ধাক্কা মাত্র। শচীশের
মনে দামিনী তখন আশ্রমের ছক অনেক পূর্বেই মুছে দিয়েছে। এবং এই
মুছে দেওয়ার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কোনো বিশ্লেষণ বাদ দেননি। প্রত্যেকটি
পুস্তকে সম্বন্ধে পার হয়েছেন লেখক। গুহার ঘটনার পর থেকে নবীনের দ্বীর
আত্মহত্যা পর্যন্ত এই ছকের ভাঙন সর্বতোভাবে রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা কবেছেন।
কাজেই নবীনের দ্বীর আত্মহত্যার পর দামিনীর শচীশের কাছে আত্মনিবেদনের
উচ্ছ্বাস সঙ্গত। এই উচ্ছ্বাসময় আত্মনিবেদনের জবাবে শচীশ বলেছিল—
তাই হবে। সংক্ষেপে এর পর পুনরায় শচীশের মত পরিবর্তন হয়ে গেছে এটা
আমাদের জানানো হল। বলা বাহুল্য মত পরিবর্তনের হেতু বলা হয়েছে।

এই পর্যায়ে তবে এ-অংশ আকস্মিকতা-দৃষ্ট বলে মনে হত। আমাদের অনুভূতি ও চেতনা কোনো ভাবে শচীশ-দামিনীর জীবন সম্বন্ধে বিস্তৃতি লাভ কবত না। সে হিসেবে এই বিস্তৃতি লাভের ক্ষেত্র সারা উপন্যাসে প্রস্তুত ছিল বলে এটা অপ্রত্যাশিত নয়। চতুরঙ্গের এই শেষ অঙ্কের আবেগের জন্ম আগের তিন অঙ্কের প্রস্তুতি ছিল বলেই এই সমস্তের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ যে বৃত্তটি সম্পূর্ণ করতে চাইছিলেন তাও নিটোলভাবে পূর্ণ হল। নবীনের স্ত্রীর মৃত্যুর পরে শচীশের পায়ের কাছে দামিনীর আত্মনিবেদন ও মুক্তি প্রার্থনায় (আমাকে এমন কিছু মন্ত দাও যা এ-সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের বডো জিনিস—যাহাতে আমি ঝাঁচিয়া ঘাইতে পারি।) শচীশ বলেছিল—তাই হইবে। তারপর শচীশ যখন বিস্তৃত বেদনাকে বক্ষে ধারণ করে অনুভব করল এ-বাঁধনও খোলা দরকার তখন সে নিজে মুক্তি প্রার্থনা করল দামিনীর কাছে—যাকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বডো দরকার—আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী তুমি তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি ত্যাগ করিয়া যাও। দামিনী বলল—তাই আমি যাইব। শচীশের ‘তাই হইবে’ থেকে দামিনীর ‘তাই আমি যাইব’, এই সিদ্ধান্ত পর্যন্ত সেই নিটোল বৃত্তের আশ্রয় অঙ্কন। এই বৃত্তের এক অর্ধাংশ লীলানন্দ স্বামীর অধ্যায়ে, দ্বিতীয় অর্ধাংশ দামিনীর সেবায়। জগমোহনে এবং লীলানন্দে মিলে দুই অর্ধে তৈরি হয়েছিল আর এক বৃত্ত। দুই বৃত্তের চারি অর্ধেও চতুরঙ্গের চারি অংশ। উপন্যাসটির প্রধান ক্রটি দামিনীর মৃত্যু-ঘটিত উপসংহার। শচীশ নিজ জীবনের মধ্যে যে প্রশ্ন জাগিয়েছে সে প্রশ্নের উত্তর শচীশের কাছে আছে কিনা আমরা জানি না। জানা আমাদের পক্ষে খুব প্রয়োজনীয় নয়। শচীশের যন্ত্রণা আমাদের কাছে প্রত্যয়গ্রাহ্য হয়েছে কিনা এটাই প্রশ্ন। বলা বাহুল্য উপন্যাসটি প্রধানত শচীশের সমস্যা বলেই, শুধু শচীশ-দামিনীর সমস্যা নয় বলেই রবীন্দ্রনাথ শচীশের পরীক্ষাটিকে সম্পূর্ণ করার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন। সেই কারণে শচীশের শেষ রূপান্তরের পর রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন উপন্যাসের বক্তব্য শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু শিল্পের নিজ নিয়মের টানে দামিনী তখনই সৃষ্টি করে বসেছে আর এক নতুন ছক। এই ছক হল শ্রীবিলাসের সঙ্গে বিবাহিত জীবনের ছক। এবং এই অধ্যায়েই দামিনীর মৃত্যুতে গল্পের পরিসমাপ্তি। অথচ এই বিবাহিত জীবনের নতুন ছকের ভিতরে দামিনীর পরীক্ষা তখনও বাকি। শিবতোষবাবুর সঙ্গে, দাম্পত্য জীবনে, সে কোনো দিন নিজের অন্তর ঘটাতে পারেনি। তার সমস্ত জীবন ব্যাপারটি

এরই প্রতিক্রিয়ার ফল কি না সে-কথা উপন্যাসে নিঃসংশয়িত রূপে প্রমাণিত হয়নি। কথাজেই শ্রীবিলাসের সঙ্গে তার বিবাহিত জীবনে শিবতোষের ভূমিকা নেই বলে তার সমস্ত জিজ্ঞাসা নিভে যায় কি না এটা একটা বড়ো প্রশ্ন। শচীশকে দামিনী কোনো বন্ধনে বাঁধতে পারবে না—এই অক্ষমতাটুকু উপলব্ধি করার পর সে শ্রীবিলাসকে বিয়ে করেছে। এই অংশে দামিনীর প্রশ্নকে যেন অকস্মাৎ মাঝ পথে ছেড়ে দেওয়া হল। কিংবা দামিনী হয়তো বুঝতে পারল যে শচীশকে সে ভালবাসে বলেই শচীশকে মুক্তি দেওয়া তার কর্তব্য। তাহলে তার মুক্তির স্বরূপটি কী? অথবা সে মুক্তিই চায়নি, বন্ধনই চেয়েছে, শুধু হয়তো বৃহত্তর বন্ধন? যে ভাবেই হোক দামিনীর মৃত্যু উপন্যাস সমাপ্তির ছেদচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দামিনীর স্বাধীন সত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাকে ফিরিয়ে এনেছেন। বলা যায় শচীশ এবং দামিনী, এই দুই অরুণি কাষ্ঠের সংঘর্ষে সে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, যেন মনে হয় সাহসের অভাবে রবীন্দ্রনাথ তার একটিকে ফুৎকারে নিভিয়ে অগ্নিশিখাকে স্তিমিত করে আনলেন। অথচ দামিনী চরিত্রের এই উপসংহারের ক্রটি দামিনীর উপস্থাপনায় বীজ আকারে ছিল না, এ-কথা ভাবলে ক্রটিটা আরও বেশি প্রকট হয়।)

•• আট ••

যোগাযোগ সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা উপন্যাসের বিষয়বস্তু সংক্রান্ত আলোচনায় করেছি। এখন আমরা যোগাযোগ উপন্যাসের সংকট কোন্ রক্তপথে প্রবেশ করেছে সে প্রশ্নেই আলোচনাকে কেন্দ্রীভূত রাখবো। সাধারণত সকল সমালোচকই যোগাযোগ উপন্যাসের প্যাটান সম্বন্ধে একমত। মধুসূদনের অধিকার চেতনা এবং কুমুর স্বাধীন সত্তার বিরোধ থেকেই যে এ-উপন্যাসের শিল্পগর্ভ টানাপোড়েনের জন্ম এ-কথা সমালোচকদের দৌলতে সুপরিজ্ঞাত। উপন্যাসটির কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বিলম্বিত লয়ে দীর্ঘ কালখণ্ডকে এই উপন্যাসে ব্যবহার করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এই উপন্যাসের শুরু। উপন্যাসটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রথম নামকরণের মধ্যও সে ইঙ্গিত সুস্পষ্ট ছিল। এবং সেই প্রশ্নে এ কথাও পরিষ্কার হয় যে নারী-পুরুষের সমানাদিকারবাদের প্রশ্নই এ-উপন্যাসের প্রধান প্রশ্ন নয়। আসলে আমরা যেমন পূর্বে বলেছি সমস্ত ব্যাপারটা দুটো পৃথক জীবনযাত্রার ব্যাপার। এবং এই পৃথক দুটি জীবনযাত্রাকে ঠিকমতো বিচার করতে গেলে দেশ-কালের প্রসঙ্গও স্বাভাবিক।

আমরা বলেছি যে আপাতত আমরা এই উপন্যাসের ক্রটির প্রসঙ্গেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো। দুই পৃথক জীবনযাত্রার প্রশ্ন আলোচনায়, সেই কারণে আমরা সর্ব প্রথমে এই উপন্যাসের প্রধান ক্রটি যে চরিত্রের কল্পনামূলক দৈত্য সেই মধুসূদন চরিত্রটির কথা আলোচনা করব। মধুসূদন সম্বন্ধে আমাদের অভিযোগ সংক্ষেপে ব্যক্ত করতে গেলে বলতে হয়—উপনিবেশের হাটের বণিক-আত্মা মধুসূদনের চরিত্রে যেমন পরিস্ফুট তার ব্যক্তিসত্তার নিজস্ব অভিজ্ঞান ততটা নয় অর্থাৎ সে টাইপ হিসাবে যতখানি সার্থক ইনডিভিজুয়াল হিসেবে সে ততখানি ব্যর্থ। যে আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের বাড়ির অন্তরমহল ও বহির্মহলকে চিত্রিত করেছেন সেই দৃষ্টিকে মধুসূদনের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারেননি। কুমুর সঙ্গে মধুসূদনের সম্পর্ক যেন মধুসূদনের মনের অন্তরমহলের ব্যাপার—যে মহলে ঘুঁটের চক্রে আচ্ছন্ন প্রাচীর, ক্রমাগত পাতা-কেড়ে-নেওয়া নিমগাছ, অন্ধকার স্মৃতিসংকেতে ধোঁয়াব ঝুলে কালো ঘর, চুলোর ছাই, ভাঙা গামলা, ছিন্নধামা প্রভৃতির একত্র সমাবেশ। শুধু কুমুর ঘরখানি “কাঁথা গায়ে দেওয়া ভিখারীর মাথায় জরিজহবৎ দেওয়া পাগড়ী।” স্মৃতবাং এই ঘর অন্তরমহলের চেহারা সেই মধুসূদন অবশ্যই কোথাও না কোথাও একটা দৃষ্ট সৃজন করবেই যে দৃষ্ট বাতিরেকে মধুসূদন ত্রিমাত্রিক হতে পারে না। অথচ বণিকবৃত্তিসম্পন্ন মধুসূদনকে রুচিহীন এবং স্থূল কবে গড়ে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের বাইবের চেহারাটাকেও পবিস্ফুট করে তুললেন না। যেদোঁড়ও প্রতাপের সাহায্যে সে তার অপিকারচেতনাকে সংগ্রহ কবেছে তাব কোনো পরিচয় না থাকায় সে হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি মনোভাবের পুতুল। এমন কি নিপুণ ব্যবসায়ী হয়েও স্বীয় মনোরঞ্জনের জন্য যে স্থূল পদ্ধতি সে গ্রহণ করলো তাতে তার ব্যবসায়ের নৈপুণ্যের কথা জনশ্রুতিই থেকে গেল।

কুমু মধুসূদনের সংসাবে আসার পর থেকে মধুসূদনের চিত্তচাক্ষুণ্য সে কারণে একটা অব্যাহত দৃষ্টের পথে উঠতে পারল না। ব্যবসায়ী মধুসূদনের ছায়া অবশ্য মাঝে মাঝে পড়েছে। কিন্তু সে ছায়া কখনো শীর্ণ, কখনো দুর্বল। কুমুর সঙ্গে সংঘর্ষে মধুসূদন কখনো অতি সহজে নিজের সত্তার বণিক অংশকে প্রকাশিত করেছে, কখনো বা অতি সহজে এমন কথা বলেছে যে-কথা বলার ক্ষমতা মধুসূদনের কোথা থেকে অকস্মাৎ এল তা বোঝা যায় না। “এইখানেই আমি বসে রইলুম, যদি আমাকে ডাকো তবেই যাব, বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করতে রাজি আছি।” এ-উক্তি যদিও রবীন্দ্রনাথের সমস্ত প্রেমের আখ্যানের পুরুষ

চরিত্রের মূল কথা, তথাপি এ-কথা মধুসূদনকে মানায় না। মনে হয় আরোপিত। কেননা অল্প ক্ষেত্রে নিখিলেশ, মহেন্দ্র, এরা যে ধরনের ব্যক্তি—মধুসূদন তা থেকে পৃথক। মধুসূদন ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আর কোনো নায়কের বৈষয়িক দিক আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। একমাত্র মধুসূদনের বৈষয়িক-জীবিকা-কর্মের দিক রবীন্দ্রনাথ সকারণেই তুলে ধরেছেন। এই তুলে-ধরা স্পষ্ট হত যদি রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের বৈষয়িক কর্ম-জীবনের নীতি-সূত্রকে উপন্যাসে প্রথম থেকে প্রতিষ্ঠিত করতেন। কতকগুলো বলিষ্ঠ বর্ণনায় ব্যবসায়ীদের টাইপ হিসাবে মধুসূদনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে মাত্র। ফলে সে হয়ে দাঁড়িয়েছে লোভ, স্বৈচ্ছাচার, অধিকারবোধ প্রভৃতির প্রতীক—যে প্রতীকের ওপর কুমুর শাস্ত্র সুদূর সৌন্দর্যের প্রতিক্রিয়া দমকা বাতাসেব মতো মাঝে মাঝে এসে পড়েছে। স্পষ্টই রবীন্দ্রনাথ এটা উপলক্ষি করেছেন, কিন্তু এই বাইরের জীবন ও ভিতরের জীবনকে একত্রে বিজড়িত করে যখনই দেখতে চাওয়া হয়েছে তখনই উপন্যাসে সংঘারিত হয়েছে কৃত্রিমতা। বেক্টশরণমেব কাছে হাত দেখানোর অধ্যায় তার বড়ো প্রমাণ। এই সম্পত্তিবাদী ব্যক্তিটির যে দুর্বলতা প্রতিপন্ন করাব জগৎ হাবুলেব মতো বালকেব সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বজন, সেই দুর্বলতা প্রতিপালনের জগৎই তাকে বেক্টশরণমের কাছে নিয়ে যাওয়া। সে দুর্বলতা হল হাবানোব ভয়। স্বভাবতই এব মূল্য খুব বেশি নয়। এবং মধুসূদনের চরিত্রে প্রথমাবধি হারানোর ভয়টাই প্রবল। এ-কারণে কুমুর সঙ্গে দ্বন্দ্ব বা কুমুকে অবলম্বন কবে অন্তর্দ্বন্দ্ব একটা সমগ্র ব্যক্তির যন্ত্রণাব সাক্ষ্য পাওয়া গেল না। যাকে পাওয়া গেল সে একটা লোভাত দুর্বল চেহারার পরাজয়-ভীকু কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি। এই সংকীর্ণ অব্যাহের ফলে কুমুর পরীক্ষাও সীমিত হয়ে গেছে। কম বেশি করে মধুসূদন যেখানে সমাধানমুখী বা আপসমুখী হয়েছে, সেখানে তার গলায় কুমুর কর্ণস্বরই আগবা শুনতে পেয়েছি। ফলে দ্বন্দ্ব হয়েছে স্তিমিত।

এর কারণ মধুসূদন সত্যিই নিজ ইতিহাস রচনাকারী বণিকবীর নয়। একটা সংবাণিজ্যব্রতী যেআবেগে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে, গড়ে তোলে স্তন্যমের সুদীর্ঘ ইতিহাস (বাডেনব্রুকস অথবা ফবসাইট সাগা স্মরণীয়) স্বভাবতই সে দৃঢ়তা, সে আবেগ, সে সততা মধুসূদনের নয়। এই ব্যক্তি উপনিবেশের হাটের কাঞ্চনসন্ধিস্থ মাত্র, যার কোনো বিবেক নেই, নীতি নেই। বলা বাহুল্য আমাদের জীবনে স্বাধীন শিল্পপতিদের কোনো ভূমিক। উপস্থিত থাকলে কুমু-মধুসূদনের সমস্তার গভীর রূপকে সত্য করে তোলার দায় কেবল কুমুর হাতে

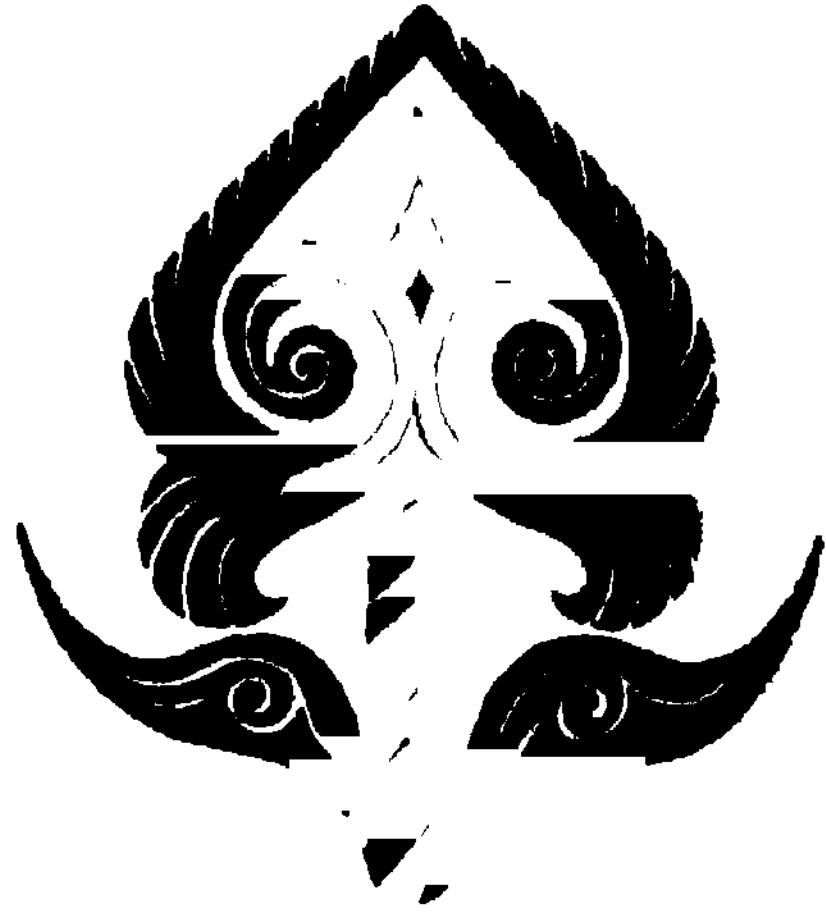
তুলে দিয়ে নিশ্চিত থাকতে হত না। এর ফলে অবশ্য এই খণ্ডিত উপন্যাসের উপসংহারে একটা স্বেচ্ছা হয়েছে। কুমুর দিক থেকে যাই হোক, মধুসূদনের সীমাবদ্ধ পরিসরে এ-উপসংহার মানিয়ে গেছে; মধুসূদন তার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকারী পেতে চলেছে। এ-উত্তরাধিকারীকে সে হারাতে চায় না। কুমুর দিক থেকে যে মীমাংসা হয়নি সে কথা তো সর্বজনবিদিত। অবশ্য শোনা যায় সে পরীক্ষার নাকি তখনও অনেক বাকি ছিল। এই অসমাপ্তির জন্য উপন্যাসটি খণ্ডিত।

এখানে বিষয়বস্তুটা ছিল এমনই দেশকালান্বিত যে মধুসূদনের এই অপরিপূর্ণতা অনিবার্য। টমাস মানের বাডেনব্রুকস অথবা গলসওয়ার্দের ফরসাইট সাগায় যে ব্যবসায়ী পরিবাহের কথা আমরা পড়ি তারা এক একটা জাতির মনোলোকের প্রতিবিশ্ব সহজেই বহন করতে পারে। কেননা সেখানকার বণিকজীবনও জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য পরিপূরক। ফলে সোম ফরসাইট ও আইরিন ফরসাইটের যে বিরোধ তাকে গলসওয়ার্দি নায়কের দিক থেকে সম্পূর্ণ করে গড়ে তুলেছেন। সেখানে স্বামীর অধিকার চেতনা মধুসূদনের মতো স্থূল কর্কশ পথে আবির্ভূত হয়নি। সে অধিকার চেতনাতেও জাতীয় সূক্ষ্ম রুচিবোধ এবং সংস্কৃতি-মনস্কতা প্রকাশিত হয়েছে। ফলে আমাদের সদাই মনে হয় যে এই দুই স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব-বিচ্ছেদে সোম ফরসাইট সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং স্বামী হিসাবে সে ফুলমার্ক পাওয়ার উপযোগী। কিন্তু আমরা ভালবেসে ফেলি আইরিনকে। এই দ্বৈত পরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ জয়ী হতে পারেননি। মধুসূদন থেকে গেল লোভী ব্যবসায়ী এবং স্থূল স্বামী। হয়তো বাডেনব্রুকস বা ফরসাইটদের মতো একটা স্বাধীন জাতীয় বণিক জীবনকে এই উপনিবেশের পটে কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। এই দেশকালান্বিত অনিবার্যতাই যোগাযোগের ভারসাম্যের বিনষ্টির মূলে। একে সংযত করার জন্য কুমুর ওপরে প্রাধান্য আরোপ করা হয়েছে বেশি। কুমুর পরীক্ষা যে তাৎপর্যপূর্ণ সে আলোচনা আমরা পূর্বে করেছি।

আসলে একটা জাতির জীবনার্থ এবং জীবনযাপনের ধারার ওপরে সে জাতির উপন্যাসের শিল্পকর্মের প্রতিষ্ঠা। মধুসূদনের ভূমিকায় আমাদের উপনিবেশিক পটে অন্যতর কিছু আশা করা অসঙ্গত। আমরা অবশ্যই উপনিবেশের জটিলতাকে মুশকিল আসান বলে ব্যবহার করতে চাই না। কেননা উপনিবেশ তো পৃথিবীতে নানা স্থানেই হয়েছে। কিন্তু উপনিবেশের পটেও বাংলাদেশের সাহিত্য এমন শক্তি সঞ্চয় করেছিল কী করে—যে শক্তি নিজ সীমার মধ্যে

থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ? তার কারণ ভারতবর্ষের মহান সভ্যতার ভিতরেই
অহুসঙ্কেষ। সেই প্রসঙ্গেই বলা যায় যে ভিলেন বা ঐ জাতীয় চবিদ্রাক্ষনে
ভারতবর্ষ চিরকাল বিমুখ। যে-সমস্ত চরিত্রে ভারতবর্ষের বিপুল ঐতিহ্যের
ধারণা সক্রিয় এবং যারা জীবনের পূর্ণাদর্শকে কোনো দিক থেকেই ভগ্নাংশ করে
ফেলেনি বাংলা সাহিত্যের অমর চরিত্রশালায় তাদের স্থান সবার ওপরে। কুমু,
ভ্রমর, আনন্দময়ী এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। যোগাযোগের ঔপন্যাসিক সার্থকতার
দায় তাই কুমুর ওপরেই শেষ পর্যন্ত বর্তিয়েছে।

যোগাযোগেও রবীন্দ্রনাথের নাটকের আদর্শ কার্যকরী। মধুসূদন যেন যন্ত্রপুরীর
সেই রাজা। বাইরের দিক থেকে যে প্রচণ্ড, অধিকারবাদী। কুমু বাইরের
দিক থেকে দুর্বল। কিন্তু তাব অন্তবেব শক্তিতে সে বিশিষ্ট। সে শক্তির
প্রধান কথা সৌন্দর্য এবং স্বাধীনতা। আইরিনের বেলায় যেমন লেখক অপরের
ওপর তার প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তাকে জীবন্ত করতে চেয়েছেন—কুমু লেখকের
সে দুর্বলতা থেকে মুক্ত।)



শরৎচন্দ্র ও উপন্যাসিকের দ্বিধা

•• এক ••

কোনো বাংলা উপন্যাস যদি গভীরভাবে শরৎচন্দ্রকে প্রভাবিত করে থাকে তবে তা হল চোখের বালি। যে সমস্ত নারী চরিত্রের সৃজন-কর্তা হিসাবে শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্যে বাংলা সাহিত্যে অক্ষাঞ্জলি অর্পণ করা হয়ে থাকে তারা সকলেই হয় বিনোদিনীর ভগ্নাংশ, আর নয় বিনোদিনীর কাঠামোয় অন্য শরৎচন্দ্রের রূপরঙ। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের মধ্যে তিনি গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে এই চরিত্রটিকে অন্বেষণ করেছিলেন। চোখের বালি বেরনোর প্রায় এক যুগ পরে শরৎচন্দ্র যখন সমাজ-বিগঠিত প্রেমকে উপজীব্য করে তার উপন্যাসাবলী প্রকাশ করতে লাগলেন যখন দেখা গেল যে প্রতিপত্তির সাফল্যে এবং জনচিহ্ন দখলে তার সৃজিত নারী চরিত্রগুলি বিনোদিনীকে বহু পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে গেছে। শরৎচন্দ্রের লেখক চারিত্র্যের ভিতরেই এই মনোহরণের সাফল্যের বীজ নিহিত ছিল। কিন্তু তৎপূর্বে কী অবস্থায় শরৎচন্দ্র বাংলা উপন্যাস পাঠকের চিত্ত জয় করলেন সেটা আলোচিত হওয়া দরকার।

বাঙালী উপন্যাস পাঠকমণ্ডলীর আভ্যন্তরীণ অংশকে রবীন্দ্রনাথ একমাত্র নৌকা-ডুবিতে ছাড়া আর কোথাও ব্যাপকভাবে স্পর্শ করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত আলোচনায আমরা সে কারণ কতকটা ব্যাখ্যা করেছি। এখন পাঠকদের দিক থেকে ব্যাপারটি বোঝার চেষ্টা করব। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজি শিক্ষার প্রথম দিবসাবধি যে পাঠকমণ্ডলীর পরিধি দিনে দিনে বেড়ে চলছিল তার চেহারা মোটামুটি এক। ইংলণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীর কর্মী পাঠক—জাতির ভবিষ্যৎ রচনাকারী কীতিগর্ভ পাবলিক। তার কর্মসূত্রের সঙ্গে মর্মসূত্রের

প্রত্যক্ষ গ্রন্থিবন্ধন বিদ্যমান ছিল। ত্রাযাতই ইংলণ্ডের এই পাঠকমণ্ডলীর চেহারা উনবিংশ শতাব্দীতে পরিবর্তিত হয়েছে। জাতির কর্মময় যুগের সর্বব্যাপী আগ্রহ, সাম্রাজ্যের অবসর-স্তুমিত দিনে সীমিত হতে বাধ্য। কুচি, নীতি, বিবেকের প্রশান্ত আশ্রয়ে সমস্ত বিক্ষোভকে আবৃত করে আত্মগোপনের যুগ এটা। এ যুগেই কীটসের চিঠি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, বেরিয়েছে কেটে ছেঁটে শেক্সপীয়ারের পারিবারিক সংস্করণ। সেদিক থেকে বাংলা দেশের দুই শতাব্দীর পাঠকমণ্ডলীর গুণগত কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। পরিমাণগত পরিবর্ধন হয়েছে মাত্র। পাঠক-সচেতনতা ঔপন্যাসিকের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। আলালের ঘরের দুলাল-এর লেখকও প্রতি সংখ্যা ‘মাসিক পত্রিকা’ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির স্ত্রীলোকেরা পত্রিকা পড়ে কী অভিমত দিলেন তা জানবার জন্ম বাস্তু থাকতেন। সেই সময় থেকে শরৎচন্দ্রের কাল পর্যন্ত যে পাঠক-জনতা (Reading-Public) গড়ে উঠেছে তা স্পষ্টত দু-ভাগে বিভক্ত। একভাগে সচেতন পাঠকমণ্ডলী ও আর একভাগে গল্পপিপাসু সাধারণ পাঠক সমাজ। এই শেষোক্তদের অনুরোধেই লিখিত হয়েছে দামোদরবাবু (কপালকুণ্ডলার পরবর্তী অধ্যায়) মৃন্ময়ী। সে-যুগের পাঠকমণ্ডলীর বৃহত্তর অংশ মৃন্ময়ীতেই গল্পস্পৃহার নিরুত্তি খুঁজে পেত। এই শেষোক্ত পাঠকমণ্ডলীর চরিত্র বৈশিষ্ট্য অনুধাবনযোগ্য। প্রতি দেশে প্রতি যুগেই এই ধরনের বিস্তৃত পাঠক সমাজের দেখা পাওয়া যায়। বস্তুতপক্ষে এরাই হলেন চলিষ্ণু ধাবাব বিস্তৃততম পাত যেখানে গভীরতা কম, বেগ কম, কিন্তু প্রশস্ততা বেশি। এই পাঠকমণ্ডলী উপন্যাসের কাছ থেকে কোনো বৃহত্তর প্রশ্ন আশা করেন না, প্রচলিত চিন্তা এবং জীবনযাত্রার প্যাটার্নকে কোনো রকম নিরীক্ষা বা পরীক্ষার ভিতর পতিত দেখতে চান না। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের জন্ম ঔপন্যাসিকের সহানুভূতিকে এরা খুব মযাদা দিয়ে থাকেন। এক কথায় জীবনকে বিস্তৃত জটিল পটে দেখার ব্যাপারে এদের উৎসাহ কম, সেই কারণে এই ধরনের অ্যাভারেজ পাঠকমণ্ডলী সব সময়েই বিগত যুগের ঔপন্যাসিক ধারার রক্ষক কিন্তু নবীন ভবিষ্যতের জনক নন।

শরৎচন্দ্র যে কালে লেখনী ধারণ করেছিলেন তার প্রাক্কাল এবং সমকাল এই দিক থেকে ন যথৌ ন তস্তৌ অবস্থায় অনড হয়ে পড়েছিল। কেননা রবীন্দ্রনাথের অসমসাহসিক নিরীক্ষা এবং সংসাহসিক সার্থকতা বাঙালী অ্যাভারেজ পাঠক-মণ্ডলীর আত্মীয় ছিল না। স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার যে প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের দেশকালের পটে বারে বারে স্থাপিত করেছেন তাকে ব্যাপকভাবে উপলব্ধির

জন্ম জনজীবনের ব্যাপক রূপান্তরের প্রয়োজন ছিল। শতবন্ধন-জাল-জটিল, থিও-অপরিভূত আমাদের ঔপনিবেশিক জীবনে গ্রামে এবং শহরে, পরিবারে এবং সমাজেও সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর শেষ বাঁধন সহজে ছিঁড়ে পড়েনি এবং পড়ে না। ফলে উপন্যাসের দর্পণে ব্যাপক পাঠকমণ্ডলী যখন আত্মপ্রতিবিম্ব দেখতে চাইতেন তখন রবীন্দ্রনাথের দিকে চাইলে স্বভাবতই আশ মিটতো না, চোখ ধাঁধিয়ে যেত। তাই এই সময়কার উপন্যাস প্রচেষ্টায় তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়।—

- (ক) রবীন্দ্রকাব্যের রোমাটিক প্রসাদের উপন্যাসে তরলীকরণের প্রচেষ্টা। প্রেম-বিরহ মিলনকে উপজীব্য করে এঁদের উপন্যাস প্রচেষ্টা। মুখ্যত ভারতীর লেখকবৃন্দ, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু প্রমুখের। এই লেখক গোষ্ঠী মধ্য পড়েন।
- (খ) রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি মনের পরীক্ষা-নিবীক্ষার অক্ষম অনুসরণ ও তারও একটি তরলীভূত রূপসজ্জন এ-যুগের আর এক বৈশিষ্ট্য। নরেশ সেনগুপ্ত ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিছু সৃষ্টি এর মধ্যে পড়ে।
- (গ) এই দুই ধারারই পাশাপাশি আর একটি ধারাও এই যুগে ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল। তা হল গল্পের ভিতর দিয়ে পাঠকশ্রেণীর পরিতোষণ বা entertainment। প্রভাত মুখোপাধ্যায়, নরেশ সেনগুপ্ত এবং উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ কিছু রচনা এই পর্ষায় পড়ে।

মোটামুটি এই ত্রিধাবার প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক ছিলেন প্রভাত মুখোপাধ্যায় এবং পরে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। উপেনবাবুর রাজপথ উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা নির্বাচনে গোরাকে অনুসরণ স্পষ্ট। শুধু গোরার বিশাল পট ও পটবিধূত জীবনের তাৎপর্য নেই এ-উপন্যাসে। নিটোল করে সম্পূর্ণতার বোধ সঞ্চারে উপেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রাজপথে সে বোধ উপস্থিত। নরেশবাবু, চারুবাবু এবং প্রভাতবাবুও তর্কপ্রাণ বুদ্ধিকেন্দ্রিক উপন্যাস অপেক্ষা মোটামুটি পারিবারিক গল্পেই মুক্তি অনুভব করতেন। নরেশবাবু যৌন সমস্লামূলক উপন্যাসের চেয়ে অভয়ের বিয়ের মতো স্নিগ্ধ চিত্তহারী গল্পে সফল হয়েছিলেন বেশি।

সমকালীন উপন্যাস সাহিত্যের প্রয়াসে মনোহরণের ঝাঁক অল্প স্থলেই অতিক্রান্ত হয়েছে। উপন্যাস-লেখক হিসাবে প্রভাতবাবুর রমাসুন্দরীর সাফল্য বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা রত্নদীপের সাফল্য এবং সম্ভাবনা দুয়ের কথাই

স্বরণীয়। রত্নদীপের প্রধান বলিষ্ঠতা এবং নীতি সচেতনতা বিশেষ অনুধাবনের বিষয়। রাখালের সাহায্যে লেখক যে কথাটি রূপায়িত করতে চাইলেন তা হল এই যে মানুষের পাপ করবার ক্ষমতার সীমা মানুষের মনই রচনা করে শাস্ত্রত নীতিবোধের সহজাত উত্তরাধিকারে। রাখাল যে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত প্রবঞ্চনায় নেমে যেতে পারে না সেটার কারণ বৌরানীর চরিত্র সম্বন্ধে তার অনুভূতির আন্তরিকতা। বৌরানীর পতিপ্রেমের ব্যাপারটি রাখালকে স্পর্শ করে বলেই অনধিকাবীর অবমাননায় সে নিজেকে ধূলাবলুষ্ঠিত করে না। রত্নদীপ বাংলা সাহিত্যের সেই ধরনের শেষ সার্থক উপন্যাস—যা বঙ্কিমী পাপ-পুণ্য বোধের ওপর স্থাপিত, শেষ প্লটপ্রধান উপন্যাস—যেখানে পাঠকের মূল আগ্রহ কী হয় শেষটা তা জানতে চাওয়ায়। তথাপি রাখালের দ্বৈত সত্তাকে ব্যবহার করায় কিছুটা সাফল্যের প্রসাদ পাওয়া গেল, বিপুলতর সম্ভাবনার প্রত্যাশা না মিটলেও এ কথা সত্য। ভারতী এবং উত্তর-ভারতী যুগের সাহিত্যকর্মের মধ্যে রত্নদীপের স্থান উচ্চ। ব্যক্তিকে একটা নির্দিষ্ট পটে স্থাপিত করে ব্যক্তিসত্তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে পরীক্ষা করা রবীন্দ্রনাথ-সম্মত পদ্ধতি। রাখালকে সে পরীক্ষায় স্থাপন করাও হয়েছিল। শুধু যে মনন এবং চিন্তাশীলতা থাকলে সে পরীক্ষার শিল্পরূপকে বিশিষ্ট করে তোলা যেত প্রভাতবাবু ক্ষেত্রে তার অভাব ছিল। রত্নদীপে প্রভাতবাবু এই ত্রুটিকে বুঝতে দেননি বৌরানীর ওপর আমাদের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট রেখে। বিষয়বস্তুর মধ্যে শিল্পসম্ভাবনা আবিষ্কার করা যদি সাধু-সমালোচনা সম্মত ব্যাপার হয় তাহলে বলা চলে যে এই ধরনের নৈতিক সমস্যার নিগূঢ় আকর্ষণ প্রভাতকুমারের সমকালবর্তী এবং পরবর্তী অণ্ড কোনো লেখকের অভিজ্ঞতার ভাঙারে ছিল না। শরৎচন্দ্রের অসংখ্য উপন্যাসের কথা ভেবেও এ মত পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না।

•• দুই ••

রত্নদীপের একক সাফল্য ছাড়া চাকবাবুর অবাস্তবতা, নরেশবাবুর মনস্তত্ত্ব এবং তার আগের মণীন্দ্রলাল বসুর রোমাণ্টিকতা—এসব কিছুই বাঙালী পাঠকের আত্মীয়কল্প বিশ্বমায়া সৃজনে সফলকাম হতে পারেনি। না পারার হেতুও অত্যন্ত স্বাভাবিক। ভারতীর যুগের রোমাণ্টিকতা এবং মনস্তত্ত্বপ্রীতি জাতির মর্মমূলের সঙ্গে গ্রথিত ছিল না। এগুলো যেন স্পষ্টতই বঙ্গীয় আধারে বিদেশী সাহিত্যের প্রসাদ। এ যে-পরিমাণে ছিল অজিত অধ্যয়নের ফল সে-পরিমাণে

লেখকদের স্বীয় অভিজ্ঞতার দান নয়। কৃত্রিমতা এ-যুগের সাহিত্যকর্মের প্রধান কথা। স্বভাবত অ্যাভারেজ বাঙালী পাঠকের মনোরাজ্যে তখন অরাজকতা। তাঁরা না পারছেন রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করতে, না পাচ্ছেন উপরোক্ত লেখকবৃন্দের কাছে প্রাণের প্রতিধ্বনি। উপরোক্ত লেখকবৃন্দও রবীন্দ্রনাথের শিল্পগত সাফল্যকে, আধুনিক সমালোচকদের কারো কারো মতো, মনে করেছিলেন হয় কবিত্ব নয় মনস্তত্ত্বের পরিণাম। পুরো রবীন্দ্রনাথ ব্যাপারটি অনুধাবন করতে না পারার জন্যই এখনও যেমন রবীন্দ্রনাথ থেকে সংগ্রহ করা হয় ভঙ্গি তখনও কেবল কাপড় রাঙিয়ে যোগী হবার বাসনা ছিল অনেকের। ফল হয়েছিল আরো মারাত্মক। দেশকালের নিয়মকে লঙ্ঘন না করেই শিল্পবুদ্ধির বিকাশ ও পরিণতি ঘটে থাকে। ভারতী এবং উত্তর-ভারতী যুগের অধিকাংশ লেখকের শিল্পবোধের প্রেরণাকেন্দ্রে সদাই ছিল বিদেশী হাওয়ার দোলা। সেই দোলায় কেমন করে ফুল ফোটাতে হয় তা জানতে গেলে মৃত্তিকামূলের সঙ্গে নিবিড় পবিচয় প্রয়োজন। তা এঁদের কারো ছিল না। ওদিকে পাঠক সমাজেও মনস্তত্ত্ব বা রোমান্টিক কাহিনী অপেক্ষা ভিন্নতর চাহিদা অপেক্ষা করছে। আমাদের গ্রামীণ জীবনবোধ এবং জীবনাচরণের সূত্রগুলিও জট দুইই আমাদের কাছে ছিল দুশ্ছেদ, এও যেমন সত্য এক-শ বচবের কলকাতাশ্রমী নবকালের সংঘর্ষে তারা হয়ে পড়েছিল নানা সমালোচনার বিষয় এও তেমন সত্য। তখনকার পাঠকমণ্ডলীর মনোভাবে দুই লক্ষণ পরিস্ফুট ছিল। এক, আমাদের জীবনাচরণ সম্বন্ধে, পুরনো মূল্যবোধগুলি সম্বন্ধে ক্ষুদ্র সমালোচনার বোধ, দুই, কোনো প্রকার ইতিবাচক মনোভাবের অনুপস্থিতি বশত বহুকালের বন্ধন-সূত্রগুলি সম্বন্ধে মমতাবোধ। এই ইয়া এবং না-এর কাটাকুটি খেলার শূন্য মনোভাবের আশ্চর্য প্রতিনিধি শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রকে যে বাঙালী পাঠক জয়মালা দিয়েছে তার অন্তর্নিহিত কারণ এখানে।

এই ইয়া এবং না-এর কাটাকুটি খেলা তাঁর বহুল পরিমাণে জনপ্রিয় অথচ গৌণ সৃষ্টিগুলির মধ্যে অধিক মাত্রায় পরিস্ফুট। যেখানে একজনের পাশে আর একজনকে দাঁড করিয়ে ইয়া এবং না-এর বৈপরীত্য সৃজন করেন শরৎচন্দ্র। তাই দিগম্বরীর পাশে নারায়ণী কিংবা হেমাজিনীর পাশে কাদম্বিনী অথবা এলোকেশীর পাশে অন্নপূর্ণাকে রেখে শরৎচন্দ্র সহজেই পাঠকমনের পরিচর্যা করতে পেরেছেন। এই ইয়া এবং না-এর উভয় কুল রক্ষা করতে গিয়ে তিনি যখন একান্নবর্তী পরিবারের সংকটকে ব্যবহার করতে গেছেন তখন সেই

সংকটের উটভূমিকে স্পর্শ মাত্র করে তিনি অপূর্ব মমতায় 'আবার' তার সমস্ত গুরুত্ব করেছেন। অশ্রুপলিত আনন্দে দেশবাসীর জয়ধ্বনি তিনি এই সমস্ত ক্ষেত্রে লাভ করেছেন। শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপারটা যে তাঁর শিল্পের দৈন্ত এবং সংকটকেই সূচিত করেছে সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র সচেতন ছিলেন না। কেননা দেশ-কাল এবং পাত্র-পাত্রীকে গভীর অভিনিবেশ ও তাৎপর্যের সঙ্গে শরৎচন্দ্র কখনও ধরবার চেষ্টা করেননি। ব্যক্তিত্বের মূল থেকে উৎসারিত কোনো সমস্তা তাঁকে কখনও বিচলিতও করেনি। সেই কারণেই স্বাভাবিকতা কখনও শরৎচন্দ্রের স্বধর্ম নয়। আতিশয্যের সম্পর্কগুলিকে পরিমাপ করবার কোনো বিধিনির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই বলে সেই সব অপার মুক্তির প্রাক্কণে শরৎচন্দ্রের শক্তির বিপুল বিকাশ ঘটেছে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, বিন্দুর সঙ্গে বিন্দুর ছেলের সম্পর্ক অপেক্ষা অন্নপূর্ণার সঙ্গে বিন্দুর (দেবর জায়া) ছেলের সম্পর্ক তাঁকে আগ্রহান্বিত করে বেশি। নাবায়ণীর সঙ্গে তার নিজের ছেলেব স্বাভাবিক সম্পর্কে পাশ কাটিয়ে দেবর রামের সঙ্গে স্নেহাতিশয্যের সম্পর্কে শিল্পী হৃদয়ের সাড়া শরৎচন্দ্র বেশি অনুভব করেন। মা এবং ছেলে অথবা স্বামী-স্ত্রী অথবা এ-জাতীয় প্রত্যক্ষ সম্পর্কের মধ্যস্থিত টানাপোড়েন—যেখানে শিল্পীর পরীক্ষা আরো গভীর এবং জটিল (যেমন কুমু-মধুসূদন বা মহেন্দ্র-রাজলক্ষ্মী)—শরৎচন্দ্র প্রায় সময়েই পরিহার করেছেন। সহজ হওয়াই যে ভয়ানক কঠিন কর্মভার এবং সহজের পরীক্ষাতেই যে শিল্পের প্রকৃত পরীক্ষা, শরৎচন্দ্রের সে জ্ঞানের অভাব তাঁর অপেক্ষাকৃত প্রধান শিল্প প্রচেষ্টাতেও কেমন প্রকট তার বড়ো প্রমাণ পল্লীসমাজ উপন্যাসের জ্যাঠাইমা চরিত্রে। পাত্র-পাত্রীদের ব্যক্তি জীবনের গায় শৃঙ্খলার কতখানি অভাব একটা চবিত্তের রূপায়ণে অনুভব করা যেতে পারে জ্যাঠাইমা চরিত্র তার সবচেয়ে বড়ো নিদর্শন। জ্যাঠাইমা নিজের সম্ভান বেণী ঘোষালের সম্পর্কে কতখানি আগ্রহান্বিত সে-নিদর্শন উপন্যাসে অন্তর্পস্থিত (মাতা পুত্রের কোনো সাক্ষাৎকার নেই), কিন্তু রমা ও রমেশ প্রসঙ্গে যে-কোনো ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ও ভূমিকা অসীম। এমনও যদি হত যে বেণী ঘোষালের মতো পুত্র মাতার (বিশেষ এমন মাতার) সমস্ত অহংকারকে চূর্ণ করেছে বলেই সে মা পুত্র সম্বন্ধে সাধারণত নীরব তাহলেও একটা প্রশ্ন থাকে যে এই মায়ের বার্থ মাতৃত্বের জন্য একটা প্রচণ্ড বেদনাবোধ থাকবে না? হয়তো জ্যাঠাইমার মধ্যে সে আক্ষেপের একটা সুর বিদ্যমান কিন্তু তা এতই অগভীর যে রমেশ প্রসঙ্গে এসেই মুছে যেতে পারে। শরৎচন্দ্র দেখলেন না যে রমার ক্ষেত্রে ব্যক্তিমানুষের সামনে

সমাজের যে বাধাকে তিনি আতিশয্যে বড়ো করে তুললেন সেই একই বাধা তো জ্যাঠাইমার ক্ষেত্রেও সক্রিয় ছিল। সমাজপতি বেণী ঘোষালের মা আর রমেশের জ্যাঠাইমায়ে যে দ্বন্দ্ব তাও তো অল্প শক্তির দ্বন্দ্ব নয়। বেণী ঘোষালের ছক থেকে জ্যাঠাইমার বেরিয়ে আসার মতো স্বাতন্ত্র্যের উৎস কোথায় তাও রয়ে গেল অস্পষ্ট। জ্যাঠাইমাও তো পল্লীসমাজেরই মা। কী করে তিনি এড়িয়ে এলেন সেই সামাজিক অর্থনৈতিক পিছুটান? আলোচনাকালে দেখা যাবে যে এতাদৃশ সহস্র কৃত্রিমতায় ও অসঙ্গতিতে শরৎসাহিত্য পরিপূর্ণ।

স্বভাবতই এখানে একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। বলা যেতে পারে যে কিছুক্ষণ আগে ভারতী এবং উত্তর-ভারতী যুগের লেখকদের প্রসঙ্গেও কৃত্রিমতার অভিযোগ তোলা হয়েছে। আবাব শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে সেই অভিযোগই তৈরি হল। তাহলে একটা কৃত্রিমতাকে পাঠকেবা পরিহার করল অথচ আর একটাকে গ্রহণ করল সাগ্রহে—কেন? তাব কারণ শরৎচন্দ্রের কৃত্রিমতা আমাদের আহত জীবনকে, আমাদের ক্ষুদ্র বোধকে শুশ্রূষা করেছে নিপুণভাবে। ‘রমলা’র নায়ক-নায়িকাদের থেকে জ্যাঠাইমাকে বিশ্বাস করতে আমরা বেশি প্রস্তুত। রোগ শয্যাশায়ী ব্যক্তি যেমন কবে চিকিৎসকের কৃত্রিম আশ্বাসকে বিশ্বাস করে, জাতীয় জীবনের এক অদ্ভুত শূন্য মানসিকতায়, আমরাও বিশ্বাস করেছি শরৎচন্দ্রকে। শরৎচন্দ্রের এই কৃত্রিমতা অধিকতর স্পষ্ট হয়েছে দুই ক্ষেত্রে। এক, যেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শে চরিত্র এবং প্যাটানকে গড়ে তুলতে গেছেন সেখানে। জ্যাঠাইমাকে আনন্দময়ীর মতো গড়ে তুলতে গেলে জ্যাঠাইমার চরিত্রে যে গায় এবং যুক্তির ব্যবহার প্রয়োজন শরৎচন্দ্র কখনও সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। গৃহদাহকে নষ্টনীড় বা ঘরে বাইরের আদর্শে দাঁড় করাতে গেলে ব্যক্তিত্বের যে প্রবল টানাপোড়েনের সৃষ্টি করতে হয় সে ব্যক্তিত্ব শরৎচন্দ্রের চরিত্রশালার বাইরের ব্যাপার। দুই নম্বর ক্ষেত্রে যে দুর্বলতা শরৎচন্দ্রের শিল্প প্রচেষ্টাকে গভীরভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে তা হল অকাবণ মনন প্রদীপ্তি সঞ্চারের প্রচেষ্টা। শেষ প্রশ্ন এ-প্রসঙ্গে একটি অবিস্মরণীয় উদাহরণ।

বস্তুতপক্ষে যখন বাংলা উপন্যাস পাঠক সমাজ পরিমাণে বিস্তৃত হয়েছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রবল জিজ্ঞাসা সে বিস্তৃত পাঠকমণ্ডলীর অ্যাভারেজ অংশকে স্পর্শ করতে পারছে না অথচ যখনও তিরিশের যুগে রবীন্দ্রনাথেরই উত্তরাধিকারকে নানাভাবে গ্রহণ করে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের বিস্তার ও গভীরতার সূচনা হয়নি এই রকম ধরনের অবস্থায় দুই অঙ্কের মাঝখানে বিরতির সময়টুকুতে

শবৎচন্দ্র বাঙালী পাঠকমণ্ডলীকে অধিকার করেছিলেন। যাহুঘের সহজে গভীর ভালবাসার বোধ শবৎচন্দ্রের নৈতিক সম্পদ বলে, কোনো জীবনদর্শন ব্যতিবেকেই, কোনো গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় না দিয়েও শবৎচন্দ্র পাঠকের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হননি। এ-ভালবাসা কতকাংশে শিল্পমূল্যের প্রতিদান কতকাংশে শবৎচন্দ্রের করুণাময় মনের মূল্যশোধ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, উপন্যাস করুণাময়দের উপযুক্ত বঙ্গভূমি নয়। এ-কথা এই জন্ত যথার্থ যে উপন্যাসের সহানুভূতি শুধু সহানুভূতি নয়, উপন্যাসের কল্পনাও শুধু কল্পনা নয়। উপন্যাসিকের সহানুভূতির পশ্চাতে থাকে কল্পনার সূদৃঢ় সহযোগিতা, আবার কল্পনার পশ্চাতে থাকে সহানুভূতির গভীর সমর্থন। সহানুভূতি, কল্পনা এবং মনন এই তিনটিকে একই আধারে মিশ্রিত করতে না পাবলে উপন্যাসের পানপাত্র অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শবৎসাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনায় এই তিন প্রসঙ্গেই বিচার বাঞ্ছনীয়।

•• তিন ••

শবৎসাহিত্যের সাফল্য প্রসঙ্গে সাধাবণত আমাদের সমালোচকেরা নিম্নলিখিত কাবণগুলি নির্দেশ করেন

(ক) নিষিদ্ধ সমাজ-অনুভূতিমোচিত প্রেমের বিশ্লেষণ।

(খ) আমাদের সামাজিক বীতি-নীতি ও সংস্কার প্রভৃতির কঠিন সমালোচনা।

এখন এই কাবণগুলিকে একে একে পরীক্ষা করে শবৎচন্দ্রের সাহিত্য-কীর্তির তাৎপর্য অনুধাবন করা যাক।

সমাজ-বিগর্হিত নিষিদ্ধ প্রেমকে শবৎচন্দ্রই প্রথম উপন্যাসের উপজীব্য করেননি। বরং বলা যেতে পারে যে স্বদেশে ও বিদেশে উপন্যাস সাহিত্যের গোড়া পত্তনের কাল থেকেই নিষিদ্ধ প্রেমকে অবলম্বন করে উপন্যাস লিখিত হয়েছে। বোহিগীকে গোবিন্দলাল ভালবেসেছিল এমন প্রমাণ কৃষ্ণকান্তের উইলে বহু ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন। সে ভালবাসার স্বরূপ কী এবং তার প্রতি বঙ্কিমের মনোভাব কী সে কথা স্বতন্ত্র। চোখের বালিতে বিনোদিনীর বিছাবীর প্রতি ভালবাসা নিঃসন্দেহেই ভালবাসা এবং নিষিদ্ধ ভালবাসা। নিষিদ্ধ ভালবাসার বিষয় উপন্যাসিকের একটি এমন পরীক্ষাগার যেখানে সাধা জীবনে তাঁদের একবার না একবার যেতেই হয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের অগুনতি উদাহরণ এবং বঙ্কিম ও

রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু সৃষ্টিকে এর প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা চলে। আনা কারেনিনা বা মাদাম বোভারি, চন্দ্রশেখর বা নষ্টনীড়—নিষিদ্ধ প্রেমই যেন ঔপন্যাসিকের বীক্ষণাগার। সত্যই বীক্ষণাগার—কেননা নিষিদ্ধ প্রেম বিষয়টির সঙ্গে উপন্যাসের মর্মসূত্রের একটি নিবিড় যোগ বিদ্যমান। এ-যোগ ব্যক্তি সচেতনতার সঙ্গে গ্রহি-বদ্ধ। সচেতন ব্যক্তিমানসের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ঔপন্যাসিকের প্রধান আগ্রহ। নিষিদ্ধ প্রেম ব্যক্তিকে প্রচলিত জীবন সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা ও গতাত্মগতিক বিচারের বিপরীত মুখে স্থাপন করে। ব্যক্তি জীবনের বিচিত্র রূপকে পরীক্ষা করাব বিপুল অবকাশ এই ক্ষেত্রে পাওয়া যায়।

মধ্যযুগীয় রোমান্সের নিষিদ্ধ প্রেম অপেক্ষা ঔপন্যাসিকদের ব্যবহৃত নিষিদ্ধ প্রেমের তাৎপর্য অনেক গভীর। এবং এই গভীরতাটুকুর জন্য উপন্যাসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধাবেব কোনো বিকল্প নেই। মধ্য যুগের নিষিদ্ধ প্রেমের চরিত্রে প্রধান কথা হল প্রেম সম্বন্ধে কোনো দ্বন্দ্ববোধ ছিল না। নিষেধটা আরোপিত ছিল বাইরে থেকে। বোমিও-জুলিয়েটের পরস্পর প্রেমে কোনো সংশয় ছিল না। নিষেধ বা গোপনতা প্রয়োজনীয় হয়ে ছিল বাইরের বাধাব জন্য। কিন্তু ভ্রনস্কি এবং আনার প্রেমের মধ্যে যে নিষিদ্ধতা সে নিষিদ্ধতা বাইরের দিক থেকে প্রকাণ্ড নয়। মনের দিক থেকেই সে বাধা অতিকায়। ব্যক্তি সচেতনতার একটি আশ্চর্য পরিণাম হল এই যে মানুষ বুঝল সমাজ নামক ব্যাপারটি লোকসমষ্টির যোগফলে বিবাজিত নয়। সমাজই বলা হোক, বা জীবন সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণায় প্রচলিত মানই বলা হোক, এ-সমস্ত কিছুর বাঁধন শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিমানসের নিভূতে। সেই বাঁধনে টান পড়ে ব্যক্তিমানসের বিশিষ্ট চেহারা কেমন কবে ফুটে ওঠে ঔপন্যাসিকের আগ্রহ সদাই সেই প্রক্রিয়ার সন্ধানী। অথচ রোমিও এবং জুলিয়েট-এর প্রেমরক্তান্তটির মতো গল্পের মূল আকর্ষণ গোপন দুঃসাহসিকতায়। সেখানে বিপন্নতার বোধকে ব্যবহার করা হয় প্রতি পদে। কিন্তু কেউ কখনো মাদাম বোভারির প্রণব-লিপ্সাব শান্তিস্বরূপে অসংখ্য সামাজিক মানুষকে বিচার সভায় জড়ো করবে না, কোনো বংশ মর্যাদায় আঘাতের আক্রোশে হত্যা করতে ছুটবে না কেউ প্রেমিককে। বড়ো জোর সে হয়তো কেলিংকারির গল্প করবে ড্রয়িং রুমে বা চণ্ডীমণ্ডপের আসবে। হয়তো মন্তব্য করবে। কিন্তু কোনো নিষিদ্ধ প্রেমের গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে—এগুলি প্রধান নিয়ামক ব্যাপার নয়। ব্যক্তিমানসের দ্বিধাদীর্ঘতাই উপন্যাসে নিষিদ্ধ প্রেমকে

উপলব্ধি কবাব প্রধান সূত্র । কেবলমাত্র প্রেমের নিবিড়তা বা গভীরতা বা ঐ জাতীয় কিছুকে প্রতিপন্ন কবা উপন্যাসে নিষিদ্ধ প্রেমের লক্ষ্য নয় । বিভিন্ন সম্পর্কের যোগফল স্বরূপ ব্যক্তির মৌল সত্তাকে কেমন কবে আলোড়িত কবেছে এ-ঘটনা, তাই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য ।

নিষিদ্ধ প্রেমের এই বিশিষ্ট তাৎপর্য একমাত্র উপন্যাসের কাঠামোয় ধরা যায় । আব কিছুতে নয় । কেননা বিভিন্ন সম্পর্কের, বিভিন্ন পর্থাষের, ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা রুচিসমূহের ইতিহাসের, পবিবেশের নানা চাপের ফলে যে ব্যক্তিমানস গড়ে ওঠে এবং যাকে নিষিদ্ধ প্রেমের প্রতিমুখে স্থাপন কবা হয় তাকে উপন্যাসের স্থিতিস্থাপক শিল্পরূপে সমগ্রভাবে ধরা যায় । কখনো কথকতায়, কখনো নাট্য বসাত্রে, কখনো বিশ্লেষণে, কখনো লেখকের স্বগতভাষণে, কখনো টীকায়, কখনো অপবকে কথা বলিয়ে, কখনো অপবকে ভাবিয়ে ও নিজে ভেবে ঔপন্যাসিক এই সমগ্রতার সাক্ষক । সমগ্র মানুষটার প্রসঙ্গেই নিষিদ্ধ প্রেমের ব্যাপাবটি অনুধাবনযোগ্য ।

বাংলা সাহিত্যে বিধবা বিনোদিনীকে দিয়ে এ-পরীক্ষার ব্যাপারের গভীর সার্থকতা বচনা কবেছিলেন ববীন্দ্রনাথ । বিনোদিনী এবং শবৎচন্দ্রের অসংখ্য নাট্যিক-কূলের মধ্যে একটা আপাত সাদৃশ্য বিদ্যমান সে-কথা এই প্রসঙ্গে অবগীয । শবৎচন্দ্র গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে বিনোদিনীর চবিত্রের প্যাটার্নের বাইরের সীমা-বেথাকে অনাহত বেখেছিলেন । বিনোদিনীর মতো বাকপটু, বসিকা, গৃহকর্ম-নিপুণা, সেবাপরায়াণা এবং পবকে আপ্যায়নে শুশ্রূষা পাবদর্শিনী শবৎচন্দ্রের সমুদয় নাট্যিকা । নাট্যকের শবীবের শুশ্রূষা দাতব ও ব্যাকুল চিন্ততা ববীন্দ্রনাথের বহু নাট্যিকার পবিচয়-সূত্রের অন্যতম । শীর্ণশবীব শচীশের জন্ত দামিনীর উৎকর্ষ দেখে শ্রীবিলাসের ব্যঙ্গোক্তিতে দামিনীর উত্তব এ-প্রসঙ্গে লক্ষণীয় । দামিনী বলেছিল যে মেয়েবা শবীবের শ্রষ্টা বলেই সম্ভবত শবীবের ওপব মায়া তাদের অধিক । শবৎচন্দ্রের অনিকাংশ নাট্যিকাই সে দিক থেকে বিনোদিনীর ছায়ায় গঠিত । ববীন্দ্রনাথও এই চবিত্র বিন্যাসের জন্য বন্ধিমের কাছে ঋণী । বোহিনী ও বিনোদিনীতে বিস্তব পার্থক্য সত্ত্বেও দেখা যায় বোহিনী মাঝে মাঝে বিনোদিনীতে পবোক্ষ এবং সুদূব প্রভাবসম্পাতী । বোহিনীও গৃহকর্মনিপুণা, বন্ধনে দ্রোপদীবিশেষ, ফুলের গহনা, খেলনা বচনায়, চুল বাঁধাব বিভিন্ন কৌশলে সে অদ্বিতীয়া । সম্ভবত এ-চবিত্রগুলিকে এমনভাবে পরিকল্পনার মূলীভূত উদ্দেশ্য এদের ব্যক্তিসত্তাব সম্যক পবিস্ফুটন । অন্ত্যসব দিক থেকে যে সুস্থ এবং সমগ্র,

“নিষিদ্ধ প্রেম” তার পূর্ণযুগ্ত জীবনে কেমন করে যুগ্তভঙ্গ ঘটায় এটা বোঝানো এই জাতীয় পরিকল্পনার কারণ। এই চরিত্রগুলি অল্প দিক থেকে গুণগত উৎকর্ষের অধিকারী না হলে এদের প্রচলিত জীবনবিজ্ঞাস পরিহার আমাদের আকর্ষণ করে না। রোহিণী-বিনোদিনী এবং শরৎচন্দ্রের নায়িকাকুল এদিক থেকে এক সূত্রে বাঁধা। কিন্তু শরৎচন্দ্র বিনোদিনীকে অনুধাবন করেছিলেন একান্তই তাঁর রেখাসীমার দিক থেকে। ফলে বিনোদিনীর বহিরঙ্গ সাদৃশ্য যতটা তিনি নিখুঁত ভাবে রূপায়িত কবেছেন, বিনোদিনীর ব্যক্তিত্বের মূল স্থিত সমস্তাকে তিনি ততটা উপলব্ধি করেননি। আমরা চোখের বালির আলোচনায় দেখিয়েছি যে বিনোদিনীর সমস্তা প্রকৃতপক্ষে প্রেমাতুরা নারীর সমস্তা নয়। সারা জীবন যে অপরের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে সে নিজের গোটা জীবনের সেই কঠিন ছকের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছে বিহারীর সঙ্গে তার সম্পর্কের অবকাশে। আমরা এও দেখিয়েছি যে বিহারীর বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ার মধ্যেও বিনোদিনীর ব্যক্তিস্বরূপই কেমন সক্রিয় ছিল। শরৎচন্দ্র ব্যক্তির এই নিগূঢ় প্রশ্নকে বুঝতেন না।

বুঝতেন না বলে সমাজ-বিগর্হিত নিষিদ্ধ প্রেম শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের পরিমণ্ডলে ব্যবহার কবেছেন অনেক বার কিন্তু এটা প্রতিবারই তাঁর কাছে থেকে গেছে একটা সহানুভূতির ঘটনা মাত্র, তদপেক্ষা অধিক তাৎপর্য সৃজনে তা থেকে গেছে অপারগ। রমা সম্বন্ধে জ্যাঠাইমার শেষ বক্তব্য হয়তো শরৎচন্দ্রের উক্তি এবং শরৎচন্দ্র চাইতেন যে এই উক্তি সকলের হোক। এই সাধু ইচ্ছার মানবিকতাকে আমরা যতই মর্যাদা দিই না কেন উপন্যাসের লক্ষ্য এখান থেকে অনেক দূরে নিবদ্ধ থাকা উচিত। রমার কথাই একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা যাক। রমা পল্লীসমাজের মেয়ে। স্মৃতবাং পল্লীসমাজের যা কিছু জট তার মধ্যে থাকবে হয় এটা স্বাভাবিক, আর নয় পল্লীসমাজের জটগুলিকে সে চেনে, জানে সেই জটের মধ্যে সেও বন্দী, কিন্তু জটের গহন দুর্ভেদ্যতার সঙ্গে তাব একটা দ্বন্দ্ব আছে এটা স্বাভাবিক। প্রথমোক্ত সম্ভাবনায় বিপদের ও বার্থতার ঝুঁকি নেই। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত সম্ভাবনাকে শিল্পে রূপায়িত করা দুর্লভ প্রক্রিয়া। লক্ষণ মিলিয়ে শুধু জীবনকে চিনলেই হবে না, জীবনকে জানার ব্যাপারে যে গভীর মনন এবং অস্তুদৃষ্টি অপরিহার্য সেটাই এ-প্রসঙ্গে আসল কথা। রমা কি পল্লীসমাজকে জানে? সেই সমাজ তার মনের মধ্যে কি কোনো দ্বন্দ্ব সৃজন করেছিল, না, সে শুধু সে-সমাজকে জানে। সে শুধু অভ্যস্ত জীবনের দাসী মাত্র।

এ-অবস্থায় রমেশকে দেখামাত্রই যখন তার প্রেমের বোধে জোয়ার এসে তখন থেকেই তার মনের মধ্যে শুরু হল ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার স্বন্দ। কী তার ব্যক্তিসত্তা, কোন্ বিশিষ্ট প্রসঙ্গ অঙ্কুরিত হচ্ছিল তাব মনে এ-সবেব কোনো পবিচয় নেই। এবং এই ভাবেই সমাজের প্রভাবই বা কেন তাব মনে বাবে বাবে সক্রিয় হচ্ছে—সে কি যে-কোনো ভাবে সমাজের একটা মানে খুঁজে বাব করেছে, এ-সব প্রশ্নেবও কোনো সচুত্তব নেই। কাজেই বমা যখন রমেশেব বীরত্বে, সংকাৰ্শে সপ্রশংস নীববতা পালন কবে, বমেশেব পল্লী উন্নয়নেব প্রচেষ্টাব খোঁজ খবব নেয় তখন সেটা হয়ে ওঠে প্রেমাম্পদেব প্রতি প্রেমিকাব অন্ধাঙ্গুলি মাত্র। তাব মনোলোকে একটা আলোডনেব সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু আমবা বুঝতে পাৰি না তাব স্বৰূপ, বুঝতে পাৰি না তাব উৎস। জ্যাঠাইমা বমাকে কী আলোক দিযেছেন? আশ্চয় সেই আলোক যে আলোক যিনি দিলেন এবং ষাকে ষাকে দিলেন কাউকেই আমবা চিনতে পাৰলাম না। কাজেই এ ভাবে ষাকে তুরধিগমা কবে গড়ে তোলাব জন্ত শবৎচক্রেব প্রচেষ্টা তাব তুবধিগম্যতাৰ প্রাসাদও এক নিমেষে ভেঙে পড়ল তাবকেশবেব এক দিবসেব বোমাষ্টিক প্রয়াণে। সেবায়-মমতায় বমা এই অংশে শবৎচক্রেব পাঠকচিত্ত-তোষিণী শক্তিৰ চমৎকাব, বোবহয় সর্বোত্তম, প্রতিভূ হিসাবে দেখা দিযেছে। তাবকেশবেব বমা যেন পল্লীসমাজেব বমাব কেউ নয়। হয়তো লেখকেব ধাবণা ছিল পল্লী-সমাজেব ছকেব বাইবে চলে যেতে পাৰলে বমা-বমেশেব সম্পর্কেব সম্ভাবিত কপেব একটা চিত্ৰাঙ্কন এবং তাব সাহায্যে পল্লীসমাজেব ফ্রেমেব মধ্যে এদেব অনিবাৰ্য পৰিণতিব বিয়োগান্ত কপকে স্ফুটতব করা যাবে। সাধাৰণভাবে দেখতে গেলে এ-কৌশল খুবই জনপ্রিয় এবং সে হিসেবে লক্ষ্যভেদী হযেছে। কিন্তু ছক জিনিসটা বস্তুতই লুডোব ছক নয়। একটা থেকে বেরিয়ে গেলেই তার কাজ শেষ হয়ে যায় না। তাবকেশবেব বাসাবাডিতে একটা বান্ধিব সেবা-যত্নেব স্মৃতি বমা এবং বমেশ উভয়কেই কোন অৰ্থে প্রভাবিত কবল তুব কোনো ইঙ্গিত উপল্যাসে উপস্থিত নেই। এ-যেন প্রেম প্রীতিব ধৰ্মশালায় কিয়ৎক্ষণেব জন্ত আশ্রয় গ্রহণ। তাছাড়া তাবকেশবেব বাসাবাডিতে বমাব ব্যবহাবে মনে হয় যে তাব কাছে পল্লীসমাজ নামক ব্যাপাৰটি যেন কুঁচাপুব গ্রামেবই নিজস্ব ব্যাপাৰ। সেই গ্রামেব বাইবে গ্রামেব পাত্র-পাত্রীবা নিষ্কান্ত হয়ে গেলে তাদের ওপর আব সে পল্লীসমাজেব প্রভাব থাকে না। অথচ বমাব মনেব মধ্যে যদি সমাজপ্রদত্ত সংস্কাৰগুলিব জট দৃঢ়বদ্ধ না থাকে তাহলে বাইবেব দিক থেকে বেণী ঘোষাল

এবং তারিণীর মূল্য কতটুকু। আর তার সমাজসত্তা এবং ব্যক্তিসত্তার দ্বন্দ্বেরই বা করুণ অর্থগৌরব কোথায়? যদি এমন হয় যে রমা জানে যে সমাজপ্রদত্ত সংস্কারগুলির বাস্তবিক কোনো অর্থ নেই, অথচ সেই সমাজের মুখ তাকিয়েই তাকে মনে মনে বমেশের পক্ষাবলম্বন করতে হচ্ছে, এবং সামাজিক ভাবে বমেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে হচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে রমার বেদনাবই বা মূল্য কতটুকু, আব বমার ব্যক্তিস্বকপের মূল্যই বা কী, সেই কারণেই শেষ অধ্যায়ে বমার কাশীবাস বড়ো জোর আমাদের করুণার্দ্ৰ সহানুভূতিবই উদ্বেক ববে, আব কিছু নয়। যাকে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বাপেক্ষা জটিল ও দুবধিগম্য বলেছেন সেই জটিলতা এবং দুবধিগম্যতা শিল্প-সার্থক জটিলতা নয়, অর্থাৎ শব্দচন্দ্রের শক্তির অভাবজনিত জটিলতাই এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। যে মুহূর্তে শব্দচন্দ্র বুঝেছেন যে এই উপন্যাসের আশ্রমে বংশানুক্রমিক শত্রুতাব ব্যাপারটিকে বমার ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে বিজড়িত করা গেল না সেই মুহূর্তেই পারিবারিক বেয়াবেষি হয়ে দাঁড়িয়েছে পল্লীসমাজের অন্তর্ভুক্ত সংকীর্ণতার সামগ্রী। অথচ বমাকে সেই সংকীর্ণতার শিকার হিসাবে ব্যবহার কবলে বমা এবং বমেশের প্রেমের অংশকে উপন্যাসের পটে ব্যবহার করা চলে না। স্মৃতবাং মুহূর্তেই পারিবারিক বেয়াবেষির ব্যাপার গৌণ হয়ে গিয়ে প্রধান হয়ে দাঁড়াল পল্লীসমাজ। অথচ বেণী ঘোষাল এবং তারিণীর মাধ্যমে প্রকাশিত পল্লীসমাজ একটা অনিবায অন্ধ শক্তিও নয়। মহাশক্তিশালী অন্ধ যন্ত্রের মহিমাও তাব নেই। সেই যন্ত্রেই ক্রীড়নক হয়ে বমা বমেশকে দেখা-না-পাওয়া মাত্রই আঘাত কবছে এবং দেখা-পাওয়া-মাত্রই ভালবেসে বিগলিত হচ্ছে। এই দোলাচলবৃত্তি দ্বন্দ্ব নয়। একে বাদা জোর মতিস্থিতির অভাব বলা যেতে পারে। স্মৃতবাং এই উপন্যাসের পটে বমার প্রেমেরও যেমন কোনো ব্যক্তি-সত্তাশ্রয়ী গভীর মূল নেই, বমার আঘাতেরও তেমন কোনো প্রাচীন সংস্কার অনুগামী অনিবায ভূমিকা নেই। তাই তারকেশ্বরের বাসাবাড়ি এখানে প্রক্ষিপ্ত, আদালতে বমার সাক্ষ্যদান এখানে অযথা করুণ বসেব উৎস।

অনুরূপ অসঙ্গতি এবং বৈসাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় সাবিত্রী এবং কিরণময়ীর ক্ষেত্রেও। সতীশ এবং সাবিত্রীর মেসবাড়ির জীবন উপন্যাসের দুর্বলতম বনিয়াদ। সাবিত্রীর আত্মসংঘর্ষকে অমানুষিক বলে অনেক সমালোচকের মনে হয়েছে। এই মনে হওয়ার হেতু এই যে আমরা সাবিত্রীর অতীত জীবনটাকে জানি না। রবীন্দ্রনাথের মতো শব্দচন্দ্র কখনই মানুষের গোটা জীবনের প্যাটার্নকে ধবতে

চাননি বা ধবেননি + সেইজন্য শবৎচন্দ্রের উপন্যাসে বহু কেন-র উদ্ভব নেই।
এব ফলে শবৎচন্দ্র তাদের সাহায্যে অনেক সুন্দর সুন্দর মুহূর্ত বচনা কবেছেন
বটে কিন্তু নিখুঁতভাবে চবিত্র সৃষ্টি কবেছেন কম। সাবিত্রী কেন অত চমৎকার
বাক্পটু অথবা কেন তাব এই অমানুষিক সংঘম তা উপস্থাপিত কবা হয়নি এবং
প্রতিষ্ঠিত কবা হয়নি। টাইপ এবং ইনডিভিজুয়ালের দ্বন্দ্বের ব্যাপার শবৎচন্দ্র
কখনও অভিনিবেশের সঙ্গে ধরবাব চেষ্টা কবেননি। ফলে তাঁর বাঈজীবা
কখনও বাঈজী নয়, তাঁর ঝিয়েবা কখনও ঝি নয়, তাব দিদিবা কখনও দিদি নয়,
কিন্তু সকলেই একটা অন্য কিছু হয়ে সার্থক হতে চায়। অর্থাৎ বৌদিবা হয় মায়েব
মতো, জ্যাঠাইমা হলেন গুরুব মতো, মোসব ঝি হল আদর্শ প্রেমিকাব মতো।
এই মৌল অসঙ্গতি থেকেই শবৎচন্দ্রের চবিত্রের প্রতিষ্ঠা সাধনের ত্রুটিও ঘটে
থাকে। সাবিত্রীর ব্যক্তিত্বের এমন কিছু প্রমাণ আমবা পেলাম না যাব ফলে
কলকাতাব মেসবাডিব সমস্ত আবহাওয়া মন-শান্ত ভুজ্জের মতো সতীশ এবং
সাবিত্রীর প্রেমের আকাশ বচনায় বাস্য থাকবে। সাবিত্রীর চবিত্রকে প্রত্যক্ষভাবে
আমাদের কাছে প্রমাণ কবা হল না, শুধু অন্যদের তাব সম্বন্ধে ব্যান-ধাবণাটা কী
সেটাকেই ব্যবহার কবা হল। অপরের মাধ্যমে চবিত্রকে প্রতিষ্ঠা কবাব চেষ্টা
উচু দবেব সাহিত্য-কৌশল নয়। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন - “সাবিত্রী
ও বাজলক্ষ্মী সতীত্ব ধর্মের মূল্য সম্বন্ধে এত সচেতন যে তাহাবা প্রথম বয়সেব
পদস্থলনের জন্ম আজীবন প্রায়শ্চিত্ত কবিয়াছে ও জীবনের সর্বোত্তম সার্থকতা
হইতে নিজদিগকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত কবিয়াছে।” মাত্র একটা অপবাদবোধের
ওপরে শবৎচন্দ্রের প্রধান দুটি চবিত্রের ভিত্তি স্থাপিত এ-কথা বললে শবৎচন্দ্রের
সীমিত কল্পনাকেই স্পষ্ট কবে দেখানো হয়। বিশেষ কবে এই অপবাদবোধের
যখন কোনো গতিশীল ভূমিকা নেই, এ গুলোব কাজ যখন শুধু চবিত্রগুলিকে স্থিতি-
ধর্মী কবে তোলা অর্থাৎ সর্বের ব্যক্তিত্বের নির্বাণ, তখন উপন্যাস শিল্পের বিষয়
হিসাবে তাবা কোনো গভীর মূল্যের অধিকারী থাকে না।

সাবিত্রীর উপস্থাপনায় যে ত্রুটি উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ কবেছে কিবণময়ীর সমগ্র
জীবনে তা উগ্রতব। কিবণময়ীর একটা অধ্যায়কেও যদি সত্য বলে ধবা যায়
তাহলে তাব দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপনীত হওয়ার পূর্বে দীর্ঘ প্রস্তুতি প্রয়োজন।
অনঙ্গ ডাক্তারের সঙ্গে স্কুল প্রেমলীলায যাকে মনে হয় ইতবশ্রেনীর বমণী,
দিবাকরের সঙ্গে তর্কে তাকে মনে হল মননশীল বৈদগ্ধ্যের আশ্চর্য অধিকারিণী।
কিবণময়ীর সমস্ত আচরণগুলি যেন এয়াব-টাইট-কম্পার্টমেন্টে বিভক্ত। তার

কল হয়েছে এই যে কিরণময়ীর শেষ পরিণতির শোচনীয়তা আমাদের বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে না। কেননা যে নারী ইতর তার জন্ত আমাদের কোনো দুঃখ নেই। আবার যে নারী মননশীলা, তার একবিধ আচরণের কোনো মূল্য খুঁজে পাই না। শুধু অভূতপূর্ণ বলিষ্ঠ প্রেম ঘোষণার জন্ত কিরণময়ীকে যদি তেজস্বিনী বলে ভেবে নিই তাহলে কিরণময়ীর ব্যর্থ পরিণামের একটা ট্রাজিক অর্থগৌরব খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সে ঘোষণাও আত্মসমর্থনহীন। শুধুমাত্র “অনেক রহস্যই অমীমাংসিত থাকে” এই বলে কিরণময়ীকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

“নিষিদ্ধ প্রেমের” বিষয়-সংবলিত উপন্যাস হিসাবে গৃহদাহ শরৎচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ বচনা। অচলার সমস্তা নিঃসন্দেহে একটি মহৎ উপন্যাসের বিষয় হবার উপযুক্ত। সুরেশ এবং অচলার সম্পর্ক ও প্রতিক্রিয়ায় একটি যথার্থ প্রশ্নেরও সৃষ্টি করা হয়েছে। অচলার যন্ত্রণাকে শরৎচন্দ্র রূপদান করেছেন। এবং শেষ পর্যন্ত সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে এ-উপন্যাসের প্রধান সম্বল। অচলার অন্তশোচনার আগুনে তার সমস্ত ক্ষণিক বিভ্রান্তি পুড়ে গেছে—পাঠক তার সতীত্বকে দৈহিক বলে মনে না করে, মানসিক বলে গ্রহণ করে। সুতরাং এই উপন্যাসটিকে আমরা নিষিদ্ধ প্রেমকে অবলম্বন করে লেখা পাশ্চাত্য সাহিত্যের উপন্যাসের সঙ্গে বেখে তুলনা করে দেখতে পারি। তাতে গৃহদাহের প্রকৃত মর্যাদার হানি হবে না। পক্ষান্তরে এ-জাতীয় উপন্যাসের একটা মান খুঁজে পাওয়া যাবে। একটা বিষয় পাঠক মাত্রেরই লক্ষ্য করেছেন যে পাশ্চাত্য উপন্যাসে এ-জাতীয় সমস্তাকে যখন ব্যবহার করা হয়েছে তখন লেখকেরা সাধারণত সমস্তার একটা সমগ্র রূপ উপস্থিত করেছেন। নায়িকারা শুধুই পত্নী নন, জননীও বটে। অর্থাৎ একটা নারী-জীবনের সম্ভাব্য দুটো বাঁধনই সে-ক্ষেত্রে বিদ্যমান। সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেমের ব্যাপার এই জীবন-বিজ্ঞানের ওপরে যে প্রতিক্রিয়া সৃজন করে তা আরো গভীর এবং অর্থবান। আমাদের সাহিত্যে নারীকে আমরা এমতাবস্থায় মাত্র পত্নী হিসাবে উপস্থিত করেছি। ফলে সতীত্বের বন্ধ সংস্কার ছাড়া আর কোনো দৃঢ়মূলে নিষিদ্ধ সমাজ-বিগহিত প্রেমের আঘাত এসে পড়ে না। এর একটা গভীর অসুবিধা আছে। সাধারণত এই ধরনের উপন্যাসে দেখা যায় যে স্বামীর জীবনযাত্রার কৃত্রিমতা বা ব্যক্তিত্বের যান্ত্রিকতার ফলে পত্নীর জীবনে একটা প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকে। পত্নীর মনে সেই ছকের কোনো প্রতিষ্ঠা না থাকায় যে প্রেমোন্মাদনের শুরু তার যন্ত্রণা খুব বেশি নয়। অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতার তরতম বিচার স্ত্রীর পক্ষে সম্ভব। সে-ক্ষেত্রে কারেনিনকে অথবা মঁ শিয়েবোভারিকে আমরা বলতে পারি

ক্ষীণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আনা অথবা এমাব মনে স্বামীদের বিচার করার অবকাশ বর্তমান। কিন্তু এই বিচারে অক্ষম নারী সদাই যেখানে অচ্ছেদ্য সম্পর্কের সূত্রে বাঁধা, সেটা হল সম্ভাব্য ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রেই নারীর সবকিছুকে যাচাই কবে দেখা সম্ভব। তা নইলে শুধু দৈহিক শুচিতা বোধের মূল্য কতটুকু? আর এক-জনের দাম্পত্য-নীতিবোধের অটলতাই বা কতটা গভীর প্রশ্ন সঞ্চাব করতে পারে? বিবণময়ীর পাশে সুবাবালা অথবা অচলাব পাশে মুগাল এই প্রশ্নে মাত্র সামাজিক নীতির ব্যক্তিগত প্রতীক।

এবং এই সমগ্রতার অভাবেই অচলাব দোলাচলবৃত্তি নিবর্থক। কেননা প্রথম থেকেই লেখক যেন বড়ো সতর্ক এই কথাটি বোঝানোর জন্য যে সূবেশ একান্তই মুহূর্তমায়া সৃজন কবেছিল। তা যদি হয়, অচলাব মনের মধ্যে যদি সূবেশ বন্ধমূল না হয় তবে শুধু দৈহিক শুচিতাবোধ সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে যতটা অগ্রসর হওয়া সম্ভব ততটা অবশ্য শবংচন্দ্র এগিয়েছেন। কিন্তু “নিষিদ্ধ প্রেমের” বিষয় তো শুধু দৈহিক শুচিতা বোধের প্রশ্ন নয়। এর মূল ব্যক্তিস্বকপের নিভৃত মৃত্তিকায়। ব্যক্তিত্বের গভীরে এর ক্ষেত্র। এবং সেখান থেকে উৎসাবিত না হলে এ-সমস্তা কখনো জলন্ত হতে পারে না। সূবেশ এবং অচলাব সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত কববার কোনো বকম প্রচেষ্টা ব্যতিবেকেই উপন্যাস আবন্ত হবার উনচল্লিশ পাতার মধ্যেই সূবেশ এবং অচলাব ব্যবহারে আতিশয্য সৃজন এই কাবণেই শিল্পসম্মত হয়নি। প্রথম থেকেই অচলা সূবেশ সম্পর্কে “ব্যাধীভীত হবিণী এবং সূবেশ যেন তাহাকে ছোঁ মারিয়া ধবিতে চায়”। সূবেশ তাব আগের দিন পর্যন্ত ব্রাহ্মদেব সম্বন্ধে বিমুখ। এবং সে অচলাব সঙ্গে কথাবার্তায় দৃবত্ব বজায় বেখে চলেছে। সে হঠাৎ এক লহমায় ব্রাহ্মবাডিতে অচলা হাতে ববে দিলে খেতে বাজী হলে তা শিল্প-সঙ্গতি বক্ষাব কোনো নিয়মকেই পালন কবে না। শবংচন্দ্র সূবেশকে দিয়ে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করিয়েছেন এইভাবে যে “একদিনের ভূমিকম্পে অর্ধেক ছুনিয়াটা পাতালের মধ্যে ডুবে যেতে পারে”। কিন্তু সূবেশের ব্যাখ্যা ছাড়াও উপন্যাসে একটা ব্যাখ্যাব প্রয়োজন হয়। শিল্পের ন্যায় অনুসরণ কবেই সেই ব্যাখ্যা আমাদের প্রত্যাকে গড়ে তোলে। শবংচন্দ্র জীবনের আকস্মিকতাকে শিল্পে আনতে গিয়ে শিল্পের ন্যায়কে লঙ্ঘন কবেছেন। ফলে এক বাত্রির অনিদ্রাতেই ঘটনাটা যা দাঁড়াল তা এই :

একে এই গরম, তাহাতে এত বেলা পর্যন্ত স্নানাহাব নাই—গত রাত্রে এতটুকু ঘুমাতে পারে নাই—তাহাব পায়েব নিচেব মাটিটা পর্যন্ত যেন

অকস্মাৎ ছলিয়া উঠিল। আরক্ত দুই চক্ষু বিক্ষারিত করিয়া বলিল, ব্রাহ্মদের ঘৃণা করি কি না, সে জবাব ব্রাহ্মদের দেব, কিন্তু আপনি আমার কাছে তাদের অনেক, অনেক উপরে—তাহার উন্মাদ ভঙ্গিতে অচলা ভয়ে কাঁঠ হইয়া উঠিল। কোনোমতে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জগ্ন সভয়ে কহিতে গেল—
বেহারাটা—

কিন্তু সে অক্ষুট মৃদুস্বব সুরেশের উত্তপ্ত উচ্চকণ্ঠে ঢাকা পড়িয়া গেল। সে অমনি তীব্র স্ববে কহিতে লাগিল, দুটো দিনের পরিচয়। তা বটে। কিন্তু জানো অচলা, দিন, ঘণ্টা, মিনিট দিয়ে মহিমকে মাপা যায়—কিন্তু সুরেশকে যায় না। সে স্থান কালের অতীত। তুমি ভূমিকম্প দেখেছ? যা পৃথিবী গ্রাস কবে—

এবং এ পবেই সুরেশ কর্তৃক অচলাকে আলিঙ্গন। শবংচন্দ্র নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন যে এ অতিশয় দুর্বল অংশ। কাজেই সুরেশকে উন্মাদ বিশেষণে ভূষিত কবে শেষ পর্যন্ত সে উন্মত্ততার কারণ ব্যাখ্যায় চিকিৎসকের ভূমিকা গ্রহণ কবেছেন। সুরেশের আতিশয্যের হেতু হিসাবে তিনি শেষবক্ষ্যের জগ্ন দেগিয়েছেন গ্রীষ্মাধিক্য, অধিক বেলা পর্যন্ত স্নান এবং আহাবের অভাব ও পূর্ব-রাত্রেব অনিদ্রা। অতএব সুরেশের আকস্মিক আতিশয্য কিছুটা সদিগম্বিব ব্যাপারের মতো পূর্বাভাসবহিত। এই সুরেশকে অচলা ভালবেসেছিল। কিন্তু সে বিষে করেছিল মহিমকে। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গৃহদাহ প্রসঙ্গে বলেছেন যে মহৎ চিত্তে অনিচ্ছাকৃত পাপের প্রতিক্রিয়া গৃহদাহের মূল বিষয়। শুধু অনিচ্ছাকৃত পাপের প্রতিক্রিয়া বললে আমবা অবশ্যই ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একমত। কিন্তু মহৎ চিত্ত কথাটিতে আমাদের বড়ো আপত্তি। অচলা এবং সুরেশের সাহায্যে ববং আমবা এই সিদ্ধান্তে সহজে আসতে পারি যে দুর্বল চবিত্র ব্যক্তিদের পাপান্তশোচনার চিত্র গৃহদাহ উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে।

শুধু যদি শবংচন্দ্র এই কথাটি মনে রাখতেন, অযথা বর্ণারোপের ভাবালুতার প্রশ্রয় না দিতেন তবে গৃহদাহ শবংচন্দ্রের তো বটেই বাংলা সাহিত্যেও একটা অসামান্য কীর্তিস্তম্ভ বলে পরিগণিত হত। অযথা বর্ণারোপের মূলে রয়েছে উপন্যাসের কাঠামোর অসঙ্গতি, এবং সেই অসঙ্গতির মূলে রয়েছে বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে শবংচন্দ্রের অস্পষ্ট ধারণা। যে দোলাচলবৃত্তির কথা অচলা প্রসঙ্গে বলা হয়ে থাকে তাকে উপন্যাসে প্রমাণিত হবার কোনো সুরোগ শবংচন্দ্র দেননি। সুরেশ সম্বন্ধে অচলার আগ্রহ কতটা এটা প্রতিপন্ন করতে গেলে সুরেশ-বিবহিত

পৰিবেশ অচলাৰ পক্ষে এ-উপক্ৰমে বিশেষ প্ৰয়োজনীয় ছিল। উপক্ৰমৰ প্ৰথম অংশে অচলাকে কটুক্তি কৰাৰ পৰা স্তবেশৰ বিদায় ও ইত্যবসৰে মহিমেৰ ও অচলাৰ বিবাহে সে স্তযোগ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু স্তবেশকে মহৎ প্ৰতিপন্ন কৰাৰ জন্তু ফয়জাবাদেৰ প্লেগ ও অগ্নিকাণ্ডে স্তবেশৰ ত্ৰাণকতাৰ ভূমিকা গ্ৰহণেৰ কাহিনী সৃজন ও সে-কথা সংবাদপত্ৰে পাঠ কৰাৰ পৰা অচলাৰ শ্ৰদ্ধাপ্লুত দৃষ্টিৰ সম্মুখে অকস্মাৎ স্তবেশৰ আবিৰ্ভাবে সে স্তযোগ নষ্ট হল। এদিকে মহিমেৰ জন্তুও অচলাকে কোথাও অপেক্ষা কৰতে হল না। অচলাৰ পাশে পাশে স্তবেশেৰ সতত উপস্থিতিৰ ফলে স্তবেশ অচলাকে অভিভূত কৰতে সক্ষম সেটা বোঝা গেল। বোঝা গেল না স্তবেশ কতখানি অচলাৰ সত্তাৰ গভীৰে আলোড়ন সৃষ্টি কৰেছে। অচলাৰ পক্ষে এটা যদি শুধু অন্ধ আবেগ হয় তা হলে আব স্তবেশেৰ জন্তু ফয়জাবাদেৰ মহত্ব বচনাৰ দবকাৰ হয় না। যদি এটা অচলাৰ প্ৰেম হয় তাহলে বিস্তৃততৰ এৰং গভীৰতৰ পৰীক্ষায় তাকে স্থাপন কৰা দবকাৰ। অচলা জীবনধৰ্মেৰ কোন্ বৃহত্তৰ আবেগে স্তবেশকে ভালবাসল তা এ-উপক্ৰমে কোথাও স্পষ্ট নয়। স্তৱাং মহিমেৰ সম্বন্ধে তাৰ শ্ৰদ্ধাৰ বোধেৰ স্বৰূপ কী এৰং স্তবেশ সম্বন্ধে তাৰ আকৰ্ষণবোধেৰ অৰ্থ কী এ-সম্বন্ধে কোনো ধাৰণা অচলাৰ নেই, অচলাৰ স্ৰষ্টাৰও নেই। অস্তিৰমতি ব্যক্তিৰ সৰ্ববিধ দৌৰল্যে অচলা চিহ্নিত। কাজেই স্তবেশেৰ ক্ষেত্ৰেও স্তবেশেৰ কেউ নেই এই নিঃসহায় অবস্থাৰ সাহায্যে তাৰ প্ৰতি অচলাৰ এৰং পাঠকেৰ দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকৰ্ষণেৰ চেষ্টা শবংচন্দ্ৰেৰ মৌল অসঙ্গতিবই ফল।

এই সমস্ত অসঙ্গতিৰ ফলে বোঝা গেল না কেন অচলা স্তবেশকে দীৰ্ঘ বেলযাত্ৰায় তাদেৰ সঙ্গী হতে বলেছিল। কাজেই অচলা যখন স্তবেশেৰ পা জড়িয়ে ধৰে মহিমেৰ জন্তু বাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা কৰে “কোথায় তিনি ? তাকে কি তুমি ঘুমন্ত গাৰ্ভি থেকে ফেলে দিয়েছ ? বোণা মানুষকে খুন কৰে তোমাৰ—” তখন অচলাৰ উচ্ছ্বাসময় উক্তিৰ পীড়া অনুভৱ না কৰে উপায় থাকে না। বিশেষ কৰে বোণা মানুষকে খুন কৰা প্ৰসঙ্গটি হাস্যকরও বটে। যেন অচলাৰ মহিমেৰ প্ৰতি সহানুভূতি শুধু মহিম ৰুগ্ন বলেই। শবংচন্দ্ৰ অবশ্য এই উক্তিৰ সাহায্যে মহিমেৰ প্ৰতি অচলাৰ আকৰ্ষণেৰ বোধে যে কোনো খাদ নেই সেটা প্ৰতিপন্ন কৰতে চেয়েছেন। কিন্তু যখন মহিম ৰোগা হলেই মহিমেৰ প্ৰতি সহানুভূতি বাড়ে এৰং স্তবেশ অস্থস্থ হয়ে পড়লেই স্তবেশেৰ কাছে থেকে যেতে হয় তখন বডোজোৰ সে চৰিত্ৰকে আমবা বলতে পাৰি সেবা-ধৰ্মে উৎসৰ্জিত প্ৰাণ। উক্ত দুই ক্ষেত্ৰেই

অল্পই মানুষের প্রতি সহানুভূতিকে, নারীর স্বাভাবিক জীবনচরণ-বিধিকে শরৎচন্দ্র ব্যবহার করেছেন প্রেমানুভূতির প্রকাশ-মাধ্যমরূপে। এই অতিব্যবহৃত শরৎচন্দ্রীয় ছক অন্তত এই উপন্যাসের ক্ষেত্রে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে। বক্তব্য বিষয়ের অস্পষ্টতার জন্যই অভ্যস্ত কৃত্রিম কৌশলে অচলার দোলাচলবৃত্তিকে শরৎচন্দ্র রূপায়িত করতে গেছেন। জরে অচেতন স্বরেশকে মৃত বলে মনে করে অচলার যে ভাবনা তাও এই কারণে অচলার পক্ষে যথার্থ হয়নি। স্বরেশের জন্য তখন অচলার যে চিন্তা তার মূল সূত্র এ-উপন্যাসে কোথাও লেখক স্পষ্ট করে তোলেননি। সেখানে অচলার ভাবনার মূল বক্তব্য এই যে “যে তাহারই জন্য এত বড়ো দুর্নামের বোঝা মাথায় লইয়া, হতানশ্বাসে এমন করিয়া, এই পৃথিবী হইতে চিরদিনের তরে বিদায় লইয়া গেল, অপরাধ তাহার যত গুরুতরই হোক, তাহাকে মার্জনা করিতে পারে না এত বড়ো কঠিন হৃদয় সংসারে অল্পই আছে।” এখানেও অচলার সহানুভূতিই প্রধান কথা। এই শুধু এখানে বোঝা গেল যে সেই অল্পসংখ্যক কঠিন হৃদয়ের মধ্যে অচলা পড়ে না। এ রোহিণী বা বিনোদিনীর জীবন-পিপাসা নয়, আনা কারেনিনা বা মাদাম বোভাবির প্রচলিত ছকেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহও নয়, এ বাস্তবিকপক্ষে একটি দুর্বল ব্যক্তির অপরাধচেতনার গল্প—যে ব্যক্তি লৌকিক সম্বন্ধের অনুরোধে যার সম্বন্ধে তার বিতৃষ্ণার পাত্র পূর্ণ হয়েছে অনিচ্ছায় তারই শয্যা-সঙ্গিনী হয়। সুতরাং অচলার ভুল এবং ভুল সংশোধনের জন্য অনুতাপ এই দুয়েরই কোনো নৈতিক ভিত্তিভূমি নেই।

সুতরাং সমাজ-অনুমোদিত নয় এমন সব প্রেমের ব্যবহার শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ঘন ঘন ঘটলেও, সেগুলির তাৎপর্য অধিক নয়। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি এমন সব মোটা দাগে ভাগ করে নিষেছিলেন যেখানে বিশ্লেষণ শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে যান্ত্রিক। সেই যান্ত্রিকতাকে পরিহার কবাব জন্য পাঠকদের উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলার আয়োজনেই শরৎচন্দ্রের যোলো আনা চেষ্টা নিয়োজিত। মহৎ ঔপন্যাসিকেরাও পাঠকদের কাছ থেকে তাঁদের সৃজিত চরিত্রাবলীর জন্য সহানুভূতি প্রত্যাশা করে থাকেন। তাঁদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের এবং শরৎচন্দ্রের ছায়া অনুসারী চল্লিশ-পঞ্চাশের বাঙালী ঔপন্যাসিকদের তফাত এইখানে যে মহৎ ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের সৃজিত চরিত্রদের সাহায্যে ঘেঁটা করে থাকেন, শরৎচন্দ্র এবং তার অনুসারীরা সেটা করতে চান পাত্র-পাত্রীদের জীবনের কতকগুলো অবস্থার সাহায্যে। আমাদের সহানুভূতিটা জাগ্রত হয় চরিত্রদের জীবনের কতকগুলি পরিস্থিতি প্রসঙ্গে। দেবদাসের যক্ষ্মা, স্বরেশের

নিউমোনিয়া—একটি হাজার রকমের পরিস্থিতি (জানদার মুখে সিঁছর মেখে বসাও এই পর্যায়ে পড়ে) সৃজন করে পাঠকদের চোখের অশ্রুবাহী শিবার ওপর প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃজন করতে শবৎচন্দ্র ছিলেন সিদ্ধহস্ত। শবৎচন্দ্রের সঙ্গে গত দুই দশকের ঔপন্যাসিকদের তফাত এইখানে যে এ-প্রসঙ্গে অন্তত শবৎচন্দ্রের প্রচেষ্টা ছিল খাঁটি এবং আন্তরিক। এ-যুগের শবৎ ছায়ানুসাবীবা সে-ক্ষেত্রেও কেমন কৃত্রিম, বর্তমান গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে সে-কথা আলোচনা করা যাবে। উপন্যাসের অন্তিষ্ট যে সমগ্র জীবনবোধ সে সম্বন্ধে শবৎচন্দ্রের ধারণার ব্যত্যয় নানা ভাবে তাঁর উপন্যাসের শিল্পকর্মকে ক্ষতিগ্রস্ত কবেছে। পূর্ব অনুরোধে কথিত পরিস্থিতি-প্রিয় মনোভাবের উত্তম অভিব্যক্তি তাঁর সমাজ আবিষ্কারের চেষ্টাতেও প্রতিফলিত। মাত্র আন্তরিকতা বা শুভেচ্ছা যে ঔপন্যাসিকের প্রধান সঙ্গল হতে পাবে না এটা তাবই প্রমাণ। এখন আমরা শবৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ চेतনার স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হবার প্রয়াস পাব।

•• চাব ••

আংশিকতাই একজন ঔপন্যাসিকের প্রধান ত্রুটি। যে পটবিধৃত জীবন সার্থক উপন্যাস রচনার অন্ততম শর্ত সেই পট অথবা বিধৃত জীবনে আংশিকতা সমস্ত শিল্পকর্মকে নষ্ট কবে। শবৎচন্দ্র কেমনভাবে এই পটবিধৃত জীবনকে শিল্পে ব্যবহার করেছেন তার ভিতবেই প্রকাশিত তাঁর মানসোৎকর্ষ। উপন্যাসের বিচারে সেই মানসোৎকর্ষের বিচার হয়। শবৎচন্দ্রের পল্লীসমাজবোধের পূর্ণ চেহারা নানাভাবে নানা উপন্যাসে উপস্থিত থাকলেও প্রধানত পল্লীসমাজ, পণ্ডিত মশাই ও অবক্ষণীয় ব্যবহৃত সমাজচিত্র শবৎচন্দ্রের খ্যাতির কারণ। আমাদের আলোচনা পল্লীসমাজে-ব্যবহৃত সমাজচিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

গ্রামসমাজকে ব্যবহার বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন নয়। নতুন হওয়া সম্ভবও নয়। স্বর্ণলতার গ্রামকেন্দ্রিক পারিবারিক উপন্যাসে, বমেশ দত্তের সমাজ ও সংসারের চিত্রে গ্রামের ব্যবহার আমরা দেখেছি। কিন্তু গোটা দেশীয় জীবনের অংশ হিসাবে গ্রামজীবনের উপস্থাপনা এবং তাকে শিল্পসূত্রে গেঁথে নেওয়া ববীন্দ্রনাথের পূর্বে আর কোনো লেখকের হাতে ঘটেনি। গল্পগুচ্ছেব অসংখ্য গল্প এবং গোরা এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ববীন্দ্রনাথের কাছে গ্রামসমাজের সমুদয় অবস্থার উপলব্ধি যে ভাবে হয়েছিল তাব তাৎপর্য শবৎচন্দ্রের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এ-কথা সকলেবই জানা আছে যে স্বদেশী যুগে স্বদেশী সমাজ-বিষয়ক নানা চিন্তায়

রবীন্দ্রনাথ ব্যাপ্ত ছিলেন। আমাদের সমাজের পক্ষ অবস্থা কেমন করে আবার নব স্বাস্থ্যের সঞ্চারে পরিপূর্ণ হবে তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বহুভাবে ভেবেছেন। আমাদের গ্রামসমাজ সম্বন্ধে চার্লস মেটকাফের মূল্যায়নের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাবও কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রনিরপেক্ষতা যে আমাদের প্রাচীন সমাজের মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তির একটা দিক এবং নিজের ভিতর থেকেই আয়ুসঞ্চয় করে বেঁচে থাকবার একটা অদম্য ক্ষমতা প্রাচীন গ্রাম সমাজের ছিল এ-কথা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন। “রাজলক্ষ্মী” নয় “সমাজলক্ষ্মী”ই ছিলেন আমাদের উপাসনার লক্ষ্য। সমাজের সেই হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনার সঙ্গে মতানৈক্যের অবকাশ থাকতে পারে। কিন্তু কাষ-কারণ সূত্রে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ সমস্তার গোটা রূপটাকেই বুঝতে চেয়েছিলেন। তাঁর গল্প-উপন্যাস এ-কথার মহৎ সাক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে আমাদের সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন এক রাষ্ট্রশক্তির বৈশ্ব-শকট-চক্রের তাড়নায় অনিবার্যভাবে আমাদের প্রাচীন গ্রামসমাজ হযেছে পবাভবমুখী। রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে যেটা আকৃষ্ট করে সেটা হল অনাত্মীয় রাষ্ট্রশক্তির সামনে প্রাচীন গ্রাম জীবনের প্রতি গুরুত্বের পবাভব, লাঞ্ছনা এবং যন্ত্রণা। মেঘ ও বৌদ্র গল্পে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে ম্যাজিস্ট্রেটের মেথর যখন ব্রাহ্মণ হবকুমারকে কান ধবে ঘোড়দৌড় কবালো, সেই ঘটনার তাৎপৰ্য রবীন্দ্রনাথের কাছে জাতি-ভেদ-কণ্টকিত গ্রামে ক্ষীণজীবী ব্রাহ্মণের প্রতাপের অভিনয় অপেক্ষা অধিক গভীর বলে মনে হযেছে। আমরা পূর্বে আলোচনা করে দেখিয়েছি যে অপমানিত নামেবের সমস্তটাই নায়েব, সামান্যংশে মাত্র সে ব্রাহ্মণ। কাজেই ব্রাহ্মণের প্রেক্ষিতে ওপরওয়ালা অফিসার যখন ধূল্যাবলুষ্ঠিত করে তখন সামান্যংশের ব্রাহ্মণের ক্ষোভ অচিবেই নায়েবাংশের কাছে পরাভূত হয়। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন যে গ্রামীণ জীবনের করুণ বিডম্বনা ঐখানে। এ নয় শুধু নিমন্ত্রণ বাড়ির দলাদলি অথবা চণ্ডীমণ্ডপী ঘোঁটা অথবা শুধুই অকারণ মূঢ়তা। একটা একদা শক্তিশালী অতিকায় সত্তাকে বিদেশী রাষ্ট্রশক্তি কেমন করে মেবে ফেলেনি কিন্তু চিবস্থায়ী বন্দোবস্তের তৃণমুষ্টি ভক্ষণ করিয়ে তাকে বেঁধে রেখেছে জীবন্তে অধমৃত—তারই যন্ত্রণা রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন। সেজন্য শুধু পাডাগেঁয়ে নীচতা ও সংকীর্ণতাকে তিনি চিত্রণের বিষয় করেননি। পল্লীসমাজের পরিবেশ বলতে কেবল পল্লীর ভূমি-নির্ভর পর-শ্রমজীবীদের কথাই তিনি ভাবেননি। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন বিশ্লিষ্ট গ্রাম-সমাজের শোচনীয় দীর্ণতাকে। শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজে আমরা সমস্তার অতি

সামিত রূপ প্রত্যক্ষ করি। সমস্তাটা যে শুধু লোকগুলির ভালো-মন্দ হবার সমস্তা নয়, এবং কেউ ভালো হয়ে গেলেই যে সমস্তার মীমাংসা হয় না—সে কি ব্যক্তি-জীবনে, কি সমাজ-জীবনে—শব্দচন্দ্র তা নিয়ে কখনো মাথা ঘামাননি। কী সেই তৎকালীন গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামো যাব অনিবার্য পবিণতিতে প্রাচীন গ্রামসমাজের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির পবম্পব সম্পর্কের ভাঙন শুরু হয়েছে, শব্দচন্দ্র সে সম্বন্ধে কোনো জিজ্ঞাসা তোলেননি। তিনি দেখেননি যে সমস্তার একটা সামগ্রিক স্বরূপ না উপলব্ধি কবলে সমস্তার লঘুকরণের দিকে প্রবণতা সহজে আসে। ইংরাজ আগমনের পর ভূমিজীবী গ্রামীণ মধ্যবিত্তের সঙ্গে যখন গ্রামের রসক, কামার, ছুতোব, মুচি, মেথবের সঙ্গে প্রাচীন সম্পর্ক-সূত্র শিথিল হয়ে গেল তখন শুধু বর্ণাশ্রম পবিচালিত সমাজের দুর্দশা শুরু হল না, সেটাই হয়ে দাঁড়াল প্রকৃত পক্ষে জাতীয় দুর্গতি। কলকাতামুখী মধ্যবিত্তের চেহারা বমেশ দত্ত সামাজিক উপন্যাসে অচেতনভাবে যথার্থ অঙ্কন কবেছেন—‘গ্রামে থাকিলে উন্নতি নাই।’ তাই মধ্যবিত্তের যে অংশ কলকাতায় লেখাপড়া শিখতে গেল তাদেরই আত্মীয়-স্বজনরা সমাজ রক্ষার্থে অভিভাবক হলেন। কিন্তু কণওয়ালিসের ভূমি-ব্যবস্থার ফলে গ্রামীণ মধ্যবিত্তশ্রেণীর সঙ্গে গ্রামীণ সাধারণের মধ্যে যে ফাটল সৃষ্টিত হল সেই দুর্বতিক্রম ফাটলের একদিকে বইলেন গ্রামীণ মধ্যবিত্ত, ভূস্বামী, পুর্বোহিত, মোল্লা আর অপর দিকে বইল গ্রামের প্রাচীন অর্থনৈতিক জীবনের প্যাটার্নের ভ্রাম্যশেষকে বৃষ্টি নিয়ে রসক, কামার, ছুতোব, নাপিতেবা এবং প্রভৃতিরা। ববীন্দ্রনাথ সব সময় এই ফাটলকে দেখাতে চাইতেন, ফস্ফার মূল নির্ণয় করতে চাইতেন এখানে। গোবা উপন্যাসে চব্বোষপুত্রের উৎসর্গ গ্রাম সমাজের স্বরূপ তিনি সে কাণে বৃহৎ উপবরণ ব্যতীত প্রস্তুট কবতে পেয়েছেন। বড়ো কথা এটা নয় যে গোবা বা গোবার সঙ্গী বমাপতি নাপিতেব ঘরে জল খেতে সম্মত হয়নি। শুধু এই সূত্রটুকু অবলম্বন করে ববীন্দ্রনাথ জাতিভেদের নিদারুণ কুফল সম্বন্ধে আমাদের সচেতন কবতে চাননি। তিনি দেখিয়েছেন নাপিতও গোবাকে পানীয় জল দিতে ইচ্ছুক ছিল না। এত ব্যাপারটা একটা বহু কালাগত জীবনাচরণ-বিধি। সমস্তাটা এখানে নয়। ববীন্দ্রনাথ সমস্তাটাকে দেখিয়েছেন তাব একটু পবেই। যেখানে নায়েব মারব চাটুজোব ঘরে বিশ্রান্তালাপবত দাবোগাকে তিনি উপস্থিত কবেছেন। নীলের হাঙ্গামায় পুলিশ অবশ্রান্তাবী-রূপেই জমিদারের বন্ধক হিসাবেই আবিভূর্ত হবে। নায়েবের ঘরে দারোগা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দাবোয়ানের মতো অপবিহায। কিন্তু ববীন্দ্রনাথ মাত্র

এইটুকু বলে সমস্যাহত জীবনের রূপনির্ধারণকে পরিহার করেননি। ভালো নায়েব আছে, ভালো জমিদারও আছে, ভালো দারোগাও আছে। প্রশ্নটা কারুর ভালো হয়ে যাওয়া বা মন্দ হয়ে যাওয়ার নয়। এই পরিচ্ছেদের পরে রবীন্দ্রনাথ গোরার সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট ব্রাউনলো সাহেবের সাক্ষাৎকার ঘটিয়েছেন। ব্রাউনলো সাহেব গোরা অপেক্ষা স্বভাবতই শাসনযন্ত্রের দারোগা নামক সেই ছোট বন্টুটিকে বেশি বিশ্বাস করেন। দারোগার কাছ থেকে তিনি গ্রামের যে চিত্র সংগ্রহ করেছেন তারই ফলে সাতচল্লিশজনকে পুলিশের কর্তব্য-কর্মে বাধা দেওয়ার জন্য, দাঙ্গা মারপিটের জন্য হাজতে যেতে হল। কিন্তু এটুকুও যে-কোনো সাধারণ ঔপন্যাসিকের হাতে পড়লে হতে পারত শুধুই বিদেশী রাজার পুলিশী দাপটের কাহিনী। কিন্তু ব্রাউনলো সাহেব, দারোগা ও নায়েবের অক্টোপাশে বন্দী গ্রামের মানুষের যে ছবি লেখক ইতিমধ্যে অপূর্ণভাবে শিল্প-সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলেছেন তা অবিস্মরণীয়। গ্রামের সাধারণ মানুষের বীষবভার প্রতীক হিসেবে একদিকে যেমন ফকর সর্দার অপব দিকে তেমনি সেই নাপিত। সেই নাপিতের লৌকিক জীবনবোধের যে পরিচয় রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন তা বিশেষ অন্বধানযোগ্য। ফকর সর্দার নীলকুঠি সাহেবকে আঘাত করার পর জেলে চলে গেলে সারা গ্রামে যখন পুলিশের অত্যাচার নেবে এল সেই সময় নিবাস্রয় মাতৃহীন ফকর সন্তান তর্জিককে নাপিত এবং তার বৃদ্ধ পত্নী আশ্রয় দেয়। গোরা এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় নাপিত জবাব দিয়েছিল যে “হিন্দুর হবি ও মুসলমানের আল্লায় কোনো তফাত নেই”। যে প্রাণময়ী শক্তি দার্শনিক বলে বাংলার লোক-জীবনকে লালন করে আসছে ক্ষতিমোহনবাবুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও আমাদের লোকধর্ম ও লোকসাহিত্যে, এবং লোকজীবনের ধর্মসাধকদের সাধনায় সেই শক্তির উৎস সন্ধান করেছিলেন। যে অন্তরময় ঐক্যসূত্র একদা গ্রাম জীবনকে ভিতবেব দিক থেকে আলিষ্ট কবে রেখেছিল সেই লোকজীবন-গত প্রাচীন ঐতিহ্যকেই আমরা বিস্মৃত হয়েছি এবং ম্যাজিস্ট্রেট, দারোগা এবং নায়েবের সমস্ত কুঠারাঘাত গিয়ে পড়েছে সেই জীর্ণ বনস্পতির শিথিল মূলে। তখন গোরাব বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা আমাদের কাছে আর নির্বন্ধক নয়, সে যন্ত্রণাকে আমরা যেন হাতে করে অনুভব করতে পারি। ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ঐতিহ্যের সচেতন নবমূল্যায়ন মহৎ সাহিত্যের লক্ষণ। চব্বিশোশপুরের উৎসন্ন গ্রাম সমাজকে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি প্রসঙ্গসূত্রে নিবিড়ভাবে বিধ্বত আঁচড়ে এমন এক মূল্যে মূল্যবান করে তুলেছেন যে সেই মূল্যে আমরা তখন স্বদেশের গ্রাম সমাজেব

একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নকেই লাভ করি। এ-সম্বন্ধে ববীন্দ্রনাথের চেতনা কতখানি ব্যাপক ও গভীর ছিল আত্মশক্তি গ্রন্থের স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধে তাৰ প্রমাণ পাই :

এখনই আবস্ত কৰিতে হইবে। যত শীঘ্র পাবি, আমবা যদি সমস্ত দেশকে কর্মজালে বেষ্টিত কবিয়া আয়ত্ত কৰিতে না পাবি, তবে আমাদের চেয়ে যাহাদের উত্তম বেশি, সামর্থ্য অধিক, তাহারা কোথাও আমাদের জগ্ন স্থান বাগিবে না। এমন-কি, অবিলম্বে আমাদের শেষ সম্বল কৃষিক্ষেত্রেও অধিকাবকবিয়া লইবে, সেজগ্ন আমাদের চিন্তা কবাব দবকাব। পৃথিবীতে কোনো জায়গা ফাঁকা পড়িয়া থাকে না, আমি যাহা ব্যবহার না কৰিব অগ্নে তাহা ব্যবহারে লাগাইয়া দিবে, আমি যদি নিজেব প্রভু না হইতে পাবি অগ্নে আমার প্রভু হইয়া বসিবে, আমি যদি শক্তি অর্জন না কৰি অগ্নে আমার প্রাপ্যগুলি অধিকাব কৰিবে, আমি যদি পৰীক্ষায় কেবলই ফাঁকি দিই তবে সফলতা অগ্নেব ভাগেই জুটিবে—ইহা বিশ্বব অনিবাৰ্য নিয়ম।

প্রাচীন গ্রামজীবনের অর্থনৈতিক বনিয়াদ যে কৃষিকে আশ্রয় কৰেই টিকিছিল এবং সেই শেষ সম্বল কৃষিব পুনঃসংস্থাপনের ভেতৰ দিষেই যে বিদেশী গভনমেণ্টেব প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে গ্রামসমাজকে পুনরুজ্জীবিত কৰা যাবে ববীন্দ্রনাথ এটা বিশ্বাস কৰতেন। এই প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনাথ আৰো জানতেন যে নবোদিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীৰ সঙ্গে দেশেৰ বৃহৎ অংশেৰ ব্যবধানজনিত মূঢ়তাৰ অভিধাপ গ্রাম এবং শহৰ প্রভেদ কৰে চলে না। কলকাতায় গোবাব বন্ধু অসাম স্বাস্থ্যবান পক্ষু কেবল ছুতোবেব ঘৰেব অসাম মূঢ়তাৰ জগ্ন মৰে। একই উৎস-নিঃসৃত অভিধাপেব বাবি পানে সাৰা দেশটাৰ পক্ষু অবস্থাকে বুঝতে চেয়েছিলেন ববীন্দ্রনাথ। পক্ষুব মৃত্যু তাৰই নিদর্শন।

সে-ক্ষেত্রে শবৎচন্দ্র কদাচ সমস্য়াৰ সমগ্র রূপকে ধৰতে চেয়েছেন। এ-ক্ষেত্রে তাৰ প্রথম ক্রটি এই যে পক্ষীসমাজেব সমস্য়াটা যেন কতকগুলো বাঁতি-নাঁতি, আচাৰ-আচৰণেব মৰ্য্যেই সীমাবদ্ধ। কতকগুলো কুপ্রথাৰ সমষ্টিতেই যেন সমস্য়াৰ রূপ নিৰ্ণয় হৰে গেল। ফলে উদ্ভূত হয়েছে তাৰ এ-সংক্রান্ত দ্বিতীয় ক্রটি—কতকগুলি ব্যক্তিৰ দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি বনে দিবেছেন যে এবাউ হৰা সংস্কারতাৰ আপাব, সমস্য়াৰ উৎস। আমবা আগেই বলেছি যে এ-অবস্থায় সমস্য়াৰ সদলাব বণ হয়, উপল্যাসেব উপাত্ত সামগ্রিক তা থেকে বঞ্চিত হয় উপল্যাসেব পট। বেণী অথবা তাৰিণী যদি সমস্য়াৰ পূর্ণ রূপ হয় তা হলে বনা এবং বমেশেন নিজেদেব দন্দ এবং যক্ষণাব ঘনীভূত তীব্রতা হাস্যৰ পযায়ে গিয়ে পৌছয়। শবৎচন্দ্র তাই

করেছেন। অত্যন্ত ক্ষীণ এবং মোটেই প্রতিনিধিত্বান্বিত নয়, এমন অংশকে সমগ্রের প্রতিভূ বলে মনে করেছেন। অল্প ক্ষেত্রে—যথা পণ্ডিতমশাই উপন্যাসে চরণের মৃত্যুর পূর্বে গ্রামের মহামারী উপলক্ষে অসামান্য গ্রাম্য মৃত্যুর সম্মুখবর্তী নাগকের অবস্থাকে, পূর্বোক্ত কারণেই, মনে হয় একটা সংলোকের দুর্গতি মাত্র। এবং এই ভাবেই, এই আংশিকতার জগুই, এই সমস্যাগত অস্পষ্টতার কারণেই বোঝা গেল না বিশ্বেশ্বরীর বেদনার উৎস কোথায়, বোঝা গেল না চিরপ্রবাসী রমেশ কী করে গ্রামে এসেই সমস্যাঙ্গীর্ণ গ্রামবাসীকে ভালবেসে ফেলল। কিংবা সমস্যা বলতে সে কী বুঝল? তাই এও বোঝা গেল না যে হঠাৎ কারান্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে কোন্ মন্ত্রবলে রমেশ দেখল পল্লীসমাজ এবার আদর্শ সমাজের দিকে অগ্রসর হতে চলেছে। সমস্যার সরলীকরণের জন্য সমাধানও অত্যন্ত সরল পথে এসেছে। তার ফলে চরিত্রগুলি কোনো দৃঢ় বনিয়াদের ওপর দাঁড়াতে পারেনি। তারাও থেকে গেছে লেখকের ভাবাবেগ সৃষ্টির উপায়ক্রম। রমা কেন রমেশের বিদ্যোৎসাহিতায় অথবা শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসে স্তম্ভিত হয় তা বোঝা মুশকিল। এ যদি শুধু প্রেমিকের কীতিতে প্রচ্ছন্ন আনন্দোপভোগ হয় তা হলে তারও একটা সঠিক প্রস্তুতিভূমি প্রয়োজন। শরৎচন্দ্র সেই প্রস্তুতিভূমি রচনা ব্যতিরেকেই রমার দোড়ল্যমানতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। আংশিকতার প্রধান দোষ আকস্মিকতা। তাই রমা এবং রমেশের প্রথম সাক্ষাৎকার থেকেই রমা রমেশ সম্বন্ধে দুর্বোধ্য মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। গ্রামের সমাজপতিদের সপক্ষে, পিতৃশত্রুর পুত্রের বিপক্ষে তার উচ্চকিত ঘোষণাও যেমন আকস্মিক, আবার রমেশকে দেখে বিচলিত হওয়াও তেমনি আকস্মিক। স্ততরাং এই রমা এবং এই রমেশ, যাদের কাছে নিজেদের রূপ পরিষ্কার নয়, তারা পল্লীসমাজের স্বরূপ আবিষ্কারে কতখানি সক্ষম হতে পারে? তাই শরৎচন্দ্রের সামাজিক রীতি-নীতি সংক্রান্ত উপন্যাস কতকগুলি সংকীর্ণচেতা মানুষের সঙ্গে দুটি একটি আদর্শীভূত মানুষের সংঘর্ষের গল্প মাত্র। পল্লী অঞ্চলে অরক্ষণীয় কল্যায় সমস্যা তাঁর কাছে শুধুই একটা শুভবুদ্ধির, অথবা তার অভাবের সমস্যা। এ-সমস্যার সরলীকৃত রূপ সৃজনের জন্য কল্যায় পিতৃমাতৃবিয়োগের মর্যাস্তিকতা যেমন লক্ষ্যহীন, তেমনি অর্থহীন কারো একজনের শুভবুদ্ধির শুভলগ্নে শ্মশানকেও আনন্দাশ্রিতে ভাসানোর আয়োজন।

আংশিকতা থেকে আকস্মিকতা, এবং আকস্মিকতা থেকে আতিশয্য—এই হল শরৎচন্দ্রের প্রতি উপন্যাসের অপরিহার্য ছক। এই ভাবেই সামাজিক সমস্যার

কাটা-কাটা অংশগুলিকে তিনি শুধু ওপর থেকে দেখে জুড়ে দিতে চান। এই ভাবেই বোঝেন না (যেমন একজন তরুণ তীক্ষ্ণদী সমালোচক বলেছেন) যে রমা এবং বেণীর আর্থিক-বৈষয়িক সম্বন্ধ সূত্রটির বাস্তবতা কতখানি, বোঝেন না যে রমার দৃষ্টিকে যদি অন্তত বেণীর কূটবুদ্ধিতে ধৃত শিকারের অন্তর্জালা করে গড়ে তুলতেন শরৎচন্দ্র তাহলেও একটা তাৎপর্য সৃজিত হত। অথচ বেণীর দীর্ঘ পরিচয়ে বেণীবুদ্ধিকে রমা কোনো দিন প্রশ্ন কবেনি। সম্ভবত মেয়েমানুষ—বিশেষ স্নন্দরী তরুণী—বৈষয়িক বুদ্ধির ক্ষেত্রে অতখানি তীক্ষ্ণতা দেখালে তার সরল পবিত্রতা থেকে বিচ্যুত হয়, এই ছিল শরৎচন্দ্রের ধারণা। কিন্তু তাহলে আবার বেণী যে কেন এই সরলপ্রাণা তরুণীকে পথে বসানোর আয়োজন করেনি সেটা থেকে গেল দুর্বোধ্য। নাকি, বেণী ছিল রমা প্রসঙ্গে সং এবং খাঁটি, আর বমেশ প্রসঙ্গে পল্লীসমাজের চক্রান্তবাজ ব্যক্তি? তাহলে আবার বেণীরও তো একটা দৃষ্ট থাকার দরকার ছিল, একটা অধিকার হাবানোব ব্যাপার সংক্রান্ত বোধ তার কাষগুলির নিয়ামক হওয়া উচিত ছিল। একমাত্র তখনই রমার সূত্র ধরেই তার স্বমতি জাগ্রত হতে পাবত। শুধু পবম্পরায় সেটাকে রূপায়িত করলে আকস্মিকতা কিছু পবিস্কৃত হতেও পাবত।

ববঞ্চ সমাজকে বোঝার ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি অপেক্ষা শরৎচন্দ্রের দুটি ছোট গল্প বিশেষ মূল্যবান। মহেশ এবং অভাগীর স্বর্গ গল্প দুটিতে গ্রাম-সমাজকে ছোট গল্পের ছোট পরিসরে হলেও অধিকতর গভীরভাবে শরৎচন্দ্র ধববার চেষ্টা করেছেন। এবং সেই ছোট গল্প দুটিতেই দেখা যায় যে প্রেমের ঘটনার ভাবালুতা (যেখানে শরৎচন্দ্র সব থেকে দুর্বল এবং যেখানে তিনি সব থেকে জনপ্রিয়)-বর্জিত পবিবেশে শরৎচন্দ্র তাঁর বক্তব্যকে অনেক লক্ষ্যভেদী করে গড়ে তুলতে পেরেছেন। এই ছোট পরিসরেই দেখা গেল যে গ্রামের কঠিন সমস্যাতে তিনি চিনতেন না এমন নয়। মহেশ এবং অভাগীর স্বর্গ গল্পে গোটা গ্রাম জীবনের প্যাটানকে, তার বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক রূপ এবং জীর্ণ সামাজিক বন্ধনকে শরৎচন্দ্র ব্যবহার করেছেন। আমাদের ভাবতীয় শ্রমিক শ্রেণীর ব্যক্তিগত জন্মবৃত্তান্তে যে নগর-জীবনের স্বাধীন স্বাচ্ছন্দ্যের আকর্ষণ অপেক্ষা পল্লী-অর্থনীতির নিদারুণ বিপর্যয় ক্রিয়াশীল রয়েছে মহেশ গল্পটি তার আশ্চর্য প্রমাণ। অভাগীর স্বর্গের স্বত্বহীন প্রজাটিকেও আমরা চিনতে পারি এই কারণে। “দুরধিগম্যতা” “জটিলতা” “দোলাচলতা” প্রভৃতির লোভ পরিহার করে শরৎচন্দ্র ববং এই দুটি ছোট গল্পেই তাঁর আন্তরিকতা প্রমাণ করেছেন বেশি।

(শ্রীকান্ত শবৎচন্দ্রের প্রধান উপন্যাসগুলির অন্যতম। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এটি তাব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।) আমরা শ্রীকান্তের প্রথম খণ্ডটির বিস্তৃত আলোচনায় পক্ষপাতী। (শ্রীকান্ত প্রথম খণ্ড শ্রীকান্তের অন্যান্য খণ্ডগুলি অপেক্ষা শিল্পসৃষ্টির দিক থেকে উন্নততর এবং শক্তিশালী চবিত্র অঙ্কনে সমৃদ্ধ। শ্রীকান্তের প্রথম খণ্ডেই এক নতুন ধরনের বাণী উপন্যাসের সূত্রপাত যাব সাক্ষাৎ এই উপন্যাসের আদর্শে পরবর্তীকালে পাওয়া গেলেও, পূর্বে আমরা কখনো পাইনি। এ-ধরনের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বচনা বরীন্দ্রনাথের প্রবল আত্মসচেতনতায় সম্ভব ছিল না। শবৎচন্দ্রই প্রথম আত্মকাহিনীর ছলে উপন্যাস লিখলেন।)

(আত্মকাহিনীর ছলেই হোক বা বোনো নাযককে স্থাপিত কবেই হোক সাধারণত এ-জাতীয় উপন্যাসের ভিত্তিতে লেখকের জীবন ছায়াপাত কবে বলে পাঠকদের কাছে এদের একটা পৃথক মূল্য থাকে।) কিন্তু সেই মূল্য লেখাটির বাজার মূল্য বৃদ্ধি ঘটলেও এ জাতীয় বচনার তাৎপৰ্য্য অল্প। (বিশেষ কোনো প্লটের দায়ভার এখানে উপন্যাসকে বহন করতে হয় না, বহন করতে হয় না চবিত্রকে পরিবেশের সম্মুখীন করে নিবীক্ষণ করার দায়। এখানে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে শুধু অভিজ্ঞতাকে বাস্তবকামে লিপিবদ্ধ কবে গেলেই উপন্যাসের কঠোৰ পালন হল। বহু ঘটনার জন্ত এ জাতীয় উপন্যাসে কোনো প্রতীক্ষা নেই, নেই বহু ঘটনাকে এড়িয়ে যাবার সন্তপণচাবিতা। মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে এ-জাতীয় উপন্যাসে লেখক অনেক মুক্তবান, অনেক স্বাধীন। কিন্তু একটা অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য কবালেই দেখা যায় যে লেখকের নির্বাচনী ক্ষমতা এ-ধরনের উপন্যাসেও গৃঢ় নিয়মের বশীভূত হয়ে ত্রিযাশীল। এসতাই নদী ধাবার মতো কতকগুলি ঘাট ছঁফে চলে যাওয়া নয়, অথবা পল্লান্দর্শী পথিকের মতো কতকগুলি বিচিত্র মানুষের সঙ্গে দেখা হওয়ার বিবরণী নয়। এ ধরনের উপন্যাসের সময়কাল সাধারণত নাযকের বা গ্রন্থের “আমি”র আশীশব প্রৌঢ়। এই দীঘ সময়খণ্ডে লেখক ব্যবহার কবেন নাযকের পূর্ণ ব্যক্তিমানের গাড ওঠার প্রস্তুতিকাল হিসেবে।) আমরা আমাদের বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছি যে উপন্যাস বহুবিধ। এই বহুবিধতার মধ্যে যোগসূত্র একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবোধ ও ব্যক্তিত্ব বিষয়ক আগ্রহ। এই জাতীয় আত্মজীবনীকল্প উপন্যাসে একদিকে যেমন মেলে নানা ব্যক্তির সাক্ষাৎ অপব দিকে সেই সমুদয় ব্যক্তির সমাহারে সমস্ত ঘটনার পঞ্জ পুঞ্জ প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠে আত্মজীবনীর যিনি নাযক তার ব্যক্তিস্বরূপ। গুছিয়ে

লিখলে প্রতিটি মানুষের জীবনই একটি সার্থক উপন্যাসের বিষয় এ-কথা এদিক দিয়ে সত্য। এই ব্যক্তিস্বকপের প্রথম উন্মেষ থেকে, শৈশব-কৈশোবের অশ্রুট এবং অর্দশ্রুট প্রদোষাক্ষক্য থেকে খবদীপ্ত যৌবনের বিচিত্র মধ্যাহ্ন ও প্রোচের শান্ত উদার প্রশস্ততা এবং আসন্ন বার্বক্যের সায়াহ্নের ক্ষমাশীল নিবাসক্তির বিশাল মোহানা পর্যন্ত নানা দিকে নানাভাবে ব্যক্তিতিকে গড়ে তোলা এ-উপন্যাসের কাজ। বাইবেল লোকটার তত নয়—মানস গহন-সঞ্চারী মানুষটার জীবনী বচনা হয় এখানে। যেন সন্তর্পণে একটা ফুলের প্রতি মুহূর্তেব ফটে ওঠাকে, পাপড়ি মেলে দেওয়াবে, বাতাস, শিশির এবং মৌমাছিৰ কাছ থেকে প্রতি মুহূর্তেব স্নিগ্ধতা সঞ্চয়েব ইতিহাসকে, সৌভল ও বেগু বিতরণেব কথাকে ববে বাখা হয় এই উপন্যাসে।)

শবংচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাস এ-জাতীয় উপন্যাসের বিশেষ ধর্মের আলোকে বিচার। (শবংচন্দ্র জীবনকে নানাকপে দেখেছিলেন। বহুকপী জীবনপট বিধ্বত বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাৰ ছিল। তিনি জীবনে বহু মানুষ এবং বহু ঘটনার সংস্পর্শে এসেছেন। এই সমস্ত কিছুৰ প্রসাদ তাঁৰ উপন্যাসে মেলে। শ্মশানে অন্ধকার বাত্মি, অথবা সমুদ্রবক্ষে সাইক্লোন—শবংচন্দ্রের অভিজ্ঞতাৰ আশ্চর্য ফল। পর্যটক লেখকের অভিজ্ঞতা কী প্রচণ্ড শক্তির খানাব, শবংচন্দ্রের বর্ণনাৰ তার সাক্ষাৎ লাভ কৰা যায়। শবংচন্দ্রের গল্প বলাৰ মনোবম ভঙ্গি তাঁৰ অভিজ্ঞতাকে পাঠকের সামনে কপময় ববে তুলেছে।)

তথাপি এখানেও সেই একই কথা মনে হয় যে আংশিক ভাবে এক একটা চৰিত্রের বা এক একটা অংশের সার্থকতা উপন্যাসের সমগ্র সার্থকতাৰ সঙ্গে অগ্নিত হতে পেবেছে কি না, এবং শবংচন্দ্র সেদিকে লক্ষ্য বেখেছিলেন কি না, তা নইলে জীবনে যেমন হতে পাবে শ্রীকান্ত উপন্যাসেও তিনি ঘটনাবিগ্ৰামকে সেইভাবে উপস্থাপিত কবতে গেছেন কেন? (শ্রীকান্তের প্রথম পণ্ডে নতুনদা অধ্যায়েব অমিশ্র ক্যাবিকেচাব শুধু যে প্রসিদ্ধ বলে মনে হয় তা নয়, নতুনদা অন্যান্য উপন্যাসে এসেছে অন্নদাদিদি অব্যাহত পৰ। অন্নদাদিদিৰ অন্যান্য যেমন গভীর তেমনি অর্থবহ। এই বিষয় গভীর কাহিনীৰ পবে নতুনদা অব্যাহত তাৎপৰ্য কী? স্বভাবতই পাঠক এ-কথা জিজ্ঞাসা কবতে পাবেন। (অন্নদাদিদি প্রসঙ্গে শ্রীকান্তের যে অভিজ্ঞতা তা শ্রীকান্তের কিশোর চিত্রকে গভীরভাবে বেখানিত কবেছে এবং সেটা নিশ্চয়ই তাৰ জগৎসংসারকে উপলব্ধি কববাব একটা সোপান। স্বভাবতই এই কাহিনীৰ পবে আমবা যখন নতুনদাৰ কাহিনীৰ ভূমিকায গিয়ে উপনীত হই

তখন আমাদের মন উচুতারে বাঁধা হয়ে গিয়েছে।) এই ভূমিকায় শব্দচন্দ্র লিখছেন :

তাবপবে অনেকদিন ইন্দ্রকে আব দেখি নাই। গঙ্গাব তীবে বেড়াইতে গেলেই দেখি, তাহাব ডিঙি কুলে বাঁধা। জলে ভিজিতেছে, বৌদ্রে ফাটিতেছে। শুধু আব একটি দিন মাত্র আমবা উভয়ে নৌকায় চড়িয়াছিলাম। সেই শেষ। তাবপবে সেও আব চড়ে নাই, আমিও না। এই দিনটা আমাব খুব মনে পড়ে। শুধু আমাদের নৌকা-যাত্রাব সমাপ্তি বলিয়াই নয়। সে দিন অথগু স্বার্থপবতাব যে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা সহজে ভুলিতে পারি নাই। সেই কথাটাই বলিব।

স্বভাবতই ওপবেব অনুচ্ছেদেব স্তব বীতিমতো গভীর। মনে হয় যেন শব্দচন্দ্র এখনও অন্নদাদিদি সাক্ষাত অনুভবিত বেষ্ট টানছেন। এব মনো সব থেকে ভ্রান্তিগর্ভ হযেছে “অথগু স্বার্থপবতা” কথাটুকু। কেননা আমাদের মন তখন সম্পূর্ণভাবে অন্নদাদিদিতে ভাবিত। স্বার্থপবতা প্রভৃতি প্রশ্নগুলি আমবা অন্নদাদিদিব পৰিপ্ৰেক্ষিতে তখনও ভেবে চলেছি। অন্নদাদিদিব নিঃস্বার্থপবতাব স্তব তখন আমাদের মনেব মনো এমনভাবে অনুবণিত হযে বাযেছে যে স্বভাবতই আমবা স্বার্থপবতাব উদাহরণ হিসাবে অন্নদাদিদিবই বিপবীত কিছু দেখবো এইবকম প্রত্যাশা মিয়ে অগসব হচ্ছি। কিন্তু যাকে শব্দচন্দ্র উপস্থাপিত কবলেন সে বড়ো জোব একটি মতিমান ক্যাবিকেচাব। এই অভিজ্ঞতা শীকান্তব মনে অন্নদাদিদিকে দৃঢ়মলে স্থাপিত ববে না, ববঞ্চ অন্নদাদিদিব গভীর স্তবেব মৰ্যাদাহানি ঘটায়। হাস্যবস হিসাবেও এ ব্যর্থ হযেছে। কেননা এ জাতীয় উপন্যাস নাটক নয় যে নাটকীয় অবকাশ বচনাব প্রযোজন হবে, আব নাটকীয় অবকাশ বচনায়ও স্থান-কাল পাত্র প্রসঙ্গ আছে। উপন্যাসে—বিশেষ এ-জাতীয় উপন্যাসে—অবশ্যই শিথিল কাঠামোব কথা উঠতে পাবে। কিন্তু উপন্যাসে শিথিল কাঠামোবও একটা নিজস্ব গায় আছে। সেখানে যথেষ্ট যোজনাব কোনো অবকাশ নেই। (শ্রীনাথ বহুকপীব ক্ষেত্রে ইন্দ্রনাথকে আমবা যা দেখলাম তাব পব নিশীথ-অভিযান ও অন্নদাদিদি প্রসঙ্গ পেরিবে যেতে যেতে নানা ছোট বড়ো ঘটনার ভিতব দিয়ে তাকেও আমবা আমাদের মনেব মনো পুণ প্রতিষ্ঠিত কবে ফেলেছি।) স্তববাং স্নেহপ্রবণতা, কষ্টবাপবায়ণতা—কোনো দিক থেকেই ইন্দ্রনাথকে নতুনদা অব্যাহে নতুন কবে ধবা গেল না। এটা শিথিল কাঠামোব ব্যাপাব শুধু নয়, কিয়ং পৰিমাণে লক্ষ্য সঙ্গন্ধে অজ্ঞতাও বটে।

এই ব্যাপার আৰো ক্ষীণভাবে হলেও প্রকট হয়েছে ইন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে। এবং সে ক্ষেত্রে অন্নদাদিদিকে উপস্থাপিত কবতে গিয়েই এই ত্রুটি আত্মপ্রকাশ কবেছে। চবিত্তকে রূপময় কবতে গিয়ে শবৎচন্দ্র ববাবব একই কৌশলেব আশ্রয় গ্রহণ কবতেন। একজনকে না নামালে, না ছোট কবে আনলে আবেকজনকে সত্য প্রতিপন্ন কবতে পাবতেন না। এব কাৰণ কিছুটা আমবা পূৰ্বে নির্দেশ কবেছি। শবৎচন্দ্র চরিত্র অপেক্ষা পৰিস্থিতি নিয়ে মাথা ঘামাতেন বেশি। যেহেতু এই চিন্তায় আংশিকতাব দৈন্যই সূচিত হয় সেইহেতু এই আংশিকতাকে সামলাতে গিয়ে আনতে হয় আকস্মিকতা ও আতিশয্য। (ইন্দ্রনাথ শবৎচন্দ্রের অতি অল্প-সংখ্যক স্থায়ী সৃষ্টিগুলিব অন্ততম। এই ইন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিশোর শ্রীকান্তের অভিজ্ঞত মানসেব অংশীদার আমবা সকলেই। স্মৃতবাং নিশীথাভিযানের কালে যখন এই ঘটনা ঘটল।

ইন্দ্র অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, ও কিছু না—সাপ জড়িয়ে আছে, তাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

কিছু না—সাপ। শিহবিয়া নৌকাব মাঝখানে জড়সড় হইয়া বসিলাম। অশ্রুটে কহিলাম, কি সাপ ভাই?

ইন্দ্র কহিল, সব বকম আছে। ঢোঁড়া, বোড়া, গোখবো, কবেত—জলে ভেসে এসে গাছে জড়িয়ে আছে—কোথাও ডাঙা নেই দেখছিসনে?

সে তো দেখছি, কিন্তু ভয়ে যে পায়েব নখ হইতে মাথাব চুল পয়স্তু আমাব কাঁটা দিয়া বহিল, সে লোকটি কিন্তু ভ্রক্ষেপমাত্র কবিল না। নিজেব কাজ কবিতে কবিতে বলিল, কিন্তু কামডায় না। ওবা নিজেবাই ভয়ে মবচে।

আব কামডালেই বা কি কবব। মবতে একদিন তো হবেই ভাই।

তখন স্বভাবতই আমাদেবও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এই অংশেব প্রতিটি কথায় ইন্দ্রনাথ-চরিত্র এমনভাবে ছড়িয়ে বয়েছে, এমন জীবন্তভাবে যে শ্রীকান্তেব মতো আমবাও ভাবি

কিন্তু সে যাই হোক, ওই লোকটি কি? মানুষ? দেবতা? পিশাচ? কে ও? কাব সঙ্গে এই বনের মধ্যে ঘুবিতেছি? যদি মানুষই হয়, তবে ভয় বলিয়া কোনো বস্তু যে বিশ্ব সংসারে আছে সে-কথা কি ও জানেও না। বুঝানা কি পাথব দিয়া তৈরি? সেটা কি আমাদেব মতো সঙ্কচিত বিশ্বাবিত হয় না? তবে যে সে দিন মাঠেব মধ্যে সকলে পলাইয়া গেল, সে নিতান্ত অপবিচিত আমাকে একাকী নির্বিঘ্নে বাহিব কবিবাব জন্য শত্রুব মধ্যে প্রবেশ

করিয়ছিল ?.....আর আজ সমস্ত বিপদের বার্তা তন্ন তন্ন করিয়া, জানিয়া
শুনিয়া, নিঃশব্দে অকুণ্ঠচিত্তে এই ভয়াবহ অতি ভীষণ মৃত্যুর মুখে নামিয়া
দাঁড়াইল ।

এই ইন্দ্রকে যখন আবার আমরা শাহজীর বাড়িতে অন্নদাদিদির সম্মুখে উপস্থাপিত
দেখি তখন অন্নদাদিদিকে সহজ শক্তিতে অসীম শক্তিময়ী করে গড়ে তোলার
জ্ঞান ইন্দ্রকে দিয়ে যে সমস্ত আচরণ শরৎচন্দ্র করিয়েছেন তা সঙ্গতিহীন)
ঘটনাটি এই :

ইন্দ্র জানাইল যে সে গোখরো সাপই খেলাইবে ; এবং পরক্ষণেই মাথা
নাড়িয়া বাঁশি বাজাইয়া ডালাটা তুলিয়া ফেলিল । সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাণ্ড গোখরো
এক হাত উঁচু হইয়া ফণা বিস্তার করিয়া উঠিল । এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া
ইন্দ্রের হাতের ডালায় একট তীর ছোবল মারিয়া ঝাঁপি হইতে বাহির হইয়া
পড়িল । বাপ্বে ! বলিয়া ইন্দ্র উঠানে লাফাইয়া পড়িল । আমি বেডার
গায়ে চড়িয়া বসিলাম । ক্রুদ্ধ সর্পবাজ বাঁশির লাউয়ের উপর আর একটা
কামড় দিয়া ঘবের মধ্যে গিয়া ঢুকিল । ইন্দ্র মুখ কালি করিয়া কহিল, এটা
একেবারে বুনো । আমি যাকে খেলাই, সে নয় । ভয়ে, বিরক্তিতে রাগে
আমার প্রায় কান্না আসিতেছিল, বলিলাম, কেন এমন কাজ করলে ?
ও বেরিয়ে যদি শাহজীকে কামড়ায় ? ইন্দ্র লজ্জার পরিসীমা ছিল না ।
কহিল, ঘরের আগডটা টেনে দিয়ে আসব ? কিন্তু যদি পাশেই লুকিয়ে
থাকে ?

এখানে সর্পভীত ইন্দ্র শরৎচন্দ্রের কাছে গৌণ ব্যাপার । আসলে তাঁর লক্ষ্য তখন
কেন্দ্রীভূত ছিল অন্নদাদিদিকে অসীম শক্তির আধাররূপে প্রতিপন্ন করা যাতে
ইন্দ্র তাঁর পদধূলি গ্রহণ করে এবং শ্রীকান্ত ভক্তিতে এবং বিশ্বাসে আপ্লুত হয় ।
কেননা পূর্বোক্ত সাপটি অন্নদাদিদি প্রায় অবলীলাক্রমে গল্প করতে করতে বন্দী
করে ফেললেন । অথচ ইন্দ্রকে আমরা জানি যে গাঘের ওপর দিয়ে গোখরো
সাপ গেলেও বলতে পারে ‘মরতে তো একদিন হবেই’ । (রাম নামে তার এতই
সরল এবং অপ্রান্ত বিশ্বাস যে সেই নামের জোরে প্রেতভূমিকেও সে ভয় করে না ।
অথচ এখানে আমরা একটু পরেই দেখতে পাচ্ছি যে ইন্দ্রের হাতে শাহজীর
মস্তপূত শিকড় ছিল , সেই শিকড় এবং শাহজীর বিষপাথর যে বিষজয়ী সেই দৃঢ়
বিশ্বাসও ইন্দ্রের ছিল । কিন্তু ইন্দ্রের ভীত আচরণে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া
গেল না । শুধু অন্নদাদিদিকে দাঁড করাতে গিয়ে ইন্দ্রের সাহস এবং ইন্দ্রের

বিশ্বাসবোধ এই উভয়কেই লেখক খণ্ডিত কবেছেন) চরিত্রে অবশ্যই অসঙ্গতি থাকতে পারে কিন্তু সে অসঙ্গতিবও একটা সূত্র থাকা উচিত। তা'নইলে অসঙ্গতিটা হয়ে দাঁড়ায় লেখকের খেয়ালখশির ফবমামেশী ফল। সে অসঙ্গতি তখন লেখকের অসঙ্গতি।

ইন্দুনাথের বৃহত্তর শিল্পসাক্ষ্যের পৰিপ্ৰেক্ষিতে এই ক্ষীণ অসঙ্গতিটুকু শবংচন্দ্রের নিজের বলেই প্রক্ষিপ্ত হিসাবে বাদ দিবে যেতে পারি। (চরিত্র এবং তাৰ পটভূমিকাগত প্রকৃতিৰ অমোঘ টানে ইন্দুনাথ নিঃসন্দেহে অবিম্বৰণীয়)-আমৰা শবংচন্দ্রৰ শিল্পস্বভাৱেৰ মুদ্রাদোষেৰ বিষয়টিৰ দিকে পাঠকদেৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাচি শুধু। এইবাব এই ক্ষীণ অসঙ্গতি বৃহত্তর ক্ষেত্রে শ্রীকান্ত উপন্যাসেৰ চৰিত্ৰাঙ্কনে কীভাবে বড়ে অসঙ্গতি ৰূপে প্ৰকট হযেছে তাই দেখাব। পৰে দেখাব যে এ-উপন্যাসেৰ ক্ষেত্ৰেও শবংচন্দ্র কতখানি লক্ষ্যহীন ছিলেন। এই লক্ষ্যহীনতা অবশ্যই উদ্দেশ্যগত লক্ষ্যহীনতা এবং শিল্পলক্ষ্য সম্বন্ধে অচেতনতাটই এৰ মূলকথা। আমৰা সকলেই জানি যে(ইন্দুনাথ শ্রীকান্তেৰ একমাত্র প্ৰভাৱসম্পাতী পুৰুষ চৰিত্ৰ)। এৰপৰে যে সমস্ত চৰিত্ৰেৰ সাহায্যে তিনি উপন্যাসেৰ পটকে নানা ভাবে নানা সাৰ্থকতায় পূৰ্ণ কৰে তুলেছেন বলে মনে কৰেছেন তাৰা সকলেই নাবী। এৰ এই বিচিত্ৰকপিণী নাবীকুলেৰ মনো বাজলক্ষী প্ৰদান। শ্রীকান্ত উপন্যাসেৰ প্ৰথম খণ্ডেৰ মধ্যভাগে বাজলক্ষীৰ উপস্থাপনা। উপস্থাপনাতে বাজলক্ষী এত ক্লদ্বিম আবেগ এৰ মেৰি স্তবেৰ স্ৰষ্টা যে তাৰপৰ বহু গঙ্গা মাটিতেও আৰ তাৰ স্বাভাবিক স্তৰ ফিৰে আসেনি। (বাজলক্ষীকে আমৰা দেখি পিয়াৰী বাঈজীৰূপে। কুমাৰ সাহেবেৰ শিকাৰ-পাটিৰ অপৰিহায আন্ত-যদ্বিক সে। কিন্তু পিয়াৰী বাঈজীৰ বাঈজী-জীবনটা যেন একটা কথাৰ কথা মাদ্ৰ। সে যেন প্ৰথম থেকেই বাস্ত এ-কথা প্ৰমাণ কৰতে যে, সে শবংচন্দ্রেৰ নাবিক।। শ্রীকান্ত যখন পিয়াৰী বাঈজীৰ গান শুনে মুগ্ধ চিত্তে এ-কথা বলল যে ‘আমাৰ বড়ে সৌভাগ্য যে তোমাৰ গান দু-সপ্তাহ বৰে প্ৰত্যহ শুনতে পাৰ।’ তখন বাঈজী তাৰে পৰিদ্ৰাৰ বাংলায় বলল, ‘টাকা নিয়েছি আমাকে তো গাউতেই হবে, কিন্তু আপনি এই পনেবো যোলে দিন ধৰে এৰ মোসাহেবী কৰবেন?’ কথা শুনে শ্রীকান্ত “হতবুদ্ধি” এৰ “কাঠ” হযে গেল। আমৰা বুঝতে পাৰি না যে এ-কথা শুনে “কাঠ” হবাব কী আছে—বদিচ হঠাৎ বাংলাভাষা শুনে হতবুদ্ধি না হযে অবাক হলেই বেশি মানায়। তবু আমৰা পিয়াৰী বাঈজীৰ হঠাৎ এমন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্ৰ্যেৰ প্ৰকাশে না হয় মেনেই নিলুম

যে পিয়ারী বাঈজী সাধারণ স্তরের নন। কিন্তু পিয়ারী বাঈজী যে শ্রীকান্তকে স্পষ্টত চিনতে পেরেছে সে কথাও বাঈজীর উক্তিতে পরিস্ফুট। শ্রীকান্ত কিন্তু বাঈজীকে চেনার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না। তাহলেও পরের দিন যখন রতন শিকার ছেড়ে চলে আসা শ্রীকান্তকে জানাতে গেল যে “বাঈজী একবার সাক্ষাৎ করিতে চায়”, তখন শ্রীকান্তের মনোভাব—“ঠিক এইটি আশাও করিতেছিলাম, আশঙ্কাও করিতেছিলাম।” কিন্তু কেন? শ্রীকান্ত পিয়ারী বাঈজীকে তো তখনও জানে না এবং জানার জগ্যও ইচ্ছুকও নয়। এরপরে শ্রীকান্ত পিয়ারী বাঈজীর তাঁবুতে এল দেখা করতে। ততক্ষণে শরৎচন্দ্রের খেয়াল হয়েছে পিয়ারী বাঈজীকে বাঈজী বলে প্রতিভাত করতে হবে। আগের রাত্রে গানের আসরের দৃশ্যে শরৎচন্দ্র সে স্বযোগ হারিয়েছেন। রাজলক্ষীর জীবনের বর্তমান পর্যায়ে কদম্বতাকে যে পরিচিত করানো দরকার সে বোধ শরৎচন্দ্রের আছে। কিন্তু কাষক্ষেত্রে দেখা গেল :

পর্দা তুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম, বাঈজী একাকিনী প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। কাল রাত্রে পেশোয়াজ ও ওডনায় ঠিক চিনিতে পারি নাই, আজ দেখিবাঁট টেব পাইলাম, বাঈজী যেই হোক বাঙালীর মেয়ে বটে। একখণ্ড মূল্যবান কার্পেটের উপর গরদের শাড়ি পরিয়া বাঈজী বসিয়া আছে। ভিজা এলো চুল পিঠের উপর ছড়ানো, হাতের কাছে পানের সাজ সরঞ্জাম, স্নমুখে গুড়গুড়িতে তামাক সাজ। আমাকে দেখিয়া গাত্রোখান কবিয়া হাসিমুখে স্নমুখের আসনটা দেখাইয়া দিয়া কহিল, বোসো। তোমার স্নমুখে তামাকটা থানো না আর —ওবে রতন গুড়গুড়িটা নিয়ে যা।

‘রতন আসিয়া গুড়গুড়িটা লইয়া গেল।’ এবং আশ্চর্যের বিষয় যে গুড়গুড়ির সঙ্গে সঙ্গে পিয়ারী বাঈজীব বাঈজী-জীবনও যেন বিদায় নিল। গুড়গুড়িটা রাজলক্ষী আগেও সরিয়ে রাখতে পারত। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ধারণা যে গুড়গুড়িতেই বাঈজী-জীবনের সমস্ত প্রতীক। সেই প্রতীকটি সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মূল্যবান কার্পেটের ওপর গরদ পরিহিতা সিন্ধু-কেশিনী নারী মুহূর্তেই শরৎচন্দ্রের নায়িকা হয়ে উঠল। যে শ্রীকান্ত রাজলক্ষীকে একবিন্দুও স্মরণ করতে পারছে না (এটিই শরৎচন্দ্রের একটি প্রিয় কৌশল, তারকেশ্বরে রমেশও রমাকে এই রকমই চিনতে পারেনি। সম্ভবত পুরুষ নারী-উদাসীন হলে নারীকে আকর্ষণ করতে পারে বেশি এরকম ধরনের একটা ধারণা

শরৎচন্দ্রের ছিল। এটি তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে দিয়ে গেছেন বর্তমান বাঙালী সাহিত্যের প্রবোধ সাহালকে) রাজলক্ষ্মী সেই শ্রীকান্তের সমস্ত শৈশব ইতিবৃত্ত এরপর একে একে বলে চলল, জিজ্ঞাসা করতে লাগল তার সমস্ত অতীত সংবাদাদি। এবং শুধু জিজ্ঞাসা করেই ক্ষান্ত হল না আঁখিপাতা ভারী ও চোখ ছল ছল করে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি সম্বন্ধে তার আগ্রহের গভীরতাও রাজলক্ষ্মী ব্যক্ত করল। অত দীর্ঘ প্রশ্নাবলীর পরেও শ্রীকান্তের কিন্তু রাজলক্ষ্মীকে মনে পড়ছে না। যে-শ্রীকান্তের সমস্ত শৈশবস্মৃতি নখদর্পণে, যে-শ্রীকান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছে এমন কি নতুনদা প্রসঙ্গেরও, সেই শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর বিন্দু বিসর্গও স্মরণ করতে না পারলে যে শ্রীকান্তের জীবনে রাজলক্ষ্মীর ভূমিকা সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়, মনে হয় রাজলক্ষ্মীর সমস্ত ব্যাপারটাই বাডাবাড়ি, এ-বোধ শরৎচন্দ্রের ছিল না। কাজেই রাজলক্ষ্মীর লম্বা জেরার পবে শ্রীকান্তের এই চিন্তা অনেকখানি বিসর্গ ও অসঙ্গত।

কে এ? আমার পাঁচ বছর বয়সের ঘটনা পর্যন্ত আমি স্পষ্ট মনে করিতে পারি, কিন্তু অতীতের মধ্যে যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, কোথাও এই পিয়ারীকে খুঁজিয়া পাইলাম না। অথচ এ আমাকে বেশ চিনে। পিসিমার কথা পর্যন্ত জানে। আমি যে দরিদ্র, ইহাও তাহার অবিদিত নহে। সুতরাং আব কোনো অভিসন্ধি থাকিতেই পারে না। অথচ যেমন কাঁচিয়া পাবে আমাকে সে এখান হইতে তাড়াইতে চায়। কিসের জন্ত? আমার থাকা-না-থাকায় ইহা কি? তখন কথায় কথায় বলিয়াছিল, স'সাবে লাভ-ক্ষতিই কি সমস্ত? ভালবাসা-টাসা কিছু নাই? আমি যাহাকে কখনো চোখেও দেখি নাই, তাহার মুখেই এই কথাটা মনে করিয়া আমার হাসি পাইল।

এবং মনে যে শ্রীকান্তের ছিল না, সে কথাও তো সত্য। কেননা তাহলে অন্নদা-দিদি পর্ষায়ে অন্তত বালিকা লক্ষ্মীর কথা শ্রীকান্তের একবার না একবার মনে পড়ত। তারপর শ্মশান এবং শনিবাবের অমাবস্তার ঘটনাকে অবলম্বন কবে পিয়ারী যখন শ্রীকান্তের বিপদ আশঙ্কায় “অকস্মাৎ ঝর ঝব করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল” তখন অকস্মাৎ শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মীর সমস্ত শৈশব মনে পড়ে গেল। এবং সেই অতীত স্মৃতির প্রত্যাবর্তনেও রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে শ্রীকান্তের গভীর সম্পর্কের কোনো সূত্র পাওয়া গেল না। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের প্রহারের ভয়ে বৈচির মালা এনে শ্রীকান্তকে দিত। এই উপদ্রবের স্মৃতি ছাড়া রাজলক্ষ্মী-

শ্রীকান্ত সম্পর্ক সম্বন্ধে শব্দচন্দ্র আব কিছু তখন আমাদের জানালেন না।
 শ্রীকান্তের কাছে যে ব্যাপাবটা কিছুই ছিল না এ তো বোঝাই গেল। কিন্তু
 বাজলক্ষ্মীর ব্যাপাব দেখে মনে হয় যে বাজলক্ষ্মীর কাছে এটি ছিল একটি গভীর
 স্তবের ব্যাপাব। তাহলে হবে নিতে হয় যে বাজলক্ষ্মী সেই ক্ষুদ্র স্মৃতিকে তাব
 আঁট বহুব বয়স থেকে লালন কবছে শ্রীকান্তের কাছে এক মুহূর্তে কেঁদে সমস্ত
 কিছু নিবেদন করার জন্য। কিন্তু আমরা জানি বাজলক্ষ্মীও নিরুদ্দেশ শ্রীকান্ত
 সম্বন্ধে কোনো খবর বাখতো না, এমন কি সে খবর সম্বন্ধে তাব-যে কোনো
 আগ্রহ ছিল সে বখাও তাব উক্তিভে ব্যক্ত হয়নি। তাহলে বাজলক্ষ্মীর এই
 অকস্মাৎ মমতাতিশয়োব কারণ কী? এই অব্যায় যদি শ্রীকান্ত বাজলক্ষ্মীর
 পুৰাতন প্রেমের মব্যলীলা হয় তবে তা খণ্ডিত, কেননা আমরা আদি লীলা কী
 তা জানি না আব যদি এ নতুন প্রেমের উপক্রমণিক। হয় তবে তা যেমন ব্যর্থ
 তেমন হাশিবব।

এবং এই হাশিবব আতিশয়োব জন্যই শ্মশানের নিশীথ অভিজ্ঞতাৰ অপূর্ব
 কাব্যময় রূপাষণও বেশ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা সকলেই জানি যে
 শিল্পসমতাৰ আশ্চর্য ব্যবহাবে প্রকৃতিতে এখানে প্রায় স্পর্শগ্রাহ্য কবে তুলেছেন
 শব্দচন্দ্র। নিজস্ব অভিজ্ঞতাৰ প্রসাদ ছড়িয়ে রয়েছে এব সর্বত্র। একটা পৃথক
 অংশ হিসাবে বাংলা সাহিত্যে এই বর্ণনা তুলনাবহিত না হলেও এব স্থান
 কারো নিচে নয়। এব ভাষায় ববীন্দ্র প্রভাবের ছায়া একট অসংযতভাবে
 আগ্রপ্রকাশ কবলেও তা অন্তর্ভুক্তিকে স্পর্শ কবে নিজেব প্রাণবন্তায়। প্রকৃতিব
 ভীতিকর মৃতিকে রূপময় করার অনন্তসাবরণ ক্ষমতা ছিল শব্দচন্দ্রের।
 ইন্দ্রনাথের সঙ্গে নিশীথান্ধারনের বর্ণনায়, শ্মশান-বাত্তিব বর্ণনায় এবং সন্দেশ
 ঝড়ের বর্ণনায় সে ক্ষমতায় পূর্ণ নিদর্শন বিদ্যমান। কিন্তু আমাদের রূপবর্ণনাব
 ক্ষেত্রে আমাদের কতব গুণি বক্তব্য রয়েছে। আমরা জানি যে উপন্যাসে মানুষ
 অথবা প্রকৃতিব বিশিষ্ট মূল্য কিছু নেই। গোটা উপন্যাসেব পট্টেই সমস্ত কিছব
 বিচার। এই আধাবের রূপ মাত্র আধাবের রূপ নয়। যে ব্যক্তি সম্পর্কে
 উপন্যাস প্রসঙ্গে আমাদের আগ্রহ আমরা উপন্যাস-ধৃত প্রকৃতিতেও দেখে থাকি
 সেই ব্যক্তি সম্পর্কেই জড়িত কবে। যে উপন্যাসে প্রকৃতিব ব্যবহার সেই
 বিশিষ্টতা-বহিত, অর্থাৎ প্রকৃতিতে ব্যবহার কবা হয়েছে একাগুই ব্যক্তি-
 নিবপেক্ষভাবে—সে উপন্যাসে প্রকৃতি মাত্র একটি অভিজ্ঞতাৰ ব্যাপাব।
 শ্রীকান্তের প্রথম খণ্ডেব এই অংশে সেই দোষ ঘটেছে। আমরা নিঃসন্দেহে

আধাৰেব কপালেখা দেখে মুগ্ধ হই। এবং শ্মশানেব uncanny রহস্যখন ভয়-ভয়
 পৰিবেশ চিত্ৰণে শব্দচক্ৰেব ক্ষমতাকে তাৰিফ কৰি। কিন্তু যে ব্যক্তিটি এই
 সমস্ত অনুভূতিব ধাবক, শ্মশানেব ঐ অভিজ্ঞতা তাৰ চেতনায় বা মনোলোকে
 কোনো স্থায়ী স্থব বেঁবে দিল কিনা, ব্যক্তিমানসেব যে তিল-তিল বিকাশ এ
 জাতীয় উপন্যাসেব প্ৰধান বিষয় সেই বিকাশেব পথে এই শ্মশানেব অভিজ্ঞতা
 অপৰিহায ছিল কিনা তা বোঝা গেল না। শুধু বোঝা গেল যে বাজলক্ষ্মী
 অসীম মমতায় শ্ৰীকান্তকে বাধা দিষেছে শ্মশানে যেতে আৰ শ্ৰীকান্ত ইন্দ্ৰনাথেব
 ছাত্ৰেব উপযুক্ত দ্ৰুতসাহসিকতায় শ্মশানভূমিতে নিশীথাভিযান কৰেছিল। এই
 জাতীয় অতিপ্ৰাকৃতিক অনুভূতি ইন্দ্ৰনাথেব সঙ্গৈ নৈশ অভিযানেব সময়েও
 একবাৰ শ্ৰীকান্তেব ভাগ্যে জুটেছিল। সেখানে ক্ষুদ্ৰ পৰিবেশে সেটা যেমন ছিল
 ভয় অনুভব ও ভয়মুক্তিৰ কাহিনী, বিস্তৃত পৰিসৰে সমৃদ্ধতৰ বচনাব বীতিতে
 এখানেও তা ভয় এবং ভয়মুক্তিৰ গল্পই থেকে গেল। কেননা এত বড়ো একটা
 প্ৰচণ্ড অভিজ্ঞতাৰ পৰেও শ্ৰীকান্ত তেমনি তাৰ আত্মসম্মানেব প্ৰশ্ন নিয়ে
 বাতিব্যস্ত, এবং বাজলক্ষ্মীৰ চৰো যাওয়াৰ বেদনাটাই তাৰ বকেব মন্যে কম্প-
 মান। বাজলক্ষ্মী এপৰ চৰো গেল এবং শ্ৰীকান্তকে সঙ্গৈ কৰে নিয়ে যেতে
 চাইল। আত্মসম্মানেব ভয়ে শ্ৰীকান্ত বাজী হ'ল না। বোঝা গেল না এ
 আত্মসম্মানেব স্বৰূপ কী—কেন এহ না যেতে চাওয়া। যাই হোব জীবানন্দেব
 কলিকৈব বাথাৰ মতো যথাবাতি, স্তবেশেব নিউমোনিয়াৰ স্ত্ৰোযোগেব জায সন্ন্যাসী
 শ্ৰীকান্তেব দাকণ অস্থগেব স্ত্ৰোযোগে বাজলক্ষ্মী এবং শ্ৰীকান্তেব ক্ষণবিচ্ছেদেব পৰ
 পুনর্মিলন হল। এখানেও আগবা অকস্মাৎ জানতে পাবলাম যে বাজলক্ষ্মীৰ
 বন্ধু বলে একটা ছেলে আছে এবং তাৰপৰেই জানলাম পুত্ৰটি বাজলক্ষ্মীৰ ছেলে
 নহ। ছেলেটি নিজেব মা থাক। সন্ত্ৰেও বাজলক্ষ্মীকে মা বলে। এবং বাজলক্ষ্মীৰ
 গানবাজনাৰ ব্যাপাৰ সংসাৰেব সম্মতিলাভ যে কৰেছে এ-কথাও বন্ধু গল্প প্ৰসঙ্গে
 শ্ৰীকান্তকে জানিষে দিল। এবং ‘ও জানাতে ভুলল না যে বাজলক্ষ্মী শ্ৰীকান্তকে
 দেপলে খুশি হয় এ-কথা সে নোৱে, কিন্তু তাতেও তাৰ অসম্মতি নহে। এদিকে
 বাজলক্ষ্মীও ততক্ষণে পিয়াৰী নাম বোডে দেলেছে, সে আৰ তখন মাহৰি বলে
 না। কিন্তু শ্ৰীকান্তেব মন্যে সংশয়—“হঠাৎ বন্ধুৰ মা অশ্ৰুভেদী হিমাচলেব
 জায় পথ বন্ধ কৰিয়া বাজলক্ষ্মী ও আমাৰ মাৰাথানে আসিয়া দাঁড়াইল”। স্তত্ৰাং
 বাজলক্ষ্মীৰ কাছ থেকে শ্ৰীকান্ত পুনৰায় বিদায় নিল। এবং তখনও শ্ৰীকান্তেব
 জন্তু পাঠকেব সমবেদনাকে আৰও ভাবী কৰাব আয়োজন হিসাবে আমাদেব

জানানো হল যে শ্রীকান্তের ফের জ্বর এসেছে। কিন্তু বন্ধুর মায়ের সম্মান রাখতেই হবে কাজেই শ্রীকান্ত আবার চলে গেল। তাবপব শ্রীকান্ত উপন্যাসের বাকি তিন খণ্ড হবে চলল আসা এবং যাওয়া।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে অকস্মাৎ আগত অভভেদী হিমাচলের একটু চূড়াও এব আগে দেখা যায়নি। এবং “আমাদের মাঝখান” বলে যে কোনো বস্তু আছে সে-কথাও স্পষ্ট হবে বা আভাসে জানানো হয়নি। বাজলক্ষ্মীর দিক থেকে তার অর্থহীন আট বছর বয়সের প্রেমের স্মৃতি যে আতিশয্যই সৃষ্টি করুক না কেন, শ্রীকান্তের দিক থেকে সমস্তটাই নতুন ব্যাপার। স্মৃতবাং আমাদের মাঝখান গড়ে উঠতে যে প্রস্তুতি প্রয়োজন তা এখানে নেই। শ্রীকান্তের শবৎচন্দ্রের মতনই সব হঠাৎ মনে হয়। এই হঠাৎ-মনে-হওয়া শবৎচন্দ্রের সমস্ত আতিশয্যের জন্মদাতা। এবং সেই আতিশ্যাকে অধিকতর বর্ধিত করার জন্যই বন্ধুর অবতারণা। অথচ বন্ধু সমস্তকে কোনো দিক থেকেই স্পর্শ করেনি। এই আতিশ্যাত্মক নাবী চবিত্রটি যখন কমললতার সঙ্গে দৃষ্টিবটু প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হল তখনই প্রকৃতপক্ষে চবিত্রটির ভবাডুবি হয়েছে। সে ভবাডুবির আয়োজন শবৎচন্দ্র চবিত্রটির অবতারণার মুহূর্তেই করে রেখেছিলেন।

অসংখ্য চবিত্র এসেছে এই উপন্যাসের পর্ববর্তী খণ্ডগুলিতে। তাবা কেউ এব নায়ককে পূর্ণতার পথে নিয়ে গেল না। ইন্দ্রনাথ অন্নদাদিদির অধ্যায়ে আমবা যে বোধের দেখা পেলাম—যে সমস্ত চবিত্রগুলির কাছে মাপুকবা শেষ হবে শ্রীকান্ত খুঁজে পাবে জীবনের একটা মানে—উপন্যাসের শেষে দেখা গেল সে মানে শ্রীকান্ত যেন খোঁজেইনি। কাজেই অন্নদাদিদির অগ্রিপবীক্ষা এবং ইন্দ্রনাথের নিম্পূহ নিবিকারত্বের পাঠশালায় যে নায়ক মানুষ হল সে এত মাঝাবি অভিজ্ঞতাকে নিয়ে (একবার বাজলক্ষ্মীর সেবা-শুশ্রূষার জগতে ও তার পবেই জাগ্রত বিবেক নিয়ে আবার বাইরে) জীবন কাটাল এটা সঁসারের দিক থেকে বেদনার, এবং শিল্পের দিক থেকে গৃঢ়ার্থহীন।

●● ছয় ●●

কিন্তু শবৎচন্দ্রের সঞ্জীবনী শক্তির উৎসটা তা হলে কোথায়? ঔপন্যাসিক অসঙ্গতির বিপুল বোঝা বহন করেও তিনি কেমন করে পৌঁছে গেছেন পাঠক চিত্তের অমবতার বাজত্রে? চেল্টারটন সাহেব ডিকেন্স প্রসঙ্গের উপসংহারে

ডিকেন্সের বিরুদ্ধবাদীদের দুটি প্রধান প্রশ্নের অভিযোগের জবাব দিয়েছেন। অভিযোগ দুটি এই . ডিকেন্স প্রচুর অনুন্নত সৃষ্টির জনক। এবং তাঁর চরিত্র সৃষ্টিতে বড়ো আতিশয্য আছে। চেস্টারটন সাহেব ডিকেন্সের পক্ষ সমর্থনে শেকস-পীয়রকে দোহাই দিয়ে বলেছেন যে অনুন্নত সৃষ্টির প্রাচুর্য তাঁরও অনুল্লেখ্য নয়। দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তরে তিনি বলেছেন যে তাঁর চরিত্র সৃষ্টিতে আতিশয্য ঘটেছে বটে কিন্তু আতিশয্যগুলি চরিত্র-ন্যায়েরই অন্তঃনিঃসৃত ব্যাপার। অর্থাৎ আতিশয্যগুলি পাত্র-পাত্রীর জীবনযাত্রার ফল—লেখকের আবোপিত নয়। এ প্রসঙ্গে মিকবের দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা চলে। অশ্রমযতায় ডিকেন্স এবং শবংচন্দ্র এক জায়গায় বলেই শবংচন্দ্র সম্পর্কেও অনুরূপ যুক্তি উত্থাপিত করা চলে নিশ্চয়। এবং গোটা উপন্যাসের বৃহৎ পটের কথা বাদ দিলে ডিকেন্স প্রসঙ্গ দ্বিতীয় অভিযোগে চেস্টারটন সাহেবের উত্তরের স্তবিধা শবংচন্দ্রেরও প্রাপ্য।

ছোট মাপে, মিত পবিসবে শবংচন্দ্র এই কাবণেই সিদ্ধহস্ত জীবন-বসিক। তাঁর মেজদিদি, নাবায়ণী, ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি, এবং সকলে যে বাংলা দেশের গায়ে ঘরে বামাযণ ম-ভাবাতের চরিত্রগুলির পাশেই বিবাজ কবে তাঁর একমাত্র কাবণ লেখকের জীবন-প্রেম। বহু উপন্যাসের বিস্তৃত পট শবংচন্দ্রের অনুবোধীয় ছিল না—এই দৌর্বল্য তাঁর সমগ্র উপন্যাস পবিকল্পনায় পবিস্ফুট। রামেশ, শ্রীকান্ত, জীবানন্দ—সকল উপন্যাসের নায়কই উপন্যাসের পটে বাইরে থেকে প্রসিদ্ধ নায়ক। ফলে এদের ব্যবহারের সঙ্গতি সূত্র বক্ষা করার ক্ষমতা লেখককে মানতে হয়নি। পক্ষান্তরে ছোট ছোট পটে এক-একটা যাকি চরিত্রের অসামান্যতা পবিস্ফুটনে শবংচন্দ্রের কৃতিত্ব অসাধারণ। নীচান্তর (প্রথম খণ্ড) এই কাবণে তাঁর অপেক্ষাকৃত সার্থক সৃষ্টি। এখানে বিস্তৃত নদীপটে কাউকে ধরে রাখতে হয়নি। এক-একজনের বড় ফোটানো সাবা হলেই তাঁকে ছেড়ে দিতে পেরেছেন। যাদের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে পৌনঃ-পুনিকতা। তাবাই শেষ পর্যন্ত হয়েছে বড়ছুট। জীবন-প্রেম ও মানবিক অন্তর্ভুক্তি শবংচন্দ্রের প্রধান শক্তি। ঔপন্যাসিক বার্থতা সত্ত্বেও তিনি যে আমাদের সঙ্গে চিবদিন থাকবেন তা এই কাবণে। তাঁর ছোট পটে দ্রুত চরিত্র পাত্রগুলির প্রধান উপাদান মানুষের জন্ত মানুষের ভালবাসা। এর কাছে সবল অপ্রিয় সমালোচনাই—তা সে যতই সত্য-দর্পিত হোক না কেন—কিছুটা আত্মানুশোচনায় দগ্ধ না হয়ে পাবে না।



জগদীশ গুপ্ত ও শবৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া

•• এক ••

শবৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া শবৎচন্দ্রের কালেই কতখানি নির্মমভাবে সক্রিয় ছিল জগদীশ গুপ্তের বচনাবলী তাব অব্যর্থ নিদর্শন। সমাজ প্রগতি বা বাষ্ট্রনীতিক দ্বন্দ্ব প্রতিক্রিয়ার অর্থ ভিন্ন। শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে প্রতিক্রিয়া শব্দটি সেই পাবিত্যময় অর্থসীমায় আবদ্ধ নয়। বরঞ্চ আক্ষরিক অর্থেই তাব সঠিক ব্যাখ্যাব ঠিকানা। শবৎচন্দ্রের দাবদী সৃষ্টির বিপুল বিস্তৃতি যে পরিমাণে চিত্তবিনোদনী সেই পরিমাণে শিল্পার্থসাধক নয়—এই প্রতীতির মূলে রয়েছে সংহত জীবনবোধ ও সংহত শিল্পজ্ঞানের প্রতিক্রিয়া। শিল্প-সাধনা শিল্পের নিয়মে জীবন-সাধনা বলেই শিল্পের অসঙ্গতিতে প্রকৃতপক্ষে জীবনবোধের অসঙ্গতিই অভিযুক্ত। শবৎচন্দ্রের শেষের পবিচয়ের সমালোচনায় জগদীশ গুপ্ত শবৎচন্দ্রের অসংহত জীবনবোধ এবং সঙ্গতিহীন শিল্পক্রিয়ার নির্মম বিশ্লেষণ করেছেন। শেষের পবিচয় শবৎচন্দ্রের প্রতিনিধিস্থানীয় সৃষ্টি নয় এবং জগদীশ গুপ্তের সমালোচনাও প্রতিকূলতাব আতিশয্যে ছুঁই তথাপি এই উপল্যাসের আলোচনাব ভিতবে জগদীশ গুপ্তের মনের প্রবণতা এবং জীবন-জিজ্ঞাসাব গঠনটির প্রকৃত পবিচয় লাভ করা যায়। এক অর্থে শেষের পবিচয়ের আলোচনায় শবৎসাহিত্যের সাধাবণ অসঙ্গতির সূত্রগুলিকে নির্দেশ করা হয়েছে—বিশেষ-বচনাব প্রসঙ্গে সমগ্র বক্তব্যটি সীমিত বলে সমালোচনাকে মনে হয়েছে উগ্র প্রতিকূলতায় পূর্ণ—এই সীমিত পবিসরের শ্বাসবোধকাবী অসহিষ্ণুতায় কিছু কিছু কটুক্তিও সজ্জিত হয়েছে—যেমন একক্ষেত্রে শবৎচন্দ্রকে জগদীশবাবু প্রায় ধাপ্লাবাজ বলেছেন।—

বাখালরাজ ভক্তিভরে সবিতার সর্বান্নে যত মর্যাদাই নিরীক্ষণ করুক, আর
মা মা আহ্বান যতই ধ্বনিত করুক, আর সারদা যত উৎসাহ লইয়াই বাখালের
সঙ্গে কণ্ঠ মিলাক শবংচন্দ্র সবিতাকে মর্যাদা দিয়া ফুটাইয়া তুলেন নাই—
সজ্জানে কিংবা অজ্ঞাতে আমাদের ধাক্কা দিয়াছেন।

অবশ্যই অসহিষ্ণুতা। এই সমালোচনাব বিশ্লেষণকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে কিন্তু তা
সত্ত্বেও যে পদ্ধতিতে সমগ্র গ্রন্থখানি বিশ্লেষিত হয়েছে, চবিত্তগুলিব অসঙ্গতির
স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে, তা শবংচন্দ্রের কালে তাব প্রবল প্রভাবের পটভূমিতে
বীতিমতো নির্মোহ মানসিকতার পবিচায়ক। চবিত্ত-সংক্রান্ত আলোচনায়
নিন্দাবাদী অথবা প্রশংসাবাদীকে আবদ্ধ বাখা যেখানে গড়পড়তা সমালোচনা,
সেখানে একটা উপন্যাসের নৈতিক সমস্যা কে কেন্দ্র করে আলোচনাও আমাদের
কাছে নতুন এবং তাৎপর্যপূর্ণ না হয়ে পাবে না। শবংচন্দ্রকে আমরা যে সমস্ত
সদা-প্রস্তুত বিশেষণে বিশেষিত করে থাকি—দবদৌ কথা-শিল্পী, নবনাবীর
সম্পর্কের ওপর নতুন আলোক-সম্পাতী, নাবীর দোলাচল-চিত্ততার রূপকাব—
এই সমস্ত বিশেষণকে এই সমালোচনায় আঘাত হানা হয়েছে। সমালোচনাটি
যদি শবংচন্দ্রের একটিমাত্র উপন্যাসের ভিত্তিতে না হত তাতলে যে অসহিষ্ণুতা
সমালোচনাটিকে মাঝে মাঝে আবহাওয়াচ্যুত করেছে তাব অবকাশ ঘটত না।
স্বর্তব্য যে শবংচন্দ্র সঙ্গন্ধে ভাবালুতাকে জগদীশ গুপ্ত যতটা সমালোচকের দৃষ্টিতে
দেখতে পেয়েছেন তাব থেকে বেশি ঘটেছে শিল্পী হিসাবে তাঁর নিজের
প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ। এবং এই বকমই ঘটে থাকে। যখন কোনো লেখক
অপর লেখকের সাহিত্য-কীর্তির বিচার করেন তখন সমালোচনাব ন্যায়-মূল
অপেক্ষা তাঁর কাছে প্রধান বলে প্রতিভাত হয় নিজ শিল্প-অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞ
শিল্পীই অভিজ্ঞ সমালোচক। বিদগ্ধিত শিল্পীর সমালোচনাতেও বিদগ্ধনা।
সমালোচক হিসাবে বঙ্কিম এবং ববীন্দ্রনাথ যে এখনও পর্যন্ত ধ্রুবমর্যাদার অধিকারী
তাব অগ্রতম কারণ শিল্পকে তাঁরা যথার্থ শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখেছেন। শিল্প-
বসিকের সৌখিনতা সেখানে অহং বিনোদনে তৎপর হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া
শিল্পীর শিল্প-সমালোচনাব ব্যাপারটি আবেদন একটি কারণে আমাদের কাছে
গভীরতর অর্থদ্যোতক। এ জাতীয় আলোচনায় আমরা একজন শিল্পীর শিল্প-
কর্ম আর এক শিল্পীমানসে কোন্ শিল্পসমস্যার আকাবে অন্তর্ভুক্ত, তাব ইঙ্গিত
পাই। সাহিত্য জীবনের ব্যাখ্যা। জীবনের ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা সেখানেই অধিকতর
গৌরবময় হয় যেখানে ব্যাখ্যাত। নিজেই জীবন সমালোচক শিল্পী। এখানে একটা

কথা স্পষ্ট বলা দরকার যে, বিষয়বস্তুর সমালোচনায় যে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ—
 মধ্যবর্তিনী গল্পেও সেই রবীন্দ্রনাথই প্রত্যক্ষ এমন ধরনের একটা মন্তব্য কিন্তু
 বেশিক্ষণ আমাদের সহায়তা কববে না। আমরা শিল্প-সমালোচককে জীবন-
 সমালোচনায় অবতীর্ণ দেখতে যতটা বাসনা করি জীবন-সমালোচককে শিল্প-
 সমালোচনায় দেখাব বাসনা আমাদের কাছে তাব চেয়ে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ।
 সফল শিল্পী জীবনকে বোঝেন বলেই শিল্প ব্যাখ্যায় সেই জীবনোপলক্ষিকে
 প্রয়োগ কবতে পাবেন। পাঠলব্ব শিল্পোপলক্ষিকে যদি জীবন-ব্যাখ্যায় প্রযুক্ত
 করেন কেউ, তবে তার মব্যে কিছু সাম্যবদ্ধতা অবশ্যস্তাবী। মধ্যবর্তিনী গল্প
 গল্পেব বেনামিতে কিছুটা বিষয়বস্তুর সংশোধনী সমালোচনা বলেই রবীন্দ্রনাথের
 বসন্তটির শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর থেকে বঞ্চিত। এ-ক্ষেত্রে গল্পে ভাববস্তুর প্রবণা,
 সংশোধনের বাসনাসম্ভাত পবোক্ষ প্রবণা। যতটা বুদ্ধিজাত ততটা অন্তর্ভূতি-
 শুদ্ধ নয। জগদীশ গুপ্তের বচনার নেপথ্য-প্রবণা-নির্মাণে শরৎচন্দ্রের ভ্রান্তি
 ও অসঙ্গতির প্রতিক্রিয়া কতটা এবং নিজস্ব মৌল অন্তর্ভূতি-সিদ্ধ জীবন-ব্যাখ্যা
 প্রয়াস কতটা সক্রিয় ছিল এই বিচারেব ওপবই শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতিভাব
 স্বাতন্ত্র্য নির্ণয় নিতবশীল।

•• দুই ••

জগদীশ গুপ্ত কল্লোলেব কালবর্তী এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও সত্য যে কল্লোলেব
 যা মূল বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত ছিল তা একমাত্র জগদীশ গুপ্তের বচনাতেই
 অভিযাক্ত। স্বভাবতই এ-ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে যে কল্লোলেব মূল বৈশিষ্ট্য
 বলতে কী বোঝায়? অচিন্ত্যকমাবেব সাঙ্কেয় প্রতি অমর্যাদা না কবেও
 প্রতিক্রিয়াকেই কল্লোলেব প্রাণবর্ম বলে আখ্যাত কবা যায়। শুধু রবীন্দ্রনাথ
 যদি এই প্রতিক্রিয়ার লক্ষ্য হন তাহণে সমগ্র আন্দোলনই একটা সাহিত্যিক
 ফ্যাশন প্রচলনের অপবিণত উদ্দেশ্যে পর্যবসিত হয়। কল্লোল বলতে যা
 বোঝায় তাব লক্ষ্যভ্রষ্টতার প্রধান হেতু এই অপবিণত উদ্দেশ্য। জগদীশ
 গুপ্তের দিকে না তাকালে মনে হয় কল্লোলেব সমগ্র প্রতিক্রিয়া শেষ
 পর্যন্ত বোমাস্টিক পন্থাবিলাসে পর্যবসমাপ্ত। বেদে, উপন্যাস, মিছিল প্রমুখ
 উপন্যাসেব কাঠামো এবং বক্তব্য সমীক্ষণে এ-কথার সমর্থন মেলে। গোকুল
 নাগের পথিক ছাড়া কাব্যধর্মী উপন্যাসেবও একটা শিল্পসম্মত মান কল্লোল-
 পরায়ণদের হাতে সৃজিত হয়নি। বলাবাহুল্য এঁদেরও অধিকাংশের শিল্প

জীবনের মূলে যতখানি জীবন-সমালোচনার প্রেরণা কার্যকরী ছিল তার থেকে শিল্প-সমালোচনার প্রভাব কার্যকরী ছিল অধিকতর। বিদেশী সাহিত্যের হাতছানিতেই এঁরা রবীন্দ্র-প্রভাব-পরিহারের ছস্তর পথে ধূলি-ঝঞ্ঝায় নেমে পড়েছিলেন। “অমুক অমুক বস্তু আমাদের সাহিত্যে নেই, থাকা উচিত” —কল্লোলের হাওয়ায় আন্তর্জাতিক আকাশের দান এইটুকু। কাজেই স্বভূমি এবং পরিবেশ সম্বন্ধে কোনো গভীর জিজ্ঞাসার অবকাশ এখানে ছিল না। আমাদের বোহেমিয়ানী ভঙ্গি মানে এলোমেলা যথেষ্ট কল্লনা। অ্যাণ্টি-রোমান্টিক নায়িকা মানে নায়িকার কেক ভক্ষণরত মুখশ্রী। ডিটেল সম্বন্ধে সূক্ষ্ম জ্ঞানের অর্থ নায়ক মুখে ক্যাটিকুরাকে ফেস পাউডাবেব বদলে মেখে ফেলবে কিনা এই সংশয় প্রকাশ। প্রেরণাব বিদেশী পুঁথির উৎস যখন হারিয়েছে তখন দেশ নিরুদ্দেশ। অথচ কল্লোলের কালে প্রতিক্রিয়ার মুহূর্তও পরিপক। যে সমস্ত বস্তুগত কারণে এই প্রতিক্রিয়া মানসিক সাবালকত্ব অর্জনের পথে চলছিল তার বিস্তৃত আলোচনা জগদীশ গুপ্ত প্রসঙ্গে স্থগিত বেখে শুধু এইটুকু ইঙ্গিতই বোধ হয় যথেষ্ট যে প্রথম মহাযুদ্ধের পবের বাঙালী মধ্যবিত্তের চেতনাগত বিস্তৃতি যুদ্ধোত্তর সংকটের শঙ্কিল পথ বেয়ে অগ্রসব হয়েছিল। প্রাকযুদ্ধ মধ্যবিত্ত জীবনের ছকে প্রথম আলোড়নের আঘাত এসে পড়েছে তখন। রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র এই পবিবর্তনমুখী চেতনাকে গল্পে-উপন্যাসে ধারণ করতে পাবেননি। তখনও কথাসাহিত্যের মানুষেবা মাটির মানুষ থেকে পৃথক। মাটির মানুষের যে প্রাকৃত যন্ত্রণা তা তখনও শিল্পের অলৌকিক বঙে রঞ্জিত হবার জন্য উন্মুখ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস প্রমুখ উপন্যাসে সেই যন্ত্রণাকে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়।

কিন্তু প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, বুদ্ধদেব যে রবীন্দ্র-প্রতিক্রিয়াকে কথাসাহিত্যে বহন করতে চেয়েছিলেন সে প্রতিক্রিয়ার সীমাবদ্ধ চেহারা অনুধাবনযোগ্য। বাংলা কথাসাহিত্যে তখন রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্রের আমল। এই ত্রয়ীর মধ্যে বিস্তৃত পার্থক্য সত্ত্বেও পাঠকমানসে শেষোক্ত দুজন নিঃসন্দেহে একটা আবহাওয়া সৃষ্টি কবেছিলেন। কল্লোলের লেখকবৃন্দের সামনে কাজ ছিল জনশ্রুতিতে ধৃত, অথচ সাধারণ পাঠক সমাজে শ্রদ্ধেয়, কিন্তু অপ্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ঐতিহ্যকে স্পষ্ট করে তোলা। শরৎচন্দ্রের লঘুকরণের হাত থেকে উপন্যাসকে পুনরায় রবীন্দ্রনাথ-সম্মত জীবনচর্য্যাব ছরুহ পথের সন্ধানে ত্রতী কবে তোলাব দায় ছিল এঁদের। Up-to-date হবার ঐতিহাসিক তাগিদে

সে শিল্প-কর্তব্য এঁরা শ্লিষ্ট হইয়াছিল, উপন্যাসের দিকে তাকালে এ-কথা বলতেই হয়। প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন নিশ্চয় ছিল। কিন্তু সে প্রতিক্রিয়া সবলীকৃত অর্থ ববীন্দ্র-অতিক্রমণ নয়। অবশ্যই আমরা জানি যে আমাদের সত্ত্ব-ব্যবহৃত শিল্প-কর্তব্য কথাটির কতব্যংশে আপত্তি উঠতে পারে। কিন্তু সমগ্র আন্দোলনটি যখন কতব্যমূলক তখন কতব্যের শুদ্ধ রূপ এবং সমগ্র চেতনাই বাঞ্ছনীয় ছিল।

•• তিন ••

জগদীশ গুপ্তের শব্দচন্দ্র সম্বন্ধে উগ্র প্রতিক্রিয়া সৈদিক থেকে একটি বিশিষ্ট মানসিকতা-সঙ্ঘাত। এই মানসিকতা তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের ফল। এই ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি জগদীশ গুপ্তের সাহিত্য-কীর্তির আলোচনা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এ-প্রসঙ্গে প্রথমেই যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কবে তা হল জগদীশ গুপ্তের অন্তর্দৃষ্টির একটি নিজস্ব অগুণ গঠন। ববীন্দ্র-অতিক্রমণ জাতীয় কোনো সৌখিন সাহিত্য অভিরুচি এই অন্তর্দৃষ্টির বচয়িতা নয়। ববীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমার-শব্দচন্দ্রের যৌথ প্রয়াসে যে সাহিত্যিক গড়ে উঠেছিল, সেই আবহাওয়ার বিরুদ্ধে প্রথম সার্থক শিল্পী প্রতিবাদ জগদীশ গুপ্তের। জগদীশ গুপ্তের বিভিন্ন সৃষ্টি একটা গোটা সাহিত্যিক যুগের প্রতিক্রিয়া-সঙ্ঘাত। সেই গভীর তাৎপর্ষ্যেই এই লেখক বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে স্ববর্ণীয়। অগ্রদেব ক্ষেত্রে যেখানে প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটা ছিল বুদ্ধিসত্ত্বের উপলব্ধি, জগদীশ বাবুর ক্ষেত্রে সেখানে উপলব্ধিটা জীবনবোধের ফল। জীবনের গুঢ় সমস্তা হিসাবেই তিনি বিষয়গুলিকে শিল্পী হিসাবে দাবি করেছিলেন। যে সমস্ত পূর্বতন শিল্প-সৃষ্টি তাঁর স্রষ্টা-মানসে বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল, সেগুলো তাঁর কাছে শিল্পবীতির বিচ্ছিন্ন প্রশ্ন নয়। জীবনের তাই নিজের দৃষ্টিতে বুঝতে চাওয়ার প্রবণতা পেয়েছিলেন সেখান থেকে। এই স্রষ্টার সাহায্যেই জগদীশ গুপ্তের শক্তি এবং দৌর্বল্য উভয়কে ব্যাখ্যা করা যাবে।

ধবা যাক্ অমাবু সিদ্ধার্থ নামক উপন্যাসটির কথা। নটবর নামে এক ব্যক্তি সিদ্ধার্থ নামে মৃত এক উজ্জল-চরিত্র ব্যক্তির ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল অজয়া নামে একটি সুন্দরী তরুণীর হৃদয় হরণের জন্য। সিদ্ধার্থের সমস্ত পবিচয় নটবর সংগ্রহ করে বেখেছিল। এই ছদ্মবেশ ফেঁসে গেল অজয়া এবং ছদ্মবেশী সিদ্ধার্থের প্রেম যখন বিবাহের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়িয়েছে তখন। এখন এই যে কাঠামো

এ আমাদের কাছে অল্পবিস্তর পরিচিত কাঠামো। বুদ্ধদীপ উপন্যাসে এই কাঠামোর সাদৃশ্য মোটেই দুৰ্লভ নয়। সেখানেও মৃত স্বামীর আবয়বিক সাদৃশ্যেব সুযোগে বৌরানীৰ অন্তঃপুরে এবং অন্তরে প্রবেশের অধিকার পেয়েছিল নায়ক রাখাল। গল্প-প্ৰিয় প্রভাতকুমার যে যত্নে প্লটকে গড়ে তুলেছিলেন সে যত্নে বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে ব্যবহার করতে পারেননি। এখানে কল্পনার সর্বোচ্চ ব্যবহারে বাথালের দ্বন্দ্বকে ব্যবহার কবাব কথা। প্রভাতবাবু তাঁর এই সর্বোত্তম সৃষ্টিতে যেন বড়ো তাড়াতাড়ি বাথালের পাপ-ক্ষমতার সীমায় গিয়ে পৌঁচেছেন। বাথালকে স্তিমিত বেথে বন্ধিমের moral teaching-এর অনুবর্তী প্রভাতকুমার বৌবানীকে ফুটিয়েছেন সর্ব-শক্তি নিয়োগ কবে। সে-ক্ষেত্রে তিনি সার্থককাম। জগদীশ গুপ্তের কাছে এই গল্পের অর্থ অগ্ৰতব। “নিজে যা নয় ছদ্ম আচরণে নিজেকে তাই প্রতিপন্ন কববাব প্রাণান্ত প্রয়াস তো প্রত্যেকেবই জীবনের এক অংশ” —এই জীবনগত চিবন্তন অদৃষ্ট লিখনের টানে আমাদের অনেক ব্যর্থতার জন্ম। সিদ্ধার্থের ছদ্মবেশের ব্যর্থতা প্রকৃতপক্ষে তাব জীবনের ব্যর্থতা।

বুদ্ধদীপের বাথালের পাপ-চেতনা বৌঠাকুবানীকে দেখে এবং তাঁর সংস্পর্শে এসে জাগ্রত হয়েছে। তাব পূর্ব পর্যন্ত সে স্বাভাবিক মানুষ, স্বাভাবিক বিপদ-বিমুখ এবং অকস্মাৎ দুঃসাহসী ব্যক্তি। বৌবানীৰ সংস্পর্শে না এলে সে কখনও আত্মানুশোচনায় দগ্ধ হত না। বৌবানী তাঁর পাপ-চেতনাব উদ্বোধক। পক্ষান্তরে নটববের সিদ্ধার্থ হবাব বাসনা জেগেছে অজয়াকে দেখাব পর— অজয়াব নিকটবর্তী হবাব বাসনায়। নটববের জীবন বাথালের মতো এই ঘটনা ব্যতীবেকে স্বাভাবিক জীবনও নয়। ববঞ্চ বলা যায় চবম অস্বাভাবিক। নটবব ছিল বৈষ্ণবীৰ গৰ্ভে ব্রাহ্মণের জাবজপুত্র। মুদিব দোকানের ছোকৰা চাকৰ, সখের থিয়েটারে অভিনেতা ও পৰিশেষে অৰ্থলোভে এক বৃদ্ধা বেগ্ৰাব শয্যাসহচৰ — এই হল নটববের নাতিদীৰ্ঘ জীবনের প্রধান বগত পৰিচ্ছেদ। এই ব্যক্তি নানা অপবিত্ৰ কাৰ্যাদিব মাঝে বা পৰিশেষে একটি পবিত্ৰ স্বপ্নের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল— সেটি হল অজয়াকে ভালবাসা। ভালবাসা তাকে যে ছদ্মবেশ পৰিয়ে দিল ভালবাসাব বিশুদ্ধ আবেগে সেই ছদ্মবেশ তাব জীবনে খাঁটি হয়ে উঠতে চাইল। অতীত জীবনের প্ৰেতভূমিব বাসিন্দাব। অত অনায়াসে এই নবাগত অধ্যায়কে সংযোজিত হতে দেবে না। জগদীশবাবু ষথার্থই নটবব-সিদ্ধার্থের সংঘাতকে উপন্যাসেব কেন্দ্ৰবিন্দু হিসাবে ব্যবহার কবেছেন।

অজয়ার প্রভাবে ধীরে ধীরে মহানুভবতার অভিনয়ে অভ্যস্ত নটবরের আত্ম-সমালোচনা ও আত্মচিন্তার মধ্যে নিষ্ঠুর স্বার্থপরতার যে কারুণ্য তা লক্ষণীয়।—

শুনতে পাই, জীবন-যুদ্ধে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা কীট-পতঙ্গে আছে উদ্ভিদে আছে—সেটা বিধিদ্ভ প্রেরণা। তবে আমি মানুষ হয়ে কেন টিকে থাকতে চাইব না?...মনে মনে তাল ঠুকিয়া বলিল—আলবৎ চাইব।...কীট পতঙ্গ উদ্ভিদ রং বদলায়, আমি একটু নাম বদলেছি, কিন্তু মানুষ তো আমি সেই আছি।...ধরণীর সব সুখ রূপণের মতো লুকিয়ে রেখেছিল—এতদিন পরে তার এক অঞ্জলি তপস্তার ফলের মতো আমার সম্মুখে ছড়িয়ে দিয়েছে; কেন আমি তা দু-মুঠো ভরে কুড়িয়ে নেব না?

এই কাঙাল মনোভাবকে নটবর বহু শঠতায় ও কাপট্যে সিদ্ধার্থের রূপে সাজিয়েছে। অজয়ার স্বপ্নময় আকর্ষণ আত্মহত্যাযুক্ত নটবরকে যে মুহূর্তে নবজীবন-রসে সঞ্জীবিত করেছে, প্রকৃতপক্ষে সেই মুহূর্তই নটবরের ধ্বংসাবশেষে সিদ্ধার্থের জন্মমুহূর্ত। অজয়ার ভালবাসায় নটবরের জগৎ সংসার পরিবর্তনের দিকে ঝুঁকে পড়ে—কিন্তু মিথ্যা খতের সাক্ষী হিসাবে আসে রাসবিহারী, তার পুরনো বন্ধু। রাসবিহারীকে দেখলেই নটবরের মনে হয় জগৎ অপরিবর্তনীয়। নটবরের অবচেতনে ধীরে ধীরে সমুদয় অভিনয়, সমুদয় ছলনার প্রতিক্রিয়া রূপ-পরিগ্রহ করে স্বপ্নে :

শ্মশানে চিতা জ্বলিতেছে, চিতাব আগুনে ধোঁয়া নাই, কিন্তু তার অবিশ্রান্ত সোঁ। সোঁ। শব্দ নিবিড় আর নিস্তব্ধ অন্ধকারেব ভিতর দিয়া যেন একটা তরল শ্রোতের মতো বহিয়া চলিয়াছে—

চিতায় শায়িত শবদেহটা দেখা যাইতেছে—

পুড়িতে পুড়িতে দেহটা কাষ্ঠ শস্যার উপর উঠিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে মাটির উপর পা রাখিয়া নামিয়া দাঁড়াইল, আগুনের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল—
চক্ষু তার নির্নিমেয—

আসিয়া সে সিদ্ধার্থেরই সম্মুখে দাঁড়াইল, বলিল—চিনতে পারছ?

—না, কে তুমি?

—আমি সিদ্ধার্থ। আমার প্রত্যাবর্তন আশা করনি বুঝি?

—তুমি তো মৃত।

—না, আমি জীবিত। আমার পরিচয় চুরি করে যাকে তুমি মুগ্ধ করেছ সে তো আমার। তুমি তার কে?

স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার পরেও সিদ্ধার্থের মৃত চোখ দুটি যেন নির্নিমেষ নয়নে নটবরের দিকে তাকিয়েছিল। সমগ্র কাহিনীটির তাৎপর্যও এইখানে। “আমার পরিচয় চুরি করে যাকে তুমি মুগ্ধ করেছ সে তো আমার। তুমি তার কে?” এই উক্তির মধ্যে অসাধু সিদ্ধার্থ উপাখ্যানের নাট্যরসের সংহত রূপ। সমগ্র উপন্যাসটির মূল বিষয়বস্তু মুমূর্ষু মানুষের জিজ্ঞাসাবিষা। নটবরের শেষ উক্তি ও-প্রসঙ্গে আলোক-সম্পাতী। তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল, বলে যাও সিদ্ধার্থ কোথায়, তার জবাবে সে বলল—স্বর্গে কি নরকে তা সে জানে না, তবে এটুকু জানে সে বেঁচে নেই। সিদ্ধার্থ বেঁচে নেই—এই শেষ উক্তির সার্থকতা এইখানে যে সিদ্ধার্থ হতে চাওয়া সর্বক্ষেত্রেই মৃত হতে বান্য। মূল সিদ্ধার্থের ক্ষেত্রেও এটা সত্য, ভুল সিদ্ধার্থের ক্ষেত্রেও এটা সত্য।

দেখা যায় রূপকের আবহাওয়া বা পরিমণ্ডল সত্ত্বেও জগদীশবাবু নটবরের জীবনের মৌল সমস্রাকে বিশ্ব জীবনের মূল ধারার সঙ্গে অস্থিত করে শিল্পরূপ দিয়েছেন। প্রভাতবাবুর ক্ষেত্রে বাথালের পাপ-সাধ্যের সীমা হল রাখালের (মূলত অব্যবহৃত) দ্বন্দ্বের হেতু। এখানে দেখানো হল পাপ-সাধ্যের কোনো সীমা নেই। নটবরের পাপ-ক্ষমতার ভিতর দিয়েই প্রকাশমান পৃথিবীর শাশ্বত নিবাময়-সঞ্চারিণী শক্তি। সে জীবনান্তবেব বাসনায ছলনার পথেব পথিক—সেই বাসনার এমনই অন্তর্নিহিত অমৃতধাবা যে তারই এক অঞ্জলি পানে পাপও, ছলনাও অমর হতে চায়। বিষয়বস্তু এবং বক্তব্য নির্মাণের দিক থেকে জগদীশবাবুব প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রভাতকুমারের থেকে একপদ অগ্রবর্তী।

•• চার ••

ঠিক এমনভাবেই গতিহারা জাহ্নবী-র প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতে পাবে। অকিঞ্চন ও কিশোরীর দাম্পত্য জীবনের নিদারুণ অসঙ্গতিঘটিত নৈতিক প্রশ্ন এই উপন্যাসের ভাব-বীজ। অকিঞ্চন স্থূল-প্রবৃত্তিপরাষণ গ্রাম্য যুবক। ভৃষভভোগী, নিক্কর্মা। তার নববিবাহিতা স্ত্রী কিশোরী নারীর স্বাভাবিক সততার অধিকারী। এই দুয়ের সংঘাতে যে আপসহীন অনিবার্যতা তাকে লেখক ক্ষমাহীন ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। স্থূল স্বামী এবং আদর্শ-রুচি পত্নীর ব্যক্তিত্ব-সঙ্ঘাত দ্বন্দ্বের আশ্চর্য শিল্পরূপ আমরা যোগাযোগ উপন্যাসেও প্রত্যক্ষ করি। যোগাযোগের ব্যক্তিসত্ত্বাগুলি নিজ নিজ ইতিহাসেব যোগফলে জগদীশবাবুর ব্যক্তিবৃন্দ অপেক্ষা বিরাটতর। উপন্যাসের উদ্দিষ্ট রসবস্তুকে শিল্পেব ও জীবনের গুণে বন্দী

করার প্রয়াসেও রবীন্দ্রনাথ অধিকতর অভিনিবেশের পরিচয় দিয়েছেন। কুমুর ব্যক্তিত্বের উৎস, মধুসূদনের অধিকার-চেতনার মূল শিল্পের জ্বায়েই আমাদের কাছে পরিস্ফুট। জগদীশবাবুর ক্ষেত্রে সেই ঔপন্যাসিক মননশীলতার অভাব আছে। কিশোরী কেমন করে জগদীশবাবুর নায়িকা হল সে-কথা আমাদের কাছে অস্পষ্ট। শুধু আমরা ধরে নিতে পারি যে লেখক একটি গ্রাম্য তরুণীর স্বাভাবিক শুচিতাবোধকে একটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার বলে ধরে নিয়েছেন। তাই বাগ্‌দীদের মেয়ে ভুবন এবং গেরস্তের মেয়ে কিশোরীতে কোনো পার্থক্য না দেগলেও জগদীশবাবু আশ্চর্য হন না। কেননা দুইয়ের ক্ষেত্রেই শুচিতাবোধ স্বতঃসিদ্ধ।

তথাপি এই উপন্যাসে নাট্যরস সৃজনে লেখক এমন সব মুহূর্ত রচনা করেছেন যা জীবনের গভীর অন্তঃস্থলটিকেও আলোকিত করে। বাড়ির উঠানে ভুবন এসে যখন অকিঞ্চনের তার প্রতি কামাত আচরণের অভিযোগ উচ্চারণ করল সে-মুহূর্তের সূচীভেদ্য জমাট গাঢ়তা অতুলনীয়।—

ভুবনের একান্ত সন্নিকটে আর একেবারে সম্মুখে বসিয়া আর নির্নিমেষ চক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কিশোরী সব শুনিল—

কাত্যায়নী অদরে দাঁড়াইয়া বোধকরি কতক শুনিলেন, কতক শুনিলেন না। কিশোরী তাব পরেও বসিয়াই রহিল। কাত্যায়নী নিঃশব্দে রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন কড়াই পুড়িয়া ধাঁ ধাঁ করিতেছে। ভুবন বলিল—এখন আমি আসি, তুমি ক্যানো শুনলে—বলিয়া কিশোরীর রক্তহীন বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সে কিছুক্ষণ আবিষ্টের মতো অবশ হইয়া বসিয়া রহিল।

কিশোরী বলিল—শুনলাম ভালোই হল, আচ্ছা এসো এখন। ভুবন চলিয়া গেল। এবং কাত্যায়নী রান্নাঘরের ভিতর হইতে গভীর কণ্ঠে আদেশ করিলেন—বৌমা চান কর, বাগ্‌দী মাগীকে ছুঁয়েছ।

কিশোরী বলিল—করি।

তারপর মনে হইল তার বলে—জননী কতবার কত জলে স্নান করিলে তোমার পুত্র শুচি হইতে পারে? বলিল না ঘৃণা করিয়া, বাক্যব্যয়ের অরুচিতে।

এই মুহূর্তে কিশোরীর আচরণের স্পষ্টতা আমাদের বিস্মিত করে। এবং এই আচরণগত স্পষ্টতার জন্ত যে পরিস্থিতি পর্যায়ের পরম্পরা-সৃজন উপন্যাসে প্রয়োজন সে-ক্ষেত্রেও জগদীশ গুপ্তের কাহিনী-সংস্থান প্রয়াস মূল্যবান কিন্তু

“তারপর মনে হইল তার বলে” এই অংশে যে রুচির প্রাণ জড়িত তার ইতিহাস কোথায় সে-কথা স্পষ্ট হয়নি। “বলির পর জীবটির মুণ্ড আর দেহ যেমন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়”—কিশোরী সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হল। পিত্রালয়ে চলে গেল সে স্বামীগৃহ পরিহার করে।

স্বাভাবিক সততার আশ্রয় আধার নয় কিশোরী। বরঞ্চ মানুষী আধারের দুর্বলতাও সেখানে ঈঙ্গিত পূর্ণতারই জননী। স্বামী-বিরহে পিত্রালয়বাসিনী কিশোরীর দেহ অথবা মন স্বামীর জন্ত কেমন কেমন করেনি। এ যদি হত তবে বলতে হত নিম্নশ্রেণীর শিল্পকৌশলের আশ্রয়ী হয়েছেন জগদীশবাবু। স্বামীকে সে উপযাচক হয়ে পত্র প্রেরণ করেছিল বটে, সে ভিন্ন কারণে। ব্যক্তিমানসের সামাজিক অংশটুকু সমাজের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণাকে ভয় পায়। সমাজ নানা সম্পর্কের জাল মেলে দিয়ে নানাদিক থেকে বেঁধে ফেলতে চায় ব্যক্তির মন। কিশোরীর ক্ষণদৌর্বল্যের ইতিহাসও তাই। বৈশাখ মাস আসে, চারদিকে শব্দরবাড়ি থেকে মেয়ে আসবার, শব্দরবাড়িতে জামাই আসবার সোরগোল, কিশোরী বুঝল যে এ-উৎসবে তার স্থান নেই। তার বান্ধবীরা তাকে এড়িয়ে চলে। তার পত্র প্রেরণের মূলে এই সামাজিক মন। সেখানে তার শর্তে অকিঞ্চনের অসম্মতিতে অথবা উপেক্ষায় চিঠির ভূমিকা শেষ হল। তার এই পিত্রালয় জীবনের মাঝখানে একদিন সে আবিষ্কার করল অকিঞ্চনের সন্তান তার গর্ভে।

এমনিভাবে কুমুও একদিন সচকিত হয়ে উপলব্ধি করেছিল তার শারীরিক অবস্থা। অশ্লীল এবং স্থূল মধুসূদন সন্দেহে এমনি ঘৃণাই তখন ছিল কুমুর। কিন্তু ভিন্ন ব্যক্তিত্বের আধারে কল্পিত এই দুই চরিত্রের একই ঘটনার প্রতিক্রিয়ার দুই রূপ লক্ষণীয় :

কিশোরী

কুমু

কিন্তু সহজ সরল অর্থ ঘুচিয়া গিয়া মধুসূদনের মতো এমন কিছু আছে যা কিশোরী যে অর্থ পাইল তাহা ভয়ানক। কুমুকে কেবল যে আঘাত করেছে তা এমন নিরর্থক অযাচিত ব্যাপার, এক-নয়, ওকে গভীর লজ্জা দিয়েছে। ...ওর দিকে হাস্যকর অতীতকে হৃদয়বিদারক সেই স্বাভাবিক ইতরতায়, ভাষার হইয়া আর কাহারো জন্ত কখনো ঘটে কর্কশতায়, দান্তিক অসৌজন্যে, সবসুদ্ধ নাই বোধহয়। এট সন্তান কি স্বামীর মধুসূদনের দেহমনের, ওর সংসারের

আজ্ঞা ? স্বামী যাহা অকাতবে দান
কবিয়া কবিয়া ইহকাল ও পবকাল-
ব্যাপী কলুষ মর্মে আত্মায় পুঞ্জীভূত
কবিয়াছিল—এই সন্তান সেই অশেষ
কলুষজাত—ইহা শুভ নহে, ঈর্ষ্যত
নহে। ইহা অবাঞ্ছিত এবং বর্জনীয়
কলুষ। সর্পেব যেমন বিষদাত থাকে
ঐ পুরুষটির অন্তবে তেমন একটি
জ্বালাময় প্রবৃত্তি আছে। এই সন্তান
তাহাব সেই প্রবৃত্তিব পবিত্রত্ব চিহ্ন
মাত্র। বিবাহিত। পত্নীর গর্ভেব
সন্তানের যে মূল্য লোকে দিয়া থাকে
ইহাব সে মূল্য নাই তাব মুখ দেখিয়া
কি সে সকল যক্ষণা ভুলিতে পারিবে ?
যেমন সকল মা পাবে ? সে তা
পারিবে না।

স্বাস্থ্যবিক অশোভনতার প্রত্যাহই কুমুর
সমস্ত শরীর মনকে সঙ্কুচিত করে
তুলেছে। যতই এগুলোকে দৃষ্টি থেকে,
চিন্তা থেকে সবিয়ে ফেলতে চেষ্টা
কবেছে, ততই এবা বিপুল আবর্জনার
মতো চাবিদিকে জমে উঠেছে। আপন
মনেব ঘণাব ভাবেব সঙ্গে কুমু আপনহ
প্রাণপণে লড়াই কবে এসেছে। স্বামী-
পূজাব কর্তব্যতাব সম্বন্ধে সংস্কারটাকে
বিশুদ্ধ বাখবাব জন্তু ওব চেষ্টাব অন্ত
ছিল না, কিন্তু কত বড়ো হাব হয়েছে
তা। এব আগে এমন করে বোঝোনি।
মধুসূদনেব সঙ্গে ওব বক্তৃতা-সেব বন্ধন
অবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তাব বীভৎসতা
ওক বিষম পীড়া দিলে।

এ-প্রসঙ্গে কুমুর শেষ উক্তি হল “এমন
কিছু আছে যা ছেলেব জন্তুও খোঁ ওয়ানো
যায না।”

ব্যক্তি হিসাবে উভয়েব ক্ষোভ এবং নারী হিসাবে উভয়েব অসহায়তা উদ্ধৃত
অনুচ্ছেদ দুটির সাদৃশ্য-সূত্র। কিশোরীর চিন্তায় যে স্পষ্টতা এবং কুমুর অবস্থাব
কাছে আত্মসমর্পণেব যে ভঙ্গি তা গভীর আলোচনাব বিষয়। এত বড়ো একটা
ব্যাপাবে যেন কুমুর প্রতিক্রিয়া তাদৃশ সাদা দিতে পারেনি এমন মনে হওয়া
অস্বাভাবিক নয়। অশ্লীলতা এবং বীভৎসতাব কথা কুমুর মনে এসেছে বটে
কিন্তু শ্রামাপ্রসঙ্গ এই প্রয়োজনীয় মুহূর্তে দেখা দেয়নি। অবশ্যই কিশোরীও
শেষ পর্যন্ত মায়েব কাছে গিয়ে কেঁদে পড়েছিল, বলেছিল—যা খুশি কবো তোমরা
আমায় নিয়ে। এখানে কিশোরীর জীবন-বিত্ত্বকে প্রতিকূলতাব কাছে
অসহায় কবে তুলেছেন জগদীশবাবু। কিন্তু কুমুর ক্ষেত্রে তা না হওয়াব কারণ
রবীন্দ্রনাথের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে অপার নৈতিক সচেতনতা। কুমু না হতে
পাবলে আর সবকিছু হওয়াই ব্যর্থ। বধু হওয়া এবং জননী হওয়াও। জননী

হতে চলেছে বলে তার প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা কিছু বৃদ্ধি ঘটবে না। ঘটলে, নিঃশেষে আত্মসমর্পণের আত্মস্তিক পবাজয়ই প্রধান হয়ে ওঠে। সংসার অন্ধের মতো বসে বসে যে অদৃষ্টের জাল বনে চলেছে তা কখন এবং কবে থেকে আমাদের চাবপাশে ঘন হয়ে নিকটবর্তী হয় আমরা তা জানি না। জালবদ্ধ হবিণেব মতো জালবদ্ধ মানুষ জাল সম্বন্ধে অকস্মাৎ সচেতন হয়ে প্রবল প্রতিক্রিয়ার আক্ষেপে কেঁপে ওঠে। বিশোবীর স্পষ্ট চিন্তাব মধ্যে তাবই ইঙ্গিত। যে-স্ত্রীলোক মাষেব কাছে বলল—মা খুশি কৰো আমাকে নিয়ে, সে আসলে মৃত। কুম্বৰ অধ্যাত্ম-প্ৰেবণায় এই মৃত্যু থেকে সঞ্জীবিত হবাব সম্পদ ছিল। কিশোবীর এং নটনবেব শেষ উক্তিৰ মনো যে আত্মিক বিনষ্টিবোধ, যে চূড়ান্ত শূন্যতা তান মধ্যে সঞ্জীবনীবোব নেই।

এই অভাবেব মূল অবশ্যই জীবন সম্বন্ধে জগদীশবাবৰ attitude-এব মধ্যে। কুম্বৰ ক্ষেত্রে কুম্বৰ লাঞ্ছনা তাব ব্যক্তিত্বেব লাঞ্ছনা। কিশোবীর লাঞ্ছনা অদৃষ্টেব লাঞ্ছনা। কুম্বৰ যে ভাবনাংগ আমবা উদ্ধৃত কবেছি সেখানে দেখা যায় মধুসূদন নামক ব্যক্তিৰ অন্তৰ বাহিবেব গোটা জীবনাচৰণেব যোগফলবেই কুম্ব স্বীকাৰ কবে নিতে পাবেনি। অকিঞ্চনেব দুঃচৰিত্ৰতাই সে-ক্ষেত্রে কিশোবীর বিকপতাৰ কাৰণ। কিন্তু এই কাৰণেব মাধ্য এমন এক দৈন্ত্য বিদ্যমান যেটা জগদীশবাবৰ জীবন স দান্ত মনোভাবেব বা তাব মনোভাৱিৰ কিছুটা ক্ষতি কবেছে। জীবন নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰতাৰ শিকাৰ। জীবনেব নিষ্ঠুৰ কবতে গিযে তিনি অকিঞ্চনকে নিষ্ঠুৰ কবে ফেলেছেন। সেই কাৰণে কিশোবীর উদ্ধৃত উক্তি কুম্বৰ চেয়ে স্পষ্ট শোনাতেও কুম্বৰ সমগ্রতা কিশোবীতে নেই, যদিও এ প্ৰমাণেব কোনো অভাব নেই যে কিশোবীর বেদনাৰ তীব্রতাবে তিনি অনুভব কবেছিলেন। এং সে অনুভূতিকে গোজামিল দিয়ে হেয কাবননি।

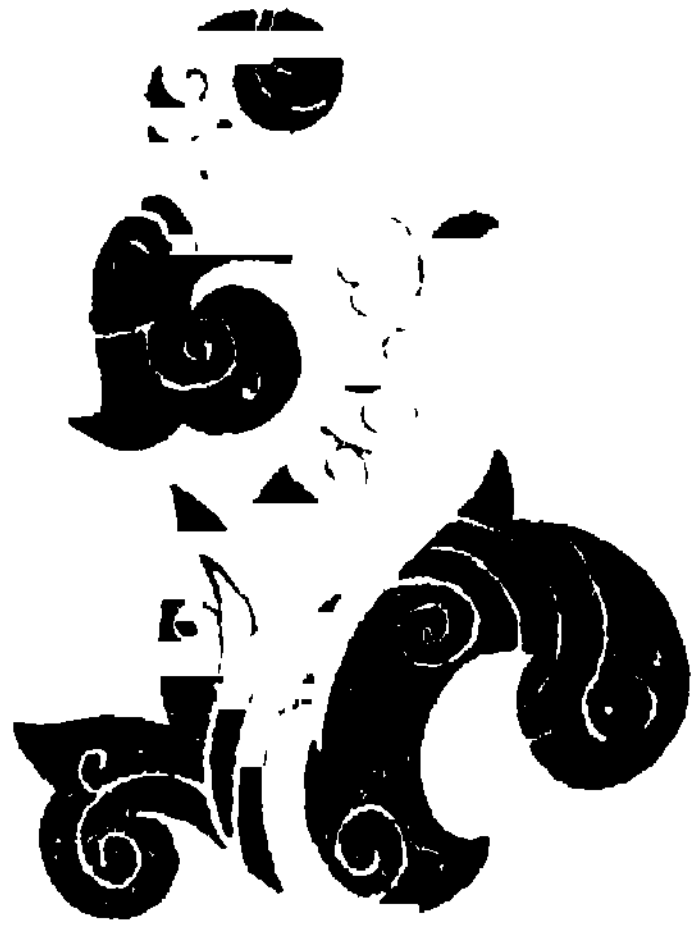
জীবনেব অন্তৰ্নিহিত শুদ্ধিভবনেব শক্তিকে দুঃখবাদী জগদীশবাব সবত্ৰই পবাভূত দেখেছেন। একটা শিল্পী-জীবনেব আদি অন্ত জীবনবোধেব অপবিবৰ্তনীযতা শিল্প এং জীবন দুয়েব জায়েই অসত্য। জগদীশ গুপ্তেব দৃষ্টিৰ এই অপবিবৰ্তনীযতা অবশ্যই আমাদেব পাডা দেয। কিন্তু তিনি কখনও জীবনেব প্ৰচেষ্টাকে ছোট কবে দেখেননি। শুদ্ধিভবনেব দিকে জীবনেব অমেয প্ৰয়াসকে তিনি যদি ছোট কবে দেখতেন তাহলে তাঁৰ পক্ষে শিল্পসৃষ্টিই সম্ভব হত না। সুখেব বিষয় জীবনেব অমেয প্ৰয়াস জগদীশ গুপ্তেব সার্থকতম শিল্পসৃষ্টিৰ মধ্যে সৰ্বদাই প্ৰতিফলিত। যদিও প্ৰাক্তনেব স্মত্ৰে অথবা বৰ্গকলেব বন্ধনে মাণুষেব স্বাধীন

ভূমিকা অবলুপ্ত এমন একটা ধারণা জগদীশবাবুর ছিল, তথাপি স্বাধীন ভূমিকা বিশ্বত মানুষের কথা তিনি কখনও ভাবেননি। বরঞ্চ প্রাক্তন কর্মফলের বন্ধনে বন্দী মানুষ স্বীয় ভূমিকার স্বাধীন বিকাশের জন্য অশেষ যত্নগাকে শিরোধার্য করেছে, হয়েছে সংগ্রামপরায়ণ— এই ছবিই মানুষের সত্য ছবি বলে তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছে। এই কারণেই বোধহয় বাংলা সাহিত্যে তাঁর আত্মীয়-সন্ধানে ব্যর্থ হবার আশঙ্কাই বেশি। একমাত্র কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ছাড়া জগদীশবাবুর শিল্পস্বভাবের আত্মীয় আব কেউ নেই। উদাসীন অদৃষ্ট শক্তি, যাকে রচনা করেছে কর্মফল, এবং যত্নগাহত শান্ত মানুষ—যতীন্দ্রনাথ ও জগদীশ গুপ্তকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর প্রধান উপন্যাস লঘুগুরু এ-প্রসঙ্গে প্রোজ্জ্বল নিদর্শন। যত্নগাহত শান্ত মানুষ এই কথাটি লঘুগুরু উপন্যাসের টুকির সংমা বলে পরিচিত বিশ্বস্তরের রক্ষিতা উত্তমকে যত মানায় তত আর কাউকে নয়। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিশ্বস্তব উত্তমকে পছন্দ করে নিয়ে এসেছিল সঙ্গে রাখবে বলে। যদিও উত্তম-বিশ্বস্তর সম্বন্ধে লেখক ‘নবযুগল’ বলে উল্লেখ করেছেন তথাপি আমরা জানি বিবাহাদিব কোনো ব্যাপাব এখানে নেই। “উত্তম বিশ্বস্তরের বাড়িতে যাইবে ঠিক হইয়া গিয়াছে”—এই চুক্তিটুকুর কথা লেখক এক কথায় সমাপ্ত করেছেন। এব পরে আমরা উত্তমকে বিশ্বস্তরের কন্যা টুকি-সমেত সংসারের কর্ণধার হিসাবে দেখি। সমগ্র লঘুগুরু উপন্যাসকে উত্তমের আত্ম-প্রতিষ্ঠার অনলস যত্নগাভোগ বলে বর্ণনা করা চলে। উত্তম সর্বৈবভাবে টুকির মা হতে চেয়েছিল। টুকির প্রতিষ্ঠায় এবং শুদ্ধ জীবনের বাসনায় প্রকৃতপক্ষে তার নিজেরই শুদ্ধতার বাসনা। স্ববণ বাখা কর্তব্য যে বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র পতিতা নারীদের সাধী হিসাবে অঙ্কনে তখন পূর্বসূরী। রাজলক্ষী চন্দ্রমুখী প্রমুখ চরিত্রে শরৎচন্দ্র স্নিগ্ধ মানবিকতার সাহায্যে পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সমাজ-ভ্রষ্টাদের দিকে। শরৎচন্দ্রের কাছে পতিতার সমস্তা বলে কিছু ছিল না। পতিতার সাধু রমণী মাত্র এই কথাটুকুই ছিল শরৎচন্দ্রের বক্তব্য। তাদের শ্রেণী বা ব্যক্তি কোনো রূপকেই শরৎচন্দ্র ধারণ করতে চাননি, করেননি। এইসব রমণীদের মধ্যে প্রেম আছে এবং প্রেমেই সব শুদ্ধ, সত্য অথবা নারীত্ব অনেক বড়ো কথা, এই ছিল মোটামুটি শরৎচন্দ্রের বক্তব্য। উত্তমের সাহায্যে জগদীশবাবু দেহজীবিনী এক নারীর গোটা জীবনের বাসনার সমস্তাকে রূপদান করেছেন। শরৎচন্দ্রের মতো সহানুভূতিব প্রশ্ন জগদীশ গুপ্তের মুখ্য প্রশ্ন ছিল না।

নাট্যকারের নির্গুণি জগদীশবাবুর আদর্শ বলে তিনি উপন্যাসে যৎপরোনাস্তি স্বল্পভাবী। এ-স্বল্পভাবিতা কখনো কখনো তাঁকে ক্রটিব সীমায় উপনীত করেছে। করেনি যে সমস্ত ক্ষেত্রে উত্তম তার অন্ততম। উত্তম চেয়েছিল টুকির জগত তার সমস্ত অতীতকে মুছে ফেলতে। পাড়াপ্রতিবেশীর কুংসা, বিশ্বস্তরের দেওয়া অমর্যাদা এবং শতমুখী সামাজিক দংশনকে সে সহ্য কবেছে শাস্ত চিন্তে এবং পক্ষীমাতার মতো টুকির নবজাগ্রত নানা প্রশ্নের হাত থেকে, পবিবেশের কবল থেকে, টুকিকে ডানাব আডাল দিয়ে বাঁচাতে চেয়েছে। নিজেব সর্বস্ব দিয়ে সে টুকিব বিয়ে দিয়েছে। টুকিব ভালো ববেব জগত আশ্রয় চেষ্টা করেছে। উত্তম যা কিছু এ-সংসারে ভালো বলে জানে তা সবই টুকিকে শিখিয়েছে। ঘর গেরস্তালির মাস্তুলিক কর্মাদি, ক্রোচেট বোনা প্রভৃতি টুকিকে শিখিয়ে উত্তম যেন টুকিব ভিতর দিয়ে নিজেব জীবনেবই সংশোধিত রূপ সৃজন কবে চলছিল। টুকিব বিবাহিত জীবনেব ব্যর্থতায় প্রতি পদে পদে আমাদের চোখেব সামনে উত্তমেব সেই প্রয়াস ভেঙে খান খান হয়ে গেল। টুকিব অন্ধকাবে অন্তর্ধানের ভিতরে যেন প্রতিফলিত হল উত্তমেব সাধনাব অন্ধকাব-বিনুপ্তি—যে সাধনা একমাত্র টুকি ছাড়া লালমোহন, বিশ্বস্তব, পাড়া প্রতিবাসী, বিশ্বস্তরেব বন্ধুবান্ধব সকলেব কাছ থেকে শুধু আঘাত পেয়েছে। কাম্য বিষয়েব স্পষ্টতায় এবং স্পষ্ট কামনাব সঙ্গে প্রাক্তনেব কর্মফলেব সংঘাতে ব্যক্তিব চূর্ণীকৃত রূপরচনায় লঘুগুরু অনুরূপ। লঘুগুরু তাঁব প্রথম দিকেব উপন্যাস হলেও সার্থকতায় বোধ কবি জগদীশ গুপ্তেব সর্বোত্তম বচনা।

•• সাত ••

এতক্ষণে একটা কথা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে জগদীশবাবু তাঁব সমস্ত উপন্যাসে একই বক্তব্যকে উপস্থাপিত কবেছেন। অবশ্যই ববীন্দ্রনাথ-প্রভাত-কুমার-শবচন্দ্রেব প্রতিক্রিয়া তাঁব বচনায় পরিস্ফুট কিন্তু তাঁব এই প্রতিক্রিয়াব জন্ম জীবন-বিষয়ক বক্তব্য থেকে। সে বক্তব্য হল এই মানুষ তাঁব কর্মফলকে মুছে ফেলে স্বাধীন শুদ্ধতাভিসারী হতে চায়। উত্তম, নটবব, কিশোরী—এবা সকলেই তাঁব এই বক্তব্যেব প্রমাণ। অনন্ত প্রয়াসশীল মানুষেব যন্ত্রণাকে, পরাভবকে যিনি এঁকেছেন তিনি মানুষকে ছোট কবে আঁকেননি। জগদীশ গুপ্ত সম্বন্ধে এইটাই প্রধান কথা।



তিরিশের যুগ : বাংলা উপন্যাসের দ্বিধামুক্তি

আমাদের বাংলা উপন্যাস পবিত্রমাত্র এই পবিত্রিত প্রয়াসে এতক্ষণে একটা কথা পবোক্ষে স্পষ্ট হয়েছে—Pure Novel বা বিশুদ্ধ উপন্যাস বলতে যা বোঝায় বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে তা প্রধানত অনুপস্থিত। স্ববিশুদ্ধ পবিকল্পনায় শুদ্ধ মানবিক সম্পর্কগুলির অভিব্যক্তি সাধনকে শিল্প লক্ষ্য হিসাবে অবিচল বেথে কোনো জেন অস্টেন বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হননি। তিরিশের যুগের বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের এই লক্ষণটির বিশেষ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। জেন অস্টেনের ন্যায় উপন্যাস-শিল্পীর কল্পনার স্ফূর্তি এবং সংশয়হীনতায় উত্তর-বিপ্লবী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছিল। ইংলণ্ডীয় উপন্যাস সাহিত্যের অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যেই এই উত্তর-বিপ্লবী নিশ্চিত অবিচলতার পবিমণ্ডল ছিল সহজে ক্রিয়াশীল। জেন অস্টেন উনবিংশ শতকের ব্যক্তি হলেও তাঁর উপন্যাসের মাটিতে প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতকের বীজের ফসল। কল্পনার স্ফূর্তি এবং নিশ্চিত অবিচলতার প্রসঙ্গে তিনি পূর্ব শতাব্দীর উত্তরাধিকারকে বহন কবেছেন। এই দুটি গুণের অধিকারিণী তিনি ছিলেন বলেই তাঁর বচন। বিশুদ্ধ উপন্যাসের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

বিশুদ্ধ উপন্যাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় নিশ্চিত নিবাসক্তি অবশ্যই বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে দুর্লভ। এই দুর্লভতার হেতু আমাদের স্বদেশীয় জীবন-বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত। প্রথমত, আমাদের সমাজ-জীবনে আমরা ইংলণ্ডীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থানের ন্যায় ব্যাপক পবিবর্তনগর্ভ কোনো সামাজিক আলোড়ন প্রত্যক্ষ করিনি। আমাদের যা কিছু চেতনাগত আলোড়ন তা প্রধানত চাকুরিমুখী ও কলকাতাকেন্দ্রিক। ফলে জীবনের সাবিক প্রসারের কোনো

ভূমিকা এখানে প্রস্তুত হয়নি। স্বতরাং জেন অস্টেনের জায় উপন্যাসিক যে উত্তর-বিপ্লবী নিশ্চিত্ত অবিচলতার উত্তরাধিকারিণী হতে পেরেছিলেন এখানে তা কাবো পক্ষে হওয়া দুঃসম্ভব ছিল। সে-কারণেই কীর্তিপ্রধান জাতির প্রথম উপন্যাসিক প্রয়াসে যে বাস্তব ব্যাখ্যার প্রয়াস পবিলক্ষিত হয়, মানবিক সম্পর্ক-গুলির নিখাদ কপাষণ মুখ্য হয়ে ওঠে—সে-জাতীয় কীর্তিগর্ভ বনিয়াদ এখানে ছিল অল্পপাণ্ডিত্য। বন্ধিমের উপন্যাসের সমস্ত শক্তি সম্বন্ধেও পারিবারিক-সামাজিক সম্পর্কগুলির বিষয়ে তাঁর পবাঅুখতা লক্ষণীয়। দ্বিতীয়ত, উপনিবেশিক জীবনের শতবন্ধন জাল জটিলতায় সমস্তা আমাদের নিত্য সহচর। যেখানে কিছুবই সমাধান হয়নি—অথচ সমাধানের আবেগও নয় তীব্র—সেখানে সমস্তা সদা-সবদাই তদপেক্ষা দীর্ঘতর ছায়া সৃজন করে। কপালকুণ্ডলা আর চতুর্ভুজ ছাড়া সমুদয় বাংলা উপন্যাস—শিল্পসাকল্য নিবপেক্ষভাবেই বলা হচ্ছে—সমস্তাসঙ্কলতা প্রধান।

স্বতবাং তিবিশেষ যুগের উপান্তে আমবা যখন পৌছলাম তখন এই দ্বিবিধ হেতুবই শক্তিরুদ্ধি ঘটেছে। বিশুদ্ধ উপন্যাসের অবকাশ হয়েছে সম্পূর্ণ তিবোহিত। প্রথম মহাযুদ্ধের পবে বাস্তব অবস্থায় তাব একটা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার চবিত্রটিকে সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। ইতিহাস ব্যাখ্যায় শুধু তাব সত্রটুকুই হাতে আসে। কেননা এমন বিমিশ্র অন্তর্ভুক্তিবে সমাজে এবং সাহিত্যে যুগপৎ উপস্থিত হতে অল্পই দেখা গেছে। একদিকে যুদ্ধ দিগন্তকে বিস্তৃত ববেছে, আর একদিকে যুদ্ধ-পববর্তী অধ্যায়েই চাকুবিপ্রাণ মধ্যবিত্তক সত্যযুগের অবসান ঘটল। একদিকে বিপ্লব ও কপান্তবের বিশ্ববোদ, অপব দিকে ঘন ঘন জাতীয় আন্দোলনের উত্তাল তবঙ্গের নিফল আলোডন, একদিকে ফ্রয়েডের অবচেতন-লোকেব আবিষ্কার, অপব দিকে এঙ্গেলস-মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদেব নবীন জ্ঞান—তিবিশেষ উপান্তে এই জট-পাবানে বাস্তব জীবনে গ্রন্থিমোচনের জন্তু দুম্পাঠ্য বাস্তবকে ব্যাখ্যা কবার দায় ছিল উপন্যাসিকদের।

দুই ••

কল্লোল এই সাহিত্যিক দায়িত্ব পালনের জন্তু বাস্তব ছিল যে পরিমাণে, সে পরিমাণে প্রস্তুত ছিল না। এই বাস্তবতায় সে যে ‘আগ্রহে পাঠ কবেছে আন্তর্জাতিক সাহিত্য, সেই অন্তসাবে পাঠ কবেনি দেশেব জীবনকে। বেদে উপন্যাস প্রসঙ্গে

স্ববীজনাথের পত্রের সারমর্ম এই তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত এ-দেশের সকল সাহিত্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রেই আলোক-সম্পাতী। যে বোহেমিয়ান বিলাসীকে স্বাণ্ডিনেভীয় পানপাত্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আসব পান কবে বিচরণ করতে দেখেছি আমবা বিদেশী সাহিত্যে, এখানে তাব উপযুক্ত ভূমি ছিল না। উপন্যাসের পক্ষে যা পবম প্রয়োজনীয় : দেশ-কালের সঙ্গে উপন্যাসের ভাবমণ্ডলের যুক্তিকরণ—কল্লোলগোষ্ঠীর ভিতরে তাব পবম অভাব তাঁদের সার্থক উপন্যাস লিখতে দেয়নি। গোকুল নাগের পথিকের আংশিক সাফল্যের কথা বাদ দিলে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের পাঁক, উপনায়ন, মিছিল কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে উল্লেখ্য উপন্যাস। তিনটি উপন্যাসেই কল্লোলের যা সম্ভাবনা ছিল, এবং যে-সম্ভাবনা শেষ পর্যন্ত অচিন্ত্যকুমারের বেদে ও যুবনাথের পটলডাঙার পাঁচালিতেই নিঃশেষিত হত—তার সূচাক্ষর বিকাশ ঘটেছে। তাব কাবণ একমাত্র প্রেমেন্দ্র মিত্রই হলেন কল্লোলের ক্রোড়ে লালিত সেই লেখক যার অসঙ্গতি অল্প। যদিও ছোট গল্পের প্রেমেন্দ্র মিত্রে আর কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রে দৃশ্যের পার্থক্য এবং ঔপন্যাসিকও আবাব এই দুইকেই ছাড়িয়ে অন্তঃপথগামী তথাপি মানুষের দুঃখ-বেদনাকে মূল্য প্রদানের চেষ্টায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমগ্র শিল্পপ্রয়াসে একটা সূত্র বিধৃতি ঘটেছে। নইলে সাদা থেকে তিথিডোবের যদি বা ব্যাখ্যা চলে, বেদে থেকে পবমপুরুষের বহুস্ত বোঝা যায় একমাত্র এইভাবে যে সাহসিকতায় বিশ্বয় স্বজনের দুর্মব অভীপ্সায় সমগ্র কল্লোলী লেখকদের প্রয়াস নিয়োজিত।

তথাপি এই যুগের না হলেও প্রথম যুদ্ধোত্তর বলকাতার একটা প্রতিফলন মিছিল এবং উপনায়নে পড়েছে। উন্মূলিত এবং উদ্দেশ্যহীন নিম্ন মধ্যবিত্ত কিশোর বিনুর জীবনে অথবা মেস-বাড়ির অসহযোগ-আন্দোলনোত্তর নিস্তবঙ্গ বেকার জীবনে চাকুরির সত্যযুগের যে অবসান ঘটেছে তাব ইঙ্গিত স্পষ্ট। এবং বিষয়বস্তুর মতো এই সত্যনিষ্ঠা ছিল বলেই প্রেমেন্দ্র মিত্র এমন একটা মানসিক দৃষ্টির অধিকারী হতে পেরেছিলেন যা তাঁকে কল্লোলের যুগের অশ্লীলতার ফ্যাশন থেকে মুক্ত বেখেছিল। অবশ্য কল্লোলের স্থূল বাস্তব বর্ণনায় একটা সামাজিক সত্যের ছায়া পড়েছিল। কল্লোলের যুগের ঐ দেহাশ্রয়ী বাস্তবতা প্রকৃতপক্ষে প্রথম মহাযুদ্ধের পবের সর্বাঙ্গীণ অস্থিরতার ছায়া চিহ্নিত। এবং সে-অস্থিরতাও আবাব উপনিবেশের জীবনের চূড়ান্ত বিফলতাবোধ-সঙ্গাত। প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রধান উপন্যাসগুলিতে এই বিফলতাবোধের ব্যবহার ঘটেছে জীবনের শাখত নীতিতে বিশ্বাস-ব্যতিবিক্ত ভাবে নয়। এই স্থিরতায় তিনি পবিহার কবেছেন

অসীলতা। কিন্তু তাতেই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্যভেদ সম্ভব হয়নি। উপন্যাসে উপন্যাসে বিহীন দৃষ্টিকে উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ব্যবহার করতে করতে অকস্মাৎ কেন্দ্রচ্যুতি ঔপন্যাসিক অসম্মতিরই প্রমাণ। বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের যিনি রাজা শুদ্ধ প্রচেষ্টা সম্বন্ধে উপন্যাসে তিনি অকিঞ্চিৎকর।

•• তিন ••

তিবিশেষ ঔপন্যাসিকবৃন্দ সে দিক থেকে যেমন কল্লোলের তেমন শব্দচন্দ্রেরও সীমাবদ্ধতাকে উপলব্ধি কবেছিলেন গভীরভাবে। যদিও শব্দচন্দ্রের চৈতন্য-সঞ্চাবী প্রয়াসের পাঠে তাঁরা ছিলেন দীক্ষিত, এবং কল্লোলের সাহসিকতাকে তাঁরা স্বীকার কবেছিলেন গ্রায়তই। তিবিশের প্রধান ঔপন্যাসিকদের বুদ্ধিপ্রধান (ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর বাঘ, গোপাল হালদার) এবং হৃদয়প্রধান (তাবাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক) এই দুই পন্থায় বিভক্ত কবলেও এই বিভক্তিকবনের জন্তু কঠিন সীমাবেধা ব্যবহার করা চলে না। বরঞ্চ বলা চলে, সং ঔপন্যাসিক প্রচেষ্টায় অনিবার্যভাবে মননের যে আলোকসম্পাত ব্যবহৃত হয়ে থাকে তিবিশের যুগের সমগ্র ঔপন্যাসিক প্রয়াস সেই মননশীলতার প্রয়োগে বিশিষ্ট। তাবাশঙ্করের দেশ-জিজ্ঞাসা, বিভূতিভূষণের বিশ্ববহু জিজ্ঞাসা, বা ধূর্জটিপ্রসাদের নাযকের সমগ্র মানসের টানাপোড়েন হৃদয়েরও ব্যাপার, বুদ্ধিরও ব্যাপার। বস্তুত হৃদয় নামক বস্তুটি তো সত্যিই হৃৎপিণ্ডের ধারে কাছে নেই—সে বরঞ্চ বয়েছে আমাদের মস্তিষ্কের শক্তির মধ্যেই। তিবিশের বাংলা উপন্যাস এই বুদ্ধির স্বাভাবিক কিরণসম্পাতে উজ্জল। He who thinks reasonably must think morally—বন্ধিম ও ববীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক উত্তবাধিকার এই পথেই নির্দেশক। প্রচুর পঠনশীলতায় অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ কবে তোলায় এই নির্দেশেই স্বীকৃতি।

তিবিশের কালে বাঙালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী-মানসে চিন্তাকে বিজ্ঞাননিষ্ঠ করে তোলাব জন্তু যে প্রবণতা পবিলক্ষিত হয়েছে তার মূলে একদিকে যেমন বিশ্ববীক্ষা, স্বদেশকে বিশ্বের অংশ হিসাবে উপলব্ধি, অপর দিকে তেমনি মানুষের পরিবেশ ও মনোজগৎ সংক্রান্ত নানা জিজ্ঞাসাব ভূমিকা ক্রিয়াশীল। সে কারণে তিবিশের বুদ্ধি-জগতে জীবনের সার্বিক সংকটের স্বীকৃতি যেমন স্পষ্ট, সেই সংকটকে শিল্প-সৃষ্টিতে পবিহার না করার দৃঢ়তাও তেমনি লক্ষণীয়। এই দৃঢ়তাব মূলে ছিল জীবন সম্বন্ধে প্রবল আশা। ভারতবর্ষে এই আশাব চেহারা গড়ে উঠেছিল

উপনিবেশের বন্ধনমুক্তির স্বপ্নে। যত অস্পষ্টই হোক এই আশার আলোকে চেতনাচঞ্চল মধ্যবিত্ত যুবকের প্রেরণা এবং বেদনার (শিবনাথ ও শশী) কথা ধ্বনিত হয়েছে আমাদের উপন্যাসে। সম্ভবত এই কারণেই শরৎচন্দ্রের স্ত্রী-চরিত্র-প্রাধান্য এবং কল্লোল-পন্থীদের নেতিভিত্তিক উন্মূল যুবকদের প্রসঙ্গ পরিহার করে তিরিশের উপন্যাস আবার বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ধারা বহন করে পুরুষ-চরিত্র-প্রধান হয়ে উঠেছে। অপু-শিবনাথ-শশী-বাদল-খগেনবাবু-অমিত এই যুগের উপযুক্ত প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র। ভাবপ্রবণ নায়ক অপেক্ষা চিন্তাশীল নায়কের প্রতি পক্ষপাত তিরিশের চেতনা-বিস্তারের অনলস প্রয়াসের পটেই প্রাসঙ্গিক। এই চেতনার বিস্তৃতিভবনের জন্ম তিরিশের ঔপনাসিকবৃন্দ তাঁদের উপন্যাসের বিষয়-নির্বাচনে ও শিল্পপ্রয়াসে অনেক বেশি সমগ্রসম্মানী দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। তারাকঙ্করের গ্রামীণ সমাজবীক্ষা এবং বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-অভিমুখিনতা উপন্যাসের কাম্য সমগ্রতা-সম্মানের নিদর্শন। সমগ্রতা সম্মানের এই বিভিন্নমুখী প্রয়াসের জন্মই তিরিশের যুগেই ঘটল বাংলা উপন্যাসের যথার্থ প্রসার। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের কালে এ ছিল শুধু একক পুরুষের প্রবল কীর্তি। তিরিশের যুগেই প্রথম পাওয়া গেল বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে একাধিক শক্তিমানের একত্র সমাবেশ। সাহিত্যে সর্বতোমুখী কর্মিষ্ঠতার কাল বলে তিরিশের কালকে আখ্যাত করা যায়। সে কর্মিষ্ঠতার মূলে ছিল এক পরম মানবিক বিশ্বাস—বিশ্বাস মানুষের ক্ষমতা সম্বন্ধে। মানুষের জীবনের প্রতি মমতা সম্বন্ধে। একেই আমরা ব্যাপক জীবনবোধ বলে আখ্যাত করেছি। তিরিশের লেখকদের প্রসঙ্গে গণজীবনের সঙ্গে পরিচিতি, মাটির মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা প্রভৃতি যে-সব বিশেষগোষ্ঠি বাবজত হত তার মূলে জীবন সম্বন্ধে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর চেতনা। বিস্তৃতি ও গভীরতায় এ-চেতনা বিশিষ্ট জীবনাগ্রহের ফল।

এই বিশিষ্ট জীবনাগ্রহের মৌল প্রবণায় আলোচ্য সময়ে উপন্যাসের আঙ্গিক-সাধনারও একটা ধারা ক্ষীণভাবে গড়ে উঠতে থাকে। বনফুলের আঙ্গিকসাধনা নানা পথচারী না হলে, এবং তিনি বক্তব্য নির্মাণে অতিমাত্রায় আলস্যবশত শেষ পর্যন্ত নেতিধর্মী লক্ষ্যহীনতায় বার্থ না হলে, তাঁর সে ও আমি উপন্যাসের আঙ্গিক-নিরীক্ষা মূল্যবান পরিণতির পথে অগ্রসর হতে পারত। ডায়েরিধর্মী উপন্যাসে বা স্বগত আলাপনের মেজাজে বনফুল শতধাবিভক্ত মধ্যবিত্ত যুবমানসের অসমতীময় চরিত্র-চিত্রণে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু লেখকের নির্মম ব্যঙ্গদৃষ্টি যে পরিমাণে

উত্তম ছোট গল্পেব স্রষ্টা, শুধু সেই বক্তব্যটুকুই কখনও মহৎ উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে না। জঙ্গমেব বিশাল আয়োজন এ-কাবণেই ব্যর্থ। আজিক সাধনায় বনফুলেব ব্যর্থতাব মূলে তাঁব বক্তব্যেব হীনতা বা ন্যূনতা। আবার এই বক্তব্য সম্বন্ধে অতিসচেতনতাই আৰ একজন লেখকে তাঁব সাধনায় অগ্রসৰ হতে দিল না—তিনি গোপাল হালদাৰ। ‘একদা’ বাংলা সাহিত্যেব গতানু-গতিক গল্পধাৰায় অকস্মাৎ আশ্চৰ্য শক্তিশালী ব্যতিক্রম। আজ বাংলা সাহিত্যে যখন সাহিত্য আলোচনাৰ ক্ষেত্রে চেতনা-প্রবাহ প্রভৃতি বিষয়েব পুনঃ পুনঃ উল্লেখ হচ্ছে তখন একদাব প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়া উচিত বলে মনে কৰি। প্রকৃতপক্ষে অন্তঃশীলা এবং একদা থেকেই এই নতুন লেখকেবা প্রেবণা সংগ্রহ কৰেছেন—এঁবা অভিনব কিছু নন। একদাব একটি দিনেব মুকুবে কলকাতা, সমকালীন স্বদেশ - কাজেই বিশ্বজগৎ এবং ব্যক্তিমানসেব সকল ভগ্নাংশে প্রতিফলিত সভ্যতাৰ ছবি—সবই প্রতিফলিত। একদাব ভাষা সম্বন্ধে লেখক সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিতে পাবেননি। যে কাবণে পাবেননি সেটা হল লেখকেব বক্তব্য সচেতনতা। যে-দৃষ্টিৰ সাহায্যে লেখকেব বিশ্ববীক্ষা তা জ্যেস প্রস্তুত ভাষাবীতিকে আত্মসাৎ কৰে নিতে পাবেনি। এই সমস্যাৰ কাবণেই লেখকেব এই পথে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদচাৰণা সার্থক নয়। বলা প্রযোজন আজকেব নতুন প্রযাসীলদেব মনোও এই সমস্যা অগ্নিবৎ জ্বলন্ত। নিবিশেষ যোগেই বাংলা উপন্যাস সাবালকেব দ্বিগুমুক্তি অজন কৰেছে। এখন আমবা এ যুগেব লেখকদেব প্রধান ঔপন্যাসিক বৈশিষ্ট্যেব পৰিচয় গ্রহণ কৰব।

ভাৰাশঙ্কৰ বন্দ্যোপাধ্যায়

●● এক ●●

নগৰ-জীবনেব ব্যর্থতা, ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্তেব চাকুবিগত নিবাপত্তাব অভাব, বা ত্রিশেব আধিক সংবটে প্রথম উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ কৰল—এবং বাজনৈতিক আন্দোলনেব ব্যর্থতা ও পৰ্বতেব মূষিকপ্রসব ইত্যাদি সত্ত্বেও বাঙালী মধ্যবিত্তজীবন তখন আশাহীন হয়নি। বৰঞ্চ এবম্বিধ অবস্থায় চিন্তাব বিভিন্ন স্তবেব সক্রিয়তায় বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজ তখন বিশ্বাস এবং আশাব মূল জাতীয় জীবনেব গভীৰে মেলে দিতে চেয়েছে। শশী, অপু অথবা শিবনাথ কিংবা শঙ্কৰ, প্রত্যেকেই পৰম্পৰেব থেকে দৰে হলেও, এদেব সমস্যাৰ একটা সাধাবণ উৎস বিদ্যমান ছিল। জীবন সম্পর্কিত আশা বা আদর্শকে কপায়িত কৰতে পাবা-না পাবাব

ব্যাপারটাই এদের জীবনের মুখ্য ব্যাপার। অপূর্ণ শিল্পচিন্তে স্বপ্নের আচ্ছাদন, অথবা শশীর নগর-স্বপ্নের সঙ্গে গাওদিয়ার সংঘর্ষ কিংবা শিবনাথের ধরিত্রীকে চেনার বাসনা জীবন সম্পর্কিত আশা-আকাঙ্ক্ষারই প্রমাণ। এটা অবশ্য সে-যুগেই সম্ভব, যে-যুগে জাতীয় মানস স্বদৃঢ় আশাবাদিতার গ্রায়ে ও শঙ্কলে বাঁধা। (স্বপ্ন থাকলে তবেই স্বপ্নভঙ্গের বেদনার কথাও ওঠে এই কারণে শশী এ-যুগেই প্রাসঙ্গিক।) এই আশাবাদিতার মূল জাগ্রত জাতীয় চেতনায়— যে জাতীয় চেতনা ১৯০৫ সালের দেশমাতৃকার বন্দনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। উপনিবেশের জোয়াল কাঁধে চেপে আছে বলেই স্বদেশকে, দেশজ মানুষকে, দেশের প্রকৃতিকে চেনা যাচ্ছে না, গ্রামকে যে রূপান্তর দিতে চাই তা দিতে পারছি না। কখনো স্পষ্টভাবে, অধিকাংশ সময়ে অস্পষ্টভাবে এটাই এ-যুগের সকল সাহিত্যকর্মের প্রধান কথা। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিকূল ছকের সঙ্গে ব্যক্তি-মানসের আশা-প্রত্যাশার সংঘাতের রূপায়ণে এ-যুগের উপন্যাসের শিল্পকর্ম নিয়োজিত হয়েছে। এখানে আমাদের আলোচ্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এ-যুগের প্রথম সারির ঔপন্যাসিকদের অন্যতম। দীর্ঘ সাহিত্যজীবন এবং তাৎপর্যপূর্ণ সাহিত্যকীর্তিতে তিনি বিশিষ্ট। জীবন সম্বন্ধে বহুমুখী আগ্রহবিশিষ্ট তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক সাহিত্যকর্মের আলোচনা দ্বিতীয় যুদ্ধপূর্ব ও তৎপরবর্তী বাংলা উপন্যাসের শক্তিসামর্থ্যেরই একটা প্রধান পর্যায়ের আলোচনা।

•• দুই ••

যে ভৌগলিক অঞ্চলকে তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসের ঘটনাবলীর জন্য নির্বাচন করেছেন সেটি তাঁর সম্পূর্ণ স্বক্ষেত্র। কিন্তু এটাই সেই ভৌগোলিক অঞ্চলের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। নানা দিক থেকে জীবন সম্বন্ধে বহুমুখী কৌতূহল এবং আগ্রহ সঞ্চার করার ক্ষমতা এ-অঞ্চলে বর্তমান। বীরভূম-বর্ধমান-বাঁকুড়ার ভূপ্রকৃতি সম্বন্ধে ধারাই জ্ঞান আছে তিনিই জানেন যে একদিকে বর্ধমানের শস্যপূর্ণ আদিগন্ত প্রান্তর, অপরদিকে বীরভূম ও বাঁকুড়ার তরঙ্গময় কাঁকুরে রক্ষতা, জীবনের দ্বৈত রূপকে এখানে যুগপৎ ধরে রেখেছে। কাজেই পিপাসার্ত বীরভূমের দুভিক্ষ (ধাত্রীদেবতা) এবং দু-কূলপ্লাবী ময়ূরাক্ষী (গগদেবতা) দুইই এই অঞ্চলের বিশেষত্ব। বীরভূমের গ্রামীণ অর্থনীতি বাংলার আর পাঁচটা জেলার মতো কৃষিনির্ভর হওয়া সত্ত্বেও বীরভূমের সাধারণ ভাগচাষীকে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয় সাঁওতালদের সঙ্গে—যেটা এ-অঞ্চলেরই নিজস্ব

ব্যাপার। অল্প মজুরিতে কঠিন শ্রমের সাহায্যে এরা বীরভূমের কাঁকুরে
 বিমুখতাকেও ব্যর্থ করে দেয়। একদিকে ধ্বংসমুখী সামন্ততন্ত্র এবং অপরদিকে
 সাঁওতাল কৃষকদের ঘর গড়ে তুলতে গিয়ে বাঘাবরত্ব ত্যাগের আহত বাসনায়
 ইতিহাসের একটা পর্যায় এখানে স্পষ্ট (কালিন্দী)। দুর্বল কৃষির ওপর নির্ভরশীল
 গ্রামীণ বেকারের অজস্র টাইপ স্বভাবতই ঝাঁকুড়া-বীরভূমের বৈশিষ্ট্য এবং
 পূর্ববঙ্গের তুলনায় অধিকতর গ্রামমুখিতা এবং অধিকতর আলাপ এই বৈশিষ্ট্যকে
 আরো উজ্জ্বল করেছে (অগ্রদানী এবং কবির বিপ্রপদ)। কৃষি দুর্বল বলেই
 জীবিকাহীন অনন্তোপায় বাউরী প্রভৃতি শ্রেণীর তথাকথিত “স্বভাব অপরাধিত্ব”
 এখানে অধিকমাত্রায় প্রকট। আবার অপরদিকে একই কারণে বাউল, বৈরাগী,
 বোষ্টম এবং কবির দল, ঝুমুরের দল প্রভৃতির আধিক্য তথাকথিত “স্বভাব
 অপরাধী” শ্রেণীর সঙ্গে একটা বৈপরীত্য সৃজন করে রয়েছে (রাইকমল ও
 কবি)।

দুই রাত অঞ্চলের জীবনের প্রধান পরিচয়সূত্র এটা আরো বেশি বোঝা যায়
 যখন সমগ্রভাবে এ-অঞ্চলের অর্থনৈতিক রূপটা চোখে পড়ে। একদিকে
 রানীগঞ্জ এবং বরাকরের কয়লাখনির শিল্পাঞ্চল এবং অপরদিকে তারই সঙ্গে
 সংঘর্ষে লিপ্ত ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবংশগুলি যে-কোনো চিন্তাশীল লেখকের কাছেই যথেষ্ট
 আগ্রহের বিষয়। বর্ধমান-বীরভূমের এই বিচিত্র রূপটি বাংলা দেশের অগ্রত
 দুর্লভ। চটকলের চেহারা অগ্র। সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদেশী ম্যানেজিং
 এজেন্টের একচেটিয়া ব্যবসায়ে বাঙালী শিল্পপতির ভূমিকা লুপ্ত। শ্রমের
 প্রতিযোগিতায় স্বল্পশ্রমী বাঙালী মজুরদের ভূমিকাও গৌণ। একমাত্র রানীগঞ্জ-
 বরাকর অঞ্চলেই সেই শ্রেণীর বাঙালী শিল্পপতির দেখা পাওয়া যাবে যারা
 জমিদারি সম্পত্তি বেচে কয়লার ব্যবসায়ে নেমেছেন। এই নতুন বাঙালী
 ব্যবসায়ী শ্রেণীর সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের সংঘাত এখানকার মাটি থেকেই উদ্ভূত
 ব্যাপার। ফিউডাল অর্থনৈতিক কাঠামোর চারদিকের রূপান্তরমুখী ইতিহাস
 কী ভাঙন, আলোড়ন সৃষ্টি করল তা বলার উপযুক্ত ক্ষেত্র বর্ধমান-বীরভূম
 (হানুলিঝাঁকের উপকণ্ঠ চাকরানভোগী কাহারপাড়া বনাম রেলপথের বিস্তৃতির
 দ্বন্দ্ব স্মরণীয়)। ভারতীয় কয়লার পৃথিবীর বাজার নেই। আর বিদেশী পুঁজি
 ভারতবর্ষে সে-ক্ষেত্রে একচেটিয়া হয়নি, যে-ক্ষেত্রে পাট বা চায়ের মতো
 একচেটিয়া বাজারের সম্ভাবনা কম। সুতরাং উপনিবেশের প্রভুদের ছত্রছায়ায়
 থেকেও এক ধরনের অর্ধগঠিত বাঙালী শিল্পপতি ও বাঙালী ব্যবসায়ী চরিত্রের

বিকাশ এ-অঞ্চলে ঘটেছে—যা বাংলার অন্তর বিরল। তাবাশঙ্করের উপন্যাসে এ-ধবনের ব্যবসায়ী চবিত্রের ভূমিকা সর্বত্রই বিদ্যমান। কালিন্দীর বিমল মুখুজ্যে বা শিবনাথের শ্বশুর (ধাত্রীদেবতা) বা আরতির বাবা (উত্তরায়ণ) শুধু নয়, আবো প্রমাণ এ-প্রসঙ্গে দেওয়া চলে। অবশ্য এদের ভূমিকা সম্বন্ধে তাবাশঙ্কর ওয়াকিবহাল হলেও তাব পূর্ণ ব্যবহার তাঁর উপন্যাসে হয়নি। তথাপি এটা তো খুবই স্পষ্ট যে এই উঠতি ব্যবসায়ী শ্রেণীর সংঘর্ষে ধ্বংসমুখী সামন্ত জমিদার বা ভূম্যধিকারীদের চবিত্র তাবাশঙ্কর উপন্যাসে অনেকবার ব্যবহার কবেছেন। বিষয়বস্তুর ব্যবহারের দিক দিয়ে এটা কতটা তাৎপর্যসূচক তা শিল্পবিচার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে।

•• তিন ••

এই বিষয়বস্তু ব্যবহারের সময় উপন্যাসের কাঠামোগত পরিকল্পনায় তাবাশঙ্কর যে বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন তাও এই প্রসঙ্গেই আলোচ্য। তাবাশঙ্করের উপন্যাসবাজিকে দু-ভাগে ভাগ করা যায় এক ভাগে পড়ে ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, গণদেবতা প্রভৃতি, আর এক ভাগে পড়ে ইন্ডলিয়ারের উপকথা, নাগিনী কন্যার কাহিনী, কবি, বাধা প্রভৃতি। এব মধ্যে শেষোক্ত উপন্যাসগুলির প্যাটার্নে রূপকথার প্রভাব সহজেই বোঝা যায়। কবালী, নাগুঠাকুর যেন রূপকথার সেই নায়ক যে আধাবপুর্বীতে প্রতিকূল দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জেতে, আধাবপুর্বী ভেঙে দেয়। যথকর্তার ভিত্তিতে প্রথমাবধি চন্দ্রামিত্র ভাষায় বিধৃত এই কাহিনীগুলি শুধু যে লোক জীবনের সঙ্গেই তাবাশঙ্করের পরিচয়ের প্রমাণ তাই নয়, লৌকিক সাহিত্যবাবার সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয়ের প্রমাণও বটে। কিন্তু নাগিনী কন্যার কাহিনী, ইন্ডলিয়ারের উপকথা প্রভৃতি উপন্যাসেই নয়, মনে হয় রূপকথার আদর্শ তাবাশঙ্করের অন্য বৃহৎ উপন্যাসগুলিতেও সমানভাবে বিদ্যমান। তাবাশঙ্করের বড়ো উপন্যাসের গল্প সর্বদাই এই। একটি পুরাতন জীবনের ছকে এক নবীন নায়ক কী পরিবর্তনের পথায় নিয়ে এল তাবই সংঘাত-সংঘর্ষকে ভিত্তি করে তাবাশঙ্করের উপন্যাসের নাট্যবস জমে ওঠে। তাব নায়কেরা প্রাচীন বাংলা কাহিনী-বাব্যের নায়কের মতো সর্বথাই ধীবোদাত্ত, রূপবান, গুণবান, অক্রোধী, দৃঢ়চেতা এবং মেধাবী (শিবনাথ, অঙ্গীন, দেবু ঘোষ থেকে শুরু করে উত্তরায়ণের প্রবীর পর্যন্ত স্রবণীষ)। তাঁর মধ্যবিত্ত নায়কেরা সবসময়েই অভিজাত বংশোদ্ভূত। নায়ক-চবিত্রের এই পরিকল্পনা বন্ধিম-

ববীন্দ্রনাথের নায়ক পবিকল্পনার কথা মনে করিয়ে দেয়—অধিকন্তু তাবিশ্বকবীর উপন্যাসের গ্রামীণ পৰিবেশ-পটভূমিতে তা সহজেই রূপকথার গল্পের প্যাটার্ন গ্রহণ কৰতে পাৰে (অবশ্য এব একটা সংকটও আছে) ।

বলা প্ৰযোজন যে পূৰ্ণ পৰিচ্ছেদে কথিত বিষয়বস্তুৰ সঙ্কে—তথা তাবিশ্বকবীর আঞ্চলিকতাব সঙ্কে—এই রূপকথার প্যাটার্নের সম্পর্ক নিবিড়। আঞ্চলিক উপন্যাসের প্ৰধান বৈশিষ্ট্যগুলিৰ মনো একটা হল এই যে আঞ্চলিক জীবনবিজ্ঞাসেৰ ওপৰ কোনো বহিৰাগত শক্তিৰ আঘাত যে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰে তাৰ কপায়ণ । যথাদৃষ্ট স্থিৰ ছবিৰ জ্বাষ মাত্ৰ আঞ্চলিক জীবনই প্ৰচুব পাবিভাষিক শব্দেৰ সাহায্যে কখনো সার্থক উপন্যাস গড়ে তুলতে পাৰে না । হাডিৰ উপন্যাসে Ballad tale-এৰ প্যাটার্ন এব তাবিশ্বকবীর উপন্যাসে রূপকথার প্যাটার্ন-বচনাৰ হেতু এই সূত্ৰেৰ মনোই সন্ধান কৰতে হবে । এই উভয় লেখকেৰই উপন্যাসে বাবহৃত জমাট কাব্যবস এবং নাট্যবস এই বিশেষ জীবন-বিজ্ঞাসেৰ জগত্ৰই এমন সার্থক হয়ে উঠতে পেৰেছে । ওষেসেক্স অঞ্চলেৰ Agricultural Decline-এৰ সঙ্কে অবশ্যই বৰ্তমান বীৰভূমেৰ আংশিকভাবে আগত ভূম্যধিকাৰীদেৰ কোনো তুলনা হয় না । কেননা ব্যাপক শিল্প রূপান্তৰ এব ১৮৪৬ সালে শস্বে স্বাবীন বাণিজ্যেৰ ফলে Agricultural Decline, আব সম্ৰাজ্ঞীৰ ছত্ৰছায়ায় গজিয়ে-ওঠা কলোনিয় কষনাৰ বাবসাযাদেৰ সঙ্কে সংঘৰ্ষে বা অন্ত কোনো আঘাতে কম্পমান সামন্তদেৰ কাৰো কানো ব্যক্তিগত দুঃখভোগ নিঃসন্দেহে এক ব্যাপ্যৰ নম । ফলে উপন্যাসেৰ বিষয়েৰ দিক দিযে ইতিহাসেৰ বন্দিষ্ট সাহায্য হাডি যতটা পেৰেছেন তাবিশ্বকব ততটা পাননি । তথাপি উপন্যাসে জীবনকে শিল্পৰূপে বিজ্ঞান্ত বনতে গবে হাডিৰ Ballad tale-এৰ প্যাটার্নেৰ মতো রূপকথার প্যাটার্নেৰ আশ্ৰয় গ্রহণ তাবিশ্বকবীর পক্ষে কখনো কখনো খুবই সমীচীন হযেছে । এইভাবে লোকসাহিত্যেৰ বলিষ্ঠ ধাবাৰ সঙ্কে আত্মীয়তা এবং বৰ্দ্ধিত-ববাব্দ্রনাথেৰ ব্যক্তিচেতনাৰ পন্থান্তৰণেৰ ভিতৰ দিযে তাবিশ্বকব তাৰ ব্যক্তি-প্ৰতিভাৰ সঙ্কে জাতীয় ইতিহাসেৰ এস মিলন খুঁজে পেলে । এইটাই বাংলা সাহিত্যে তাবিশ্বকবীৰ নিজস্ব মহৎ দান ।

●● চাব ●●

‘মানুষেৰ ওপৰ বিশ্বাস হাবানো পাপ’—এটাই তাবিশ্বকবীরও প্ৰধান বক্তব্য । উপন্যাসে যে দ্বন্দ্ব অবলম্বনে তাবিশ্বকব এই সিদ্ধান্তে পৌছতে চান তাৰ রূপটাও

প্রাণিধানবোধ্য। সাধারণত সামাজিক দ্বন্দ্বগুলির পশ্চাতে পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্বের একটা ছায়া কাজ করে। শ্রীহরি ঘোষ এবং দেবু, বা ইন্দ্র রায় এবং বিমলবাবু বা শিবনাথ এবং তার শক্তুরবাড়ি বা করালী এবং কাহারপাড়া এদের সংঘাতের মধ্যে সামাজিক অর্থ নৈতিক সূত্রগুলির সন্ধান যেমন মেলে তেমনি সাধারণভাবে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ, ভালো-মন্দের যুদ্ধ, গ্নায়-অগ্নায়ের যুদ্ধ প্রভৃতি মোটা দাগের নৈতিক প্রশ্নও জড়িত থাকে। রূপকথার প্যাটার্ন এই নৈতিক চেতনাকে এভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। কথক যেমন তার সমস্ত কথকতার শেষে স্বস্তিবাণী উচ্চারণ করেন—তারাকঙ্করেরও সমস্ত উপন্যাসের ফলশ্রুতি সেই স্বস্তিবাণী। সম্ভবত সমস্ত অকল্যাণ বা পাপের মধ্যেও পুণ্যের জন্য একটা সংগ্রাম বিদ্যমান এমন ধরনের একটা বক্তব্যো তিনি বিশ্বাসী। রামায়ণ-মহাভারতাত্মক ভারতীয় চাষী যেমন ‘সত্যের জয় অবশ্যজ্ঞাবী’—এ-কথাকে বিশ্বাস করে, তারাকঙ্করের বিশ্বাসেও সেই unsophisticated সারল্য আশ্রয়ের চেষ্টা উপস্থিত। প্রত্যেক মহৎ ঔপন্যাসিকের সৃজিত চরিত্রাবলীই জীবনের ঘাটে ঘাটে নিজের অভ্যাস সত্তাকে খুঁজে ফেরে। নেথল্যাডফই হোক বা গোরাই হোক—নিহিলিস্ট বাজারভ ব্যতীত—মহৎ উপন্যাসে বোধকরি সকলেই সেই অস্তিত্বের পূর্ণাদর্শের সন্ধানী। বাজারভের নেতিবাচনে এবং বিমুখ ঔদাসীণ্যের পক্ষে এটা অপ্রয়োজনীয়। এই কারণে অপ্রয়োজনীয় যে, বুদ্ধিজীবী রুশ মধ্যবিত্তের তৎকালীন খণ্ডায়নই সেখানে দেখবার বিষয় ছিল। বাজারভ তার চতুর্পার্শ্বের বাস্তবতার মাঝখানে বিশ্বাস খুঁজে পেলে এই দেখানোর কোনো যৌক্তিকতা থাকে না। তারাকঙ্করের প্রশ্ন অন্তর। মানুষ বিশ্বাস খুঁজে পায় তার অন্তরে—বাস্তব ব্যবস্থার সঙ্গে সংঘর্ষে তার বিশ্বাসেরই শুদ্ধিভবন ঘটে। তাই টলস্টয়ের এই পথে তারাকঙ্কর পদার্পণ করতে চেয়েছেন। কোনো মহৎ উপলক্ষের সুরে জীবন যদি উপনীত না হয় তবে জীবনের ঘাটে ঘাটে ফেরা নিরর্থক। জীবনের অন্তর্নিহিত কোনো শক্তি সেই মহৎ বিশ্বাসে মানুষকে নিয়ে যায়। নিতাই (কবি), রুক্ষেন্দু (সপ্তপদী), শিবনাথ (ধাত্রীদেবতা), প্রবীর (উত্তরায়ণ), এরা সকলেই নিজ নিজ ঘটনাময় জীবনের শেষে এই বৃহত্তর উপলক্ষের সুরে উন্নীত হয়েছে। এই উপলক্ষটি কতখানি জীবন থেকে উদ্ভূত আর কতখানি লেখকের আরোপিত, সেটা আমরা পরে আলোচনা করব।

এতক্ষণ আমরা দেখলাম যেটুকু তা সংক্ষেপে এই : তারাকঙ্করের আঞ্চলিকতা যেমন তাঁর উপন্যাসের প্যাটার্নকে গঠন করতে সাহায্য করেছে তেমনি

তারাশঙ্করের নৈতিক সিদ্ধান্ত এবং প্রজ্ঞাবলীও সেই পার্টার্নের কাছ থেকে বিশেষ সহায়তা পেয়েছে। জীবন, জীবনের বিস্তৃত রূপ এবং নৈতিক সমস্তা একাধারে বিধৃত হবে—এটা মহৎ উপজ্ঞাসিকেরই লক্ষণ।

•• পাঁচ ••

হার্ডির কারুদক্ষতা তারাশঙ্করে অবিদ্যমান এই ভেবে ঠাঁরা শোক করেন তাঁরা উক্ত দুই লেখকের আঞ্চলিকতার সাদৃশ্যটুকু দেখেই বিচারে অগ্রসর হন বলে এই বিপত্তি ঘটে। তাঁরা অবশ্যই হার্ডির কারুদক্ষতার প্রচুর প্রশংসা জ্ঞায়িত করতে পারেন। চরিত্রের বিধুরতার ব্যঞ্জনা বা প্রকৃতির আশ্চর্য চিত্র অঙ্কনে হার্ডির সিদ্ধতা স্মরণীয়।—

The stillness was disturbed only by some small bird that was being killed by an owl in a neighbouring wood, whose cry passed into the silence without mingling into it.

এ-জাতীয় বর্ণনার সিদ্ধতা বা ‘রিটার্ন অফ দি নেটিভ’-এর এক অংশে একটা উপযুক্ত চিত্রকল্পের জন্ম তীব্র অনুসন্ধানের পর্যায়ে

প্রথমে : A dwindled voice strove hard at a husky tune.

পরে : The note bore a great resemblance to the ruins of human song which remains to the throat of fourscore and ten.

এবং পরিশেষে অব্যর্থভাবে : It was worn whispers, dry and papery and it brushed so distinctly across the ear.....

এই পরিণত চিত্রকল্পের জন্ম কবিস্বলভ জাগ্রত প্রয়াস তারাশঙ্করে প্রায় অনুপস্থিত। কিন্তু এ-কথা বলার সময় একটি প্রধান কথা ভুলে যাওয়া হয় যে, হার্ডির উপজ্ঞাসে কাব্যরস প্রধান, সে-ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের উপজ্ঞাসের প্রধান গুণ নাট্যরস। হার্ডির উপজ্ঞাসের প্রধান সহচরই হল কবিত্ব। হার্ডির সমালোচকেরা বহু স্থলেই বলেছেন যে কথাসাহিত্যের পরিভাষার নয়, ব্যালাড কবিতার আঙ্গিকে এবং কাব্যবিচারের মাপকাঠিতেই হার্ডি স্পষ্টতরভাবে বোধগম্য।

এ-পার্থক্যের মূল দুজনের বিষয়বস্তুতে। আমরা আগেই বলেছি যে ওয়েসেক্স

অঞ্চলের Agricultural Decline এবং বর্ধমান-বীরভূম অঞ্চলের সামন্ততন্ত্রের ভাঙন এক কথা নয়, যেহেতু এক কথা নয় একটা স্বাধীন বাণিজ্যজীবী জাতির শিল্পবিপ্লব এবং কলোনির সাম্রাজ্যের প্রভুদের প্রসাদপুষ্ট কয়লা অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের খবিত আত্মপ্রসার। তাই শিল্পবিপ্লবের ফলে ওয়েসেস্টার কৃষি অঞ্চলে যে-প্রতিক্রিয়া সহজেই চোখে পড়ে বীরভূম-বর্ধমানের কৃষি-জীবনে সে রূপান্তরের সন্ধান নেই। সেখানে অতি অসম্পূর্ণ দেশী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সামন্ততন্ত্র প্রবল প্রতিরোধী শক্তি। সে শুধু কালের নিয়মে অন্তর্দ্বন্দ্বের ভাঙনদশাগ্রস্ত। ফলে বাথসেবা বা টেসের মতো সামাজিক বিপর্ষয়ের বলি হিসাবে সাধারণ মানুষের কথা তারাশঙ্করে নেই কিন্তু ইন্দু রায় বা বিশ্বস্তুর রায় তারাশঙ্করে আছে। অদৃষ্ট নয়—ইতিহাস অর্থে যে কাল বোঝায় সেই কাল বিমুখ বলেই বিশ্বস্তুরের মতো শক্তিমানকে ভেঙে যেতে হচ্ছে — এই নাটকীয় দ্বন্দ্ব এই বিষয় থেকেই জন্মেছে। এখানে তারাশঙ্কর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অদ্বিতীয়। এইভাবে “কালবিমুখ”-তার বোধকে যদি তারাশঙ্কর ব্যবহার না করতেন তাহলে বিমল মুখুজ্যের মতো দেশী শিল্পপতির পঙ্গু নিদর্শনের হাতে রামেশ্বর ও ইন্দু রায়ের পতনের কোনো মানে হয় না।

প্রশ্ন উঠতে পারে টেস কিংবা বাথসেবা নেই, কিন্তু বনোয়ারী আছে। বনোয়ারী যদিও প্রাকৃত মানুষ—কিন্তু সে জনতার একজন নয়। সে কাহারপাড়ার মোডল। করালী এবং ইতিহাসের দ্বাঙ্কায় কাহারপাড়ার রূপান্তরের সে একটা প্রতিরোধী শক্তি। এবং এ-প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের শিল্পকর্ম বিচারে ইন্সলি-বাকের উপকথা ও বনোয়ারীর বিষয় নানা কারণে তাৎপৰ্যপূর্ণ। বিশ্বস্তুর রায়, রামেশ্বর, ইন্দু রায়ের চেয়ে বনোয়ারী অনেক পূর্ণতর চরিত্র। বিশ্বস্তুর, রামেশ্বর, ইন্দু রায়ের পতন অনেকটাই সামন্ত জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব-প্রসূত। দশ আনা ছয় আনার বিবাদ যেন সামন্ত দাঙ্কিতাব ফল। বিমল মুখুজ্যের ভূমিকা এখানে গৌণ নয়। কিন্তু সে পরিমাণ স্পষ্টতার সঙ্গে গোটা সামাজিক কাঠামোয় বিমল মুখুজ্যের ভূমিকা তারাশঙ্কর আঁকতে পাবেননি। কাজেই উল্লিখিত ব্যক্তিদের পতনে প্রতিকূল ‘কাল’ বা ‘কালের রূপান্তর ঘটেছে’ এই বোধের ব্যবহারে তারাশঙ্কর যথেষ্ট শিল্পচেষ্ঠা নিয়োগ করলেও রূপান্তরমুখী সারা সমাজপটের অতি ক্ষীণ সমর্থনই উক্ত শিল্পপ্রয়াস পেয়েছে। অনেক সময়ই মনে হয়েছে যে বিষয়টা যেন শেষ পর্যন্ত শুধুই ব্যক্তিগত। কিন্তু বনোয়ারীর ক্ষেত্রে এই ক্রটি নেই। সে কাহারপাড়ার মোডল। কাহারপাড়ার ভবিষ্যৎ করালী তার হাত থেকে

ছিনিয়ে নিতে চায়, বলেই তার সঙ্গে কবালীর দ্বন্দ্ব। গোটা কাহাবপাড়াৰ
 রূপান্তৰটো তাৰ চোখেৰ সামনেই ঘটেছে তিল তিল কৰে। এবং প্রতি মুহূৰ্তেই
 সে তাৰ সঙ্গে দ্বন্দ্ব লিপ্ত। তাই বনোয়াৰী অনেক পূৰ্ণ এবং স্পষ্ট। সমাজ-
 বাস্তবতাৰ সাৰ্থক ব্যৱহাৰে তাৰাশঙ্কৰ বনোয়াৰীৰ নাটকীয়তাকে উপাত্তাসে
 সূত্ৰযুক্ত কৰেছেন। কাহাবপাড়াৰ বটগাছে যখন কুড়ুলেৰ ঘা পড়ে তখন
 বনোয়াৰী ইতিহাসেৰ অনিবাৰ্যতাৰ কাছেই বিধ্বস্ত হয়।

অথচ ইতিহাসেৰ এই অনিবাৰ্যতা হাৰ্ডিৰ অদৃষ্টবাদ নয়, যদিও অদৃষ্টও যেমন
 অপ্ৰতিবোধ্য হাঁহুলিবাঁকেৰ উপকথাৰ কাহাব-পল্লীতে ইতিহাসেৰ প্ৰবেশও
 তেমনি অপ্ৰতিবোধ্য, অন্তত বনোয়াৰীৰ কাছে। তথাপি এটা ইতিহাস বলেই
 —শুধু অদৃষ্টেৰ বিধিকল্প-অন্ধতা নয় বলেই—এ যেমন কাহাবপাড়াৰ পূৰ্বনো
 জীৱনেৰ প্যাটানকে ভাঙে তেমনি কবালীদেৰ নতুন জীৱনকে বচনাও কৰে।
 তাৰাশঙ্কৰেৰ সম্বন্ধে এ-আপত্তি না উঠে পাবে না যে জীৱনেৰ দ্বন্দ্বসম্মত যে
 পুৰাতনেৰ ক্ষয় তাৰ জন্তু বিধুৰতাকে তিনি যতটা আশ্ৰয় কৰেন ততটা তাৰ
 স্বৰূপকে চিনতে চান না। বস্তুৰ অন্তৰ্নিহিত দ্বন্দ্বেৰ ফলে যে সামাজিক অগ্ৰগতিৰ
 জন্ম হয়, এটাকে তাৰাশঙ্কৰ শুধু কথাৰ কথা মনে কৰেন। না কবলে হাঁহুলি-
 বাঁকেৰ উপকথা বনোয়াৰীৰ গল্প না হয়ে কবালীৰ গল্পই হত। এবং এখানেই
 হাৰ্ডিও যে ক্ৰটি তাৰাশঙ্কৰেৰও সেই ক্ৰটি। হাৰ্ডি চৰিত্ৰকে গল্পেৰ কাঠামোৰ
 কাছে সমৰ্পণ কৰেন, তাৰাশঙ্কৰেৰ নাযক-চৰিত্ৰেৰা বলি হয়ে যায তাঁৰ
 নাটকীয়তাৰ কাছে। বনোয়াৰীৰ প্ৰতি পক্ষপাতে যে নাটকীয়তাৰ জন্ম তাৰ
 মধ্যো নাট্যকাৰেৰ নিবাসন্ধি খণ্ডিত - এ সন্দেহ শেষ পৰ্যন্ত নিৰ্মূল হয় না।

এবং এইখানেই তাৰাশঙ্কৰেৰ শিল্পেৰ প্ৰধান অসঙ্গতি। যে যুক্তি পৰম্পৰায়
 ইতিহাসেৰ নতুন ৰূপকে চেনা যায এবং উপাত্তাসে তাকে ব্যৱহাৰ কৰা চলে সে
 ত্ৰাযশঙ্কল। তাৰাশঙ্কৰেৰ চেতনায় খণ্ডিত। এটা তাৰ যে-কোনো নাযক
 চৰিত্ৰেৰ মূল ভিত্তিৰ অসঙ্গতিৰ দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়। জীৱনেৰ পুৰাতন
 বিজ্ঞাসেৰ ছকে ৰূপান্তৰেৰ আঘাত হানবাৰ জন্তুই তাৰাশঙ্কৰেৰ নাযক-চৰিত্ৰ
 ব্যৱহৃত হয়। ৰূপান্তৰেৰ ফলে পুৰাতন ছকে আঘাতেৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বলাব জন্তু
 তাৰাশঙ্কৰ ত্ৰায়তই ব্যস্ত। কিন্তু সে ৰূপান্তৰ সৃজনেৰ মাধ্যম যে মানুষগুলো
 যেমন কবালী, অহীন—তাৰা যেন অনেকটাই ইতিহাসেৰ যন্ত্ৰ। কবালী, অহীন
 বা শিবনাথেৰ প্ৰতিকূল পৰিবেশেৰ সঙ্গে দ্বন্দ্ব বণিত হয়েছে। কিন্তু এদেৰ
 মানসলোকেও যে একটা দ্বন্দ্ব বা টানাপোডেন চলতে পাবে এবং তাৰও একটা

নাট্যকীয় সার্থকতা থাকা সম্ভব—তারাশঙ্কর সে সম্বন্ধে প্রায় উদাসীন। এই 'জগুই হান্সলিবাঁকের উপকথা ও কালিন্দী করালী এবং অহীনেব চেতনার নবজন্মের কাহিনী না হয়ে বনোয়ারী এবং ইন্দ্র বায়ের গল্প হয়ে ওঠে। লেখকের নাট্যাসক্তি শিল্পীর নিবাসক্তিকে ব্যাহত করে, শিল্পবিজ্ঞানে অসঙ্গতি নিয়ে আসে। অহীন কী কবে নিজ জন্মের পরিবেশ ছাড়িয়ে মার্কসবাদী হয়, কবালী দুটো বিয়ে কবতে চাইলে তাব পাপবোধে আঘাত লাগে না কেন, আরতি গান্ধীবাদ গ্রহণ কবে কিসেব ভিত্তিতে, এ-সমস্ত কথার কোনো উত্তর নেই। একমাত্র কবি উপন্যাসেব নায়ক ছাড়া তাবশঙ্কবেব প্রধান নায়কদেব কারো অন্তর্দ্বন্দ্বই যথার্থ প্রত্যয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠেনি। (ইদানীং কালে কতকটা সপ্তপদীৰ কৃষ্ণেন্দু এ-মর্খাদার দাবি কবতে পাবে।) ডোমজীবনেব অন্ধকার পটে নিতাইয়েব ব্যক্তিত্ব বিকাশেব কাহিনীই কবি উপন্যাসেব প্রধান কথা। নিজ সমাজেব কাছে তাব ব্যক্তিজীবনেব সামাজিক দান একটি পরম স্বকীয়তায় মূল্যবান হয়ে উঠুক, এই সুপবিচ্ছন্ন নৈতিক জিজ্ঞাসায় কবিব নায়ক নিতাই বিশিষ্ট। নিতাই তাবশঙ্কবেব সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান পর্যায়েব সৃষ্টি।) যে সমস্ত অবিদ্যেব চবিত্র সৃষ্টিব জগু তাবশঙ্কবেব উত্তরকালেব কাছে নমস্কার হয়ে থাকবেন বনোয়ারী এবং নিতাই তাদেব অন্যতম। অন্যথা তাবশঙ্কবেব মধ্যবিত্ত যুবক নায়কেবা রূপকথাব নায়কেব মতো প্রায়ই অন্তর্দ্বন্দ্বহীন। অথবা অমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব পীড়িত। এই দ্বন্দ্বহীনতাৰ জগুই তাবশঙ্কবেব উপন্যাসেব তরুণ নায়কেবা প্রায়ই সবলীকৃত হয়ে পড়ে। অথচ এবম্বিধ সবলীকরণ উপন্যাসেব নৈতিক শিক্ষাস্তেব পক্ষেই হানিকর হয়ে দেখা দেয়। উপন্যাসেব নৈতিক তাৎপৰ্য তার শিল্পরূপেব সঙ্গেই সংযুক্ত—সেটা নীতিবাগীশতা বা ধর্মবিচরন বিতরণ নয়। যদি তা হয় তবে তা art এব বিচাবে দাঁডায় না। বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই তাবশঙ্কবেব এ-সতর্কতা সংগ্রহ কবতে পাবতেন। এই সবলীকরণেব হাত থেকে শিল্পকে বাঁচাতে গিয়ে তাবশঙ্কবে মাঝে মাঝে নকল বুঁদিব গড সৃষ্টি কবেন। যেখানে শিবনাথের জমিদারিৰ অশুঃসাবশূন্যতায় তাব পত্নীও বিদ্রূপমুখব হয়ে তাকে চাকবি গ্রহণ কবতে বলে সেখানে আব শিবনাথের ঘোড়া বেচে দিয়ে দেশেব জগু কুচ্ছসাধন কবছি তাবার কোনো মানে হয় না—ও তো এমনিই বিক্রি হয়ে যেত। দেবু ঘোষের বাধাটা শুধু এই যে ছিবে ঘোষ অসৎ, তা নইলে তাব কোনো সমস্যা নেই। তেমনি আবোগ্য নিকেতনেব প্রাচীন আয়ুর্বেদ এবং আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানেব দ্বন্দ্বের বাস্তবভিত্তি কোথাও নেই। উত্তরায়ণেব

প্রবীরের সিদ্ধান্তের মর্ম স্বীকার্য এবং আরতির গান্ধীবাদ গ্রহণে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তাঁর বক্তব্যটা হচ্ছে এই যে শ্রেণীসংগ্রামও তো এই প্রকারই হিংসালীলা, অতএব পরিহার্য। এ-সিদ্ধান্ত লেখক নিজ দায়িত্বে আরোপ করেছেন বলেই এটা শিল্প হয়নি। যদিও তারাশঙ্কর নিশ্চয় জানেন যে রেজারেকসনের নায়কের বাইবেলীয় সদাচরণের উপলক্ষিতে পৌঁছনো এ-ক্ষেত্রে একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে সিদ্ধান্তে নেথল্যুডফ পৌঁছল সেটা আমাদের কাছে প্রত্যয় সৃষ্টি করতে পেরেছে। কারণ, যে দীর্ঘ সোপান পথের শেষে সে উক্ত উপলক্ষিতে উপনীত হল সেই সোপানগুলির ক্রম এবং চরিত্রের গ্রায় আমাদের কাছে যুক্ত হয়ে দেখা দেয়। অহীনের মার্কসবাদ গ্রহণ এবং আরতির গান্ধীবাদ গ্রহণে সেই গ্রায় রক্ষিত হয়নি। তাছাড়া নেথল্যুডফের সাহায্যে টলস্টয় যে সমাজ-বাস্তবতার স্বরূপ চিত্রিত করলেন ও তার ব্যাখ্যা দিলেন সেটাও অনুধাবন-যোগ্য। নেথল্যুডফের গল্প শুধু শিবনাথের গল্পের মতো একটা সংলোকের গল্প নয়। নেথল্যুডফ ব্যক্তিগতভাবে সং কাজ করতে চায়, কিন্তু টলস্টয় দেখাচ্ছেন যে, সে যে ভালো কাজের জন্য চেষ্টাও কবতে পাবে তার কাবণ সে নিজে সুবিধাভোগী শ্রেণীর সন্তান। সাধারণের প্রবেশাধিকার এবং ক্ষমতা যেখানে সীমিত নেথল্যুডফ সেখানে নিজ বংশ-মর্যাদার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। এর দ্বারা নেথল্যুডফের চরিত্রের সাধুতা যতটা স্পষ্ট হচ্ছে তার থেকে ঢের বেশি স্পষ্ট হচ্ছে তৎকালীন রুশ জনতার দুর্দশা। এবং সে দুর্দশার পাহাড়প্রমাণ বাধা নেথল্যুডফের শত ভালমানুষ্যিতেও দৃব হচ্ছে না, এটাই নেথল্যুডফের দুঃখ, টলস্টয়ের বক্তব্য। শিবনাথ বা দেবু ঘোষের বেলায় বাধাটা মাত্র শিবনাথের স্ত্রীর বা ছিরে ঘোমের হয়ে ওঠায় সমস্ত ব্যাপারটা ব্যক্তিগত স্বগৃহস্থের স্তরে থেকে গেছে। কাজেই নেথল্যুডফের বাইবেলীয় সদাচরণের পথে সাধারণ মানুষের জীবন স্বীকীরণ—তথা জীবনের বিপুলতার জন্য অনলস প্রয়াস—তারাশঙ্করের নায়কদের অধ্যাত্মসিদ্ধি বা গান্ধীবাদ গ্রহণের থেকে অনেক তাৎপর্যময়।

বরঞ্চ সে-ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যবিত্ত নায়কেরা যথার্থই কালোচিত অন্তর্দ্বন্দ্বের ভারে পীড়িত নায়ক। শশী এবং গাওদিয়ার দ্বন্দ্ব আমাদের উপনিবেশিক মধ্যবিত্ত জীবনের সেই চূড়ান্ত দ্বন্দ্বই প্রকাশিত। শশীর গাওদিয়ার জীবন কলকাতাই নাগরিক জীবনের সব স্মৃতিস্বপ্নকে গলা টিপে ধরতে চায়। উপনিবেশের অসঙ্গতি আর কোন্ নায়ক-চরিত্রে এর বেশি ব্যবহৃত হয়েছে

জানি না। তিরিশের বাংলা দেশের গ্রাম-শহরের সমাজ বাস্তবতার স্বরূপ নির্ণয়ের কাজে শশী সর্বদা স্মরণীয় চরিত্র।

তা বলে আমাদের বলার উদ্দেশ্য কিন্তু এ নয় যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়ে তাবিশঙ্কর হেরে গেছেন (যেমন এর উল্টো কথাটাও আমাদের বলবার নয়)। বরঞ্চ আমাদের সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, সমৃদ্ধ বিষয়বস্তু ও তার ব্যবহারে তাবিশঙ্কর বিশেষ তাৎপৰ্য্যের অধিকারী। বহুকালাগত প্রাচীন ভারতীয় বিশ্বাসকে এ-কালের পটে নবমূল্য প্রদানে (সত্যের জয় অবশ্যজ্ঞাবী), জীবনের সুস্থ স্বভাবকে খোঁজার অক্লান্ত প্রয়াসে বিচিত্র বিশাল জনজীবনকে একটা নৈতিক ব্যাখ্যাদানের চেষ্টায়, তাবিশঙ্কর স্মরণীয়। মহৎ শিল্পের উপাদান জীবন ও জীবনভিত্তিক দর্শন। এ-কথা তাবিশঙ্কর যেখানে যে-পরিমাণে মনে রেখেছেন সেখানে সে-পরিমাণে স্বীয় প্রতিভায় তিনি কালোত্তীর্ণ, যেমন কবি, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা (আনন্দবাজাব পত্রিকায় প্রকাশিত অংশ)। এখানে তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালের বর্ণ-বিস্মল, অভিজ্ঞতার কাববারীদের শিক্ষাস্থল। কখনো কখনো তিনি নিজ অহংবুদ্ধির কাছে শিল্পবুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়েছেন। তিনি নিজে যেটাকে অসংলগ্নভাবে বোঝেন, বা বোঝেন বলে মনে করেন সেটাকে প্রচারের ভিতর দিয়ে শিল্প করে তুলতে চান যেমন আরোগ্য নিকেতন, উত্তরায়ণ প্রভৃতি। এখানেই আমাদের শিল্পগত আপত্তি। আমরা তাবিশঙ্করের সেই শিল্প-সংকটের কথা এবার আলোচনা করব।

●● ছয় ●●

তাবিশঙ্করের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে সুপরিচিত পাঠক সমাজ জানেন যে তাবিশঙ্কর শিল্পজীবনকে এখনো পর্যন্ত দু-ভাগে বিভক্ত করা যায়। একটা ভাগ হাঁসুলিবাঁকের উপকথা পর্যন্ত। আর একটা ভাগ মন্বন্তর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মন্বন্তর হাঁসুলিবাঁকের উপকথার আগে লিখিত হলেও মন্বন্তরে তাঁর সাহিত্যজীবনের রূপান্তরের সূচনা। স্মরণ্য, তাবিশঙ্করের প্রথম যুগের রচনাধারার সঙ্গে দ্বিতীয় যুগের রচনাধারার প্রতিলোম। এ-ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। সরল নায়ক, সহজ পরিবেশ এবং বলিষ্ঠ জীবনবোধ তাবিশঙ্করের প্রথমদিকের রচনার বৈশিষ্ট্য। তাবিশঙ্করের বাগ্‌ভঙ্গিতে যে কথকতার সুর তা এই ক্ষেত্রের উপযুক্ত আঙ্গিকরীতি। তাবিশঙ্কর গল্পকে স্থাপন করতেন গ্রামের পটভূমিতে। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, ক্ষীণমান সামন্ত সূয়ের অন্তরাগ তাঁর

গল্প-উপন্যাসের জগতে এক আলোকরশ্মি বিচ্ছুরণ সম্ভব করেছে যার কথা অবিস্মরণীয়। কিন্তু আত্মসম্বল শিল্পী তখনও তারাশঙ্কর ছিলেন না বলেই এ-কথা উপলব্ধি না কবে পাবেননি যে তাঁর প্রথম পর্যায়ের সাহিত্য সম্ভারের মধ্যে মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী উপন্যাসগুলিতে তিনি একটিও পূর্ণাঙ্গ নায়ক চরিত্র সৃজন কবতে পাবেননি। প্রচলিত অর্থে নায়ক চরিত্র সৃজন কবতে পারেননি। প্রচলিত অর্থে নায়কের যুগলে নাযিকা সৃজনে তাবাশঙ্কর এই পর্যায়ে একেবারেই ব্যর্থ। বরঞ্চ বলা যায় মধ্যবিত্ত পবিসবের বাইবে যেখানে দাঁড়াতে চেয়েছেন সেখানে তাঁর সাফল্য অনেক বেশি মাত্রায় কবতলগত হয়েছে। কবি এবং ইন্সলিবাঁকের উপকথা এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। অবশ্য তাবাশঙ্করের মধ্যবিত্ত নায়ক চরিত্রে সবলীকৃত যন্ত্রণার সবলীকৃত নাটক ববাবব সহজলভ্য। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির যন্ত্রণাকে তার মনোময় সত্তার গভীবে তিনি নিয়ে যেতে পারেননি। শিবনাথের সমস্তা না সামন্ত সৎকটেব, না দাম্পত্য জীবনেব, না ব্যক্তিব উপলব্ধিব। অথচ সব কিছুবই সম্ভাবনা এ-ক্ষেত্রে ছিল। অহীনেব কাছে কালিন্দীব চব সমাজতন্ত্বেব পাতা। নাটকটা ববঞ্চ ইন্দ্র বায় এবং বামেশ্ববকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। দেবু ঘোষকে তাবাশঙ্কর বলেছেন যে সে বুদ্ধি সম্বন্ধে সচেতন, খানিকটা স্বাৰ্পণ। “বিগা অবশ্য বেশি নহে, কিন্তু দেবু সেইটুকুকেই যথেষ্ট মনে করে। এ-গ্রামে তাহাব সমকক্ষ বিদ্বান ব্যক্তি বাহাবেও তো সে দেখিতে পায না।” “তাহাব ধাবণা গ্রামেব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে। ব্যক্তিত্বেব সম্মান তাহাব প্রাপ্য। অবগ্যানীব শিশুশাল সেমন বগ্ন লতাব দুৰ্ভেগ্ন জাল ভেদ কবিযা সকলেব উপব মাথা তুলিতে চায, তেমনি উদ্ধত বিক্রমে সে এতদিন গ্রামেব সকলেব সঙ্গে যুদ্ধ কবিযা আসিযাছে। তবে সে একা আলোক ভোগেব জগ্ৰই উৰ্বলোকে উঠিতে চায না, নিচেব লতাগুলি তাহাকেই অবলম্বন কবিযা তাহাব সঙ্গে আলোক বাজ্যেব অভিযানে চলুক—এই তাহাব আকাজক্ষা” কিন্তু সে নিজেব গ্রামখানিকে ভালবাসে। স্বভাবতই লেখকেব চিন্তায এই যে মানুষেব কাঠামোটি ধৃত হয়েছিল তা একটা পুৰোদন্তব উচ্চাভিলাষী গ্রামীণ মানুষেব কাঠামো। কিন্তু লেখকেব কল্পনায যে এই মানুষটি একেবারেই ধবা দেযনি পূর্ণাঙ্গ দেবু ঘোষ চরিত্রটি তাব নিদর্শন। প্রতিযোগিতাপবায়ণ ব্যক্তিব সে পট নয গণদেবতা বা পঞ্চগ্রাম, সে জটিল মনেব আধাবও নয দেবু ঘোষেব স্তখে বিগতস্পৃহ এবং দুঃখে অল্পদ্বিগ্ন সবল বিনীত চরিত্রটি। ববঞ্চ প্রথম অধ্যায়ে ছিৰু ঘোষ লেখকেব নায়কেব প্রতিশ্রুতি থেকে কিছুটা ঋণ গ্রহণ কবে নিজ গ্ৰায়ে বিশিষ্ট হয়েছে।

অথচ এই উদ্ধৃত অংশটুকু পরিহার করে দেবু ঘোষকে উপস্থাপিত করলে দেবুর গ্রাম্য পণ্ডিতের সহজ মর্যাদা-সচেতন চরিত্রের কোনো ক্ষতিই হত না। সম্ভবত লেখক মনে করেছেন যে দেবুর জীবনে ব্যক্তিস্বরূপের অন্তর্নিহিত একটা সংঘাত এবং দ্বন্দ্বের সাহায্য নিলে দেবুকে রূপায়িত করা যাবে নতুন কালের তাৎপর্যে। কিন্তু এই হিসাবী চিন্তা উপন্যাসস্থ হতে পারেনি।

অথচ তারানকরের নাট্যরস প্রবণতায় এই বিষয়টা অন্তত স্বচ্ছ যে, সত্তার গভীরে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কোনো যন্ত্রণা ব্যতিবেকে নাথকের ব্যক্তিস্বরূপকে স্পষ্টরেখ করে তোলা যাবে না। এ-ধরনের একটা বোধ তাঁর মধ্যে স্বতঃই উপস্থিত। উপন্যাসের নিজ নিয়মে দেবু পণ্ডিত বেঁচে গেলেও আরোগ্য নিকেতনের জীবন মশাইকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। জীবন মশাইয়ের অস্তিত্বের আলোড়িত রূপ সৃজনে লেখকের ব্যর্থতা উপন্যাসে দু-ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এক, দ্বন্দ্বটা কাল-কালান্তরের রূপক নির্মাণ করতে পারেনি, যা পেবেছে তা হল অ্যালোপাথি বনাম আয়ুর্বেদের ঝগড়া। ফলে মৃত্যুকে নিয়ে মিথ্ সৃজন জীবন মশাইয়ের ব্যক্তিজীবনের অনিবার্য সূত্রে গ্রথিত হয়নি। দুই, এই অসম্মতি তারানকরের দৃষ্টি এডায়নি বলেই তিনি জীবন মশাইয়ের ব্যক্তি জীবনের প্রথম-প্রেমেব ব্যাপাবটির শেষ অধ্যায়ে প্রত্যাবর্তন ঘটিয়ে জীবন-বৃত্তের বিষয় সম্বন্ধে, মাযামুক্তি বা মোহচ্ছেদ সম্পর্কে আমাদের সচেতন কবতে চেয়েছেন। আরোগ্য নিকেতনে অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস প্রাধান্য পেয়েছে এটা উপন্যাসটির আংশিক ত্রুটি। এব মূলীভূত কারণটি অনুসন্ধান। চরিত্রের বিশ্বাস বৈজ্ঞানিক বা অবৈজ্ঞানিক দুইই হতে পারে। প্রশ্ন সেখানে নয়। প্রশ্ন এইখানে যে, যে-জীবন মশাই জীবনবহন ও মৃত্যুরহন দুটিকে জানেন, এবং দুজোঁয় শক্তিকে জানেন—তিনি শুধু লেখকের উপলব্ধির দায় বহন করেই ক্ষান্ত হলেন, না, উপন্যাসের আকাশ বাতাস মৃত্তিকা এবং আবহাওয়া থেকে কিছু রক্তমাংস সংগ্রহ করে জীবিতকল্প হলেন? শেষোক্ত প্রশ্নে আমাদের উত্তর—‘না’। জীবন মশাইয়ের জীবন সম্বন্ধে অসামান্য স্নিগ্ধবোধ, নিরুদ্বিগ্নতা এবং শান্ত-ভাবের সঞ্জীবনেব জ্ঞান উপন্যাসের বিষয়ভূমি থেকে কোনো সহায়তা না থাকায় জীবন মশাই কতকগুলি নিবাসয়ের হেতু হয়ে রইলেন শেষ পর্যন্ত। জীবনের ভ্রমে এবং স্থলনে, উত্থানে ও পতনে যে নিবাসয়ের সম্ভাবনা নিহিত সেই awareness of the possibilities of life উপন্যাসে শিল্পোজ্জ্বল হয়ে উঠল না। অথচ কবি উপন্যাসে নিতাইয়ের শেষ উত্তরণকে জীবন ও পৃথিবীর কূলে এমন ভাবে স্থাপিত করা হয়েছিল যে সেখানে সৃজিত ব্যক্তিস্বরূপের নিজস্ব

স্বায়েই তাকে মনে হয়েছে জীবন এবং শিল্পের অগ্নিপরীক্ষার উত্তীর্ণ। নিতাইয়ের যন্ত্রণা, প্রেম, অভীক্ষা সমস্তই উপন্যাসের শিল্পময় আধারকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। পক্ষান্তরে সে নিজেও প্রাণবায়ু সংগ্রহ করেছে উপন্যাসের পটভূত পরিমণ্ডল থেকে। কিন্তু তারশঙ্করের অপর মূল্যবান সৃষ্টি হ'ল সুলিষাকের উপকথার নায়ক চরিত্রের পরিকল্পনায় পুনরায় অসঙ্গতির দেখা মেলে। করালী যদি মাত্র নবকালের প্রতীক হয় তা হলে করালীর একটা ব্যাখ্যা হয়তো দাঁড় করানো চলে। কিন্তু উপন্যাস তো প্রতীকী বাচনরীতির বা আঙ্গিকরীতির উপযুক্ত নীলাভূমি নয়। তাই এখানে চরিত্রের পরিভাষায় লেখক তাঁর জীবন-বিষয়ক বক্তব্যকে ব্যক্ত করলেও সাংকেতিক নাট্যরীতি নিশ্চয় এখানে চলে না। করালীর প্রথম উপস্থাপনায় নিঃসন্দেহে সে নায়ক। সর্প-নিধনের তাৎপর্যে এ-কথার বড়ো সাক্ষ্য মিলবে। কিন্তু ধীরে ধীরে দেখা গেল যে করালী একটা অন্ধ আবেগ ছাড়া কিছু নয়। সে নবকালকে ধারণ করে নেই। নবকালই তাকে ধারণ করে আছে। তার প্রয়াসের কোনো শুদ্ধতা নেই। যে রূপকথার নায়কের মতো কাহারপাড়ার আঁধার দৈত্যকে হনন করেছিল সে ধীরে ধীরে শুধু কাহারপাড়াকে আঘাত করার একটা যন্ত্রে পরিণত হল। অতঃপর বনোয়ারীর প্রাধান্য আর আতিশয্য ছাড়া উপন্যাসকে বাঁচানোর আব কোনো উপায় ছিল না। উপন্যাসটি হয়ে উঠল বনোয়ারীর গল্প। বনোয়ারীর বেদনা তারশঙ্করের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলির অগ্রতম হলেও বনোয়ারীকে তিনি নায়ক কবতে পারেননি তাঁর সামাজিক বুদ্ধির তাগিদেই। অথচ তারশঙ্করের দীর্ঘ সাহিত্যকীর্তিতে নিতাই ছাড়া তখনও পর্যন্ত কোনো নায়ক নেই।

এই অবস্থায় তিনি মুখ ফেবালেন কলিকাতা-কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত জীবনের দিকে। যে জটিলতা, যে দ্বন্দ্ব, যে বার্থতাবোধ তাঁর গ্রামীণ মধ্যবিত্ত নায়কদের ক্ষেত্রে তিনি কল্পনায় আনতে পারেন না, নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-কালীন দীর্ঘতার পর, তাবাশঙ্কর ভাবলেন, সেটা কলকাতায় হবে সহজলভ্য। মন্বন্তরে তাঁর সেই চেষ্টার প্রথম প্রকাশ। অথচ মন্বন্তর উপন্যাসেব নায়ক কানাইয়ের যন্ত্রণায় মধ্যবিত্ত মানুষের সর্বাঙ্গীণ জটিলতাব কোনো সাক্ষ্য নেই। যেটা কানাইয়ের যন্ত্রণাব প্রধান সূত্র সেটা হল বংশগত বক্তধারা, যা তার মধ্যে প্রবহমান তার শুদ্ধি-অশুদ্ধির ব্যাপার। নগর-জীবনকে গভীর মনোনিবেশে তারশঙ্কর ধরেননি কোথাও। নগর পটভূমি হিসাবেও অপরিহার্য হয়ে ওঠেনি। তাঁর প্রয়োজন ছিল দ্বন্দ্বময় নায়ক। সুতরাং তারই সন্ধানে তিনি ব্যস্ত। এই

হৃদয়ের উৎসৰূপে তিনি জীবনের গভীরে যাবার চেষ্টা করেননি। চেষ্টা কবেছেন জীবনের সংবাদে যাবার। জাবজ কিনা, বংশের বক্তৃধাবায় শুদ্ধতা কোথায়, এই সমস্ত ব্যাপার তাবশঙ্কবের কাছে নাযকের সমস্তা হিসাবে দেখা দিয়েছে। বলা বাহুল্য এব জন্ত নগবপটের কোনো অপবিহার্যতা নেই। কৃষ্ণেন্দুকে কলকাতাতেই ববং বেমানান মনে হয়েছে। বাঁকুডাব রক্ষ পবিবেশে এই স্নিগ্ধ মানুযটি চমৎকাব বৈপবীতা সৃজন কবেছে। কিন্তু ওদিকে অকাবণে বিণা-ব্রাউনের জন্মবহস্য কতকগুলি বডো বডো গ্রন্থি সৃজন কবে বডো গল্পকে উপন্যাসে রূপান্তবিত কবেছে। ‘বলো আমাব পিতা কে’ অথবা নাযক জাবজ কিনা এ-গ্রন্থের নিজস্ব জোব এত বেশি যে একটি ব্যক্তিস্বরূপেব বহুলাংশই এই জিজ্ঞাসাচিহ্নের ধাক্কায হাবিযে যায়। এব পবে যা জেগে থাকে তা হল লণ্ঠনের পলতেকে শেষ বিন্দুতে পৌঁছে দিলে যে ধুমেল শিখা জলে ওঠে, যাব মধো অন্ধকাব বেশি, তাবই মতো অবসিক কৌতুহল। এ কিছুতেই বসসৃজন নয়। ১৩৬৭ সালের শাবদীয় উন্টোবথে প্রকাশিত তাবশঙ্কবের উপন্যাস বিপাশা-র কথা উল্লেখ কবা যায়। বিপাশার নাযকের সমস্তাও এই ব্যক্তিগতরূপে নিবিশেষেব তাংপয বহিত। গোটা ভাবতবর্গকে পটভূমি কবে তুলতে গিযে পাঙাব থেকে দিল্লী হয়ে কলকাতা এব সেথান থেকে আবার এলাহাবাদে এই উপন্যাসেব ঘটনাক্রম বিস্তৃত। শিখ, খ্রীষ্টান, আদিবাসী সবই এব সদাই এথানে উপস্থিত শুধু একটি উদ্দেশ্যহীন পবিসমাপ্তিকে গড়ে তোলাব জন্ত। কৃত্রিম নাটক, মেরিক আবেগ এব প্রচুর আবেগময বাক্যবাণিব সমাবেশে তাবশঙ্কব মধ্যবিত্ত নাযকের দন্দময রূপ সৃজনের নাম ববে যা কবেছেন তাব মন্যে আশ্চযভাবে এ-যুগেব সাহিত্যেব অধিকাংশের ক্ষেত্রে অন্তত অবক্ষণেব লক্ষণ উপস্থিত। সেগুলি এই

(ক) যা তাব ছিল—সেই বৃহৎ অর্থে জীবন এব সভ্যতা সক্ষমে আগ্রহ তাব নেই।

(খ) তিনিও এতদিন বাদে ঘটনা-সাবালো, ঘটনা-ধাবালো ও ঘটনা-ভাবালো উপন্যাস লিখতে চাইছেন।

(গ) জীবনের সমস্তা বলতে তাঁব কোনো প্রয়াস নেই। তাব চেয়ে ব্যস্ত তিনি জীবনের বহস্ত বলতে। আব বহস্ত বলতে তিনি বুঝেছেন ‘নফর স’কীতনের’ মতো গল্প।

নগব জীবনে নাযক খুঁজতে এসে তাবশঙ্কব যেন শিল্প বিসর্জন দিতে বসেছেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

•• এক ••

তিরিশের কালে প্রকৃতি চেতনার জন্ম চিহ্নিত দুজন শিল্পীর খ্যাতি এখন প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। এঁদের একজন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপরজন জীবনানন্দ দাশ। বিভূতিভূষণ এবং জীবনানন্দের মধ্যে প্রকৃতি সাধারণ উপকরণ এ-কথা কিন্তু একান্ত প্রাথমিক সত্য। উভয়ের ব্যক্তিস্বরূপের বিশেষ বিচারে, প্রকবণের স্বতন্ত্র মহিমায় দুই তাৎপর্যের সূচক দুজনে এ-কথাই শেষ সত্য। জীবনানন্দের মন সচেতনভাবে আধুনিক বলেই মর্মশায়ী পীড়া সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ অনুভূতি তাঁর প্রেরণায় ক্রিয়াশীল। জীবনানন্দের বিখ্যাত প্রতীক রূপকে, হেমন্তের অনুষঙ্গেব পৌনঃপুনিকতায় জীবনের সেই পীড়াক্লান্ত অনুভূতির প্রকাশ স্পষ্ট। যদিও শেষ দিকে মানুষের প্রেমে এই পীড়ামুক্তির সাস্থনা কবি প্রত্যয়কে আকর্ষণ কবেছে, তথাপি ‘পৃথিবীর গভীরতর অস্থখ’—এই বোধই কবি জীবনানন্দের ভাবভূমির মূল আবহাওয়া। নিঃসন্দেহেই বিভূতিবাবু জীবনানন্দের নিজস্ব সংজ্ঞানুসারে সভ্যতা-সচেতন নন। সংকটাপন্ন সভ্যতার আর্তি তাঁর মানসের সৃজনীকৃতির চেতন অংশটুকুকে অধিকৃত কবেনি। সেই জগ্রেই বিভূতিভূষণ এমন এক স্বাস্থ্য-মনস্কতা রচনা কবেছিলেন যার ফলে তিনি না হলেন পল্লীপ্রীত কুমুদরঞ্জন, না হলেন সংকট-বিধুব জীবনানন্দ। সাস্থনা আর উজ্জীবনেব মধ্যে প্রেরণাগত উৎস একই—ব্যাধিই উভয়ের উৎস, কিন্তু উভয়ের পরিণতিতে দুই মানস-দৃষ্টির কথা ওঠে বলেই উভয়ে পৃথক পথগামী।

নইলে, এ-জিজ্ঞাসার উত্তর মিলবে কোথায় যে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের গ্রাম প্রকৃতির পর বিভূতিবাবুর প্রকৃতি-দৃষ্টির বিশিষ্টতা কোন্ খানে? তিবিশেব যন্ত্রণাও যত তিরিশেব প্রেরণাও তত। এই দ্বৈতে সেই বিশিষ্টতা অনুসন্ধেয়। তিরিশের যন্ত্রণা অর্থনৈতিক সংকটে, আমাদের বেকার সমস্রায়, জাতীয় আন্দোলনের মন্ববতায় এবং মধ্যবিত্ত জীবন মূললগ্ন যুক্তিকাব বিশুদ্ধ বিদীর্ণতায়। তিরিশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার প্রেরণা এ-দেশে অনুভূত হয়েছে জিজ্ঞাসার তীব্রতায়। মার্কস এবং ফ্রয়েড জট পাকিয়ে গেলেও সে প্রেরণা অনুভূত হয়েছে জীবনের দ্বন্দ্বময় অথচ ব্যাপ্ত গভীর রূপ-কে উপলব্ধির প্রয়াসে। জীবন সম্বন্ধে নির্মোহ আগ্রহ উপন্যাস শিল্পের মূলে। ইতোপূর্বে ব্যক্তি সম্বন্ধে আগ্রহী বাংলা উপন্যাসে ব্যাপক জীবন সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ এত সমগ্রতা নিয়ে একটা

যুগ সৃষ্টি করেনি। হয়তো স্বদেশ-জিজ্ঞাসা এবং জীবন-জিজ্ঞাসা তিরিশের দশকের শুভলগ্নে মিলিত হতে পেরেছিল বলেই জীবনের সংলগ্নতা এ-যুগের প্রধান উপন্যাস-লক্ষণ হয়ে উঠেছিল। বিভূতিভূষণের উপন্যাস বিচারকালে এ-কথাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

•• দুই ••

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-চেতনায় নিঃসন্দেহে কবির মর্ত্য-প্ৰীতির প্রকাশ। অস্তুত কবিজীবনের শেষ পর্যায়ে কবির প্রকৃতি-চেতনা মর্ত্য-প্ৰীতিরই নামান্তর। প্রকৃতি তখন আর সোনার তরী-চিত্রা-পর্যায়ের কবির সৌন্দর্য সাধনার সহায়ক মাত্র নয়, বা পরবর্তী পর্যায়ের অরূপ সাধনাব অঙ্গ নয়। সহজ জীবন-প্ৰীতিতেই প্রকৃতি তখন আকর্ষিত হয়েছে—জীবনের অমেয় সম্ভাবনার বাহক হিসাবে। সেই ভাবে দেখতে গেলে বলা যায় যে বিভূতিবাবুর কোনো সঠিক সংজ্ঞানিবদ্ধ প্রকৃতি-দৃষ্টি নেই। প্রকৃতি তাঁর কাছে জীবনের অংশ রূপে প্রতিভাত। সুতরাং জীবন সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কী এই ব্যাখ্যাতেই তাঁর প্রকৃতি-চেতনাও ব্যাখ্যাত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ যে ক্ষেত্রে কবির আবেগে প্রকৃতিকে অনুরঞ্জিত করেছেন, ব্যাখ্যা কবেছেন, যে ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি কবির দৃষ্টি, সে-ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণের দৃষ্টি কোতূহলীর দৃষ্টি। যে দীপ্ত আগ্রহে জীন্স সাহেবের বিশ্ববহুশ্রেণী সম্মুখে বিস্ময়াভিভূতি, বিভূতিভূষণের কোতূহলের সঙ্গে তার সাদৃশ্য বন্ধ লক্ষণীয়। অর্থাৎ বিজ্ঞানীর জানবার পিপাসার সঙ্গে কবির আবেগ সেখানে যুক্ত। পথের পাচালিতে যে ছেলেটি বারে বারে তার পিতাকে এটা কী ওটা কী বলে ব্যস্ত কবেছিল, অথবা আবণ্যকে যে ভদ্রলোক এত কিছু আছে জানতাম না বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এরা দুজনেই জীবনের সম্মুখে প্রবল কোতূহলের লক্ষণে চিহ্নিত। এই বিশ্ববোধের ব্যাপার উপন্যাসে বিভূতিভূষণের দান। প্রথম দৃষ্টিতে বিভূতিভূষণকে কবি বলে ব্যাখ্যা সমাপ্ত করলে তাঁকে সমগ্রভাবে পাওয়া যায় না। অসীম গ্রহ নক্ষত্রের জগৎ, গাছ লতা পাতা, নদী নালা বিধূত যে জীবন আমরা যাপন করি অথচ বিস্মৃত থাকি, বিভূতিভূষণ সেই বিস্মৃতিকে পূরণ করে পূর্ণ বৃত্ত রচনা করতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতি এই সূত্রেই বিভূতিবাবুর কল্পনার সঙ্গে প্রসঙ্গবদ্ধ। বিভূতিভূষণের এই জীবনদৃষ্টি কতখানি শিল্প-প্রযুক্ত, কতখানি নয়, তাঁর আরণ্যক গ্রন্থখানির সাহায্যে সে-কথা আমরা বর্তমান প্রবন্ধে বোঝার চেষ্টা করব।

আরণ্যক গ্রন্থখানির এ-প্রসঙ্গে নির্বাচনের কারণ বিজ্ঞমান। লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনাই যে সর্বদা তাঁর সমালোচনা প্রসঙ্গে যোগ্য গ্রন্থ এমন নাও হতে পারে। যে রচনায় লেখককে তাঁর শক্তি এবং দুর্বলতা-সমেত ধরা যায় লেখকের সমগ্রতা বিচারে সেটাই তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ। পথের পাঁচালি সর্বোত্তম হলেও আরণ্যক এ-হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ রচনা। বিভূতিবাবুর শক্তির প্রকাশ এবং ব্যত্যয় দুইই এখানে বিজ্ঞমান।

আমরা জানি যে বিভূতিবাবুর প্রধান ক্ষমতা এই যে তিনি তাঁর জগৎ রচনা করেন এমনভাবে যেখানে বিশ্বাস্ততা বা অবিশ্বাস্ততার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এমন কি বিশ্বাস্ত হবার জন্যও তাঁর বিন্দুমাত্র ব্যাস্ততা নেই। তিনি প্রমাণ-প্রয়োগ করেন না, কেবল যা দেখেছেন তাই আমাদের বলতে চান। এর বিপরীতাচরণ তাঁর স্বধর্ম নয়। সেই কারণে দৃষ্টি প্রদীপের সাংসারিক রূঢ়তা বিভূতিবাবুর হাতে রূঢ়তার তালিকা প্রণয়ন হয়ে গেছে—মাঝে মাঝে অপ্রাকৃত দৃষ্টিশক্তির আলোকে যে রূঢ়তা-জনিত রসভাসকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়নি। বরঞ্চ সে ক্ষেত্রে ইন্দির ঠাকরুণের প্রতি সর্বজয়ার নিষ্ঠুরতা প্রায় জীবনসংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও, নিশ্চিন্দপুরের স্বপ্নদাত্রী পরিবেশে তাকে বেমানান ঠেকেনি। শুকনো পাতা গাছ থেকে ঝরে যায় যে স্বাভাবিকতায় ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যুও তাদৃশ। সর্বজয়ার সংকীর্ণতা এ-ক্ষেত্রে যে বিরাট প্রাণি প্রকৃতি-বেগ উপন্যাসের প্রধান স্রোত তারই অংশ। দৃষ্টি প্রদীপে এমনটা ঘটেনি। (যে সরল বলিষ্ঠতায় লেখক পথের পাঁচালির বিশাল প্রকৃতি পটকে এঁকেছেন, ইন্দির ঠাকরুণ ও সর্বজয়ার ক্ষেত্রে সে-কল্পনাকে অকস্মাৎ রূঢ় পৃথিবীর সংস্পর্শে এসে সংযত হতে হয়নি। এই পদ্ধতিতেই লেখকের জীবন-প্রত্যয় শিল্পমাধ্যমে সহৃদয়ের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়।)

আরণ্যকেও দেখা যায় বিভূতিবাবুর মূল বক্তব্যের বীজ-রূপে পথের পাঁচালি দৃষ্টি প্রদীপের সাদৃশ্য বর্তমান। এই তিন ক্ষেত্রেই মূল বিষয় হল—স্বপ্নের জগৎটা হারিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। জগৎটাকে বিভূতিবাবু এত বেশি বিশ্বাস করতেন যে তার কথা বলতেই তিনি তদুগত থাকতেন। জগৎটা ভেঙে যাওয়া, তাঁর কাছে প্রিয় বিয়োগের মতো এত নিবিড়ানুভূতির ঘটনা যে বিচ্ছেদের বেদনাটাই শেষ পর্যন্ত প্রধান হয়ে ওঠে। বিয়োগের অহেতুক বিশ্লেষণ তিনি করেন না। নায়ক-নায়িকার চেতনার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বহীনতার যে অভিযোগ বিভূতিভূষণ প্রসঙ্গে উত্থাপিত হয় তার মূল এইখানেই নির্দেশ করা যায়। সেদিক থেকে প্রথম দৃষ্টিতে

আবণ্যকের ক্রটি অনেক। ধাতুতাল সাহস মহাজনী, রাসবিহারী সিং-এর জমিদারি, গাঙোতা এবং রাজপুতদের দাঙ্গা অবণ্যের আদিম পটভূমিকা বিনাশের সঙ্গে নিবিড় ভাবে গ্রস্থিনিবদ্ধ হলে আবণ্যক অণু ধরনের সৃষ্টি হত। অবশ্যই যে তাৎপর্যে আবণ্যক এখন অনন্ত, সে অনন্ততা তখন তার থাকত না।

দেখা যাক বিভূতিবাবু কী কী পরিহার করেছেন। প্রথম, জমিবিলির ফলে আবণ্যক জীবনের পটে যে অর্থনৈতিক সূত্র সম্বন্ধ সমাজ জীবনের প্রাথমিক আবির্ভাব ঘটল তার কোনো পরিচয় লেখক দেননি। দ্বিতীয়, তিনি জীবনের ও জীবিকার যুক্তিবাদ কোনো স্বরূপ সঙ্কানের প্রয়াসী হননি। তৃতীয়, অবণ্য মণ্ডলের রূপ নির্মাণে বর্ষা বা ঝড়কে আদর্শেই ব্যবহার করেননি। ওপরে কথিত এই তিনটি সূত্র থেকে একটা কথা স্পষ্ট যে বিভূতিবাবু জীবনের সংঘাত-দ্বন্দ্বের ব্যাপারটিকে প্রশ্ন দিতে চান না। যেখানেই জীবনের নিষ্ঠুর নখরদন্তকে তিনি প্রত্যক্ষ কবেছেন, সেখানেই ডেকে এনেছেন অনন্ত জীবনরহস্যকে, বিস্মৃতি সৃজনের জন্ত ততটা নয়, যতটা জীবনের ছোট বড়ো ভালো-মন্দ প্রভৃতির অতীত একটা রূপক সৃজনের জন্ত। আবণ্যক উপন্যাসে ঘন ঘন ব্যবহৃত জোৎস্না রাত্রির ব্যবহার এই তাৎপর্যেই বুঝতে হবে। যা আছে, বা যা বিভূতিবাবু ব্যবহার করেছেন তাও এ-প্রসঙ্গে গণনীয়। এই পরিহার ও ব্যবহারের মধ্যেই তাঁর জীবনদৃষ্টির কথঞ্চিৎ পরিচয় মিলবে। বিষয়বস্তুর ব্যবহারের প্রসঙ্গে আবণ্যকের এই তিনটি বিশিষ্টতা স্মরণীয়। প্রথম যার অভিভূত কবাব ক্ষমতা বেশি প্রকৃতির ভিতর থেকে তাকেই নির্বাচিত করা হয়েছে ঘন ঘন। ছায়াহীন জোৎস্না রাত্রি এবং ছায়াহীন নির্জন দুপুরের পৌনঃপুনিক ব্যবহার এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। দাবানলে যতটা আকস্মিকতা, বর্ণনাক্ষেত্রে ততটা ক্ষততা দাবানলের ঈঙ্গিত ফলশ্রুতি আনয়ন করেনি। দ্বিতীয়, অতি-প্রাকৃতের ব্যবহার। অতি-প্রাকৃতের দিকে ঝোক পথের পাঁচালিতে অস্পষ্ট, দৃষ্টি প্রদীপে স্পষ্ট। আবণ্যকের আবণ্য-আদিম পরিবেশে এর সুসার্থক প্রয়োগ লক্ষণীয়। বোমাই নুরুর জঙ্গল কাহিনী এবং মহিষের দেবতা টাঁরবারোর গল্প উপন্যাসের সমগ্রতার সঙ্গে অভেদ সম্পর্কে গ্রথিত। তৃতীয়, এই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের অধিকাংশই জীবিকা-সংলগ্ন মানুষ নয়। কুস্তা এবং নাকছেদীর পরিবার ব্যতীত প্রায় সকলের সম্বন্ধেই এ-কথা প্রযোজ্য। রাজু পাড়ে ভক্ত কবি এবং দার্শনিক, যুগলপ্রসাদ জঙ্গলে গাছ লাগায়, বেক্টেশ্বর কবি, ধাতুরিয়া নাচে, মটুক নাথ টোলার পণ্ডিত। রাজু পাড়ে এবং যুগলপ্রসাদ লেখককে

যে আকৃষ্ট কবেছে অধিক পরিমাণে তাবও প্রমাণাতাব নেই। একান্ত সহজ কীর্তিহীন মানুষগুলিই লেখকের উপাদান।

.. তিন ..

স্বভাবতই লেখকের এই মনোভঙ্গির মধ্যে দেখা যাচ্ছে এমন অনেক কিছু রয়েছে যাদের উপন্যাসস্থ হবার তথাকথিত যোগ্যতা অল্প। জীবনের দৃষ্টিকে এড়িয়ে, ব্যক্তির পট-ধৃত জীবনের ঘটনাকে পবিহার করে বিভূতিভূষণ কীভাবে আবগ্যককে শিল্পভাতি দান করলেন সেটাই শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন। সেই শক্তিবহস্ত অনুসন্ধান করতে হবে শিল্পীর মানসিক স্বাস্থ্য, যা বচনাতে সঞ্চারিত হয়েছে, সমস্ত দুর্বলতাকে গ্রাস কবেছে এবং উপন্যাসে এনেছে অটুট পূর্ণতা। বিভূতিভূষণের স্বদেশ ভূমি সম্বন্ধে আগ্রহ নিঃসন্দেহে তিবিশেষ জীবন-সন্ধানী ব্যাপকতার দান। কিন্তু যেহেতু বিভূতিবাবুর মন কিছুতে আবিষ্ট নয় এবং তাঁর বিশ্বপরিচয়-পিপাসা একান্ত ভাবেই জীবনের ক্ষুধা, সেইহেতু সমস্ত ব্যাপাবটাকে একটা প্যাটার্নের মধ্যে নিয়ে আসা লেখকের পক্ষে অসম্ভব হয়নি। দু-ভাবে আবগ্যকের উপন্যাস-প্রকৃতির বিকৃতি ঘটতে পাবত। এক হতে পাবত লেখকের প্রাচীন ভাবতের তপোবনের ঐতিহ্যবোধ অতিমাত্রায় প্রকট হয়ে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার মুহূর্ত তাগিদে উপন্যাসটির ছন্দোভঙ্গ। আর হতে পাবত ইওবোপীয় ভ্রমণবীবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জীবনের দুবন্তরূপ সন্ধানী বচন। আবগ্যক এ-দুয়ের কোনোটাই নয়। বিস্তৃত উপন্যাসে কোথাও ঋমিকীর্তির কথা স্মরণ করিয়ে অবগ্যভূমিকে পুত করার চেষ্টা লক্ষিত হয়নি। আধুনিক বাংলা হিমালয় ভ্রমণের বর্ণনায় যেমন পদে পদে মৃত্যু বল্লনার আতিশয্য—এ-ক্ষেত্রে তাব সাহায্য পাঠককে শিহবিত করার চেষ্টাও কোথাও নেই।

এইভাবে সর্ববিধ সংস্কার-বিমুক্তির ফলেই আবগ্যকের মানুষগুলিও উপন্যাসের মৃত্তিকার সঙ্গে অবগ্যানীর মতোই দৃঢ়-বল্ল। ধাওতাল সাহুর কথা প্রথমে ধরা যায়। ধাওতাল সাহু কুসীদজীবী—অর্থনীতির পবিভাষায় Indigenous Banker-এর পর্যায়ে সে পড়ে। ধাওতাল সাহু লক্ষপতি, কিন্তু অনাড়ম্বর এবং বিশ্বাসবান ব্যক্তি। এ-ধবনের গ্রামীণ মহাজন আমবা দেখিনি—বাংলা উপন্যাসে তো নয়ই। কিন্তু বিভূতিবাবু তাকে প্রত্যয়সিদ্ধ করলেন কী প্রকারে? তাব উত্তর এই যে উপন্যাসের ন্যায় শৃঙ্খলে তাকে লেখক আশ্চর্যভাবে বেঁধেছেন বলে। এই উপন্যাসের আবহাওয়াব নিয়মেই সে হয়েছে সত্য। এখানে যদি কুটিল এবং

কুচক্রী এক মহাজনের আধুনিক লোভাৰ্ত্ত যুতি লেখক গড়ে তুলতে চাইতেন তাহলে আৱণ্যকেব সহজ বলিষ্ঠ পটভূমি স্থাপনা মিথ্যা হয়ে যেত। যেমন অক্লেশে ধাওতাল সাহু তামাদি হ্যাণ্ডনোটগুলি ছিঁড়ে ফেলে, তেমনি অক্লেশে কলেবায় মানুষগুলো মবে, তেমনি অবলীলায় গাছে গাছে বসন্তে ফুল ধরে, গরমে শুকিয়ে যায়। টাকা বসিয়ে বাখা যায় না তাই তাকে খাটাতে হয়। এ-ছাড়া তাব কোনো অভিলাষ নেই। নিবভিলাষ অবণ্যেব মতো, নিরভিমান ধাওতাল সাহু সত্য। ঠিক এই নিয়মেই বাসবিহাবী সিংও সত্য। সে বগ্ন প্রাচুৰ্য এবং বগ্ন উদামতা নিয়ে অবণ্যেব হিংস্রতাৰ স্মাবক হয়ে বইল। তাব বাডিতে লেখককে প্রদত্ত আহাৰ্যখালীতে ‘হাতিব কানেব মতো বডো বডো পুৰী’ব কথা আমবা পড়েছি। বাসবিহাবী সিং-এব স্মৃতিতে মদমত্ত হাতিব প্রসঙ্গ সৰ্বদা উপযুক্ত। এবং এইভাবে বলতে বলতে বিভূতিবাবু আৱণ্যকেব মানব-জীবনেব একটা কপ শেষ পযন্ত বিগ্ৰাসেব মধ্যে আনতে পেবেছেন। একাধিক-বাব লেখক বলেছেন এ-দেশেব মানুষ বডো নিষ্ঠুৰ, তাদেব দয়ামায় নেই। কিন্তু ধাওতাল সাহু এই দয়ামাহীন জীবনেব মধ্যেই বিচুমান। কিন্তু এব মধ্যে বাস্তবিক কোনো বিবোধ নেই। কলেবায় মানুষ মবে—এ-ঘটনায় এখানকাব মানুষেব মনে দযাধৰ্ম উদ্রেক কবাব কোনো অবকাশ নেই। অবণ্য এখানে জটিল নাগপাণেব মতো মানুষেব জীবনকে শত-জট-বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। দীৰ্ঘ অভ্যাসে তাবা সেই বন্ধনে অভ্যস্ত, সমপিত-চিত্ত। তাবা জানে অবণ্যেব অমোঘ নিয়মেব মতো সবই অৱজ্ঞা। কাজেই দযাব প্রশ্ন নিবৰ্থক। ধাওতাল সাহুও যে তামাদি হ্যাণ্ডনোট ছিঁড়ে ফেলে, তাব পশ্চাতে দযাব কোনো প্রশ্ন নেই। টাকা খাটাতে গেলে এই বকমই ঘটে থাকে। আৱণ্যক উপগ্ৰাসে মাত্র এ-কটি ঘটনা দযাব স্নিগ্ধতায় আৰ্দ্ৰ। লেখক যেখানে কুস্তাকে জমি দিচ্ছেন সেখানে কুস্তাব জমি চাষ কবে দেবে কে এ-প্রশ্নেব জবাবে সেই গাঙ্গোতা যুবক যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলল যে সকল গাঙ্গোতাই একখানি কবে লাঙ্গল দেবে—সেখানেই প্রথম দযাব সাক্ষাৎ। অবণ্যেব আদিম পট ছিঁড়ে অৰ্থনৈতিক সূত্রবদ্ধ জীবনেব উদ্ভবেব সঙ্গে সঙ্গে তাব সহজাত সামাজিক কৰ্তব্যবোধেব উদয় হল। এই ভাবেই বলা যায় যে বিভূতিভূষণ সমগ্র শিল্পকৰ্মেব দিকে প্রথব দৃষ্টি বেখেছিলেন বলেই নন্দলাল ওঝাব মতো কুটিল ব্যক্তিকে যথাসম্ভব উপগ্ৰাসেব পটের বাইবে বাখাব চেষ্টা কবেছেন। জমিদাৰি সেবেস্তাৰ দলিল দস্তাবেজ এবং আমলাবৃন্দও একই কাৰণে যথাসম্ভব দূৰে পৰিহৃত হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে লেখকেৰ বাচন-ভঙ্গিমাও দ্ৰষ্টব্য। ভাবোন্নীত স্ফুৰ্ত্তীৰ ভাষাকে কোথাও কাৰো মুখেৰ কথাৰ বাস্তব কৰে তোলোঁ অকুৰোঁ লেখক লক্ষ্য-চ্যুত কৰেননি। প্ৰাকৃত এবং অতি-প্ৰাকৃত জীৱনৰ ভেদবেথা যে অব্য-ভূমিতে মিলে-মিশে রয়েছে সেখানকাৰ বৰ্ণনাভঙ্গিতে গন্তেৰ ঋজুতাৰ সঙ্গে কাব্যো-নমনীয়তা প্ৰয়োজন। বিভূতিভূষণেৰ সমুদয় প্ৰধান উপন্যাসেৰ ভাষাতেই এই গুণ বৰ্তমান। আৱণ্যকে তা আৰো যথার্থ আধাৰ পেয়েছে।—

(ক) দিক চক্ৰবালে দীৰ্ঘ নীলবেথাৰ মতো পৰিদৃশ্যমান এই পাহাড় ও বন দুপূবে, বিকালে, সন্ধ্যায় কত স্বপ্ন আনে মনে। এব জ্যোৎস্না, এব বন বনানী, এব নিৰ্জনতা, এব নীৰব বহুশ, এব সৌন্দৰ্য, এব মানুষজন, পাখিৰ ডাক, বন্য ফুলশোভা—সবই মনে হয় অদ্ভুত, মনে এমন এক গভীৰ শান্তি ও আনন্দ আনিয়া দেয়, জীৱনে যাহা কখনো কোথাও পাই নাই। তাৰ উপৰে বেশি কবিতা অদ্ভুত লাগে ওই মহালিখাকপেৰ শৈলমালা ও মোহনপুৰা বিজাৰ্ত ফৰেষ্টেৰ সীমাবেথা। কী কপলোক যে ইহাৰা ফুটাইয়া তোলে দুপূবে, বৈকালে জ্যোৎস্না বাত্ৰে কি উদাস চিন্তাৰ সৃষ্টি কৰে মনে।

(খ) তাহাৰ কাছে সবস্বতী কুণ্ডীৰ কথা তুলিতেই সে বলিল—হুজুৰ ও মায়াৰ কুণ্ডী, ওখানে বাত্ৰে হুবী পবীৰা নামে, জ্যোৎস্না বাত্ৰে তাৰা কাপড় খুলে বাথে ডাঙায় ঐসৰ পাথৰেৰ উপৰ, বেখে জলে নামে। সে সময় যে তাৰেৰ দেখতে পায়, তাকে ভুলিয়ে জলে নামিয়ে ডুবিয়ে মাৰে। জ্যোৎস্নাৰ মধ্যো দেখা যায় মাৰো মাৰো পবীৰেৰ মুখ জলেৰ উপৰে পদ্মফুলেৰ মতো জেগে আছে। আমি দেখিনি কখনও, হেড সাৰ্ভেয়াৰ ফতে সিং একদিন দেখেছিলেন।

উদ্ধৃত অংশ দুটিতে ভাষাৰ বিস্তাৰে কোনো ভেদসীমা নেই বললেই চলে। অথচ প্ৰথমটি লেখকেৰ উক্তি, দ্বিতীয়টি আমিন বঘুবৰ প্ৰসাদেৰ। আমিন বঘুবৰ প্ৰসাদেৰ উক্তিকে বিশ্বাস বা বাস্তব কৰে তোলোঁ জন্ত লেখকেৰ কোনো গবজ নেই। কেননা আমিন বঘুবৰ প্ৰসাদকে ৰূপায়িত কৰা লেখকেৰ লক্ষ্য নয়। সে যে গল্প বলছে তাৰ অবিশ্বাস্যতাকে বিশ্বাস কৰাৰ জন্ত আমবা প্ৰস্তুত বলে ছোট খাট বিশ্বাস্যতাৰ বেলায় আমবা আৱ তীক্ষ্ণদৃষ্টি নই। কাজেই যে কবিত্ব লেখকেৰ নিজেৰ ভাষায়, সে কবিত্ব বঘুবৰ প্ৰসাদেৰ ভাষাতে এলেও বিশ্বাস্যেৰ কিছু নেই এবং লক্ষণীয় যে লেখক সৰ্বত্ৰ অতি-প্ৰাকৃত গল্পগুলিকে সফল কৰেছেন একটা

বিশেষ কৌশলে। প্রকৃতির অটল এবং উদ্যম সৌন্দর্যলীলার কথা বলতে বলতেই তিনি অতি-প্রাকৃত কাহিনীগুলির অবতারণা করেছেন। কোলরিজের কৌশল এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পাঠকের কাছে দুইই সমান বিস্ময়ের বিষয়। নাগরিকতা-ক্লান্ত মানসে বিশাল সীমাহীন প্রকৃতির কথা বিশ্বাস করতে যতটা শক্তির প্রয়োজন তারই পটভূমিকায় স্থাপিত অতি-প্রাকৃতকে বিশ্বাস করতে তদপেক্ষা অধিক শক্তির প্রয়োজন হয় না। মনে হয় প্রথমটা যদি সত্য হয় তা হলে দ্বিতীয়টাই বা নয় কেন? ঈষৎ অপ্রাসঙ্গিক হলেও এ-প্রসঙ্গে একটা ব্যাপার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। বর্ণিত অঞ্চলগুলির নামের মধ্যে মহাপ্রাণবর্নের আধিক্য বহুসময়তার সূচক হিসাবে কাজ করেছে। মহালিখা, মোহনপুরা, ফুলবইহাব, ঝানঝরি প্রভৃতি নামের মধ্যেই যেন বন ঝাউয়ের দীর্ঘশ্বাসের ইঙ্গিত মেলে।

•• পাঁচ ••

এই সমস্ত উপাদানের পশ্চাতে সতত ক্রিয়াশীল হয়ে রয়েছে লেখকের একটি বেদনা। এই বেদনার দুই মুখ। একমুখে অপরিচয়ের জ্ঞান ক্ষোভ। এ অপরিচয়-জনিত ক্ষোভের মূল সূত্র ভিত্তিতে। দেশকে জানার পিপাসা তিবিশেষ কালের একটা প্রধান লক্ষণ এ-কথা পূর্বে বলেছি। স্বদেশ-জিজ্ঞাসায় জীবন-জিজ্ঞাসারই অভিব্যক্তি ঘটেছে। বিভূতিভূষণের রচনায় স্বদেশ-জিজ্ঞাসার বহিরঙ্গ আবরণটা কখনই বড়ো হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আবণাকে বারে বারে দেখা যায় যে স্বদেশ পরিচয়ের অসম্পূর্ণতার জ্ঞান লেখকের ক্ষোভ কথা বলেছে। ভারতবর্ষ নামক ব্যাপারটা যে এত বিশাল এত বিচিত্র এ-কথা তিনি এ-উপন্যাসে বারে বাবে বলেছেন। এই বেদনাব দ্বিতীয় মুখ জাতীয় সম্পদেব অপচয়ে। উপনিবেশের ভূস্বত্বভোগীদের হাতে শাসক-শক্তির ঔদাসীণ্যে, যে বিবট অঞ্চল গ্রাম্যনাগ পার্ক হতে পাবত, তা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হতে বসল দু-মুঠো গমের জন্ম। এই জাতীয় সম্পদ চেতনা এবং জাতীয় সম্পদ বিনষ্টির ক্ষোভ থেকে জন্ম লাভ করেছে যুগলপ্রসাদ। যুগলপ্রসাদ আশ্চর্য প্রেমিক মানুষ। এ-প্রেম জীবন-প্রেম। যে জীবন ঐ বিস্তৃত অরণ্য পটভূমিতে ব্যাপ্ত, তাকে সাজিয়ে বেডায় রাষ্ট্রশক্তির সহায়তাহীন একক যুগল-প্রসাদ। সরস্বতীর ধারে ধারে নিঃসঙ্গ ঘুরে বেডালে তার মহিমা অক্ষুণ্ণ থাকত। লেখক উপন্যাসের প্রবক্তা হিসাবে তার কথা বলে গেলেই সে মহিমার সম্যক শিল্পরূপায়ণও সম্ভব হত। কিন্তু লেখক নিজে যুগলপ্রসাদের সঙ্গে অরণ্যভূমিকে

অলংকৃত করার কাজে যুক্ত হওয়ার যুগলপ্রসাদের বিশ্বাস্ততা কমে গিয়েছে। প্রাচীন অরণ্যভূমির কাছে যে কারণে লেখক বারে বারে ক্ষমা চেয়েছেন, সেই অপরাধ-বোধকে স্থলিত করার জ্ঞানই মনে হয় যেন যুগলপ্রসাদের সঙ্গে এই যুক্তপ্রয়াস—এমন ধরনের যান্ত্রিকতার অভিযোগ এখানে না উঠে যায় না। অথচ যুগলপ্রসাদ এই উপন্যাসের পক্ষে একটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। জমি বিলির ফলে লবটুলিয়ার নবোদ্ভূত মানব বসতি যদি কাউকে আঘাত করে থাকে তো সে হল যুগলপ্রসাদ। যুগলপ্রসাদকে দিয়ে সে ক্ষেত্রে লেখক অনেক কথা বলাতে পারতেন, যা বলা হয়নি।

জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট-জনিত যে-ক্ষোভের ফলে যুগলপ্রসাদকে লেখক কল্পনা করেছেন, সেই ক্ষোভের প্রেরণায় রচিত হয়েছে সাঁওতাল রাজা দোবরু পান্না। দোবরু পান্না অরণ্যভূমির আত্মা, আরণ্যক উপন্যাসেরও আত্মা। ভানুমতী অরণ্য-ভূমির সৌন্দর্যের প্রতীক। দোবরু পান্না মর্যাদার প্রতীক। লেখক সৌন্দর্যের মর্যাদা এবং মর্যাদার সৌন্দর্য উভয়কেই নিঃসংকোচে রূপায়িত করেছেন। পরাভূত দোবরু পান্না বিপর্যস্ত হলেও, সে রাজা এবং অতীত সংগ্রামের নায়ক, এ-কথাটা লেখক কদাচ বিস্মৃত হননি। যৌবন বয়সে কোম্পানির সঙ্গে লড়েছেন দোবরু পান্না, তাঁর পূর্বপুরুষেরা লড়েছেন মুগল সাম্রাজ্যবাহিনীর সঙ্গে। সূর্য বংশের সন্তান তিনি, একদা তার বংশের অধীনে ছিল ঐ পাহাড় জঙ্গল সারা পৃথিবী। দোবরু পান্নাকে রাজসম্মান দিয়েছেন লেখক। রাজার পূর্বপুরুষদের প্রাচীন সমাধিভূমিতে দাঁড়িয়ে লেখকের অনুভূতি স্মরণীয়।—

ইতিহাসের এই বিরাট ট্রাজেডি যেন আমার চোখের সম্মুখে সেই সন্ধ্যায় অভিনীত হইল, সে নাটকের কুশীলবগণ একদিকে বিজিত উপেক্ষিত দরিদ্র অনার্য নৃপতি দোবরু পান্না, তরুণী অনার্য রাজকন্যা ভানুমতী, তরুণ রাজপুত্র জগরু পান্না—একদিকে আমি, আমার পাটোয়ারী বনোয়ারীলাল ও আমার পথপ্রদর্শক বুদ্ধু সিং।

দোবরু পান্নাকে রাজসম্মান, রাজাদেশ পালন, রাজার সমাধিতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের ভিতরে লেখকের বেদনাত্মক আত্মাই ক্রিয়াশীল হয়েছে। ভারতভূমির অপরাধের প্রতিরোধের একটা প্রতীক খুঁজেছেন লেখক এই বিরাট অরণ্য-সম্পদের বিনষ্টির অসহায়তায়। ভারত সকল কিছুকে সমন্বিত করার ব্রহ্ম মন্ত্র জানে এ-কথায় তখন আর লেখকের ক্ষোভের নিরসন হয় না। দোবরু পান্নার প্রতিরোধী আত্মার স্মৃতিতে পুষ্পাঞ্জলিদানের অংশে যে গভীর ভাবাবেগ

সঞ্চারিত হয় তার মূল এখানে।

সঙ্গে সঙ্গে ভানুমতী অরণ্যের সমস্ত সৌন্দর্যকে এবং সারল্যকে নিজের মধ্যে অবলীলাক্রমে সংহত করেছে। এই ক্ষেত্রে লেখকের সংঘম যেন ভানুমতীরই সৌন্দর্যের মর্যাদার দান। তথাপি আমার মনে হয় যে দোবরু পান্নার মৃত্যুর পরে সমাধিভূমিতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের সঙ্গেই এই অধ্যায়ে যবনিকা ফেলে দিলে ভানুমতীর শেষ অধ্যায়ে যে রসাতাস ঘটেছে তার হাত থেকে সে বেঁচে যেত। ভানুমতীর সঙ্গে বিদায় দৃশ্যে ভানুমতী উপন্যাসের নায়িকার মতো আচরণ করেছে। এমন কি তার কালো জোড়া-ভুরু দুটির কথায় আমাদের হঠাৎ যেন ভুলে যেতে ইচ্ছে করে যে সে সাঁওতাল মেয়ে। ভানুমতীই হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—‘আজ যেতে দেব না বাবুজী’,—এই অংশেও তার ব্যবহারে প্রচলিত নায়িকা ভঙ্গিমার ছাপ অসঙ্গত হয়েছে। অরণ্যভূমি থেকে বিদ্লিষ্ট হয়ে পড়ে এ ঘটনা যেন একান্তই লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হল।

•• ছয় ••

আরণ্যকের মূল শক্তি তার ভাষা ভঙ্গিমায় এবং বর্ণনা-রীতিতে প্রকাশ পেয়েছে—কিন্তু এ-শক্তির উৎস নিঃসন্দেহে লেখকের সমগ্র চেতনার বিস্তার। নাট্য ও লবটুলিয়ার আরণ্য-ভূমিতে যে বিস্ময় তা একদিকে যেমন আ-নীহারিকা-তৃণকণা বিস্তৃত জীবনের বিস্ময়, তেমনি লেখকের স্বদেশ জীবনের অন্তর্গত মানুষের জীবন-ধারণের বিস্ময়ও বটে। এই দুটি ব্যাপারকে, তথা জীবনের দ্বৈত রূপকে লেখক শিল্পস্থ করেছে। ফলে অনেক টুকরো টুকরো কাহিনী (যেমন কুস্তার কাহিনী, মঞ্চীর কাহিনী) এক অনিবার্য ছন্দাবেগে রূপময় হতে পেরেছে। সে ছন্দ স্বভাবতই জীবনের ছন্দ। এই জীবনের ছন্দকে যে ঔপন্যাসিক বোঝেন তিনিই পট ও পাত্রের পরস্পর সম্পর্ককে কখনো ভুল করেন না। আরণ্যকের কতক স্থলে সেই ছন্দের ব্যত্যয় লক্ষ্য করেও বলা যায় জীবনের সমগ্রতার ধ্যানে আরণ্যক সফলকাম শিল্পকর্ম—তিরিশের যুগের কালোত্তীর্ণ সৃষ্টিগুলির মধ্যেই তার স্থান।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

•• এক ••

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পকর্ম আলোচনা কালে প্রথমে লেখকের attitude towards life বা জীবন সম্বন্ধে লেখকের মনোভঙ্গির কথা অবশ্যই অপরিহার্য। কোনো লেখকের মনোভঙ্গির কথা আমবা যখন বলি তখন আমবা নিঃসন্দেহে কোনো অস্পষ্ট আপ্তবাক্য উচ্চারণ কবি না। লেখকের মনোভঙ্গি লেখকের নিজস্ব বৃত্তি যাব সাহায্যে লেখক নিজ শিল্পকর্মে স্বাধীন এবং স্বচ্ছন্দগতি হতে পাবেন। এই স্বাধীন স্বাচ্ছন্দ্য উপন্যাসেব বা গল্পেব কাঠামো নির্মাণে, চরিত্র সৃজনে, ভাষাবয়নে এবং জীবন-ব্যাখ্যাব সর্বত্রই অন্তর্ভূত হয়। বস্তুত লেখকের জীবন সম্বন্ধে সামগ্রিক ব্যান-ধাবণা বা লেখকের মনোভঙ্গিৰ ওপবেই সার্থক উপন্যাসেব রস পরিণাম নির্ভবশীল। বলা বাহুল্য যে, লেখকের জীবন সম্বন্ধে ধ্যান-ধাবণা বা মনোভঙ্গি এবং লেখকের ব্যবহৃত দৃষ্টিকোণ সৰ্বাংশে এক বস্তু নয়। জীবন সম্বন্ধে লেখকের মনোভঙ্গি লেখকের পক্ষে এক গভীরতর প্রশ্ন। লেখকের দৃষ্টিকোণেব প্রশ্নটা অপেক্ষাকৃত বাইবেব প্রশ্ন। সে কাবণে দুজন মার্কসবাদী লেখকের দৃষ্টিকোণেব সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও দুজনেব মনোভঙ্গিৰ মধ্যে বিপুল পার্থক্য বিদ্যমান। হাওয়ার্ড ফাস্ট * এবং এবেনবুৰ্গ উভয়েই একই বাজনৈতিক দৃষ্টিৰ অধিকাৰী হওয়া সত্ত্বেও এবং উভয়েবই উপন্যাস ঐতিহাসিক ঘটনামিশ্রিত হলেও উভয়েব বচনাব প্রসাদ যে ভিন্ন তাব মূলে দুই লেখকের মনোভঙ্গিৰ পার্থক্য। একজন যে ব্যক্তিকে ইতিহাসেব পটে স্থাপন কবে তাকে পৰীক্ষা কৰাব পক্ষপাতী এবং একজন যে-ইতিহাসকে ব্যক্তিৰ জীবন-বিন্দুতে প্রতিবিস্তিত কবায় সচেষ্ট এখানেও দুই লেখকের নিজস্ব মনোভঙ্গিই সক্রিয়। লেখক যে জীবনকে দেখেছেন সেটা অবশ্যই তাব শিল্পকর্মে প্রতিভাত হযে থাকে এবং সেই জীবনবস-সমৃদ্ধ শিল্পকর্ম লেখকের বিশিষ্ট মনোভঙ্গিৰ কথাই ঘোষণা কবে। সে কাবণেই হেনবি জেম্‌সেব স্তুবিখ্যাত বক্তব্যটি আমবা স্মবণে বাখি যে No good novel will ever proceed from a superficial mind। তাই উপন্যাসেব শিল্পকর্মেব বিচাবে লেখকের মানস-বিচাবই হয়ে থাকে।

সাম্প্রতিককালে অবশ্য হাওয়ার্ড ফাস্টেব রাজনৈতিক দৃষ্টিৰ পরিবর্তন ঘটেছে।

স্বতরাং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গ আলোচনাকালে আমাদের মানিকবাবুর বিশিষ্ট মনোভঙ্গি বা attitude-এর কথা সর্বাগ্রে আলোচ্য। তিনি ফ্রয়েড এবং অতঃপর মার্কসকে অবলম্বন করেছিলেন এর কোনোটার জন্তই তাঁকে নিন্দিত বা নন্দিত না করে আমাদের দেখা দরকার যে মানিকবাবু জীবন থেকে কী “নির্বাচন” করেছেন, কোন্ বক্তব্যো পৌছতে চেয়েছেন—সুন্দর কথায় তাঁর জীবনকে দেখার মনোভঙ্গি কী। একজন লেখকের শিল্পগত এই মনোভঙ্গি বিচারের কালে আমাদের করণীয় কী এ-সম্বন্ধে রসজ্ঞ পণ্ডিতদের সূত্রও এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয়। কোনো শিল্পকর্ম বিচারে বিশেষ উপন্যাস বিচারে আমাদের বিবেচ্য এবং আলোচ্য তিনটি বিষয়—প্রথম, লেখক কী পদ্ধতিতে জীবনকে দেখেছেন, দ্বিতীয়, কী তিনি জীবন থেকে গ্রহণ করেছেন, কী তিনি বর্জন করেছেন, তৃতীয়, তাঁর সমস্ত বক্তব্য কোন্ নৈতিক বোধে বিশিষ্ট। যে-কোনোও লেখকের সাহিত্যকীর্তি আলোচনা করতে গেলে উক্ত সূত্র তিনটির আলোকে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নানা বকম ভাবে জীবনকে দেখা যায় বলেই সার্তর কমিউনিস্ট হলেও গোর্কি হবেন না। তারাশঙ্কর মনস্তত্ত্ব লিখলেও তারাশঙ্করই থাকেন। সে কারণেই মানিকবাবুর সঙ্গে তারাশঙ্করের তুলনা অনর্থক। সে কারণেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও উপন্যাসের প্রসঙ্গ আলোচিত হলে যদি দেখা যায় যে, মানুষের মনের বিচিত্র গহনতাকে উপন্যাসের বিষয় করে তিনি বাংলা উপন্যাসে নতুন দিগন্তের সন্ধান করেছেন—এ-কথার উল্লেখও হল না তখন সে আলোচনাও অপূর্ণ।

•• তিন ••

মানিকবাবুর উপন্যাসগুলিকে আমরা তিনটে মোটা দাগে ভাগ করতে পারি। একভাগে পড়ে পুতুলনাচের ইতিকথা এবং পদ্মা নদীর মাঝি আর একভাগে পড়ে চতুষ্কোণ, সরীসৃপ, অহিংসা প্রভৃতি এবং তৃতীয় ভাগে পড়ে শহরতলী, চিহ্ন, আরোগ্য প্রভৃতি। যদিও এই তিন ভাগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তিন ভিন্ন দৃষ্টিকোণের ব্যবহার করেছেন তথাপি তাঁর মনোভঙ্গি—জীবনকে গ্রহণের পদ্ধতি—প্রথমাবধি প্রায় অপরিবর্তিত থেকেছে। মানিকবাবুর শক্তি এবং তাঁর দৌর্বল্যের উৎস এই অপরিবর্তনীয় মনোভঙ্গির মধ্যই নিহিত। অবশ্যই কোনো লেখক তাঁর attitude towards life-কে পরিহার করতে পারেন না। স্বেচ্ছায় নিজ দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজের জীবন সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণাকে

তার ব্যবহারও অক্রুর নয়। তাই ‘কত ঘুমাইবা’ ওপরে উদ্ধৃত গানের এই ধূয়ার অর্থ বাউল-মুর্শিদ-ঈপ্সিত আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষের ইঙ্গিত নয়। নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণের যে বিরুদ্ধতা। হোসেন মিয়ার সমগ্র জীবনের সারার্থ গানটির রূপকে তাই বলা হয়েছে।] এবং এই গানের পর বিস্থিত কুবের যখন জিজ্ঞাসা করেছে যে—আপনি গান বাইন্ধবার পারেন? তখন হোসেন মিয়ার জবাবটিও লক্ষ্য করার মতো—খুশি হলে না পারি কি? অবশ্য কুবেরের কাছে হোসেন মিয়া প্রায় ঐশী শক্তির সমতুল্য।^১ দ্বীপে বসতি রচনা এবং গান রচনা খুশি হলে সে সব পারে—তুইই তার লীলা। সে-কারণেই ময়না-দ্বীপ যাত্রার বর্ণনায় কম্পাসের সামনে স্থিরনেত্র হোসেন মিয়ার পুরুষকার-প্রদীপ্ত মূর্তিটি মানিকবাবুর রচনার দরকার হয়—কুবেরের কাছে হোসেন মিয়াকে মানুষ করে তোলার জগুই আফিমের প্যাকেটের ঘটনার প্রয়োজন হয়। এর কোনো কথাই, আশা করি, নতুন কথা নয়। তবু একটা কথা বোধ করি কাউকে অসম্মান না করেই বলা চলে যে হোসেন মিয়ার মতো কল্পনা-সিদ্ধ চরিত্র বাংলা উপন্যাসের চরিত্র-মালায় আর একটিও নেই। পুতুলনাচের ইতিকথার যাদব আর হোসেন মিয়া একই মনোলৌল্যে গঠিত এ-কথা তাই রসবোধসম্মত কথা নয়।

এ-সমস্ত কাবণেই চতুষ্কোণ অবলম্বন কবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তুই থাকা হয় যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় যৌনতা আছে বেশি জীবন আছে ক্ষম। চতুষ্কোণের ক্ষণিক পর্যায় মানিকবাবুর আদি এবং অন্তে কোথাও স্থায়ী চিন্তা হিসাবে ছিল এ-প্রমাণ নেই। চতুষ্কোণের পরবর্তীকালে শহরতলী, চিহ্ন এবং আবোগ্যে মানিকবাবু নতুন করেই মানুষকে দেখতে চেয়েছেন। মানুষের গোটা চেহারায় তারই সমাজ প্রতিবেশ ক্রিয়াশীল—চতুষ্কোণে এ-বক্তব্যের ব্যর্থ শিল্প-রূপায়ণের পর স্বাভাবিকভাবেই মানিকবাবু অগ্রসর হয়েছেন নতুন জিজ্ঞাসায়। এবং এরই ফলে মানিকবাবু মার্কসবাদকে স্বীকার করেছেন।

নিঃসন্দেহে এই স্বীকরণ নিভুল সিদ্ধান্তেরই পরিণাম। কিন্তু এই সিদ্ধান্তকে নিজ শিল্পীজীবনে জারিত করে নিতে গেলে নিজেরই শিল্পী ইতিহাসকে যে ভাবে অনুধাবন করা দরকার সে-ক্ষেত্রে মানিকবাবুর ব্যত্যয় ছিল। তাঁর শেষ দিকের উপন্যাসগুলি নিয়ে কোনো যোগ্য বিনীত সমালোচনা হলে এ-কথা নিশ্চয় উত্থাপিত হবে। শুধু যখন অস্বিষ্ট হয় নিজের মন অথবা মনের মানে, তখন,—অথবা অন্ধ অদৃষ্টতুল্য প্রকৃতির গ্রাসে উপায়ান্তরহীন জীবন যখন উপজীব্য

তখন যে-মনোভঙ্গি কার্যকরী, মানুষ নিজ ইতিহাসকে নিজেই রচনা করে এ-কথা বলবার সময় আর সে-মনোভঙ্গি কার্যকরী হয় না। মানুষ পরিবেশের অধীন—শহরতলী পর্যন্ত এ-কথা যত শিল্পসম্মত ভাবে মানিকবাবু বলেছেন—মানুষ আপন অদৃষ্ট রচনায় অংশ গ্রহণ করে এ-কথা তত শিল্পসম্মত ভাবে তিনি বলতে পারেননি। অথচ মানিকবাবু হোসেন মিয়ার মতো চরিত্র সৃজন করেছেন। যশোদার নিঃসঙ্গতার ছবি এঁকেছেন। সেই কারণেই পাকার আত্মানুসন্ধানের ছকে (জীবন্ত উপন্যাসে) অথবা চিরু উপন্যাসে অক্ষয়ের মদের ঘাসে তাজা ছেলের রক্ত দেখায় মানিকবাবু মানুষের নিঃসঙ্গতাকেই রকমফের করে এঁকে বসেছেন তাঁর মার্কসবাদী অধ্যায়ে। অবশ্যই মানিকবাবুর অগ্রসর হবার প্রয়াস সদাই অভিনন্দনযোগ্য। এই প্রয়াসেই তিনি জগদীশ গুপ্তের নৈঃসঙ্গ্যের বক্তব্য থেকে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই বক্তব্যের সার্থক রূপান্তরের পথে বাধা ছিল তাঁর নিজস্ব শিল্পী-ব্যক্তিত্ব—যা তাঁর শিল্প-ধর্ম, শিল্প-দৃষ্টি, শিল্প-বক্তব্য—সবই। শশী-হোসেন-কুবের-যশোদার পর্যায়ে তিনি যে মানুষকে খুঁজেছেন সে শুধু আত্মা নয়, শুধু দেহ নয়, নয় শুধু বুদ্ধি, অথবা স্নায়ু কিংবা কোমের জটিলতা, কিংবা সমাহার। তিনি খুঁজেছেন সেই অথও ব্যক্তিস্বকপকে যে তার সমুদয় উক্ত খণ্ডগুলির থেকে বড়ো। সেই মানুষের যন্ত্রণা ছিল মানিকবাবুর বিষয়। মার্কসবাদী পর্যায়ে তিনি বুদ্ধিসর্বস্ব মানুষকে আঁকতে গিয়ে হারিয়ে ফেললেন তাঁর শিল্পের অভিজ্ঞান।

এইভাবেই মানিকবাবুর গদ্যরীতিকেও উপলব্ধি করা সম্ভব। তিরিশের লেখক-বৃন্দের মধ্যে যার গদ্যরীতি চতুর্থ ও পঞ্চম দশকের শক্তিমান লেখকদের সমন্বিত প্রভাবিত করেছে—তিনি হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং আপাত দৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা স্মরণ করার মতো। কথাটি এই যে প্রভাবিত লেখকে বা প্রায় ক্ষেত্রেই মার্কসবাদী নন। এই অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি আমাদের এতক্ষণের আলোচিত সিদ্ধান্তের দিকেই ইঙ্গিত করছে—মানিকবাবুর শিল্পজীবনের প্রকৃষ্ট অধ্যায়ে মার্কসবাদের সাক্ষীকরণ হয়নি। তাঁর বিশিষ্টতার উত্তরাধিকারীদের দিকে তাকালে এই কথাই স্পষ্ট হয় যে মানিকবাবুর শিল্প-সাধনার সার্থকতার সুরে, ভবিষ্যৎ প্রভাবী সুরে, মার্কসবাদের বীজ ছিল না। যে অর্থে মানিকবাবুর সঙ্গে জগদীশবাবুর আত্মীয়তা এবং মানিকবাবুর সঙ্গে ইদানীন্দের লেখকদের—সে অর্থের সঙ্গে মার্কসবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। বিচ্ছিন্ন মানুষ, প্রতিকূল পরিবেশের কাছে নিঃশব্দে সমর্পিত-প্রাণ মানুষ—এবং

ভিতর থেকে ও বাইরে থেকে পরাধীন মানুষকে গড়ে তোলার উপযুক্ত ভাষা জগদীশ গুপ্তের ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং এই ভাষাকেই ব্যবহার করেছেন বর্তমান কালের অনেকে।

এই ভাষা-রীতিকে প্রসঙ্গসমেত পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে এর প্রধান লক্ষণ হচ্ছে এই যে এ-ভাষা বেগবতী নয়। সম্প্রতিকালে বাংলা গল্পের ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন এমন কারো কারো মন্তব্যেও মানিকবাবু ভাষা যে বেগবতী নয়, সেখানে যে তীব্রতা প্রায় নেই এ-অভিযোগ ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু অভিযোগের কোনো কারণ থাকে না, যদি আমরা এ-কথা অনুভব করি যে বেগবতী না হওয়াটাই মানিকবাবু ভাষার প্রধান গুণ। মানিকবাবু যদি প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধরত মানুষের কথা বলতে চাইতেন, তাহলে তাঁর উপন্যাসের উপকরণ-প্রকরণ সমেত ভাষাও পরিবর্তিত হত। কিন্তু তিনি যে ব্যক্তির কথা বলেছেন তাবা কেউই তাবাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণের নায়কের মতো জীবনের পাঠ প্রথম গ্রহণ করছে না। চারদিকেব জীবনের সঙ্গে হৃদয়, অথবা সখাময়, এই দুই ছবিব কোনোটার প্রতিই তাঁর কোনো লোভ নেই। স্মৃতিবাং তাঁর গল্পে বেগ বা আবেগ দুয়ের কোনোটাই স্পন্দিত হয়ে ওঠেনি। তিনি বেছেছেন সেইসব মানুষকে যারা জীবনের একটা প্যাটার্নের নিদর্শন (যশোদা), সেই প্যাটার্নকে যাবা অদৃষ্টেব মতো মেনে নিয়েছে, সুখ-দুঃখকে সেই জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে (কুবের), যাদের জীবনের সেই বিধাতা-কল্প অপরিবর্তনীয়তাব বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতাব বাসনা নেই, ক্ষীণ প্রয়াস প্রায় দুর্লভ্য (শশী)। আবার তিনি কখনো কখনো অন্ধ অদৃষ্টেব বিপরীত মেরুতে যে প্রতিযোগী শক্তি কল্পনা কবেছেন সেও পদ্মাব মতোই নিরাসক্ত এবং প্রায় অমানবিক (হোসেন মিয়া)। পাকাব মতো দামাল কিশোরের কল্পনায মানিকবাবু এই ধরনের ব্যক্তি কল্পনা একবার ব্যতিক্রমের পথ ধরেছিল বটে, কিন্তু অচিরেই মনের দিক থেকে পাকা বয়সকে ছাড়িয়ে যাওয়ায় গল্প-রীতির নিজস্ব ছন্দের বদল আবশ্যিক হল না। স্বভাবতই যে সমস্ত মানুষের কথা তিনি বলেন তাদের প্রসঙ্গে ভাষার মস্তব নিবাবেগ ভঙ্গিই কার্যকরী।

মানিকবাবুর গল্পরীতির দ্বিতীয় লক্ষণ হল এই যে এ-ভাষা একেবারেই ঘটনা-ভারবাহী বা সংবাদ-বাহন নয়। কেননা মানিকবাবু বাস্তব বলতে বাস্তবতার বিকারকে বোঝেন না। তিনি সব সময়েই বাস্তবের অন্তঃসারগত মূর্তিকেই আবিষ্কার করতে চান। ফলে খুঁটিনাটি বর্ণনায় তাঁর সহজাত দক্ষতা তর্কাতীত

হলেও (পদ্মানদীর মাঝির জেলেদের জীবন বর্ণনা) এ-বর্ণনার কোনো তাৎপর্য তাঁর কাছে নেই। তিনি জানেন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার কোনো শেষ নেই—বাস্তবের শুদ্ধ সার, যা সং অসং, ভালো-মন্দ কিছুই নয়, তা এই বর্ণনার জঙ্কলে হারিয়ে যেতে পারে। মানিকবাবুর এই শক্তিই তাঁর গদ্যভঙ্গিতে একটা সংক্ষিপ্ত হবার ক্ষমতা এনে দিয়েছিল যা শেষের দিকে তাঁর শত্রুতা করেছে। এবং এখানেও তিনি তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণের বিপরীত পথচারী। কেননা তারাশঙ্করের মতো তথ্যসম্পন্ন হবার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন না, বিভূতিভূষণের বিমুক্ততারও তিনি কেউ নন।

প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে জগদীশ গুপ্তের সঙ্গে কোনো ক্ষেত্রে তাঁর আত্মীয়তা থাকলেও জগদীশ গুপ্ত নিজস্ব মেজাজকে গড়ে প্রায়ই নষ্ট করতে চাইতেন, অনাত্মীয় কাব্যশ্রোতের সাহায্যে। যে শুদ্ধতা তাঁর সম্পদ তা এর ফলে মাঝে মাঝে হারিয়ে গেছে। শুদ্ধতার পবিত্র স্রসতা এ-ক্ষেত্রে কদম সৃষ্টি করেছে। দিবারাত্রির কাব্যে মানিকবাবুর ভাষার শুদ্ধতায় যে কবিত্বের প্রসাদ তা পল্লবগ্রাহী কবিত্ব নয়। সেও বিষয়ের অন্তর্নিহিত স্বরূপকে উন্মোচিত করার মাধ্যম। যে সরল ঋজুতার জন্য তিনি খ্যাতিমান তা তাঁর মধ্যবর্তী জীবনের সৃষ্টি। এখানে তিনি জগদীশ গুপ্তকে অবশ্যই অতিক্রম করেছেন। বক্তব্যে কৃত্রিমতা থাকলে এ-ভাষাও কৃত্রিম হতে বাধ্য। তখন এর শক্তিসূচ্যতা ঘটে। মানিকবাবুর হাতে তা কখনো ঘটেনি। মানিকবাবুর গদ্যের উত্তর-সাধকদের এ-কথা মনে রাখা দরকার।

অন্নদাশঙ্কর রায়

•• এক ••

সত্যাসত্যের ভূমিকায় অন্নদাশঙ্কর জানিয়েছেন যে ইচ্ছা ছিল সত্যাসত্য এপিক হবে, তথা রূপক। সূর্যী এবং বাদল হবে সত্য এবং অসত্যের প্রতীক—এই ছিল লেখকের বাসনা। বাসনা ছিল—উজ্জয়িনী হবে সংকটাক্রান্ত মানবাত্মা। লেখক বলেছেন—‘আইডিয়াটাকে মগজ থেকে কাগজে নামিয়ে দেখা গেল বাদল সূর্যী উজ্জয়িনী আমার হুকুম মানে না। অবাধ্য সন্তানের মতো যা খুশি বলে, যা খুশি করে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যায়। দেখতে দেখতে তাদের চরিত্র বদলে গেল, সম্বন্ধ বদলে গেল। মানসসরোবর থেকে নির্গত হয়ে সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র দুই বিপরীত দিকে প্রবাহিত হল, গঙ্গা ধাবিত হল তৃতীয় দিকে—এই

তিন নদ-নদীর সঙ্গ নিল ও ছাড়ল বহু উপনদ উপনদী, শাখানদ শাখানদী। তাদের সবাইকে রূপকের অঙ্গীভূত করা যায় না, তারা এক একটা শক্তি নয়, ব্যক্তি। রূপক গেল, কিন্তু এপিক রইল।’ যে সচেতন উদ্দেশ্য সত্যাসত্যের অব্যবহিত পূর্বপ্রেরণা, অচিরেই দেখা গেল সে সার্থক শিল্পের শাস্ত্রতত্ত্বায় অনুসরণ কবে সেই সচেতন উদ্দেশ্যের সংকীর্ণ চতুঃসীমাকে লেখক অতিক্রম করে গেছেন। ‘আমার হুকুম মানে না’—এ-কথাটা কতকটা সৌখিন উক্তি। কেননা ঔপন্যাসিকই হোন অথবা নাট্যকারই হোন, সৃজনী ক্ষমতা জীবন এবং শিল্পের দ্বৈত লীলায় সেতুবন্ধন প্রয়াসী, তাই সেতুরচনা নামত রচনা হলেও যেহেতু তা বন্ধন, বন্ধনের কঠিন নিয়ম শিল্পীকে পালন করতেই হয়। তথাপি রূপকের ছায়া সত্যাসত্যে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত এবং তাতে তার মর্যাদার হানি হয়নি, শুধু রূপকের বেশ বদল করাব জন্ত সিদ্ধির তারতম্য এসেছে। সে কথাটাই এখানে আলোচ্য।

অন্নদাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের যুক্তদৃষ্টির প্রসাদলব্ধ হয়েও শুধু প্রসাদের মূল্যেই প্রসন্ন ছিলেন না। উপন্যাসে এক-ধবনের বিশ্ববীক্ষা বা সভ্যতা-সচেতনতাকে তিনি ব্যবহার কবলেন, যাব বিমুক্ত সংস্কৃতি-মনস্কতার ভিত্তিতে হয়তো প্রমথ চৌধুরী এবং তাঁর প্রকৃতিচেতনা ও সহজ মানবিকতাব মূলে হয়তো রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অপার আধুনিক আগ্রহের জন্ত যা হয়ে উঠল বিশিষ্ট। “উজ্জয়িনী হবে সংকটাক্রান্ত মানবাত্মা”—শেষ পর্যন্ত উজ্জয়িনী নিজে তা হয়নি কিন্তু যুদ্ধোত্তর ইওবোপের মানবতাব সংকটকে অন্নদাশঙ্কর উপন্যাসস্থ কবেছিলেন। এই সভ্যতার সংকট সম্বন্ধে চেতনা এবং আগ্রহের গূঢ় অর্থ অন্নদাশঙ্করের আধুনিকতা এবং স্বাভাব্য উভয়ই গৌরবময়। স্মর্তব্য যে, বাংলা সাহিত্যে তখন শব্দচন্দ্রের জনতা-বিজয়ের কাল, তখনই কল্লোলের কলরবে সমুদ্রের গভীরতা না বাজলেও নানা জলতবঙ্গের বিদেশী স্রব,—শ্রীকান্ত-অমিত এবং অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্রের পথিক-চিত্তসম্পন্ন নায়কেরা তখনকার অস্থিত-মূল মধ্যবিত্ত-মানসের প্রতিভূ—এই সাহিত্যিক পরিবেশে তখন অন্নদাশঙ্করের নায়ক-নায়িকাবৃন্দ একে একে আবির্ভূত হল। শব্দচন্দ্র তাঁর ধারেকাছে নেই, কল্লোলের পথিক-স্বভাব বেদনা-বিলাসের তিনি কেউ নন। তিনি বললেন—‘এপিকের বিষয়বস্তু সত্যাসত্যের হিসাব-নিকাশ। পটভূমিকা কেবলমাত্র মানব সংসার নয়, নক্ষত্রনীহারিকার সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় পারম্পর্য, অণুপরমাণুর চিরন্তন অস্তিত্ব। নায়ক-নায়িকার তিনজনের তিন পন্থা। সূর্যী গ্রহণ করেছে ইন্টুইশনের

মার্গ, বাদল ইন্টেলেক্টের, উজ্জয়িনী আত্মনিবেদনের। তিনজনের আকাজক্ষা
 বিশুদ্ধ ও বিপুল, অধ্যবসায় একাগ্র ও একান্ত, নিষ্ঠা নিবিড় ও নিগূঢ়।’ স্পষ্টই
 দেখা যাচ্ছে যে এ-উপন্যাসে মানুষের আত্মচেতনার বহু সাক্ষ্য বিদ্যমান থাকার
 কথা। এবং সেই দ্বন্দ্বসংঘাতযুক্ত চেতনা-লোকের ভাষাও লেখককে গড়ে নিতে
 হবে। সত্যাসত্যের এপিক ধর্ম সম্বন্ধেও লেখক নিজেই একটি নিরিখ আমাদের
 দিয়েছেন—যথাকালে এই উপন্যাসের ভাষার বিচারও হবে সেই নিরিখের
 ব্যবহারে। নিরিখটি হল—‘এপিকের লক্ষণ নায়ক-নায়িকার লক্ষ্যের উচ্চতা
 ও প্রয়াসের মহত্ত্ব।’

•• দুই ••

লক্ষ্যের উচ্চতা সম্বন্ধে পূর্বে সূনিশ্চিত হয়ে প্রয়াসের মহত্ত্বের কথা বিবেচনা করা
 যাবে। বাদল এই উপন্যাসের নায়ক, অন্ততম নায়ক সূর্যী। বাদলের বক্তব্য হল :
 Free will এবং determinism-এর দ্বন্দ্ব Free will-এর জয় কল্পনাভীত
 নয়। বাদল ভারতীয়। কাজেই বাদলের পক্ষে Free will-এর প্রবক্তা হওয়া
 বলিষ্ঠ সত্যসন্ধিস্যবই পরিচায়ক। সূর্যী বাদলকে বলেছিল—জীবনের সঙ্গে ফ্লাট
 কোনো না। সম্ভবত এইটাই সূর্যীর জীবনের তাৎপর্য। উজ্জয়িনী জীবনের রস-
 পিপাসায় পরিপূর্ণ। ‘কার জন্ত বাঁচব?’ ‘কার কাছে আমার আদর?’ আত্ম-
 নিবেদনের জন্ত সে আকুল। এখন এই তিনটি চরিত্রের লক্ষ্যের তাৎপর্য কি?
 সম্ভবত অস্তিত্বের মূলীভূত রহস্যে অবহিত হওয়াই কুশীলবদের লক্ষ্য। জীবন
 শুধু বিরহ-মিলন কাহিনী নয়, নয় শুধু মনের অগমরহস্যেব সিংহদ্বার উন্মোচন।
 প্রকৃতপক্ষে আমাদের এ-কালের বেঁচে থাকায় উপলব্ধির শর্তটি প্রধান। সমাজ,
 সভ্যতা এবং ইতিহাসের জটিল রূপ সম্বন্ধে সচেতনতায় জীবনের তাৎপর্য অব্বে-
 যণের প্রেরণা। ত্রিশের ইওরোপে সেই সচেতনতা জন্মলাভ করেছে যুদ্ধোত্তর
 ইওরোপের রক্তহারা ক্রান্তির পথে। এ দেশে জীবনের গাইদ্য চেহারায় এই ক্রান্তির
 অক্ষুট প্রতিফলন। ভারতবর্ষে জীবনের চেহারায় ত্রিশের যুগেও মাত্র চাকুরিগত
 সংকটের ছায়া। কল্লোলের শ্রেষ্ঠ রচনা গোকুল নাগের পথিক। পথিকে আভি-
 জাত্যের প্রতি বিদ্রূপ, অথবা অসহযোগ আন্দোলনের কথা থাকলেও পথিক শেষ
 পর্যন্ত বিরহ-মিলন কথা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপনায়নে দুঃখের বাস্তবিক রূপ সৃজনে
 সহানুভূতি নির্মাণের প্রয়াস—যদিও তা নিঃসন্দেহে শরৎচন্দ্রের (মেজদিদি গল্পে) কেটে
 যেমনভাবে সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে এবং শিল্প হিসাবে নিকট হইয়াছে, সে পথে

পদার্পণ করেনি। জীবন সম্বন্ধে নতুন আশা-বোধ ত্রিশের যুগের কাল-লক্ষণ। কিন্তু সে-আশার স্পষ্ট কোনো অবয়ব আমাদের মনে গড়ে ওঠেনি। কাজেই আশাভঙ্গের বেদনাও আত্মির পর্যায় ছাড়িয়ে পৌরুষের যন্ত্রণায় গিয়ে উপনীত হল না। সীমিত জীবনবোধকে নিয়ে বড়ো উপগ্রাস সম্ভব নয়। গোরা এবং চতুবঙ্গের পর, তাই আমাদের কল্লোল-কালীন উপগ্রাস-সাহিত্য প্রধানত ক্লান্ত মধ্যবিত্ত জীবনের সর্ববিধ জড়, অলস, কর্মবিমুখতাকে রঙিন এবং ভাবময় করে তুলতে চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অমিত এবং শব্দচন্দ্রের শ্রীকান্ত তার প্রমাণ। এই কারণে অন্নদাশঙ্কর তাঁর নাটকদেব ইওরোপের পটভূমিকায় স্থাপিত কবেছেন। ভেবেছেন, বাদল-সুধী-ব লক্ষ্যের উচ্চতাকে এই স্বাদেশিক অষ্টাবক্র জীবনের আধাবে ধারণ করা অকল্পনীয়। স্বভাবতই ইওরোপে সভ্যতার অন্তর্দ্বন্দ্ব-জাত টানাপোড়েনে এই লক্ষ্যগত উচ্চতার বাস্তব পরীক্ষা। উদ্ভৃঙ্গ শৃঙ্গ ব্যতীত সমতলে যেমন শৈলবীরদের পবীক্ষা অসম্ভব, সেইভাবে বলা যায় ইওরোপের জটিল গ্রন্থিল জীবন-সূত্রের মাঝখানে না দাঁড়ালে গ্রন্থিমোচনের কাজ সমাপ্ত হবে না। সুধী-বাদল সকলেরই উদ্দেশ্য জীবনকে বাইরের শক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট ছকের হাত থেকে মুক্ত করা—এক কথায় গ্রন্থিমোচন। বাদলের Free will এবং সুধী-র নিবাসিত জীবন-প্রীতি দুইয়েরই লক্ষ্যমুখ এই দিকে। উজ্জয়িনীর ব্যক্তি-জীবনের গ্রন্থিমোচন-কল্পনাও এই প্রসঙ্গেই বিবেচ্য। আধুনিক অর্থে যে তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সত্যাসত্য উপগ্রাসের প্রধান পাত্র-তিনজনের উদ্ভাসন, ভারতবর্ষের পক্ষে সে আলোকবশির কথা স্পষ্টতই জনশ্রুতি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এখানে সমাজ-সভ্যতার বিবর্তনের অমোঘ টানে উদ্ভূত নয়। কেতাবে পাওয়া ব্যাপার মাত্র। নানা মতবাদের মতো এও হয়তো আমাদের কাছে একটা ‘বাদ’। উজ্জয়িনীর পিতার মতোই অসম্পূর্ণ এবং অসহায় এখানকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীর চেহারা। এখানে জীবন নিয়ে ওবকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবাধ স্বাধীনতা কল্পনা করা তুরূহ। বাদলের মতো আত্মগোপনের ব্যাপারও এখানে সন্ন্যাসের ছকে বাঁধা। জীবনের মধ্যবর্তী হয়ে আশ্রমধর্মের অবহেলা কলকাতাতেও ত্রিশ সালে সম্ভব ছিল না। কাজেই ইওরোপ ছাড়া সত্যাসত্যের উপগ্রাসিক কল্পনার স্বভূমি লেখকের পক্ষে ছিল দুরধিগম্য। লক্ষ্যের উচ্চতার সঙ্গে এই পটভূমি জড়িত হয়েছে এইভাবে।

প্রয়াসের মহত্ত্ব এপিকের নায়কের অন্তিম চরিত্র-লক্ষণ। লক্ষ্যের উচ্চতা সত্যের সন্ধানে—প্রয়াসের মহত্ত্ব সন্ধানের তীব্রতায়। কিন্তু মুশ্কিল হল এই যে

রামচন্দ্র এবং সীতার জীবনে সত্যের প্রতিষ্ঠা ছিল অবিচল এবং দৃঢ়বদ্ধ। প্রায়শই আমাদের মহাকাব্যের নায়কের কাছে এই ছিল না যে সত্যটা কী? সত্য ছিল তখন জীবনাচরণের সঙ্গেই যুক্ত। তাঁদের সংগ্রাম ছিল প্রতিষ্ঠিত সত্যের মহিমাকে রক্ষার সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের তীব্রতায় তাঁদের মহত্ব। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে সত্য কী সে সম্বন্ধে আমরা সন্দিগ্ধ। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দানে র্যাশনালিজম ধর্মকেও একদা প্রভাবিত করতে চেয়েছে বটে কিন্তু উনিশ শতকের ইংলণ্ডের ই্যা এবং না-এর দ্রুত কাটাকুটির ভিতরে Imperfect Synthesis-এর মধ্যে সত্যের পূর্ণ চেহারা মেলেনি। যুদ্ধোত্তর ইওরোপেও সংকটের দীর্ঘকায় ছায়ারণে সত্যের সন্ধানেই মানুষ ফিরেছে। স্মরণ্য প্রতিষ্ঠিত সত্যের মহিমা রক্ষার জন্য সংগ্রামে যে ইতিবাচকতা তার ফলস্বরূপে প্রাচীন মহাকাব্যে সরল বলিষ্ঠতা ছিল স্বাভাবিক। ‘সত্য কী’—এই অন্বেষণ নিয়ে যে আধুনিক সন্ধানী যাত্রা সেখানে নায়কের জীবনরেখা জটিল বক্রিম হতে বাধ্য। টমাস মানের ম্যাজিক মাউন্টেন তার প্রমাণ।

ম্যাজিক মাউন্টেনের জন্য নির্ধারিত ঘটনাস্থল ইওরোপের সংস্কৃতির সংকটের রূপক রচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল। নায়ক হান্স কাস্ট'প-এর বিগত জীবন-জিজ্ঞাসাকে এই রুগ্নাবাসের পটভূমিকায় স্থাপিত করেছেন লেখক। Research অথবা The Snow, প্রাকৃতিকতা অথবা জীবের প্রাণরহস্য, Settembrini-র বিতর্ক, Walpurgis Night-এর বিচিত্র ছদ্মবেশের অন্তরালবর্তী প্রাণোল্লাস—সমস্ত কিছুই হান্স কাস্ট'প-এর কাছে জীবনের পটকে বিস্তৃততর করে তুলেছে। এগুলি যেন নায়কের কাছে বিশাল জীবনের নানা অনুন্মোচিত অধ্যায়কে আলোকিত করেছে। যখন নায়কের জীবনান্বেষার সঙ্গে—রুগ্নাবাসের সার্বজনীন প্রচ্ছন্ন মৃত্যুচিন্তার এবং অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিকশিত ইওরোপের দীর্ঘদিনের সংস্কৃতি, তার বিজ্ঞান, তার মানবতাকে সম্পৃক্ত হতে দেখি, তখনই ‘সত্য কী’ এই বোধের অপেক্ষা জীবনসন্ধানী অপরাধেয়তা অধিকতর সত্য বলে প্রতিভাত হয়। সত্যাসত্য উপন্যাসের নায়ক বাদল জীবন অথবা জীবনসত্যকে খুঁজেছে এই জাতীয় পদ্ধতিতে এ-কথা উভয় উপন্যাসের যে-কোনো তুলনাই অবান্তর জেনেও, বলা চলে। ম্যাজিক মাউন্টেনের লেখক বুঝেছিলেন যে যুদ্ধপূর্ব ইওরোপও রোগজীর্ণ। যুদ্ধ এল আর ঘনিয়ে এল সংকট তা নয়। নানা খাত ধরে সংকটের শ্রোত এসেছে বলেই যুদ্ধ। জোয়াকিম যেমন নিজের সমস্ত রুগ্ন শারীরিকতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছে সাহসী সৈনিকের মতো, হান্স

কার্টপ-এর শেষতম পরিণতিতেও হয়তো তারই ছায়া দুর্লভ নয়। আমাদের নায়ক বাদল দেখেছিল যুদ্ধদীর্ঘ ইওরোপকে। বাদলের জগৎ যুদ্ধোত্তর বিশ্বজনীন শূণ্যতার রূপক, ইংলণ্ডের দ্বীপভূমি তার উপযুক্ত অল্পকূল ক্ষেত্র। সেও এখানে সন্ধান করেছে জীবনসত্যের।

বাদলের অভিজ্ঞতার মাধুরীতে আশ্চর্য শক্তি দেখিয়েছেন অন্নদাশঙ্কর। এই গ্রন্থখানি যে পথে-প্রবাসের বিদেশবিবরণের সঙ্গে কাহিনী ও চরিত্র-সংযোগ মাত্র হয়ে ওঠেনি তা অন্নদাশঙ্করের প্রখর বক্তব্য-সচেতনতার জগৎ। এবং তা প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন চরিত্রে। মিঃ ওয়েলি দাবারু—মাঝে মাঝে বাদলকে তিনি আহ্বান করেন খেলার জগৎ। হাসি তাঁর মুখে বাদল দেখেনি, মুখের মাংসপেশীতে তাঁর নেই কোনো ভাবতরঙ্গ। এই বিশুদ্ধ র্যাশনালিস্টকে দেখে পাঠক নিঃসন্দেহে আকৃষ্ট হবেন। কিন্তু আস্তে আস্তে তাঁর ঔদাসীণ্যের ব্যাখ্যায় আমরা ইওরোপের গত দুশো বছরের ছায়ার বদলে যেন দেখতে পাব শূণ্য ভবিষ্যতের ছায়া। ‘ওয়েলি কোনো জিনিসকে ভালো বলেন না মন্দ বলেন না। কারো ভালো বা মন্দ চান না। তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ নেই। তিনি বেঁচে আছেন, কারণ বাঁচা ছাড়া অন্য কিছু করতে পারেন না, করবার ইচ্ছে যে নেই। আত্মহত্যা করলে যে অস্তিত্ব থাকবে না অথবা আবার বাঁচতে হবে না, এর প্রমাণ কই?’ আশ্চর্য এই যে ইতিহাসের শঙ্কিত গিরিপথে এই সমস্ত উক্তি যে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি কবে তা শুধু দার্শনিকতার জনক নয়, কিন্তু বর্তমান ও হতাশাস ভবিষ্যতের যে বোধ তৎকালীন ইওরোপীয় বুদ্ধিজীবী মহলে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল তার ইঙ্গিতবহুও বটে। বাদলেব কাছে ওয়েলির বক্তৃতাটি তাৎপর্যপূর্ণ: ‘ইচ্ছা কাকে বলব সেন? কার ইচ্ছা? ঐ সমস্ত cell-এর ইচ্ছা? Cell-সমষ্টির ইচ্ছা? ইচ্ছার লক্ষ্যটা কী? আরো কিছু কাল জীবনধারণ? দু-দিন কমবেশিতে কি আসে যায়? জীবন যদি যায়ও তবে এমন কি আসে যায়? Cell-গুলো বাঁচতে পারে না, শুকিয়ে গুঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত atom-গুলো তো থাকবে? Personal immortality-র কথা ওঠে না, যেহেতু person বলে কিছু নেই। আর atomic immortality তো স্বতঃসিদ্ধ।’

মানবজাতি থাক বা না থাক তাতে ওয়েলির অক্ষিপ নেই। Nothing matters in the last analysis। অন্নদাশঙ্কর গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে উপন্যাসের সমকালীন বুদ্ধির সংকটকে অনুভব করেছেন এবং ওয়েলি-চরিত্রের সাহায্যে তার রূপ নির্মাণও করেছেন। কিন্তু বাদলের কাছে ওয়েলি শুধুই ইংলণ্ডীয় বৈচিত্র্য-

মালায় নানা ফুলের একটি ফুল, নাকি বাদলের কাছে এর কোনো মূল্য ছিল ?
 পরবর্তী অধ্যায়ের বাদলকে দেখে মনে হয় ওয়েলি তার মধ্যে পলায়নের প্রবৃত্তি
 ছাড়া কোনো বৃহৎ প্রশ্ন সঞ্চার করতে পারেনি। হান্স কার্টপ-এর
 What is Life আর বাদলের মুক্ত জীবনাকাজ্জায় যে মূলগত তফাত তারই
 ফলস্বরূপে এই প্রশ্নের অবিচ্ছিন্নতা। বাদলের মুক্ত জীবনাকাজ্জা প্রকৃতপক্ষে
 একটা কিছু প্রমাণ করতে চাওয়া। প্রমাণের প্রয়োজনে তার যা কিছু।
 উজ্জয়িনীকে পরিহার এবং পান্থজীবনের গতিবেগ সবই প্রমাণের প্রয়োজনে।
 জীবনের কোনো সংকট থেকে, জীবনবোধের অমোঘ আকর্ষণে এগুলো ঘটেনি।
 তাই কারো আসা-যাওয়াই তাকে কোথাও পৌঁছে দেওয়ার জগৎ ব্যয়িত হচ্ছে না।
 ম্যাজিক মাউন্টেনে Research অধ্যায়ে প্রাণতত্ত্বের গবেষণার শেষে হান্স যেমন
 জীবনকে ভালবাসার রূপকে ভেবেছিল, বাদলের জগৎ সে জাতীয় তাৎপর্যপূর্ণ কোনো
 পরিস্থিতি সৃষ্টিত হল না। বাদল যেন ইংলণ্ড আবিষ্কারে বেরিয়েছে। অথচ
 বাদলকে দিয়ে লেখকের করণীয় ছিল অনেক। প্রতি মুহূর্তের বেঁচে থাকা মানেই
 প্রতি নিমেষের ‘হওয়া’। সেই হওয়ার যে পদ্ধতি তা কি শুধু দু-একজনের
 সঙ্গে দু-একবারের ইষ্টগোষ্ঠীতেই রূপায়িত করা সম্ভব? ধরা যাক মিঃ
 মারউডের কথা। দু-বগলে ক্রাচ, খবরের কাগজ নির্ভর এই ব্যক্তিটি
 আরেকবার লেখকের অন্তর্দৃষ্টির দূরস্পর্শী শক্তির সাক্ষ্য দেয়। সমুদ্রতীর থেকে
 দূরে একটি ছোটো মার্কেট টাউনে এর সাক্ষাৎ পেয়েছিল বাদল। এর আগে
 বাদল পেরিয়ে এসেছে মেরিয়ন এবং অথারোহণ-পর্ব। তখন অদমা উৎসাহে
 ঘোড়ায় চড়তে যাওয়ার মধ্যে বাদলের স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়াসকে আমরা দেখেছি।
 মারউড ওয়েলির মতোই ইতিহাসেব সৃষ্টি। প্রথম মহাযুদ্ধের স্মৃতি। মারউডের
 বিখ্যাত উক্তি, ‘আমার ভবিষ্যৎ নেই, আছে অতীত’ অথবা ‘বহু সংস্কারকের যা
 খেয়ে খেয়ে পৃথিবী বুড়ি ঘাগী হয়ে গেছে—একে ভেঙে গড়বার কল্পনা বৃথা’—
 তখন আমাদের তৎকালীন ইওরোপকে চিনতে দেরি হয় না। হৃত-বিশ্বাস
 মারউড এবং প্রায় শূন্য-বিশ্বাস ওয়েলি নিশ্চয় লেখকের পশ্চিম ইওরোপের
 বিপর্যস্ত সামাজিক অবস্থা উপলব্ধির প্রমাণ। এদের দুজনের কথায় এবং আচরণে
 যেন তৎকালীন অবক্ষয়ের মাঝে ধ্বনিত এলিয়ট এবং অডেনের স্বর শুনতে
 পাওয়া যায়। কিন্তু এই অকৃত্রিম স্বরের পরেই যখন বাদল বলে (মারউডের
 প্রশ্ন ছিল, ভারতবর্ষের লিবারেলদের সঙ্গে এদেশের লিবারেল পত্রিকার কী
 সম্পর্ক)—‘আঃ মিস্টার মারউড সারা ইংলণ্ডকে আমি বারবার এ-কথা

বলে ক্লান্ত হয়ে গেলাম যে আমি জন্মত ভারতীয় হলেও স্বেচ্ছায় ইংরাজ। জন্মের উপর হাত নেই, Free will খাটে না। তা বলে কি জন্মের পরও determinism মেনে নিতে হবে?’ তখন আমাদের বাদলকে চিনতে কষ্ট হয়। জন্মের পর determinism-কে যে চ্যালেঞ্জ করবে ভারতবর্ষই তার উপযুক্ত ক্ষেত্র হওয়া উচিত। ইওরোপ নানাভাবে নানা দ্বন্দ্বময় জীবন-ধারণার মধ্যে দিয়ে তার ইতিহাসকে গড়ে তুলেছে। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময়েও ইওরোপের জীবন-ভাবনায় ত্রিমুখী চাপ। যুদ্ধের ফলে তৃতীয় চাপটা প্রবল। সেটা সোশ্যালিজম বা তাকে এভাবে চেয়ে ফ্যাশিজম। একদিকে ছিল প্রেম ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের খ্রীষ্টীয় ধর্মবাহী ঐতিহ্য, অন্যদিকে পাশাপাশি ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর প্রাধান্য-আরোপী Enlightenment ও Liberalism-এব দর্শন, এর সঙ্গে শক্তিমান হয়ে উঠল যুদ্ধোত্তর সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক ভূমিকা। এখানে যখন chief desiderata of the age ছিল good life, সামাজিক সাম্য-সুবিচার প্রভৃতি, অথচ এ-সম্বন্ধে, মানুষের জীবনাচরণের যথার্থ বিমূর্ত রূপ সম্বন্ধে কোনো মীমাংসিত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সম্ভাবনা ছিল দূরপর্যায়, যখন মূল্যায়নের সংকট শুরু হয়েছে এবং সংকটের মূল্যায়নও, তখন বাদলের ভারতীয় determinism-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের যদিবা কোনো তাৎপর্য মেলে, ইংলণ্ডীয় হবার জন্য Free will-এর সাধনা হয় হাস্যকর। তার শেষ অধ্যায়ও এ-থেকে বিচ্যুত হতে পারেনি। বাদলের ‘আমাদের’ কথাটির মধ্যে যে বিশ্বগ্রাহী সারলা, একমাত্র তাকে আমরা যুবক-বলিষ্ঠতার পরিচয়-চিহ্ন বলেই গ্রহণ করে সন্দ্বিষ্ট।

মিস্টার পিউ ভারত-ফেরত ইংরাজ। বাদলের সঙ্গে মারউডের সাক্ষাৎকার যখন ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে তখনই মিস্টার পিউর সঙ্গে বাদলের সংঘাত। ইনি ভারত-বিদ্রোহী। বাদলকে, কুলির দেশের মানুষ বলেই বোধ হয়, তিনি কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিলেন। মিস্ এফিংহামের বাড়ির পার্টিতেও মিস্টার পিউ এবং বাদলের সংঘাত হল। অপমানিত বাদলের পক্ষে মিস এফিংহাম আতিথেয়তার ব্রিটিশ-পরাকার্য অবশ্যই রইলেন। কিন্তু বাদল আইনের আশ্রয় নিতে গিয়ে দেখল যে তার সমর্থকেরা অন্তর্হিত। এ-ব্যাপারে বাদলের ক্ষোভ ভারতীয় হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবেই। কিন্তু ত্রিশের ভারতীয় যুবক একেবারে বর্ণাধিকার চেতনাবিহীন এই কথা কল্পনা করা দুষ্কর বলেই এর প্রস্তুতি আমাদের সম্মুখে ঘটা সমীচীন ছিল। সে-কারণেই আমাদের কাছে বাদলের পুরো চেহারাটা

কখনই স্পষ্ট হ'ল না। জীবনবোধ ব্যাপারটা জীবন বৃক্ষের ফল। 'স্বপ্ন বাস্তব স্মৃতি' অধ্যায়ে স্মৃতি-র অতীত স্মৃতি বিবরণে আমরা বাদলের অতীত পরিচয় পেয়েছি। মাঝে মাঝে আরো নানা প্রসঙ্গে বাদলকে অতীত বিগ্ৰস্ত দেখেছি, কিন্তু তার চাওয়ার মূলীভূত শক্তির উৎসটা কোথায় বোঝা গেল না। অথচ যখনই সাধারণ ইংলণ্ডীয় চরিত্রের সঙ্গে বাদলের সাক্ষাৎ হয়েছে সে অভিভূত হয়েছে তাদের প্রাণবত্যায়। কলিন্স এমনই এক সাধারণ চরিত্র। মেরিয়নের আগে কলিন্সের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। কলিন্স বইয়ের দোকানদার। এবং একজন খাঁটি কর্মিষ্ঠ ইংরাজ তনয়ের মতো সে বইয়ের দোকানী হয়েই খুশিনয়, হতে চায় প্রকাশক, নিউ ইয়র্কে থাকবে তার শাখা আপিস। কলিন্স মেরিয়নকে দিয়ে বাদল জীবনের সহজ রূপসাধনাকেও বুঝল না, দেখল শুধু।

তাই বাদল যেখানে গিয়ে পৌঁছল সর্ববিধ অহমিকামুক্ত সেই উপসংহার, সেখানে সত্যের সাক্ষাৎ মিলল না। দেশলাই-বিক্রেতার জীবনে একটা করুণ ব্যাঙ্গনা-গৌরব আছে হয়তো, কিন্তু সত্য গৌরব কোথায়? শ্রেণী পরিচয়ে মানুষের পরিচয় না থাকতে পারে কিন্তু বিমুক্ত মানুষের Free-will-এর যে পরিচয় বাদল খুঁজছিল দেশলাই-বিক্রেতার জীবনে কি তার ইঙ্গিত লভ্য? আসলে বাদলের চরিত্র পরিকল্পনায় এবং তাকে উপস্থানে উপস্থাপনায় অনুরা-শঙ্করের একটি মূলগত ত্রুটি ঘটেছে। বাদলের বীর্যবান সারল্য প্রশ্ন-চিহ্নের পক্ষে উপযুক্ত নয়, এটা প্রথম ত্রুটি। দ্বিতীয় ত্রুটি যতগুলি তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্রের সঙ্গে বাদলের সম্পর্ক ঘটেছে তারা সকলেই উপসংহারে উপনীত চরিত্র। ওয়েলি মারউড তার উজ্জ্বল উদাহরণ। অতীত থেকে পিউ ব্যতিক্রম নয়। ফলে এদের উপসংহার থেকে বাদল কোনো উপক্রমণিকার সন্ধান পেল না। ওয়েলির কাছ থেকে সমুদ্রতীরে গমন এবং উদ্দাম জীবনের প্রয়াস যতটা ওয়েলির কাছ থেকে পলায়ন ততটা ওয়েলির প্রতিক্রিয়া নয়। শুধু একটা বিপরীত ছক সৃজন। আবার ওখান থেকে মারউডের অভিজ্ঞতায় যাওয়াও কোনো জিজ্ঞাসার বিস্তৃতি-সাধন নয়। ফলে কমিউনিস্ট বাদল, মিস্টিক বাদল, নানা বাদলের দেখা পেলাম বটে কিন্তু তার অন্তিম পরিণতিকে কোনো সত্য জিজ্ঞাসার অপরিহার্য ফল বলে মেনে নেওয়া গেল না। বড়ো বড়ো রাশি বসানো হল। যোগফলে এত বড়ো শূন্য সেই রাশিগুলিকে মিথ্যা করে দিলে বলে বাদলের যাত্রা দুর্বল হয়ে গেল।

সেদিক থেকে উজ্জয়িনী এবং সুধী এ-উপন্যাসের বলিষ্ঠ নির্ভর। উজ্জয়িনী আমাদের কাছে আদি অস্ত সমেত পূর্ণ এক নারী হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত। উজ্জয়িনীর পিতা, উজ্জয়িনীর স্বশুর, যোগানন্দ এবং মহিমচন্দ্র, উজ্জয়িনীর সখিবৃন্দ, স্বদেশে-বিদেশে তার অভিজ্ঞতা সব মিলিয়ে সে শুধু সংকটাক্রান্ত মানবাত্মা নয়, সম্ভবত আধুনিক ভারতবর্ষও। উজ্জয়িনীর পিতা এবং উজ্জয়িনীর স্বশুর আধুনিক ভারতবর্ষের দুই রূপ। এখান থেকে উজ্জয়িনীর শুরু। কাজেই এই উভয়ের সামান্য পরিচয় গ্রহণ করা প্রয়োজন। উজ্জয়িনীর পিতা নব্য ভারতবর্ষের একদিক। সেদিকে তার সংস্কারমুক্ত মানসিকতায় পাশ্চাত্য ভাবাকাশের উজ্জল আলোকবশ্মির প্রতিফলন। উজ্জয়িনীর স্বশুর ভারতবর্ষের বিকৃতির চিহ্নধর। স্বশুরবাডিতে উজ্জয়িনীর কোনো পরীক্ষার আয়োজন লেখক করেননি। ব্রিটিশ উপনিবেশের চাকুরিঅস্ত আভিজাত্যের রায়বাহাদুরীর প্রতীক উজ্জয়িনীর স্বশুর। মিসেস শ্রামুয়েলসের অবতারণা করিয়ে লেখক এই ভঙ্গলোকের হাংলামিকে চূড়ান্ত কণাঘাত করেছেন। বিদ্রূপ যে অন্নদাশঙ্করের স্বক্ষেত্র নয় উজ্জয়িনীব স্বশুরের কাঙালপনাকে কুকুরের হাংলামির সঙ্গে তুলনা করে তা তিনি প্রমাণ করেছেন। এ-আঘাতে আমাদের লৌকিক ক্রোধের নিবসন ঘটে বটে, কিন্তু বিদ্রূপের আতিশয্য বোধহয় এই গভীর যন্ত্রণা-মথিত উপন্যাসে সুসঙ্গতি লাভের উপযুক্ত বিষয় নয়। সে যাই হোক এখানে উজ্জয়িনীকে আকর্ষণ করত—সম্ভবত এই বাড়িরই পিঙ্গল প্রাণহীনতার প্রতিক্রিয়ায়—পাশের বাড়ির ছোট সাধারণ শ্রমক্লান্ত পবিবাবের দাম্পত্য জীবন। যে আত্ম-নিবেদনের থালা পূর্ণ করার সাধনা উজ্জয়িনীর—এই ছোট পরিবারের রূপকে হয়তো তারই কিছু আভাস সে পেয়েছিল। ওদিকে ছিল তার পিতার প্রভাব। যে পিতা সম্বন্ধে ইংলণ্ডে একদা সূচীমুখ জিজ্ঞাসার যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে সে ভেবেছিল : ‘অস্তুর উদ্বেল হল। তাব সেই স্নেহের বাবাটি নেই। বেচারী বাবা। কেউ তার মর্যাদা বোধেনি, না ঘরের লোক, না বাইরের লোক কেউ তাকে চিনত না, তিনি ছিলেন মনের গহনে একাকী। সেই উপেক্ষিত বাবা, পরাজিত বাবা, নিরহংকার ও নিঃসঙ্গ বাবা আজ নেই।’ নিঃসঙ্গ একাকিত্বের সাধক উজ্জয়িনীর পিতাকে আমরা মাত্র উজ্জয়িনীর চোখ দিয়েই দেখেছি। চরিত্র হিসাবে সেই বিড়ম্বিত স্বতন্ত্রতার সাধক মানুষটি আমাদের কাছে তত স্পষ্ট নয়। বাবা এবং স্বশুর দুজনেই শুধু উজ্জয়িনীর ভূমিকা। যে নব ভারতবর্ষ উজ্জয়িনীকে

রূপ দিতে চেয়েছে তার দুই দিক এঁদের দুজনের মধ্যে।

উজ্জয়িনীর প্রশ্ন কাকে দেব আমার জীবনের নৈবেদ্য? ‘আমি যদি পাখি হতুম, উজ্জয়িনী ভাবে, আমার কোনো প্রশ্ন থাকত না। আমি অসংশয়ে বাঁচতুম ও তেমনি সহজে মরতুম। আমার আসা-যাওয়ার চিহ্ন রইত না। আমি যদি গাছ হতুম তবে তো আমি ভাবতুমই না কোনো কথা। আমি অকারণে বাঁচতুম ও কখন এক সময় চূপ করে মরে যেতুম। কেউ মনে রাখত না যে এখানে একটা গাছ ছিল। আমি যদি পতঙ্গ হতুম তবে হয়তো জানতুমই না যে বেঁচে আছি কি মরে গেছি। আফসোসের বিষয় আমি মাহুষ। তাই প্রশ্ন ওঠে বেঁচে কি হবে? কার জন্তে বাঁচব? কার কাছে আমার আদর?’

উজ্জয়িনীকে অনেক কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়। মিলিয়ে নেওয়া যায় ভারতীয় রসসাধনার ধারার সঙ্গে। মিলিয়ে নেওয়া যায় প্রেমধর্মের নায়িকা রূপে, সত্যাসত্যের পরে অন্নদাশঙ্করের প্রেমের উপন্যাসের নায়িকাদের মুখপাত হিসাবে। দেখা যায় তাকে সংকটাক্রান্ত মানবাত্মার রূপকে, চেনা যায় তাকে চিরকালের রাধাভাবের আখরে চিহ্নিত বলে। এগুলিই উজ্জয়িনীর শক্তির নিদর্শন। আসলে উজ্জয়িনী জীবনের ভাস্বর নিদর্শন, অন্নদাশঙ্করের জীবনার্থ। উজ্জয়িনী কেন দে-সরকারকে গ্রহণ করেছিল মাত্র এই অভিযোগে উজ্জয়িনী চরিত্রের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। কিংবা রূপক সাহিত্যের সনাতন রীতি অনুমোদন করলে এমন উপসংহার কল্পিত হত না—ডাঃ ঞ্জকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই মন্তব্যেও উজ্জয়িনীর স্বরূপ নির্ণয় হবে না। শূন্যেরে করিব পূর্ণ এই ব্রত বহিব সদাই—এমন ধরনের একটা লাবণ্য-স্বলভ জীবনার্থ-বোধ উজ্জয়িনীর ছিল এমনও নয়। উজ্জয়িনীর সমস্ত জীবন এবং মনন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সে যা খুঁজেছিল তা হল কিসে তার সার্থকতা। উজ্জয়িনী গোটা জীবনের রূপক বলেই রূপকের ক্লাসিক বন্ধনগুলি তার প্রসঙ্গে শিথিল। সে বারবার বলেছে আমার মূল্য কোথায়। উজ্জয়িনী বীণাকে দেখে যা বুঝেছে সেইটাই প্রকৃতপক্ষে তার প্রধান উপলব্ধি। সেইটাই বস্তুত তার স্থায়ীভাব। তার পরের যা কিছু সমস্তই অকৃতার্থতার অস্থিরতা থেকে। বাদলের জন্ম রয়েছে তার আকুলতা অথচ বাদলের জন্ম যদি তার ‘মানব জমিন রইল পতিত’ হয় তাহলে সেই চরম অচরিতার্থতায় সাঙুনা কী? তার রাধাকৃষ্ণ, তার মক্ষিরানীবৃত্তি, তার সকল কিছুর মধ্যেই এই অস্থিরতা। এই লক্ষণ নিঃসন্দেহে এক যুগের ‘সংকটাক্রান্ত

মানবাত্মারই' লক্ষণ। যে যুগে মানুষ সার্থকতার পথ সন্ধান করে ফিরেছে—পথ কোথায় হয়তো কেউ কেউ তাদের মতো করে সে-কথা জেনেও ছিল কিন্তু অন্ত সকলের জটিল পথের অরণ্যে তাদের পথের মুখ গিয়েছিল হারিয়ে। চূড়ান্ত হতাশার মাঝখানে উজ্জয়িনী যখন বলছে 'কেন বাঁচব' তখন তার সঙ্গে দেখা হয়েছে ললিতার। স্বামীপুত্রের সম্পদে একদা-ধন্য কিন্তু বর্তমানে সর্বরিক্ত এই নারীর প্রথম প্রবেশ শোকের শাস্ত পদক্ষেপে, অচিরেই কথা বলতে বলতে ললিতা জীবন্ত হয়ে উঠে উপস্থাপিত করলে তার মোক্ষম প্রশ্ন 'কেন বাঁচব না?' 'তুমি জীবনের স্বাদ পেয়েছ, যদিও সাধ মেটেনি তোমার। তোমার পক্ষে বলা সাজে, জীবন নিয়ে কী করব? কিন্তু জীবনের সিংহদ্বারে প্রবেশ করবার সময় যার চোখের ওপর দ্বার বন্ধ হয়ে গেল, প্রাণের পেয়ালাখানি তুলে ধরে পান করবার সময় যার মুখ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল, তার পক্ষে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করা ছি আমি, কেন বাঁচবে না?' এই প্রশ্নে উজ্জয়িনীর আবেগদীপ্ত সিদ্ধান্ত-বাচন— ঠিক। কেন বাঁচব না। কেন বুঝে নেব না আমার অধিকার, বুঝে নেব না কেন? অবশ্যই কথার আবেগে কথা। কিন্তু তার পরবর্তী জীবন কিছুটা এই বিশ্বাসেব বোধে চালিত। স্বধী-র কাছে প্রত্যাহত হয়ে দে-সরকারে আত্ম-সমর্পণও এই বোধের ফল। দে-সরকারের পরিবর্তনের মধ্যে উজ্জয়িনীর সার্থকতার সন্ধান মেলে। সেই দে-সরকার, যে সব সময়েই একটা না একটা অ্যাফেয়ারের নায়ক সে ধীরে ধীরে সোখিন প্রেমিকের বেশ পরিহার করে প্রেমের শুদ্ধ উপকূলে পৌঁছে গেল। এই উপনায়নের মূলে উজ্জয়িনীর প্রতি তার প্রেমের অনুভূতি। দে-সরকার সকল দিক থেকে জীবন্ত চরিত্র। স্বধী-র সঙ্গে উজ্জয়িনী সংক্রান্ত কথোপকথনের কালে স্বধীকে তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে, পরাজয়কে নিশ্চিত জ্ঞান করে সে যখন কথা বলছিল তখনই দে-সরকারের সমস্ত প্রবঞ্চিত জীবনের রূপ আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে। দে-সরকার-রূপী ধূলিমুঠিকে উজ্জয়িনী যখন নিজেব অজ্ঞানে সোনামুঠিতে রূপান্তরিত করে ফেলল তখন উজ্জয়িনীর সর্বরিক্ততাও কাঁড়াল হয়ে অপেক্ষমান। এই অবস্থায় দে-সরকারকে উজ্জয়িনী গ্রহণ করেছে। এই গ্রহণের ভিতরে অভিজ্ঞতা-দীর্ঘ জীবনের যন্ত্রণার ছায়া পড়েছে, জীবনের অনেক সম্ভাবনার ইঙ্গিত তুলে উঠেছে। এই দুই আলোকে উজ্জয়িনী পেয়েছে জীবনের স্পন্দন। এই উপন্যাসের একটা ব্যাপার লক্ষ্য না করে পারা যায় না। অনেক বিষয়ে দেখা যায় যে একের পরিণতি বা পরিস্থিতি দিয়ে অপরকে লেখক স্ফুটতর করছেন। উজ্জয়িনীর

উপসংহার এবং বাদলের উপসংহার যখন এইভাবে আমরা একত্র যুক্ত করে দেখি তখনই জীবনের অপচয় এবং সম্ভাবনার ব্যাপারটা আমাদের কাছে করুণোজ্জ্বল সমগ্রতা লাভ করে।

জীবনকে উজ্জয়িনী কোনো পূর্ব-নির্ধারিত দৃষ্টিকোণের সাহায্যে দেখেনি। সুধীও দেখেনি। তথাপি এই দুজনের মধ্যে সাদৃশ্য দুর্লভ। সুধী-র মার্সেলকে ভালবাসা আর উজ্জয়িনীর সোনিয়াকে আদর করার মধ্যে তফাত অনেক। একটা জীবন সম্বন্ধে স্নিগ্ধ প্রসন্ন মনোভাব থেকে উৎসারিত। আরেকটা অতৃপ্তি সজ্জাত। সুধী মানুষের দিকে তাকায়, প্রকৃতির দিকে তাকায়, আত্মার পূর্ণতার আনন্দের মনোভাব নিয়ে। সে স্থিতধী এবং স্থিত-প্রজ্ঞ। সে প্রকাশ্যভাবে ভারতবর্ষের কথা না বলেও ভারত আত্মার যথার্থ প্রতিভূ। সেদিক থেকে সকলের প্রিয় কিন্তু আপন অন্তরে একাকী, অথচ অপূর্ণতার কোনো গ্লানি যাকে স্পর্শ করেনি সেই সুধী যেন সত্যের প্রতীক। অন্নদাশঙ্করের রূপকাভিপ্রায় সুধীতে শিল্পসম্মত হয়েছে। এ-কথা বলার হেতু এই যে বাদলকে অসত্যের প্রতীক বলা দুষ্কর। তার সত্য-জিজ্ঞাসা কোনো ক্ষেত্রেই অসত্য নয়। উজ্জয়িনীর বাদলের জন্ম যে আকুলতা তাকেও সংকটের প্রতীক বলা যাবে না। লেখক সে কারণেই বলেছেন যে শিল্প নিজ নিয়মে সেই রূপকাভিপ্রায় খণ্ডিত করেছে। জীবন এবং শিল্পের নিয়ম মেনেও যেখানে এই রূপকাভিপ্রায়কে খণ্ডিত করা প্রয়োজন হয়নি সে হল সুধী। লেখকের জীবনবোধ-সজ্জাত যে বক্তব্য সেটা চরিত্র-পাত্রের বাইরে কোথাও নেই। বক্তব্য ও চরিত্রের পরস্পর ক্রিয়ার রূপার্থ সমন্বিত আধার-আধেয়ের রূপকে এ-ক্ষেত্রে লেখকের শিল্পোদ্দেশ্য সাধিত হয়। লেখকের গদ্য শৈলী নির্মাণে, ঘটনা সংস্থানে, চরিত্র উপস্থাপনার সর্বত্রই সেই পরস্পর সম্পর্কের অমোঘ প্রভাব। অন্নদাশঙ্করের সত্যাসত্যের শিল্পকর্মেও সেই প্রভাবের প্রসাদ মেলে।

তথাপি যদি ধরা যায় যে উজ্জয়িনী এবং সুধী-র মধ্যে তুলনায় সুধী রূপকে অধিকতর আভাসিত করেছে, তাহলেই শিল্পগত যথার্থ্যের দিক থেকে সুধী-র একক জয়লাভ সূচিত হয় না।

আগেই বলা হয়েছে যে অন্নদাশঙ্করের মহাকাব্যকল্প উপন্যাস-চিন্তায় প্রধান ত্রুটি ঘটেছে নায়ক চরিত্রের ক্ষেত্রে। নায়কের জীবনের দ্বন্দের ব্যাপারটা বুদ্ধির স্তরে সীমিত থাকায় আমাদের আপত্তি নেই। যদি সেটা চিন্তার সংকটের আকারে নায়কের জীবনকে নানাদিক থেকে ছায়াচ্ছন্ন করত তাহলে

নায়কের মাধ্যমে বা নায়কের চরিত্রের পরিভাষায় বলা লেখকের জীবনবোধ রূপান্তরিত হতে পারত। তখন যে-কোনো দিকেই সে হতে পারত বিচারের ঘাতসহ। নায়ক কল্পনায় এই ক্রটি লেখকের বক্তব্য-বিষয়ক অসঙ্গতির ফল বলে উপন্যাসের ভাষায় তার কিছু প্রকাশ ঘটেছে। মহাকাব্য-কল্প উপন্যাসে উপন্যাসের উপযুক্ত সংহতি নির্মাণে প্রয়োজনীয় নিরাসক্তি এ-ভাষা সর্বত্র রক্ষা করতে পারেনি। মহিমচন্দ্রকে উপলক্ষ্য করে শানিত ব্যঙ্গময়তা ভারসাম্যকে লঙ্ঘন করেছে। যে-কোনো স্বগত চিন্তায় কবির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বড়ো দ্রুত। অন্নদাশঙ্করের গল্প নায়কের মতো কিঞ্চিৎ অস্থিতমতি বলে মননের ভাষায় মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। উজ্জয়িনীর নিজের কথার পক্ষে তা মেয়েলি আটপোরে প্রসাদগুণে শক্তিময়ী। সেখানে আর একবার বোঝা যায় সত্যাসত্যের প্রধান শক্তি কোথায়। সংকটাক্রান্ত মানবাত্মার মুক্তি সভ্যতার নিজস্ব নিয়মের চেয়ে ব্যক্তির নিজের যন্ত্রণার পথে লভ্য এবং সাধারণ মানুষ হওয়াই মুক্তির পথ, এই টলসটয়ী বিশ্বাসের পক্ষে অন্নদাশঙ্করের সায় উপন্যাসটির নানা জটিলতার মধ্যে কখনও অম্পষ্ট নয়। সেদিক থেকে তিরিশের উপন্যাস-কীর্তিতে সত্যাসত্য বিশিষ্ট। আমরা যখন বিভূতিভূষণের আরণ্যক ও অন্নদাশঙ্করের সত্যাসত্যকে এই যুগের প্রসঙ্গে চিন্তা করি তখন বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাসে তিরিশের যুগের সর্বতোমুখী জীবন-জিজ্ঞাসার ব্যাপকতাকে কিছুটা বুঝতে পারি।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বুদ্ধির রৌদ্ররাগ-দীপ্ত পথের পথিক—কিন্তু কখনই সে বুদ্ধির উপাসক নন—‘কৈলাসেরে লক্ষ্য করে যে-দার্শনিক ছোঁড়ে শুধু টিল।’ যে বুদ্ধি আন্তো বস্তুকে ভেঙে ভেঙে টুকরো করে আবার সেই টুকরোগুলিকে খুঁজে এনে সমগ্রতা গড়তে চায় সে কখনও সমগ্রতার প্রসাদ পায় না। তিরিশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা অপ্রসন্ন সমগ্রতাকে সমগ্রতা বলেননি, তাঁদের মধ্যে প্রোট ধূর্জটিপ্রসাদ অন্যতম। এঁরা বুঝেছিলেন বুদ্ধি-চর্চা জীবনের বিকল্প নয়। অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহানা—এই উপন্যাস তিনটিতে সমগ্রতা-সন্ধানী (কেননা সমগ্রতাতেই সার্থকতা) আধুনিক মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধিজনিত যন্ত্রণারই প্রতিফলন ঘটেছে। এই উপন্যাসত্রয়ের প্রথম দুই ভাগের আলোচনায় উপন্যাস সম্বন্ধে বিষ্ণু দে মহাশয়ের বক্তব্য স্মরণীয়। তিনি বলেন—“পাত্রপাত্রী চরিত্র

উপন্যাসে আসলে একটা স্বসমুখ বা ইমার্জেন্ট ব্যাপার। লেখকের পুরুষার্থ ও তাৎপর্যার্থের আবশ্যিকতায় যে ছন্দ সমগ্র রচনার অস্থি মজ্জায় ছড়িয়ে পড়ে, সেই ছন্দের নির্দেশে, ভাষা ব্যবহারে, প্লটগতিতে, গল্পের বিকাশেই পাত্র-পাত্রীর আবির্ভাব। শুধু চরিত্রই যদি উপন্যাসের উৎস হত, তাহলে টলস্টয়ের সময় ও শাস্তি, তোমারের ওডিসি বা রবীন্দ্রনাথের গোরা, এমন কি প্রসূতির অতীতের অন্বেষণের মতো ব্যক্তিমনসর্বস্ব উপন্যাসের কার্যকারণ নির্ণয় করা যেত না। সূত্রে বিষয় ধূর্জটিবাবুও পুরুষার্থ যে তাৎপর্যার্থেই অস্তিত্ব পায় এ-কথা বোঝেন।” বিষ্ণুবাবু যে তাৎপর্যার্থের কথা বলেছেন শরৎচন্দ্রের বার্থ অনুকারীদের পরিস্থিতি সর্বস্বতায় বাংলা উপন্যাসে তার সংখ্যা বিরল। ধূর্জটিপ্রসাদের প্রধান কৃতিত্ব এইখানে যে তাৎপর্যার্থের সচেতনতা এবং উপন্যাসের রসত্রীর মধ্যে তার সেতুবন্ধন প্রায় সমাপ্ত। এই প্রায় শব্দটি অক্লেশে পরিহার করতে পারা যেত যদি রমলাকে যে-পরিমাণে হৃদয়বতী বলে মনে হল সেই পরিমাণে সংসার-লগ্ন বলে না মনে হত। হয়তো লেখক চেয়েছিলেন খগেনবাবুর নিজেকে আবিষ্কারের চকটি সম্পূর্ণ করতে। তাই ঈষৎ অমনোযোগ এসেছে কচিং কখনো অন্তদের ‘বেলায়। এবং এই অমনোযোগের দায়—শক্তিমান উপন্যাসিকদের রচনায় দেখা যায়—নারী চরিত্রগুলিই কমবেশি করে বহন করে। তাই দেখা যায় গোরা’র অগ্নিপরীক্ষা জীবনের বিভিন্ন অগ্নিকুণ্ডে যতটা তীব্র, সূচাবিতার হরিমোহিনীর বাড়িতে জীবন পরীক্ষা যেন সে তুলনায় অনেক নিস্তেজ। খগেনবাবুর অস্তির দীর্ঘবাত্রা ও রমলা’র আবেগময়তা কিছুটা ভারসাম্যের ব্যত্যয় ঘটিয়েছে এই ভাবেই। এই আবেগময়তা তার জীবনে উপযুক্ত আদ্যাব পায়নি বলেই এমনটা ঘটেছে। খগেনবাবুর চরিত্র-বীজ কিছুটা রিয়ালিস্ট গল্পে মেলে। শুধু সেখানে ছোট গল্পের মিত-পরিসরে যা কেবল এক চমকে গোটা অন্তরলোককে ক্ষণকালের জগ্ন উন্মোচিত করেছে—উপন্যাসের বিস্তৃত পটে স্থায়ী আলোক-সম্পাতে তাকে সমগ্র করে তোলা হয়েছে। সে আলোক-সম্পাত যেখানে যেখানে দৃঢ় হস্তে হয়নি রমলা চরিত্র তার মধ্যে প্রধান। রমলা’র জীবনে প্রেম কতকগুলি মানসিক প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কোনো বৃহৎ তাৎপর্য সৃজন করেনি। রমলা’র পরাভবের মূলে এই সত্য। ফলে অন্তঃশীলার অন্তঃশীলা নদীধারার জায় শক্তিশালিনী নারী মোহানায় গিয়ে শুষ্ক রঙিন বালুরাশি। খগেনবাবুকে দীর্ঘ টানাপোড়েনে সহায়তা করাতেই রমলা’র অধিকাংশ শক্তি ব্যয়িত হয়েছে।

সেদিক থেকে গ্রন্থত্রয়ের নামকরণ খগেনবাবুকে লক্ষ্য করেই হয়েছে বললে ভুল হবে না। খগেনবাবুর অন্তঃশীলা জীবন-পিপাসা সংসারের নানা অভিজ্ঞতার, আত্মনিরীক্ষার জটিল ঘূর্ণিগুলি পেরিয়ে মোহানায় উপনীত হয়ে খুঁজে পেয়েছে মানুষের জন্তু বেঁচে থাকতেই সার্থকতা। কিন্তু এই সার্থকতার মুখ তাকিয়েও এ-কথা না বলে উপায় নেই যে তিন খণ্ডের আয়তনগত বিশালতা পটভূমির বিশালতার বিকল্প হতে পারেনি। যে তাৎপর্যার্থ প্রথম খণ্ডের সৃজনে, সে তাৎপর্যার্থ বিজনে নেই। মাসিমার মৃত্যু অবশ্যই ব্যবহারযোগ্য ঘটনা, কিন্তু রমলার কাশীর অভিজ্ঞতা বক্ষ্যা। বিশেষত নায়কদের আলাপে এবং আলোচনায় যেখানে বিশ্ববীক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে সেখানে তাদের অকারণে যান্ত্রিক কথাবার্তার হাতে কেন যে ধূর্জটিপ্রসাদ তুলে দিয়েছেন বোঝা যায় না—অথচ সেখানে নায়কদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ছন্দেই যথেষ্ট তাৎপর্য তিনি সঞ্চার করতে পেরেছেন, বিশিষ্ট হয়েছে তাদের ভাষা, তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সকলই। যে বিশেষ শক্তিতে ধূর্জটিপ্রসাদ সম্পন্ন তা স্বধীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় ভাষায় এই : “অন্ততপক্ষে সব বুদ্ধিজীবীই বৈনাশিক নন, এবং মানুষের মধ্যে যেমন দেহ ও মনের দ্বিত্ব আছে, মনকে যেমন ভাব ও চিন্তায় ভাগ করা যায়, তেমনই বুদ্ধিও দ্বিমুখী—একদিকে বিকলনে ব্যস্ত, অন্য দিকে সংকলনে নিরত। ধূর্জটিপ্রসাদের বুদ্ধি এই শেষধর্মাবলম্বী।” কিন্তু নানা মতামত, নানা তত্ত্ব আবর্তের ভিতরে এত প্রবল যে সেখানে লেখকের মনোবা পাত্র খুঁজে না পেয়ে অনেক স্থলে স্বহস্তে পরিবেশিত হওয়ার ফলে লেখকের উক্ত প্রধান ধর্ম মাঝে মাঝে খণ্ডিত হয়েছে। এই ত্রুটি খুবই প্রভাবী হতে পারত। হয়নি কেবল খগেনবাবুর জগুই। “ধূর্জটিপ্রসাদের মন এমন অকপট, তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ এত ব্যাপক, তাঁর অনুসন্ধিৎসা এ-রকম মর্মস্পর্শী যে” বইখানি “আধুনিক জীবনযাত্রার প্রতীক হয়ে উঠেছে।” অবশ্যই খগেনবাবু এর মূলে। তিনি যেন চৈতন্যময় আধুনিক মানুষের প্রতিনিধি। মস্তক ও হৃদয়, বিশেষ ও সামান্য, প্রেম ও প্রভুত্বের উভয় সংকটের সম্মুখীন যে যন্ত্রণা খগেনবাবুতে তারই প্রতিবিম্ব।

কিন্তু যন্ত্রণার জন্তু যে তীব্র রঙের কথা আমরা কল্পনা করে থাকি তা আবার খগেনবাবু এবং তাঁর জগৎ সম্বন্ধে কতটা প্রযোজ্য সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। যে নিরাসক্তি নিয়ে খগেনবাবুর ভারত পর্যটন, অভিজ্ঞতার ঘাটে ঘাটে উত্তরণ সে নিরাসক্তি শিল্পীকে মানালেও মুক্তি-সন্ধানী নায়কের পক্ষে একটু দুর্বল হয়ে ওঠে। যে জ্ঞান ব্যক্তিকে জীবন সম্বন্ধে আগ্রহী করে, জীবনের ভগ্নাংশ কণিকা-

গুলিকে ফেলে সমগ্রের অভিমুখী করে অন্তঃশীলায় তা উপস্থিত। এবং আবর্তে জ্ঞানের নীরস বোঝার ভারে হুজুত। এটা মোহানায় ফের স্মৃতি ফিরে পেয়েছে কিনা তা বলা মুশ্কিল। শেষ পর্বে খগেনবাবুর কর্মযোগ এবং রমলাদেবীর প্রজাপতি-বিহার এক দুর্লভ্য বৈপরীত্য—অথচ এই রমলাদেবীকেই প্রথম পর্বে খগেনবাবুর আদর্শ নিকষে মনে হয়েছিল খাঁটি সোনা, সাবিত্রী (খগেনবাবুর আত্মহত স্ত্রী) যেন রাংতা। কিন্তু খগেনবাবুর এই প্রতি মুহূর্তের হয়ে ওঠার ভিতরে যে অজস্র মৃত্যুর যন্ত্রণা—যার অভাবে নব জন্মকে আমরা প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি না—সেটা অন্তঃশীলায় যত তীব্র, আবর্তে ও মোহানায় তত তীব্রতার প্রাণস্পর্শ পায়নি। অথচ অন্তঃশীলায় এই যন্ত্রণাকে ধারণ করার সর্বতোমুখী আয়োজন ছিল প্রস্তুত। মানুষ তার আত্মস্বরূপকে আবিষ্কার করে দীর্ঘ এবং ক্লান্তিহীন যাত্রার পথে। রমলাদেবীকে একদিন খগেনবাবু ভেবেছিলেন সমধর্মী। দীর্ঘযাত্রার শেষে যেখানে তিনি পৌঁছলেন সেখানে রমলাদেবীর থেকে জীবন বড়ো কথা। যাত্রার পূর্বেই খগেনবাবু ক্লান্ত এবং নীরক্ত—তাই যাত্রার যন্ত্রণা শেষ পর্যন্ত রঙ ফোটাতে পারেনি। এই নীরক্ত এবং ক্লান্ত মানুষটির চৈতন্য প্রবাহেও তাই পরম নিরাসক্তি। প্রথম পরিচ্ছেদে স্ত্রীর শবদাহ দেখতে দেখতে তার যে চিন্তাধারা তা নিঃসন্দেহে চেতনা-নদীর আত্মপ্রকাশ—জ্যেষ্ঠ প্রস্থের ছায়াচ্ছন্ন সে নদী।—

কাঠ ক্রমে ধরে উঠল, প্রথমে ধীরে ধীরে, খানিক পরে জোরে অতি শীঘ্র দাউ দাউ করে। মাথার একরাশ চুল গেল পুড়ে, কী দুর্গন্ধ যেন উঠল ফেন পড়েছে। সাবিত্রী একবার রাঁধতে গিয়ে উত্তরের ওপর ভাতের হাঁড়ি ফাঁসিয়ে ফেলে। তখন তার চুল আধখানা বাঁধা ছিল। তাই দেখে খগেনবাবু বলেছিলেন—যে রাঁধে সে বুঝি চুল বাঁধে না। সাবিত্রী ভীষণ রেগে উত্তর দেয়—এখান থেকে চলে যাও। চলে আসেন নাকে কাপড় দিয়ে... প্রত্যেক অঙ্গ গেল ঝলসে, পুট পুট করে শব্দ হতে লাগল। গা ফেটে জল বেরুচ্ছে।

গন্ধের অনুধ্বজে খগেনবাবুর অতীত জীবন মনে পড়া এবং ‘চলে আসেন নাকে কাপড় দিয়ে’ এই বাক্যাংশের ওপর ভর দিয়ে বর্তমানে ফিরে আসায় চেতনার প্রবাহধর্মিতা অনুসৃত হয়েছে। তিরিশের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ এবং গোপাল হালদার প্রবাহধর্মী চেতনার ব্যাপার প্রথমে উপলব্ধি করেন—আজ এ-শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে পৌঁছে এ-কথা আমাদের বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

কিন্তু এই মনে-পড়াকে অবলম্বন করে যদি আমরা ধূর্জটিপ্রসাদকে জয়েসীয় পদ্ধতির নিরীক্ষক বলি তা হলে ভুল হবে। বরঞ্চ “পুরুষার্থের তাৎপর্যকে” অনুসরণ করতে করতে তিনি একটা নিটোল কাহিনী গড়েছেন—বলাই বাহুল্য সে কাহিনীর সাদৃশ্য আমরা শরৎচন্দ্রে খুঁজে পাব না—পাব রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ নষ্ট নীড় জাতীয় সৃষ্টিতে, যেখানে কাহিনী শীর্ণ-শরীর তপস্বিনীর মতো বক্তব্যের আত্মাকে দীপ্ত করে তোলে। সে কারণেই এই উপন্যাসের যেখানে যেখানে ধূর্জটিপ্রসাদের ভাষায় নায়কের যন্ত্রণার ধ্বনি বেজেছে সেখানে কাহিনী-ধৃত মানুষটাকে বোঝা যায় সহজে—বোঝা যায় খগেনবাবুর পীড়িত অস্তিত্বের দাহ।—

শ্রদ্ধা তিনি করবেন না। শ্রদ্ধা নেই তার আর শ্রদ্ধা কী? এ-দেশে এ-সমাজে এ-যুগে শ্রদ্ধা অচল, চল হওয়া উচিত প্রায়শ্চিত্তের, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত, অপঘাত মৃত্যু কী দোষ করেছে, ধরা পড়েছে বিষ।

এই যন্ত্রণাময় মানুষটাই যখন অনুভব করে দুঃখের কাব্যময় গোপন পদসঞ্চারকে তখন ভাষায় ধূর্জটিপ্রসাদের বিপরীত কণ্ঠ শুনে আমরা বিস্মিত হলেও পুলকিত না হয়ে পারি না।—

দুঃখ আসে বনের মাঝে সন্ধ্যার মতন, ধীরে গোপন সঞ্চারে আমার প্রিয়ার মতো তার নয়গতি। দুঃখ নামে করুণার মতন আমার প্রিয়ার মতো বিপদ-মাথা স্থিত হাস্যময়ী মুখটি নিয়ে, দুঃখ আচ্ছন্ন করে আমার প্রিয়ার চোখে অশ্রুফণার মতন। যমুনার কালো জলে ডুবে যাবার যে আনন্দ গোপিকাকে আবিষ্ট করে, আজ আমার মন সেই আনন্দে ভরে উঠেছে। দুঃখ রূপান্তরিত হল।

বুদ্ধির উগ্র প্রহরায় ক্লান্ত মন মুক্তি খুঁজছে—এই হল ধূর্জটিপ্রসাদের বিষয়। সজোদ্ধিত অংশটিকে আমরা মনে করতে পারি খগেনবাবুর ক্ষণিক মুক্তির দীর্ঘশ্বাস। তাঁর গছের যুক্তিপন্থী কাটা-কাটা গতি এখানে পরিত্যক্ত। কিন্তু এ-মনোভাব ক্ষণিকের বলেই তার প্রতিকলন-স্বরূপে গড়েও কবিত্বের আতি-শযা ঘটেছে। ধূর্জটিপ্রসাদ সাধারণ লেখকের মতো এ-সমস্ত অংশে পূর্বাভাস সূচিত করেন না। আধুনিক মানুষের প্রতি মুহূর্তটাই সত্য—তাই তার অতীত নিয়ে অশ্রুপাত ও বর্তমান নিয়ে ব্যঙ্গ দুইই অচল। শুধু হয়ে-ওঠাকেই রূপময় করতে হবে, উপকরণের এবং লক্ষ্যের দ্বন্দ্বটা মিটিয়ে মিটিয়ে। এই উপন্যাসত্রয়ের প্রথম খণ্ডে তার সার্থক আশ্চর্য পরিচয় আমরা পেয়েছি এবং তা বাংলা সাহিত্যে

এখনও একক । “কর্মপ্রবৃত্তি অবরুদ্ধ হলে মানুষ বুদ্ধিজীবী হয়” এই সাধারণ সামাজিক সূত্রে, জীবননিষ্ঠ উপন্যাস শিল্পে প্রয়োগ করা অবশ্যই দুর্বল । শেষ দুই খণ্ডে সৃজন-বিজ্ঞান-রমণা খগেনবাবুর মতো তাৎপর্য পেলে এ-বইখানি কী হত সে আলোচনা না করেও এ-মন্তব্য আমরা স্বচ্ছন্দেই করতে পারি যে—তিরিশের দ্বিধামুক্তির মনোভাব যদি জীবন এবং শিল্পকে কোথাও কোথাও সাযুজ্যে নিয়ে গিয়ে থাকে অন্তঃশীলা তাদের অগ্রগণ্যদের মধ্যে ।

অন্নদাশঙ্কর এবং ধূর্জটিপ্রসাদ উভয়েই যথার্থ নাগরিক মানসের অধিকারী । এঁদের উপন্যাসেও স্বভাবতই সেই মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে । এঁদের বাদল এবং খগেনবাবু উভয়েই প্রকৃতপক্ষে জীবনের মুক্ত স্বরূপের সন্ধানী নায়ক । উভয়েই বিশ্ব-পথিক, দেশের এবং বিদেশের ধ্রুবলোক ও বহুতা নদীর প্রসাদ দুজনেরই সঞ্চয়কে সমৃদ্ধ করেছে । কিন্তু বাদল অপেক্ষা খগেনবাবুর পুরুষার্থের তাৎপর্য অবশ্যই গভীর । বাদলের উজ্জয়িনীকে ফেলে রেখে ইওরোপের জটিল আকাশের নিচে গিয়ে জীবনকে খোঁজা কতখানি সার্থক সে বিষয়ে আমরা ইতোপূর্বে সন্দেহ প্রকাশ করেছি, সে হিসাবে স্ত্রীর আত্মহত্যার পরে খগেনবাবুর অভিজ্ঞতার ঘাটে ঘাটে উত্তরণে অনেক বাস্তব যন্ত্রণার ব্যাপার । বাদলের এবং খগেনবাবুর উপসংহারে যে পার্থক্য তাব মূলেও এই জীবন-বোধের ভূমিকা । বাদল আমাদের প্রতীতি উৎপাদন করে না । অথচ মনে হয় খগেনবাবুর পটে অপূর্ণতা থাকলেও এমনটা ঘটাই স্বাভাবিক । আমাদের এই বোধ, উভয় ক্ষেত্রেই লেখকদ্বয়ের স্বদেশ-সভ্যতার ব্যাখ্যার তারতম্যের প্রভাব-জাত । বিরাট ইওরোপীয় সভ্যতার পটে সূনী যদিবা মানবিকতায় সার্থক, বাদল বহিরাগত বলেই ব্যর্থ—অথচ সে ব্যর্থতা নায়কের ব্যর্থতা নয়, পরীক্ষার ব্যর্থতা । পাত্র-পাত্রীর জীবনোদ্ভূত জটিলতাই মনোলোকে যন্ত্রণাব নানা আকার সৃষ্টি করে—ধূর্জটিপ্রসাদের অন্তঃশীলার খগেনবাবু তার নিদর্শন । যন্ত্রণা থেকে তর্ক এবং মননের টানাপোড়েনটা এসেছে এবং শেমোটের টানে আবার এসেছে নতুন যন্ত্রণা । এই দ্বন্দ্ব ছাড়া বুদ্ধিবাদী উপন্যাসে সার্থকতা অসম্ভব ।

রবীন্দ্রনাথ-ধূর্জটিপ্রসাদ-অন্নদাশঙ্করের বুদ্ধি-মার্গ বাংলা উপন্যাস জগৎকে যে আকর্ষণ করেনি চতুর্থ এবং পঞ্চম দশকের সৃজিত উপন্যাসরাজির দিকে তাকালে তা স্পষ্টই বোঝা যায় । সামন্ত-যুগাবশেষের ক্ষীণপ্রভ স্নিগ্ধ মায়ালোকের পিছুটান বাঙালী সমাজে যেমন কাটেনি, তেমনি তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে এই পিছুটানের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিষয়কে উপন্যাসস্থ করাও কঠিন । উপকরণের

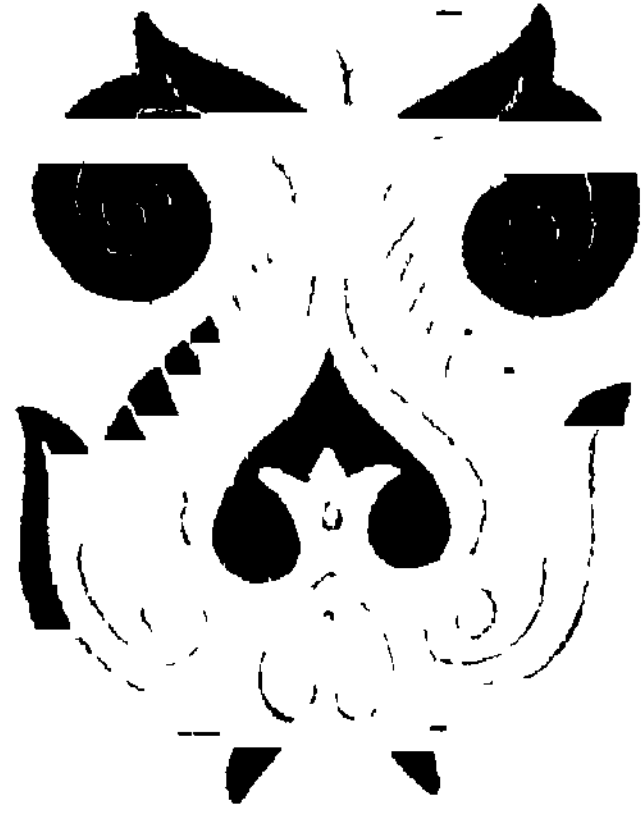
দেশ-নির্ভরতাকে মেনে নিয়ে ঔপন্যাসিককে অগ্রসর হতে হয়, তার সঙ্গে স্বন্দে, আপসে, জয়ে, পরাজয়ে, এক-এক দেশের উপন্যাসের এক-এক ধারা গড়ে ওঠে। আমাদের ব্যর্থ নাগরিকতা নিশ্চয় সার্থক উপন্যাসের প্রতিবন্ধক, যদি না তার মধোই আমরা ব্যক্তির স্বন্দময় জীবনোপকরণকে ব্যবহার করার দিকে ঝুঁকি। চতুর্থ এবং পঞ্চম দশকে সেই সুস্থ বুদ্ধিদীপ্ত জিজ্ঞাসার অনুসরণ ব্যাহত হয়েছে নানা ভাবে। সে-কথা আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে বলব। শুধু একটা কথা এখানে বলা দরকার। আমাদের এলোমেলো জীবনে বুদ্ধির দায়-দায়িত্বকে পালন করায় নিশ্চয় দুঃসাধ্য কর্তব্যপালনের গৌরব। বর্তমান কালের বাংলা উপন্যাসে সে দৃষ্টান্ত বিরল হলেও অলভ্য নয়। ধূর্জটিপ্রসাদের অনুবর্তী লেখক না হলেও আধুনিক জীবনের বহু স্রোতের কাটাকুটি খেলাকে পুরুষার্থের তাৎপর্ষে অস্থিত করে দু-একটি উপন্যাস রচিত রয়েছে। অসীম রায়ের এ-কালের কথা ও গোপালদেব তার মধ্য অন্ততম। অসীম রায়ের যেটা দুর্বলতা সেটা হল এই যে, তিনি আধেয়ের গৌরবকে আধাবের কার্পণ্যে লঘু করে ফেলেন। একালের কথা ও গোপালদেব সে দোষ থেকে কিছুটা মুক্তি পেলেও দ্বিতীয় জন্ম সেই দোষে ব্যর্থ। দায়িত্ব-গভীর অসীম রায়ের এই অসঙ্গতির অপনোদনে ধূর্জটি-প্রসাদের সৃষ্ট ঐতিহ্যের সফলতর পরিণতি এখনও ভবিষ্য-মুখাপেক্ষী। অসীম রায়ের সৃজিত আমাদের সীমিত মধ্যবিত্ত জীবনের বুদ্ধির খর্বতায় (‘বেঁড়েমি’) পীড়িত নায়ককুল এখনও বিরক্তির প্রাথমিক স্তর ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি।

তিরিশের সাহিত্যের সর্বতোমুখী বিস্তার উপন্যাসের ক্ষেত্রে আত্মমর্ষাদা অর্জনের কঠিন সাধনায় ত্রুতী থাকলেও সে সাধনায় পূর্ণসিদ্ধির পথে বাধা ছিল প্রচুর। আমাদের জীবনের উপকরণগত দৈন্য থেকেই যে প্রকরণগত ঔদাসীন্মের জন্ম তার পরিচয় বিভিন্ন সূত্রে তিরিশের উপন্যাসরাজির মধ্য মেলে। বৃহৎ পাঠক সমাজের ঝাঁক ছিল যেমন স্বয়ংসিদ্ধার মতো ইচ্ছাপূরণের কাহিনীর প্রতি অধিক, লেখক সমাজেও তেমন উপকরণগত দৈন্যকে বর্ণাঢ্যতায় ঢেকে ফেলার প্রয়াস। প্রমথনাথ বিশীর জোড়াদিঘির চৌধুরী পরিবার অথবা কোপবতী কিংবা বনফুলের দ্বৈরথ অথবা মৃগয়া-য় ঔপন্যাসিকের মানসদৃষ্টি খণ্ডিত হয়েছে। জোড়াদিঘির চৌধুরী পরিবার এবং দ্বৈরথের মতো উপন্যাস-বিভ্রমেরই পরবর্তী পর্যায়ে ঘটেছে (চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে) ইতিহাস-রূপকথার অশুভ-পরিণয়, যে সমস্ত রচনায় নিটোলতা হারিয়ে ফেলা হয়েছে উচ্ছলতায়। প্রমথনাথ বিশী

ও বনফুলের অসঙ্গতি এইখানে যে তাঁরা কন্টেণ্টের ব্যবহারতার ভিতরেই যে-প্রেরণা এবং নিষেধের দ্বন্দ্ব বিরাজমান তাকে জানেন না। এবং জানেন না বলেই যা এঁদের লক্ষ্য, সেই ফর্মের সাধনায় তদগত হওয়া এঁদেরও পক্ষে সম্ভব নয়। বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্করের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁদের উপন্যাসের প্রধান গুণ অভিনিবেশসম্পন্ন কন্টেণ্ট-জ্ঞান। এই গুণেই তাঁরা বনফুল প্রমুখ অপেক্ষা অগ্রণী উপন্যাস-শিল্পী। কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসাবে ব্যক্তিস্বরূপের বিকাশের ছন্দকে তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণ সঠিক অনুধাবন করেন না বলেই আবার ফর্মের প্রসঙ্গে এঁদের আগ্রহ শেষ পর্যন্ত দুর্বল। তাই তাঁরা তুলনায় শক্তিমান হলেও উপন্যাসের সমগ্র রস-রূপ রচনায় অতি অল্পক্ষেত্রেই সফল।

তাই যে-কটি জগদীশ গুপ্তের শিল্পী-জীবনে বিবর্তনকে সম্ভব হতে দিল না, সেই কটিই অন্য মূর্তি পরিগ্রহ করে বাধা দিয়েছে তিরিশের কনিষ্ঠতম কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে। উপনিবেশের চর ইসমাইলের কাহিনীতে যে বিষয়ী সম্ভাবনা তা মহাকাব্যোপম উপন্যাসের প্রতিশ্রুতিতে যুক্ত। নারায়ণবাবু যে তা উপলব্ধি করেননি, তাও নয়। তিনি পট-লগ্ন চরিত্রগুলিকে পটে বন্দী করে ফেলেন বলেই তাদের গতি এবং বিবর্তনকে হারিয়ে ফেলেন। এই অসঙ্গতিকে আবৃত করার জন্তই তিনি রোমান্টিক কল্পনাসিদ্ধ ভাষার আশ্রয়ী। অথচ ছোট গল্পেব সিদ্ধহস্ত শিল্পী নারায়ণবাবু সেই ভাষাতেই ছোট গল্পেব মুড়ে আশ্চর্য-রূপে লক্ষ্যভেদী। তিরিশের ঔপন্যাসিকদের সার্থক উত্তরাধিকারকে উপন্যাসে বহন করার কর্তব্য-বোধ চতুর্থ-পঞ্চম দশকে একমাত্র নারায়ণবাবুরই ছিল। সে উত্তরাধিকারের মূল কথা হল জীবন-প্রেম। এই জীবনপ্রেম-ভিত্তিক মূল্য-বোধকে নারায়ণবাবু গৃহদেবতার শ্রদ্ধায় দেখেন। কিন্তু যুদ্ধোত্তর জিজ্ঞাসার নিকর্ষে সেই শ্রদ্ধাকে তিনি যাচাই করেননি। তাঁর সম্বন্ধে এই কথাটিই সুখ-দুঃখ মিশিয়ে বলা যায়—তিনি কখনও পশ্চাদপসরণ করেননি, কিন্তু কখনও অগ্রগামীও হলেন না।

তিরিশের অসামান্য ঔপন্যাসিক প্রচেষ্টার এক বাহুতে তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-মানিকের প্রয়াস, অপর বাহুতে অন্নদাশঙ্কর-ধূর্জটিপ্রসাদের। কিন্তু এই দুই কোটির মধ্যে বাস্তবিক কোনো দ্বি-মেরু-ব্যবধান নেই। কল্পনার সঙ্গে মননের গায়কে যুক্ত করে তাকে জীবনরসে সম্বদ্ধ করে তোলাতেই তিরিশের সাধারণ সার্থকতা। একে দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর ঔপন্যাসিকেরা কতটা ব্যবহার করলেন তা পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচিত হবে।



উদ্ভাস্ত বর্তমান এবং বাংলা উপন্যাস

•• এক ••

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে, যুদ্ধ যখন বাংলা দেশের দোর-গোড়ায় এসে উপস্থিত হল, তখন থেকেই বাংলা উপন্যাসও এক অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হল। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, গণবিক্ষোভ ও দেশবিভাগজাত স্বাধীনতা চতুর্থ দশকেরই চারটে মাইলস্টোন—এগুলিকে পেরিয়ে চতুর্থ দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে, পঞ্চম দশকের শেষ পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের ক্লান্ত, স্থলিত গতি কচিৎ কখনো স্থির হয়ে ভার-সাম্যের প্রমাণ দিয়েছে বটে, নতুবা এলোমেলো পদক্ষেপেই তার লক্ষ্যহীনতার পরিচয় ক্রমশ প্রকট হয়েছে। এই লক্ষ্যহীনতার সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণ এই সময়কার ঔপন্যাসিক প্রচেষ্টাকে বোঝার জগুই বিশেষভাবে অসুসঙ্কেয়। নানা পরস্পর-বিরোধী কাঁটাকুটি খেলায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর জনমানসও ছিল যেমন খণ্ডিত, শিল্পীমানসের বৃহৎ অংশেও ছিল তারই অসুরূপ এক পহা-বিহ্বলতা। তৃতীয় দশকের সমস্ত জিজ্ঞাসার স্রোত যেন যুদ্ধোত্তর বালুকাময় খাতের ওপরে বিলুপ্ততায় মুখ গুঁজে-গুঁজে, কখনও নিজেকে হারিয়ে ফেলে, কখনও কোনো ঘোলা জলের ঝণ থেকে ঈষৎ গতি সঞ্চয় করে এগিয়ে চলছিল। এই প্রায় বিশ বছরের উপন্যাস প্রয়াসের প্রথম পরিচয় কতকটা এই:

(ক) যুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষের সময় লেখা উপন্যাস। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ আরো অনেকের লেখা উপন্যাস এর মধ্যে পড়ে। আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা অনেকগুলি উপন্যাসও এই সময়ের কীর্তি। নারায়ণবাবুর অনেক ছোট গল্প ও দু-একটি উপন্যাসও এই পর্যায়ের স্মরণীয় প্রয়াস। গোপাল হালদারের

উনপঞ্চাশী, পঞ্চাশের পথের কথাও আমাদের মনে পড়ে।

(খ) অব্যবহিত-পূর্ব যুদ্ধ ও পরবর্তী কালের গণবিক্ষোভের পটে লিখিত উপন্যাস। সতীনাথ ভাট্টার জাগরী, তারাশঙ্করের ঝড় ও ঝরা পাতা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিহ্ন এবং এই ধরনের আরো কিছু প্রয়াস এ-প্রসঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা। আয়তন এবং পরিমাণ উভয়ের দিক থেকেই এটি অতি সংক্ষিপ্ত পর্যায়।

(গ) প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়েছে রম্যরচনার অজস্র ধারাবর্ষণ। দৃষ্টিপাতের ও দেশে-বিদেশের জয়যাত্রা লেখকদের আকর্ষণ করেছে এবং সংখ্যাগণনার বাইরে চলে গেছেন রম্যরচনার লেখকেরা।

(ঘ) বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসগত পশ্চাদপসরণ ও ভৌগোলিক সীমা বিস্তৃতিও এবারে শুরু হল। বিমল মিত্র, রম্যপদ চৌধুরী, প্রাণতোষ ঘটক, সমরেশ বসু, সতীনাথ ভাট্টা, অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রমুখ নবীন লেখকেরা যোগ দিলেন মনোজ বসু, তারাশঙ্কর, প্রমথনাথ বর্মা ও বিভূতিভূষণের সঙ্গে। পাঠকমহলে এই অংশই চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন।

(ঙ) সমকালীন কলকাতার অবক্ষয় ও মূল্যবোধের বিপর্যয়ের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, সন্তোষকুমার ঘোষ ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র এ-প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম।

(চ) জীবনের দ্বন্দ্বিক সমগ্রতার ওপর স্থাপিত এবং বৃহৎ এপিক-লক্ষ্য উপন্যাস। অসীম রায়, গুণময় মাস্তা, (গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের একটি উপন্যাস) অমিয়ভূষণ মজুমদার প্রমুখেরা এই ক্ষুদ্র কিন্তু তাৎপর্যময় অংশের প্রধান কয়েকজন।

এখন আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কোনো কারণগত যোগসূত্র আবিষ্কার করা যায় কিনা দেখা যাক। ক-পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে দুর্ভিক্ষের মূল হিসাবে চোরা-গহ্বর ও তার সঙ্গে যুদ্ধরত মানুষের কথা প্রধান হয়ে উঠেছে। মানুষ যে তখনও প্রতিকূলতার কাছে সমপিত-প্রাণ নয়—জীবন যত দুর্বিষহ হোক না কেন, মৃত্যু যে তার বিকল্প হতে পারে না এ-বোধ তখনও বাংলা দেশের জনমানসে দৃঢ়। তখনও সামনে রয়েছে ঔপনিবেশিক ইংরেজ প্রভুরা, গণ-আন্দোলনের প্রত্যাশা ও বাসনা। তিরিশের জের টেনে জীবন তখনও, যত অস্পষ্ট ভাবেই হোক, আশাবাদী। যুদ্ধের ঠিক শেষ মুখে যে

গণ-বিক্ষোভের তরঙ্গ তাতে জীবনের সেই বাসনারই অভিব্যক্তি। মন্বন্তরে, ঝড় ও ঝরা পাতায়, শিলালিপিতে, চিহ্নে এই সময়ের হস্তাক্ষর স্পষ্ট। তখনও পর্যন্ত জীবনের প্রতি যে বাস্তব আগ্রহ উপন্যাসের আত্মা, তারই প্রতিফলন খুঁজে পেয়েছি আমরা গণ-আন্দোলনের প্রতি লেখকদের আগ্রহে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপান্তর এবং নবেন্দু ঘোষ ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য-প্রয়াস তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যুদ্ধের সময়ে যে প্রগতি-লেখক আন্দোলন লেখক মহলে প্রভাব বিস্তার করেছিল—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত। কিন্তু বাইরের দিক থেকে যে কারণে প্রগতি-লেখক আন্দোলন আর অধিকতর প্রসারিত হতে পারল না, সেই কারণেই বাংলা উপন্যাসেরও এল গতিচ্যুতি ও পদস্থলন। দেশবিভাগজাত স্বাধীনতায় প্রকৃতপক্ষে আমাদের ইতোপূর্বে কুঠারাহত আশাতরুকে সঞ্জীবিত কবে তোলার কোনো মন্ত্রের সন্ধান মিলল না। দেশবিভাগে ছিন্নমূল-জনতার জীবনেও এবার নেমে এল মূল্যবোধ বিনষ্টির দুর্দিন। তখনকার গণ-আন্দোলন হয় অতি-বামপন্থায় উন্নত, নয় পরম নিশ্চিত্তে অন্ধ। এদিকে সাম্প্রদায়িক হানাহানি, ওদিকে অগ্নিগর্ভ বাংলার গ্রাম জীবন। এই বিপর্যস্ত মূল্যবোধের মাঝখানে হারিয়ে গেল জীবনের পরম সহিষ্ণু অথচ জিজ্ঞাসু সম্মুখ-দৃষ্টি। স্বভাবতই শিল্প-জীবনও গভীর আঘাত পেল। জীবনের সং সন্ধিৎসু চেষ্টার নিদর্শন হিসাবে গুণময় মান্নার লখিন্দর দিগার এবং অসীম রায়েব একালের কথার মতো শিল্প প্রয়াসের সাক্ষ্যের কথা অবশ্যই উঠবে—কিন্তু তাতে গোটা জীবন এবং শিল্পের যে চেহারা তাতে উপলব্ধির কোনো রকমফের হয় না। এ-সময়ের পাঠকদের আগ্রহও এই সমস্ত রচনায় বিশেষ ছিল না। জীবন সন্মুখে আগ্রহশূন্যতাই ধীরে ধীরে তার অধিকার বিস্তার করছিল। যে মূল্যবোধগত নৈরাজ্যের ফলে রাষ্ট্র এবং সমাজের পরস্পর ঔদাসীন্যে পাঠক সমাজের এই শূন্যমনস্কতা গড়ে উঠল তার চেহারা এই :

(ক) জীবনের প্রধান দাবি অর্থাৎ জীবিকার দাবি দারুণভাবে আহত হল। জীবনযাত্রার সূস্থ মানোন্নয়নের জন্ত যে শ্রমজীবী-সমাজের দাবি তা মধ্যবিত্তের আবেগময় সমর্থন থেকে বঞ্চিত হল দু-কারণে। এক, দেশভাগের ফলে কলকাতার মধ্যবিত্তের বহুলাংশের পূর্ব-বাংলার গ্রামীণ শিকড় ছিঁড়ে যাওয়ায়, তারা হারিয়ে ফেলল অর্থনৈতিক স্থিরতা। দুই, অর্থনৈতিক সংকটের প্রথম ঝাপটায় বাঙালী ব্যাঙ্কগুলিই প্রথম শিকার হওয়ার দরুন মধ্যবিত্ত মানসে দেখা দিল দারুণ প্রতিক্রিয়া। তৎকালীন

বাংলা দেশের কৃষক-আন্দোলন ও বড়ো বড়ো আমর-আন্দোলনগুলি এই কারণের জন্য পাঠক সমাজের বৃহৎ কল্পনাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তার প্রমাণ দীপক চৌধুরীর শব্দবিষ, সন্তোষকুমার ঘোষের কিছু গোয়ালার গলি ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বারো ঘর এক উঠোনের মতো আরো নানা রচনায় স্পষ্ট।

(খ) এতদিন পর্যন্ত আমাদের জীবনের প্রধান দুই ধারায় কোনো বিরোধ ছিল না। আমাদের প্রধান চাওয়ার বিষয় ছিল ঔপনিবেশিকতার হাত থেকে মুক্তি। যা কিছু আমাদের জট তার মূল নির্দেশ করেছি আমরা ঐখানেই। আমাদের ঐতিহ্যগত যা কিছু, সাংস্কৃতিক যা কিছু, সব কিছুকেই আমরা ঐ একই মুক্তিসাধনার কাজে লাগিয়েছি। বাংলাব সাংস্কৃতিক জীবনেব একটা সমগ্র একমুখিনতা গড়ে উঠেছিল জাতীয় সংগ্রামের উন্মেষের যুগে। আমাদের কালী অথবা দুর্গা দেশের জন্ত খজা ধারণ করেছেন, আমাদের কৃষ্ণের সুদর্শন চক্রও জাতীয় সংগ্রামে সৈনিকদেরই প্রেরণা জুগিয়েছে। রামকৃষ্ণের ভক্তিসাধনার থেকেও নৈতিক মর্যাদায় সঙ্গাসবাদীদের কাছে অধিক দীপ্যমান ছিল বিবেকানন্দের ‘নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য’। সুতরাং আমাদের ধর্মপ্রাণতায় ও মুক্তিপ্রাণতায় কোনো দ্বন্দ্বব বিরোধ ছিল না। কিন্তু যুদ্ধ পরবর্তীকালে, স্বাধীনতার পর সে সমগ্র একমুখিনতা হারিয়ে গেল। ‘নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য’ কিংবা ‘হে রুদ্র নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা’ প্রভৃতি মনোভাবের উপযুক্ত মধ্যবিস্তৃত জীবন-ভিত্তিক আধার গেল ভেঙে। নানা ঠাকুর, নানা স্বামী ও নানা অলৌকিক শক্তিময় লামা অথবা বাবাদের জন্ত অনেক ছোট-বড়ো আসন তখন দিকে-দিকে প্রস্তুত। ব্যাঙ্ক মালিক এবং চাকুরিহারা ও ব্যাঙ্কফেলে সর্বস্বহারা ছা-পোষা মানুষের আশ্রয় তীর্থ-সঙ্গম গড়ে উঠেছে এই সমস্ত আসনের পাদপীঠে। জীবনে যখন এবশ্প্রকার ক্লীবব ভক্তি সামাজিক কারণেই প্রবল হয়ে ওঠে, তখন স্বভাবতই সাহিত্যেও তার প্রতিফলন অবশ্যস্বাভাবী। আতুর ও পীড়িত মধ্যবিস্তৃতের সাঙ্কনার জন্ত সে-ব্যবস্থা সাহিত্যে করলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর পবনপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থে। বেদের লেখকের এবিধ ভক্তিরসাপ্রতি প্রায় জগাই-মাধাই উদ্ধারের আদর্শ স্থাপন করল। কিন্তু ব্যবধানটা এবার হল দূরত্বক্রম্য। বারো ঘর এক উঠোনে প্রতিফলিত সামাজিক পরিস্থিতি ও পরমপুরুষের জন্ত তদুপগতচিত্ততাকে

মেলানো কবি অমিয় চক্রবর্তীর সেই মহামিলনের দেবতার পক্ষেও অসম্ভব। উভয় দিকেই যখন নেতির বোধ প্রবল, তখনকার সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য আসলে রাষ্ট্রিক নৈরাজ্যেরই সন্ধান ; সামাজিক স্থিরাদর্শহীনতারই ফল।

(গ) পারিবারিক সম্পর্কগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক জটগুলি অতিমাত্রায় প্রকট হতে লাগল এ-যুগে। সতীত্ব-মাতৃত্ব-নারীত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত স্নিগ্ধ পবিত্রভাবে বিধৃত স্নকুমার বৃত্তিগুলিকে এতদিন জীবনে বড়ো মূল্য দেওয়া হয়েছে সেগুলি ভাঙতে লাগল কলকাতার ফ্ল্যাটে, রাস্তায়, বাস্তুহারা লাঞ্ছিত মানবতার সমাবেশে। চেতনায় এ-কথাটা পরিষ্কার হয়েছে যে অপরাধী ব্যক্তিকে সাজা দেবার মৌল প্রেরণা হওয়া উচিত সংশোধনী প্রেরণা কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি নিজে বৃহৎ অপরাধীগুলি সন্মুখে শিথিল। এই শৈথিল্য থেকেই দেহপণ্যা নারীদের সন্মুখে আমাদের মনে অনিবার্য ঘটনা-সঞ্জাত নিকপায় সহিষ্ণুতার বোধ জন্মাল। আমরা নিকপায় হয়ে যেমন চোরাকারবারীদের সহ্য করলাম তেমনি মেয়েদের দেহগত শুচিতা বোধের বিনষ্টিকেও সহ্যে পারলাম। এই ঔদাসীন্য এবং আগ্রহের অভাবের সামনে আমরা আত্মহত্যাকারীর নীরবতা পালন করেছি। কখন যে সমাজ-প্রদত্ত আচরণগত সীমা মুছে যেতে শুরু করেছে তা হয়তো মীরার ঢপুতে (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী) স্বামীটির আত্মহত্যার মতো ঘটনাব পর স্পষ্ট হবার কথা, তা যে হয়নি তাও তো প্রমাণ হল বারো ঘর এক উঠানের শেষে শিবনাথের স্ত্রীর শৈথিল্যকে (হঠাৎ বুদ্ধিমানের মতো) মেনে নেবার মতো ঘটনায়।

(ঘ) লক্ষ্যহীন অসংগঠিত যুবসম্প্রদায় সাংস্কৃতিক কোনো নেতৃত্ব পেল না কোথাও। যুদ্ধের সময়ে গণনাটা সংঘ প্রমুখ আন্দোলনের ভিতর দিয়ে লোক-জীবনের বেগবতী ধারাকে জানবার জন্য যে আগ্রহ সঞ্চারিত হল, অতি-রাজনৈতিকতার ঘূর্ণাবর্তে তা যেমন সংগঠনের দিক থেকে হারিয়ে গেল, তেমনি নানা দিক থেকে আহত লোক-জীবনের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ছন্দও বাহত হল গভীরভাবে। কলকাতায় পল্লী-সাংস্কৃতিক মেলা, রেডিওতে ভাটিয়ালির মতো কলকাতার পক্ষে মনোজ্ঞ হল মাত্র—আর কিছু নয়। উদ্ভ্রান্ত জট-পাকানো অবস্থার আর এক প্রমাণ রইল চলচ্চিত্রে আর আধুনিক গানে। কোনোটাই রসপিপাসার সঙ্গে যুক্ত হল না। এরা হল শুধু অতি মিষ্টমাত্র—শিল্পকর্ম নয়। একপ্রকার রুচির বিকারে আচ্ছন্ন হল সারা দেশ।

স্বভাবতই এমতাবস্থায় শিল্প-সাহিত্যের প্রাণদায়িনী শ্লিষ্ট শ্রোত দুই কুলের মৃত্যুবিকীর্ণ তটরেখার অগ্নিদাহের তাপে শুকিয়ে যাবার কথা। গেলও তাই। পাঠকদের, কাজেই বিভ্রান্ত লেখকদের কাছে, জীবন-বিষয়ক আগ্রহের কোনো স্থির আদর্শ রইল না। বঙ্কিমী যুগে ঔপন্যাসিকের আগ্রহ ছিল অদৃষ্ট-লাঙ্ঘিত পুরুষকারের যন্ত্রণা-মথিত হাহাকারের দিকে অথবা কর্মিষ্ঠ প্রয়াসেব দিকে। রবীন্দ্রনাথ জানতে চাইতেন মানুষের ব্যক্তিত্বের সমগ্রতা-সজ্জাত সমস্তাকে, শরৎচন্দ্র ভালবাসতে চাইতেন দুঃখী মানুষকে, তিরিশের লেখকেরা জীবনের বিস্তৃত, জটিল এবং রহস্যঘন অখণ্ডতাকে ধারণ করতে চেয়েছেন—জীবনতৃষ্ণার তাগিদে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এমন ধরনের ইতিবাচক কোনো মানসদৃষ্টির সন্ধান পাওয়া ছিল দুষ্কর। যে ঐক্যানুভূতির অলক্ষ্য সূত্রে এতদিনের সমস্ত প্রয়াস ধৃত ছিল তা তখন শতধাবিদীর্ণ। বিমুখ বর্তমান ও বিশৃঙ্খল ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অধিকাংশ লেখকদেরই মনে এল এক পঙ্গু অসহায়তাবোধ। এ-রকম অবস্থায় জনজীবনের শুষ্ক খাতে আশার ধারা সঞ্চারিত করতে হলে অবশ্যই গোটা সমাজেব দ্বান্দ্বিক চেহারার অনুধাবন প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ইতিহাসের কার্যকারণ পরম্পরায় সে দ্বন্দ্বময় স্বরূপকে তখন সমাজ-জ্ঞানের মুখস্থ করা সূত্র দিয়ে উপলব্ধি করা যায়নি। অ্যাভারেজ বাঙালী পাঠক তখন নিজের জীবনকে ঘূর্ণা করে বলেই সাহিত্য-দর্পণেও নিজেকে প্রতিফলিত দেখতে আগ্রহী ছিল না। এই মানসিক শূন্যতা পূরণের জন্য লেখকদের বৃহৎ অংশে তখন প্রয়াসও ছিল অন্তহীন। তারই পরিণতিতে দেখা দিল বিষয়বস্তু পরিবর্তনের তাগিদ। এই তাগিদের মধ্যে কতখানি স্বাস্থ্য ছিল, ছিল কতখানি জাতীয়-বেদনার মূল সন্ধানের প্রয়াস তার খানিকটা প্রমাণ আমরা পাই সময়ের বস্তুর উত্তরঙ্গের মতো উপন্যাসে। উত্তরঙ্গ, সাহেব বিবি গোলাম, আকাশ-পাতাল যেমন নবীন লেখকদের বিষয় পরিবর্তনের প্রয়াসসমূহের কয়েকটি, ইচ্ছামতী ও রাধা তেমনি তিরিশের প্রতিষ্ঠিত লেখকদের উক্ত প্রয়াসে যোগদানের দুটি উদাহরণ। অতীত জীবনাশ্রয় এর মূল কথা।

এই বিষয়বস্তুর পরিবর্তন-সাধনের আর এক মুখ অজ্ঞাতপূর্ব আঞ্চলিক জীবনের সন্ধানে সচেষ্ট হওয়ার ভিতরে। নিঃসন্দেহেই তৎকালীন মধ্যবিত্ত জীবনের হতাশাস ক্লান্তি থেকেই এই প্রয়াসের জন্ম। এখানেও শ্রমিক জীবন (বি.টি. রোডের ধারে), ধীবর জীবন (তিতাস একটি নদীর নাম অথবা সাম্প্রতিক কালের গঙ্গা), অস্ত্যজ-জীবন (ঢোঁড়াই চরিত মানস), নাগা পাহাড়ের কাহিনী

(পূর্বপার্বতী) প্রভৃতি নানা প্রয়াসের উল্লেখ করা চলে। লেখকেরা যা চেয়েছিলেন তার মধ্যে যে একেবারেই অকৃত্রিমতা অনুপস্থিত এ-কথা ঠিক নয়। বিমুক্ত, বলিষ্ঠ জীবনশ্রোত, উন্মুক্ত প্রকৃতি এবং জীবন-মৃত্যুর সূক্ষ্ম স্বাভাবিকতায় অথচ নিষ্ঠুরতায় একটা আলাদা স্বাদ আছে। যদিও হাঁসুলিবাঁকের উপকথার তারাশঙ্করকে অতিক্রম করা এঁদের কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি, তথাপি বিভিন্ন ভাবে এঁদের কীর্তির আংশিক সাফল্য উপভোগ্য। যে ক্লান্ত দ্বীপ-জীবনের মধুর জীবনশ্রোতের প্রতিক্রিয়াকে পরাস্ত করার জন্য মম সাহেবের লেখায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় পটভূমি উঁকি দিয়েছে, এখানে প্রেরণা তার চেয়ে খাঁটি ছিল। বিষয়বস্তুকে ব্যবহার করার সময় লেখকদের অনেকেরই দুর্বলতা প্রকট হয়েছে বটে, কিন্তু এদেশে, স্বাধীনতার পরে, আঞ্চলিকতার তাগিদের পশ্চাতে দেশকে জানতে চাওয়ার একটা অবচেতন তৃষ্ণা কাজ করেনি এটা ঠিক নয়।

অথচ সেই অবক্ষয়ের মুখোমুখি বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত জীবনের নানা স্তরের ভাঙনকে প্রত্যক্ষ করার সাহসও একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। বারো ঘর এক উঠোন, চেনা মহল অথবা মোমের পুতুলের মতো। উপন্যাসে সেই নানামুখী ভাঙনকে ব্যবহার করা হয়েছে। যে নৈরাশ্য এবং শূন্যমনস্কতা মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্ত সত্তাকে ফোঁপরা করে দিচ্ছিল তার বিকৃত প্রতিফলন এই সমস্ত উপন্যাসে মেলে। সচেতন পাঠকদের সীমিত পরিসরের কথা বাদ দিলে, অ্যাভারেজ পাঠক এই সমস্ত রচনায় বাস্তব-যন্ত্রণা-বিশ্ববণী কোনো উপাদান খুঁজে পায়নি। তাদের প্রাথমিক আকর্ষণ ছিল বরঞ্চ ইতিহাস-ভূগোলাশ্রয়ী উপন্যাসগুলির প্রতি। কিন্তু সচেতন পাঠক একটা কথা সেদিন অনুভব করেছিলেন। সেটা এই : উপন্যাসের শিল্পগত আত্মাকেই আমরা উপন্যাসের বিষয়বস্তুর ব্যবহারে খুঁজে থাকি। সেটা এ-জাতীয় উপন্যাসে সুলভ ছিল না, তথাপি সমকালীন দেশের মানুষকে নিয়ে লিখিত এই সমস্ত উপন্যাসের পরোক্ষ ধাক্কায় গড়ে উঠল বর্তমান বাংলা উপন্যাসের দুই রূপ। এক রূপে জীবনের বিশাল ভাঙা-গডাকে তার দ্বন্দ্বিক সমগ্রতাকে ধারণ করার প্রয়াস। অমিয়ভূষণ মজুমদার, গুণময় মান্না, অসীম রায় ও ননী ভৌমিক এঁদেরই কয়েকজন। আর একরূপে—অস্তিত্ব, বিশেষ কলকাতাই নাগরিক জীবনের অস্তিত্ব, যুদ্ধ পরবর্তীকালে যে মানসিক জটিলতার মধ্যে যন্ত্রণা-বিন্দু তার চেতনাবাহী সমগ্রতাকে ব্যবহারের প্রচেষ্টা। বিমল কর এঁদের পুরোধা। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ তরুণেরা এই নবীন নিরীক্ষার পথের

প্রথম পথিক । এখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরের কথাসাহিত্যের সমগ্র অবস্থাটার একটা রেখাচিত্র অঙ্কন করলে এই দাঁড়ায় :

॥ ইতাস্থাস সমাজজীবন ও বিপর্যস্ত মূল্যবোধ ॥

॥ উপন্যাসের বিষয়বস্তু পরিবর্তনের তাগিদ ।

। মধ্যবিত্ত জীবনের ভাঙন-ভিত্তিক রচনা ॥

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার

ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ।

॥ অতীত ইতিহাস ॥ অজ্ঞাতপূর্ব আঞ্চলিক

আশ্রয় ॥

জীবনাশ্রয় ॥

॥ নতুন রীতি চেতনা

॥ বিশাল স্বল্পময় জীবন-

সমরেশ বসু

মনোজ বসু

প্রবাহ ॥

ভিত্তিক ও এপিক-

বিমল মিত্র

সতীনাথ ভাট্টা

বিমল কর, দীপেন্দ্রনাথ

লক্ষ্য রচনা ॥

প্রাণতোষ ঘটক

সমরেশ বসু

বন্দ্যোপাধ্যায়

অমিয়ভূষণ মজুমদার

রমাপদ চৌধুরী

প্রফুল্ল রায়

মতি নন্দী, জ্যোতির্ময়

অসীম রায়

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

অদ্বৈত মল্লবর্মণ

গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ।

গুণময় মাল্লা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

প্রমুখ ।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

প্রমথনাথ বিনী প্রমুখ ।

ননী ভৌমিক

গৌরকিশোর ঘোষ

•• দুই

এখন আমরা এই সমগ্র অবস্থাটিকে বিশ্লেষণ করে দেখাব যে সং-সাহিত্যের জন্ম দায়িত্বশীল নির্মাতাকে কত পিছুটান এড়িয়ে এবং কাটিয়ে চলতে হয়েছে । দেখাব একবার এদিকে একবার ওদিকে পাড ভেঙে ভেঙে শিল্পহীন বাণিজ্যবুদ্ধি কেমন করে সব কিছু গ্রাস করতে চাওয়া সত্ত্বেও বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো একটি দুটি শিল্পকর্মে আমরা ভবিষ্যতের আশ্বাস পেয়েছি । প্রথমেই স্মরণীয়, উপন্যাসিকদের সং সন্ধিৎসু প্রয়াস বারে বারে খণ্ডিত হয়েছে নানাভাবে । পাঠক সমাজের উৎসাহহীন, পঙ্গু কোতূহলকে নিবৃত্ত করতে হয়েছে শিল্পীদের, যার জন্ম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘটনা-ঘন দিনগুলিতে । এই কোতূহলের অব্যবহিত পূর্বপুরুষ হল যুদ্ধকালীন সংবাদ-স্পৃহা । সংবাদ-স্পৃহা যে জীবন সম্বন্ধে আগ্রহেরই নামান্তর, সে কথা এ-গ্রন্থের প্রারম্ভে আমরা বলেছি । কিন্তু যুদ্ধের কালে সংবাদপত্রের

পাঠক-সংখ্যার সাধারণ বৃদ্ধির কালে সংবাদ-স্পৃহা মাত্র কৌতূহল-বৃত্তি। সমাচার দর্পণের পাঠক সংবাদের ভিতর দিয়ে জানতে চাইতেন দেশের নব রূপান্তরের কথা, ইংরাজি শিক্ষার বিস্তারের কথা, সতীদাহ-বিধবাবিবাহ, নীলকর দমন, প্রভৃতির বিবরণ। যুদ্ধপূর্ব জীবনে সংবাদ-পিপাসার মূল কথায় ছিল জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিবিম্ব। জাতীয় আন্দোলনের মত্তরতার কালেই ভাওয়াল মামলার বা পাকুড় মামলার প্রতি বিকারগ্রস্ত আসক্তি সম্ভব হয়েছিল। ঠিক সেই রকম যুদ্ধের কালে মানব-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের অন্ধকার দিনগুলিতে বড়ো বড়ো শহরের পতন, জাহাজডুবি, বিরাট পশ্চাদপসরণের সংবাদে (কখনও গোপন কখনও প্রকাশ্য) ছিল আমাদের আগ্রহ। আগস্ট আন্দোলনের অগ্ন্যজ্জ্বল দিন কটি ছাড়া এর ব্যতিক্রম অল্পই। সংবাদ-পিপাসা মানেই তখন ভিতরের খবর জানতে চাওয়ার বাসনা। কে হুনের চোরাকাববারে ফেঁসেছে, কে ধরা পড়ল লক্ষ লক্ষ টাকা চালের চোবাকারবারে, হিটলারের গোপন দূত হের হেস্ কী বলতে চায়—কেমন করে ডুবল বিসমার্ক, বেহাত হল সিঙ্গাপুর—এই ধবনের অলস কৌতূহল ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলল বিরাট পাঠকসমাজের উদ্দেশ্য-হীন মস্তিষ্ক। এ-যুগের উপন্যাস-রচয়িতা এই চরিত্রহীন কৌতূহল-বৃত্তিকে বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করেছেন।

দৃষ্টিপাত উপন্যাস নয় এবং আমাদের আলোচনার তালিকায় এ-জাতীয় গ্রন্থ স্বভাবাধিকারেই অন্তর্ভুক্ত নয়। তথাপি দৃষ্টিপাতেব সাফল্যের ভিতরে তার সাহিত্যিক গুণাগুণের সঙ্গে বাইরের দিক থেকে যা যুক্ত হয়েছিল তা এই সর্বব্যাপী অলস কৌতূহল। দিল্লীর আপাত-ওজ্জ্বল্যের অন্তরালবর্তী উঁচু তলার জীবনে যে অন্তঃসারশূন্যতা, তাব সঙ্গে মিশেছিল ক্রীপ্স প্রস্তাবেব বহুভাষ্য, আর এই দুটিই শেষ পর্যন্ত তলিয়ে গেল আধারকরের চকচকে জীবনের অন্তরালবর্তী নির্বোধ প্রেমের কারুণ্যে। এর মধ্যে কিছুটা সমাজদৃষ্টি অবশ্যই ব্যবহৃত হয়েছে এবং যে কাবণে বইখানির অসামান্য অশ্রুসজল জনপ্রিয়তা, সেই আধারকরের কাহিনী বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তা যদিও সংবাদধর্মী রিপোর্টাজ, তথাপি প্রচ্ছন্ন ব্যঞ্জে ওপরতলার কৃত্রিম জীবনকে বিদ্ধ করা হয়েছে বলেও এ-বই কম প্রশংসা, এবং ন্যায্য প্রশংসা, লাভ করেনি। আমরা আবারও বলছি যে দৃষ্টিপাত আমাদের আলোচ্য নয়—এবং এ-জাতীয় গ্রন্থ আলোচনা করলে সৈয়দ মুজতবা আলির অসামান্য জনপ্রিয় গ্রন্থ দেশে-বিদেশের কথাও আসে—সে ক্ষেত্রে আমাদের আলোচনা লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা বেশি।

আমাদের বলবার কথা শুধু এই যে, পাঠক-সাধারণের সংবাদ-স্পৃহা যে আতিশয্যকে যুদ্ধ-পরবর্তী যুগের একটা প্রবণতা বলে আমরা মনে করছি, দৃষ্টিপাত থেকে তাকে পরিচর্যা করা শুরু হল। এ-ব্যাপারে রম্যরচনার প্রকরণের সঙ্গে তৎকালীন উপন্যাস-সাহিত্যের উপকরণের একটা অলঙ্কা যোগসূত্র বিদ্যমান। এই পরিচর্যা-প্রবণতার ফলে যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের বৃহৎ অংশে কতকগুলি ঝোঁক স্পষ্ট হয়ে উঠল। সেগুলি এই :

(ক) পূর্বনো আমলের সামন্ততান্ত্রিক পরিবার-জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস-গুলিতে উক্ত জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব অপেক্ষা দুর্নীতি এবং বিলাসের বর্ণনার আতিশয্য। তারাক্ষরের সামন্ত-পরিবার-কেন্দ্রিক গল্প-উপন্যাসগুলিতে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ব্যবহার সেগুলিকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল, সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের বদলে উনিশ শতকীয় বা তারও পূর্বের সামন্ত পরিবেশের বাস্তব চিত্রটিকে খুঁটিনাটি বর্ণনায় নিখুঁত করে পাঠককে মুগ্ধ করার চেষ্টাই এ-সমস্ত উপন্যাসে প্রবল। বরঞ্চ বিষয়বস্তুর নিজস্ব তাগিদেই যেখানে এই ঝোঁকের হাত থেকে মুক্তি ঘটেছে সেখানে আবারও বোঝা গেছে বক্তব্যের সম্পদেই উপন্যাসেব শক্তিব উৎস। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছামতী ও সমবেশ বহুর উত্তরঙ্গে তার পবিচয়।

(খ) আঞ্চলিক জীবনাশ্রয়ী উপন্যাসগুলিতেও এই খুঁটিনাটি সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা সববরাহের প্রয়াসে পাঠকের কৌতূহলাতিশয্যকে তুষ্ট করার অহমিকাই সক্রিয়। পাঠক কত কম জানেন, তার ওপরেই যেন লেখকদের অভিজ্ঞতার প্রাসাদ নির্ভবশীল।

আঞ্চলিক জীবন এবং অতীত জীবন-আশ্রয়ী উপন্যাসগুলির এই প্রবণতা যে কেবল বাস্তব সম্বন্ধে জ্ঞানের আংশিকতাব পরিচায়ক তাই নয় উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীদের ব্যক্তিত্বরূপ সম্বন্ধে আকিঞ্চিংকর জ্ঞানের নিদর্শনও বটে। নায়ক-পরিকল্পনার দৈন্ত এ-যুগের উপন্যাস সাহিত্যের কেবল উল্লিখিত অংশেই সীমাবদ্ধ নয়। নায়ক-পরিকল্পনার দৈন্ত এ-যুগের উপন্যাসগুলির সাধারণ ব্যাধি। আমরা তারাক্ষর-সংক্রান্ত আলোচনায় দেখেছি যে এই দৈন্তের বোধ কেমনভাবে যুদ্ধের সময়েই তাঁর মধ্যে তীব্র হয়ে ওঠে, কেমন করে তা থেকে তিনি তাঁর শিল্পী-জীবনের চোরাবালির মধ্যে পড়তে চলেছেন। ব্যক্তির ভূমিকাহারা সামাজিক পরিবেশে, সেতুবন্ধন, নগর স্থাপন, বাধ নির্মাণ প্রভৃতির আমলাতান্ত্রিক যান্ত্রিকতায়, জনগণ-উদ্দীপনা-বঞ্চিত পরিকল্পনার সবকারী আড়ম্বরে হতাশাস

ব্যক্তিত্ব, এদেশে তখন লাহোর ও অবমাননার সম্মুখীন। এ-অবস্থায় লেখকদের পক্ষ থেকে নায়ক-সবল কাহিনী গড়ে তোলার প্রেরণা অনুভব করা ছিল দুর্লভ। ইতিহাসের এবং ভূগোলের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েও তাঁরা অতীতে এবং স্বদূরেও বর্তমানের স্বদেশেরই প্রতিফলন খুঁজে ফিরেছেন। একমাত্র সমরেশ বসুর উত্তরঙ্গে এবং গঙ্গায় এই সামগ্রিক অবস্থার ব্যতিক্রম প্রশংসার সঙ্গে লক্ষণীয়। লখাই এবং বিলাস তাঁর নায়ক-সবল কাহিনীর বলিষ্ঠ পরিকল্পনার প্রমাণ। কিন্তু তিনি উপন্যাসের পট এবং পটলগ্ন জীবনের পরস্পরের টানাপোড়েনকে সবটা চিনতে ভয় পান বলেই সে পরিকল্পনা শেষ তাৎপর্যে বঞ্চিত।

বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের তাগিদ থেকে যে দুই শাখা উদ্গত হয়েছে তাদের সাধারণ লক্ষণ যেমন বিবৃত হল, তেমনি মধ্যবিত্ত জীবনের সর্বাঙ্গীণ ভাঙনের বিষয় নিয়ে লিখিত উপন্যাসগুলিতেও কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ বিদ্যমান। যেমন :

(ক) গুণময় মান্না ও পূর্ণেন্দু পত্নী প্রয়াস স্ববর্ণে বেখেও বলা যায় উপন্যাসে গ্রাম হারিয়ে যেতে বসল। কলকাতাকেন্দ্রিকতা হল এই উপন্যাসগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভাঙনের তীব্রতা সর্বাপেক্ষা গভীরভাবে অনুভূত হয়েছে কলকাতায়—মূল্যবোধের বিপর্যয়গুলিকেও, রুচির বিকার-চিহ্নগুলিকেও সর্বাপেক্ষা বেশি প্রকট হতে দেখা গেল এখানে। কলকাতা এই সমস্ত উপন্যাসের ঘটনাভূমি হওয়ার ফলে জীবনের জটিলতাকে অবশ্যই ব্যবহার করা গেল, কিন্তু কলকাতাকেই গোটা দেশ ভেবে বসায় বিচ্ছিন্ন দৃষ্টির যা কুফল তাও ভোগ করতে হয়েছে। উপন্যাসগুলির অধিকাংশেরই অন্তরের কথা হল মধ্যবিত্ত হতাশা। সে হতাশার পাশাপাশি লখিন্দর দিগার উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাও বাংলার গ্রামে-গ্রামে ঘটছিল, কিন্তু কলকাতার হতভবিষ্যৎ মধ্যবিত্তের কাছে তা শুধু সংবাদ, অথবা সংবাদও নয়। কলকাতাকেন্দ্রিকতা বিষয়গত সীমাবদ্ধতার বীজ ছিল। অসীম রায়ের একালের কথা ও গোপালদেবের মতো উপন্যাসে কলকাতার জীবনের দ্বন্দ্বময় সমগ্রতাকে ব্যবহারের সং প্রয়াস সে-প্রসঙ্গে খুবই নিঃসঙ্গ প্রয়াস।

(খ) তিরিশের উপন্যাসে নারী চরিত্র প্রাধান্য কিঞ্চিৎ স্তিমিত ছিল। সার্থক নারী চরিত্র সৃজনের পাশাপাশি পুরুষ চরিত্রের প্রাধান্যই বরঞ্চ তিরিশের উপন্যাসের প্রাথমিক লক্ষণ ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কলকাতাই মধ্যবিত্ত জীবন-ভিত্তিক উপন্যাসে দেখা গেল নায়কের ঐতিহ্য রীতিমতো

আঘাত পেতে চলেছে। অনায়ক লক্ষণাক্রান্ত নায়কদের পাশে বরং নারী চরিত্রগুলির মানসিক জটিলতা শরৎচন্দ্রের পরে আবার লেখকদের অভিনিবেশের বিষয় হয়েছে। প্যাশন-বিহীন পিঙ্গল এই নারীচরিত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মরিড। মধ্যবিত্ত নায়কদের অবশ্যই আর ধাত্রী দেবতার শিবনাথ প্রমুখের আদলে চিন্তা করার অবকাশ সামাজিক কারণেই সম্ভব ছিল না। করতে গেলে তাদের কি রকম বেথাপ্লা লাগে সমরেশ বসুর ত্রিধারা উপন্যাসের নায়ক রাজেন তার প্রমাণ।

(গ) বুদ্ধদেবের তিথিডোর ছাড়া বিশুদ্ধ প্রেমের আখ্যানও আর নেই। তিরিশের কাল থেকেই অবশ্য প্রেমকে উপজীব্য করে লেখা উপন্যাসের সংখ্যায় ঘাটতি বিদ্যমান। এবং গোটা বাংলা উপন্যাসের বিস্তৃত ঐতিহ্যের দিকে তাকালে এ-কথাও মেনে নিতে হয় যে প্রেমের বিশুদ্ধ আখ্যানে আমাদের উৎসাহ বরাবর কম। ভারতী-র যুগের লেখকদের কারো কারো প্রয়াস স্মরণে রেখেও এ-কথার কোনো ঘোরফের হয় না। চতুর্থ দশকের বিপর্যস্ত মানসিক অশান্তির কালে প্রেমের বা প্রকৃতির বিশুদ্ধ আখ্যানের অবকাশ আর রইল না। নবেন্দ্রনাথ মিত্রের বস নামক বড়ো গল্পে প্রেমকে সামাজিক কর্মসূত্রের তাৎপ্যে গেঁথে গোটা জীবনের পটে ধারণ করে রস সৃজন করা হয়েছে। এমন ধরনের তাৎপ্যপূর্ণ প্রেমের কাহিনীর দ্বিতীয় নামোল্লেখ এই দুই দশকে সহজসাধ্য নয়।

(ঘ) হাশুরসের সম্পূর্ণ অবিস্মৃতিমানতায় এ-যুগের উপন্যাস-কাহিনীর আব এক চরিত্র-লক্ষণ প্রকাশিত। যে উদার সহানুভূতি এবং মুক্ত নিরাসক্ত দৃষ্টির সন্তান হাশুরস, চতুর্থ আব পঞ্চম দশকে তাকে লালনের অনুকূল পরিবেশ ছিল না। অসঙ্গতিব মাত্রাধিক্যে হাশুরসিকেব প্রায়ের পবিবর্তে সামাজিকেব বিক্ষোভের কারণই বেশি ছিল। ব্যঙ্গের জন্য যে অনুকূল ভূমি তিরিশে বিদ্যমান ছিল, সমসাময়িক জীবনের বন্ধ্যাত্মে সে জীবন সম্পর্কে উদাসীনতায়, ব্যঙ্গরসের প্রস্রবণও শুকিয়ে গেল। পবন্তরাম, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শিবরাম চক্রবর্তী প্রথম মহাযুদ্ধের পরের ও তিরিশের সফল। চল্লিশে-পঞ্চাশে পরিমল গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত প্রয়াস ব্যতীত প্রায় কোনো হাশুরস নেই, কাজেই তার বিকল্পে ভাঁড়ামি বুদ্ধি পেয়েছে—যা আমাদের আলোচনার মধ্যে পড়ে না।

সমস্ত অবস্থাটাই ছিল যেন মেঘাবৃত গুমোট—যেখানে ক্রৈদান্ততাই বেশি।

সে বঙ্ক্যা মেঘে যেমন ঝড়ের ইঙ্গিতও ছিল না, তেমনি হাশ্বেদর বিদ্যুৎস্ফুরণও নেই। মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে ক্ষণকালের জন্য এলোমেলো হাওয়া বয়েছে—তাতে তার চারিত্র ঘোচেনি।

•• তিন ••

এই ভাবে চতুর্থ ও পঞ্চম দশকের বাংলা উপন্যাস-প্রবাহ বয়ে চলেছে। জীবন সম্বন্ধে ঔদাসীনের ফলে বিমূৰ্ত্ত ও বিশৃঙ্খল মানসে নানা বিভ্রান্তি, নানা বিকার যেমন পাঠকদের অ্যাভারেজ চারিত্র, লেখকেরাও তেমনি বহু প্রলোভনের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে কখনও পরাভূত, কখনও ‘জড়োয়া গয়না গায়ে ভ্রান্তির গণিকা’র আশ্বাসে রঙিন গলিতে পদার্পণের বিপদ থেকে বাঁচার জন্য প্রাণপণে প্রয়াসশীল। সেইজন্যই রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের জন্য প্রতীক্ষায় ক্লান্ত মানসে পাঠকের পক্ষে ধৈর্যের আসন পাতাও দুঃসম্ভব, আবার লেখকও সেখানে কী আসন নেবেন সে সম্বন্ধে সাধারণত অস্থিরমতি। তবু জীবনের সম্ভাবনাময় দৃষ্টবে লেখকেরাই খুঁজে ফেরেন, ববং রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজ-নীতির ছাত্রদের চেয়ে এ-দায় তাঁদেরই বেশি। তাবা জানেন—

“বর্তমান যদি কিছুমাত্র সুস্থ হত, তাহলে হয়তো আমাদের স্বপ্ন-প্রয়াণে সামঞ্জস্য থাকত। কিন্তু নানা লোভে ক্রুবতায় আজ আমরা ক্ষত-বিক্ষত। স্বেচ্ছাকৃত অভাবে যুদ্ধে প্রতিষেধা রোগে, অনাবশ্যক মৃত্যুতে আমাদের স্বপ্নগুলিও ছত্রভঙ্গ। তাই একতান ছিন্নভিন্ন অঙ্ককার কলকাতার উচ্চকিত রাস্তায়-গলিতে। কিন্তু জীবন তবু হার মানেন না, তার শিকড় আমাদের মনেব গভীরে, দুর্মর প্রাণ নৈর্যাত্তিক আবেগে নিনিমেষ চোখ মেলে থাকে, উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দেশ, আসন্ন সমাজ কাঁপে চৈতন্যের সম্ভাবনায়, অবশ্যজ্ঞাবিতায় বীজ কম্প নীল অঙ্ককারে বর্ষার ফলার মতো, পাহাড়ের চুড়ার মতন। বিসংবাদের মধ্যেই উজ্জীবনেব সমাধান হৈঁকে যায়...।”

(বিষ্ণু দে)

এখন আমরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কয়েকটি বাংলা উপন্যাসের কথা প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করব। এ-আলোচনা কোনোক্রমেই প্রতিটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের আলোচনা নয়। তার প্রয়োজনও বর্তমান লেখক অনুভব করেন না। যে-কোনো দিক থেকেই হোক, দোষে অথবা সম্ভাবনায় তাৎপৰ্যপূর্ণ—এমন কয়েকটি গ্রন্থের আলোচনা করা হবে।

যুদ্ধ-ভূমি-দেশবিভাগেব ফলে আঘাতপ্রাপ্ত মূল্যবোধেব সম্মুখে অবক্ষয়ের হাত থেকে রেহাই পাবাব জন্য ইতিহাস-ভূগোল আশ্রয়-বাসনা যেমন প্রবল হয়ে উঠল, বাংলা উপন্যাসের টেকনিকেব বিকাশও তেমনি ব্যাহত হল নানাভাবে। জীবনকে খুঁজতে গিয়েই টেকনিকেব উপলব্ধি এবং ভাঙাগড়া। ধূর্জটিপ্রসাদ-গোপাল হালদার যে চিন্তাধারা ও চেতনাস্রোতকে ব্যবহারেব ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিবেশেব কালে—অথবা তাবশঙ্কব, বিভূতিভূষণ, মানিক যে ঔপন্যাসিক কনটেন্টজ্ঞানের পবিচয় দিয়েছিলেন, চতুর্থ-পঞ্চম দশকে ইতিহাস ভূগোলকে আশ্রয় করায় কনটেন্ট এবং টেকনিকেব সে দায় তাঁদেব মানতে হল না। শিল্পীব দিক থেকে সকল ক্ষেত্রে না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ এক শ্রেণীব স্রবিধাবাদেব জনক। এবং সেই স্রবিধাবাদী মনোভাব তখনই প্রকট হয়ে উঠেছে যখন স্থানগত পবিবর্তনেব নাম কবে স্রজন কবা হয়েছে বিস্ময়, পাঠকেব বিমূঢ় অজ্ঞতাকে ভাবা হয়েছে বসসিদ্ধিব সহজ সোপান, যখন কালগত পঞ্চাদপসবণেব নাম করে স্বেচ্ছাবিহাবী নিবন্ধুগতাকে ভাবা হয়েছে কাহিনীগত সাফলোব স্বর্ণ-সডক।

তাই বাংলা সাহিত্যেব পবিধি বা দিগন্তেব বিস্তৃতিও দৃষ্টিপাতেব মতোই আব এক ধবনেব সংবাদ-পিপাসাব—পঙ্কু কৌতূহলেব পরিনিবৃত্তি। কলকাতায় বডো অস্থাস্থ্য, অতএব চলো যাই বায়ু পবিবর্তনে, প্রায় এই সূত্রেব অনুসরণ কবেই যেন ভাবা হয়েছে নগবজীবন বন্ধা, চলো যাই পাহাড়ে পর্বতে দ্বীপে দ্বীপান্তবে। যেন জীবন নামক ব্যাপাবটা কখনো সংসাবে থাকে, কখনো সংসারে থাকেই না, তখন সে থাকে শ্মশানে, অথবা জঙ্গলে। অপবিচিত পবিবেশ, আঞ্চলিক ভাষা লেখককে পাঠকেব কাছে সর্বজ্ঞ কবে তোলে। লেখকও সর্বজ্ঞ হবাব লোভ সংবরণ কবতে না পেবে যথাসম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খ খুঁটিনাটি জ্ঞানেব বিস্তৃত পসবা মেলে ধবেন। ফলে বহু ক্ষেত্রেই উপলক্ষ্য বডো হয়ে লক্ষ্যকে গ্রাস কবেছে, ঔপন্যাসিকেব নিরাসক্তিব ঘটেছে ভরাডুবি।

আবাব ইতিহাসকে আশ্রয় কবে যেখানে সমকালকে পরিহাব কবেছেন লেখকেবা, সেখানেও তাঁবা মনে কবেছেন ইতিহাসের পুঞ্জীভূত তথ্যবাণিব সঙ্গে কাহিনীব চুনবাণি কোনোক্রমে মেশাতে পাবলেই বুঝি উপন্যাসেব প্রাসাদ খাড়া করা যাবে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকেব জীবনযাত্রাব বিবরণকে প্রত্যক্ষ করে তোলাতেই যে উপন্যাসের সার্থকতা নয়—জীবনেব প্রাণস্পন্দন তথা ব্যক্তিব

সংঘাতময় বিকাশকে মুখ্য করে দেখানোতেই যে তার প্রধান পরিচয়, চতুর্থ-পঞ্চম দশকের ইতিহাস-নির্ভর উপন্যাসগুলিতে সে সত্যের সমর্থন খুঁজে পাওয়া হ়কর। এখানেও পাঠকের কোঁতুহল-বৃত্তিকেই পরিচর্যা করা হয়েছে। যখন আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি তখন আমাদের হাতিশাল, ঘোড়াশাল, পালকি, হাওদা, গণিকা, বেড়ালের বিয়ে, পায়রা এবং জড়োয়ার গয়নায় গল্প শুনতে নিদ্রাপিপাসু বালকের মতোই ভালো লেগেছে। সাহেব বিবি গোলাম ও আকাশ-পাতালের জন-অভিনন্দনের মূল কারণ এখানে) গোপাল হালদারের ভূমিকা-জাতীয় উপন্যাসে সাধারণ পাঠকের আসক্তি ছিল না। এর কারণ গোপালবাবু যে পরিমাণে উপন্যাসে ইতিহাস-চেতনাকে ব্যবহার করেছেন, সে পরিমাণে জীবনের রঙ ধরাতে পারেননি।

সাহেব বিবি গোলামের ঐতিহাসিক ক্রটি নিয়ে অনেক আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক ক্রটিগুলিই ঔপন্যাসিক ব্যর্থতার একমাত্র হেতু নয়। যে সামন্ত পরিবারের পতনের কাহিনীকে উপন্যাসের মূল উপজীব্য করা হয়েছে তার মধ্যে কল্পনার অসঙ্গতিই সেই পতনকে বিশ্বাস করে তুলেও তাৎপর্যে অস্থিত করতে পারেনি। ছোট বোয়ের ব্যক্তিগত পরিসমাপ্তি ব্যক্তিত্বের গগুচ্ছন্দে না ঘটে গল্পের বৃত্ত পূর্ণতার তাগিদে ঘটেছে। যন্ত্রণার যে সমস্ত ছোট ছোট ক্ষীণ উৎস এ-উপন্যাসে স্বাভাবিক ভাবেই ছিল, ছোট বোয়ের স্বামীর ওপর অধিকার হারানোর বেদনা, বংশীর ভালবাসা, সকলই স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করতে পারত। জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাব এবং কল্পনার দৈন্ত্য উভয় ক্ষেত্রে কৃত্রিমতার আশ্রয়ী হয়ে ট্রাজেডি এবং মহিমার সন্ধান করেছে। ফলে শালাবাবু দাস মহিমা থেকে বাঁচেনি অথচ শেষ পর্যন্ত প্রেমের উপন্যাসের নায়কও হতে পারেনি। ছোট বো ট্রাজিক মহিমার জন্ম প্রস্তুত কখনই ছিল না, মাঝখান থেকে সে হয়ে দাড়াল করুণার পাত্রী। ঔপন্যাসিকের অসঙ্গতির জন্মই ঐতিহাসিক ক্রটিগুলি অত প্রকট হয়েছে।

গল্প কথনের অসামান্য নৈপুণ্য সত্ত্বেও এই ক্রটি অধিকতর তাৎপর্যহীন হয়েছে তারাকরুর রাধা উপন্যাসে। মোগল আমলের শেষ পাদে বগির হাক্কামা অধ্যুষিত বাংলার ধর্মীয় সাধনার পটভূমিতে লিখিত এই উপন্যাসে যে পরিমাণে চড়া রঙের ব্যবহার সে পরিমাণে কাস্তি নেই। এ-অভিজ্ঞতার রসরূপ নির্মাণে কোন্ বিশিষ্ট বক্তব্য ছোতনা লাভ করল তা স্পষ্ট হয়নি। সাহেব বিবি গোলাম, রাধা প্রমুখ বেশ কিছু সংখ্যক ইতিহাসগত উপন্যাসের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত

শিল্প-সফল, সেটিও এই উপন্যাসগত দৈন্ত থেকে একেবারে মুক্ত নয়। এটি বিভূতিভূষণের ইচ্ছামতী। অক্লেশে এবং অবলীলায় উপাদানের ব্যবহারে, বিধ্বত কালখণ্ডের চিত্রণে, তৎকালীন সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতায় এই উপন্যাসটি এই ধরনের সমুদয় উপন্যাসের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কেরী সাহেবের মুন্সিতে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে প্রমথনাথ বিশী সময়-সমাজ চিত্রণে যে সাফল্য লাভ করেছেন, অল্প আয়াসে বিভূতিভূষণ সে-ক্ষেত্রে সামান্য উপাদানে সে কালকে ফুটিয়েছেন সুন্দর ভাবে। নীলকর সাহেবদের কথা, নীলের নায়েব, নীলচাষীদের বিদ্রোহ, কৌলীন্ড প্রথা, বহুবিবাহ, সে কালের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনাড়ম্বর নিলোভিতায় চিত্রিত হয়েছে। যে নিদ্বন্দ্ব স্নিগ্ধতা বিভূতিভূষণের কবি-ব্যক্তিত্বের প্রধান উপাদান তা যদিও এ-উপন্যাসে পরিণতিকে স্পষ্ট হতে দেয়নি—যদিও নায়কের জীবন যেন শান্তি থেকে অধিকতর প্রশান্তিতে যাত্রাকপে কল্লিত হওয়ায় উপন্যাসের ছন্দের ব্যাঘাত ঘটেছে, তথাপি পাঠক মনেব ওপরে সেই অতীত দিনের আলোকরশ্মি সম্পাতে তিনিই সফলকাম, এ-কথা চতুর্থ ও পঞ্চম দশকের একাধিক অতীতাত্মীয় উপন্যাস পাঠান্তে আমাদের স্বীকাব করতে কোনো বাধা নেই।

এই ধরনের উপন্যাসের সমগ্র কল্পনাব অসঙ্গতিব আর একটি লক্ষণ এই যে গোণের প্রলোভনে মুখ্য প্রায়শই হাবিয়ে যায়। যেমন ছোটখাট খুঁটিনাটির অরণ্যে হাবিয়ে যায় ইতিহাসের সত্য, তেমনি চরিত্র বিশেষের ওপর নির্ভর-আতিশয্যে নষ্ট হয় উপন্যাসের ভারসাম্য। কেরী সাহেবের মুন্সির কাহিনী এই ভাবেই হয়ে ওঠে রেশমির কাহিনী। রেশমির সাফল্যকেই লেখক এবং বহু ক্ষেত্রে সমালোচকেরা উপন্যাসের সাফল্য বলে ভেবেছেন। অথচ এ-কথা আমবা সকলেই জানি যে উপন্যাসে বিশ্লিষ্ট কিছু একক সাফল্যের কোনো মূল্য নেই। বেশমির প্রাধান্য কেরী সাহেবের মুন্সিকে গ্রাস কবে ফেললে যুগচিহ্নিত তাৎপর্যে বাম বসুকে, তাব দ্বন্দ্ব-সংঘাত বাসনা-কামনাকে আর ফুটিয়ে তোলা যায় না। প্রমথবাবু এই সবাপেক্ষা স্থলিখিত উপন্যাসেও যায়নি। নতুন কালের মানুষ হিসাবে রামরাম বসুকে স্থাপিত করতে হলে রামরাম বসুর কীর্তি-বাসনা সত্যিই কীর্তি-বাসনা না স্থবিধাবাদ এ-সম্বন্ধে লেখকের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত থাকা দরকার। রামরাম বসুর মনের সংশয় লেখকেরও সংশয় হলে খণ্ডিত ইতিহাস চেতনা নতুন কালের চরিত্রাক্ষনে ফলপ্রসূ হয় না। রামরাম বসু শ্রোতের মুখে শৈবালের মতো ভাসতে থেকেছে—লেখকের কৌতুকপ্রিয় মন তা দেখে কিছু

রস নিষ্কাশন করেছে বটে কিন্তু যে ঐতিহাসিক তাৎপৰ্যের বসরূপ প্রদানে এ-জাতীয় উপন্যাসেব সিদ্ধিলাভ ঘটে তাব অভাব প্রতিপদেই অনুভূত হয়।

একটা কথা এখানে স্পষ্ট কবে বলা দবকাব। বৰ্তমান সমালোচক এ-কথা মনে কবেন না যে চতুৰ্থ অথবা পঞ্চম দশকে ঐতিহাসিক লক্ষণাক্রান্ত অতীতাত্মীয় উপন্যাসগুলিব অসাফল্যেব হেতু তাৰেব বিষয়বস্তুৰ মধ্যে নিহিত। ঐতিহাসিক কাঠামোয় উপন্যাসেব কাহিনী গাঁথাব বিকল্পে আমাদেব কোনো ফতোয়া নেই। ববৰু জেম্‌স্ সাহেবেব পৰামৰ্শ স্বৰূপে বেখে বলা যায় যে লেখকেব বিষয়বস্তুগত স্বাধীনতা সম্পূৰ্ণ স্বীকাৰ। আমাদেব অনুসন্ধেয় শুধু এই যে বিষয়বস্তুৰ শিল্পময় প্ৰয়োগেব পথ ধৰে তিনি উপন্যাসে কোনো সাৰ্থকতায় পৌঁচেছেন কিনা। এই শেষ, কিন্তু প্ৰধান জিজ্ঞাসাব সামনে বিভূতিভূষণ ছাড়া সকল ঔপন্যাসিকই নীবৰ। বৰাপদবাবুব লালবাঈ-এব বেগবান কাহিনীশ্ৰোত কিংবা গজেন্দ্ৰকুমাৰ মিত্ৰেব কলকাতাব কাছেই উপন্যাসেব মধ্যবিহ্ব ইচ্ছা-পূৰণেব ইতিহাস-লীলা এই উত্তৰহীনতাৰ জগাই তাৎপৰ্যহীন। সে ক্ষেত্ৰে বিভূতিভূষণ নিজস্ব পদ্ধতিতে একটা জীবন বিষয়ক বক্তব্য উপস্থিত হমেছেন। কাল-কালান্তৰ, নবকালেব জন্ম প্ৰমথ ব্যাপাব নিয়ে তাঁব কোনো মাথানাথ নেই। তিনি যুগান্তিক্ৰান্ত মানব-জীবনধাবাকে, ইচ্ছামতীৰ প্ৰতীকে যাব পূৰ্ণ ব্যাখ্যা, ছোট সুখ-দুঃখেৰ ভিতৰ দিয়ে জীবন্ত কবেছেন। উপন্যাসেব শেষাংশেব কৰুণ স্বৰে যে জীবন মুগ্ধতাৰ পৰিচয়—তা নিববচ্ছিন্ন অপৰিমেয় জীবন লীলা সম্বন্ধে পাঠকে যুগপৎ স্নিগ্ধ কবে এবং ব্যাখিত কবে। ভূতকে পিণ্ড দিলে সে মানুষ হয়ে যায়। নীলকব সাহেবদেব উদ্দেশে প্ৰদত্ত দেশীয় প্ৰেমিকাব পুষ্পাঞ্জলি পেয়ে নীলকব সাহেবও এখানে মানুষ হয়ে গেছে। যে দুৰ্বলতায় অধিকাংশ অতীতাত্মীয় উপন্যাস চিহ্নিত এবং ভাবাক্ৰান্ত, ইচ্ছামতী তা থেকে মুক্ত এই জীবনীশক্তিৰ জোৰেই। অন্তদেব ক্ষেত্ৰে এ-দুৰ্বলতাৰ প্ৰধান প্ৰমাণ কাহিনীকে বৰ্ণাঢ্য এবং প্ৰচণ্ড কৌতূহলময় কবে সাজানোব ভিতৰ বিদ্যমান। তাবা মনে কবেন যখন সিপাহী বিদ্ৰোহ সম্বন্ধে কিছু লিখতে হবে তখন বিদ্ৰোহেব তাৎপৰ্যকে কল্পনায় ও মননে ধাবণ না কবে নানা সাহেব বা অনুৰূপ কাৰো সম্বন্ধে অনাবশ্যক কৌতূহলকে ব্যবহাৰ কবাই ইতিহাসগত জীবন-ব্যাখ্যাৰ পৰাকাষ্ঠা। সে-ক্ষেত্ৰে বিভূতিভূষণেব অসামান্য সংযমসিদ্ধ নিৰ্লোভ কাহিনী মানুষেব শাস্ত মূতিকেই একটা সময়খণ্ডেব পটে ধাবণ কবতে পেবেছে।

উপন্যাসের অভিন্ন বিষয়বস্তু নির্বাচনের জন্য অপরিজ্ঞাত-পূর্ব আঞ্চলিক জীবন-যাত্রার সন্ধানে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে ভৌগোলিক বিস্তৃতি-সাধন ঘটল চতুর্থ আর পঞ্চম দশকে। আমরা আবারও বলছি যে এ বিস্তৃতি-সাধনের প্রয়াসে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। বরঞ্চ অভিজ্ঞতাকে সর্বতোচারী কবে তোলার এই প্রচেষ্টা কথাসাহিত্যের স্বাস্থ্যবক্ষাব তাগিদেই প্রয়োজনীয় ছিল। এখানেও বিষয়বস্তুর সার্বিক স্বাধীনতাকে আমরা স্বীকার করি। কিন্তু এখানেও একই সতর্কবাণী উচ্চাৰ্ণ—বিষয়বস্তু নিজে একাকী শিল্পসিদ্ধির নিয়ামক নয়। এ-জাতীয় অধিকাংশ উপন্যাসেই দেখা গেছে অভিনব হবাব প্রাণপণ প্রয়াসে অভিজ্ঞতার প্রদর্শনী সৃজনই যেন লেখকদের উদ্দেশ্য। আঞ্চলিকতা একটা আধার, সেই আধারে ধৃত জীবন-জাহ্নবীর জল লেখক আহরণ করবেন—এমনটাই বাঞ্ছনীয়। যদি দেখা যায় আধারটিকে ঘুবিয়ে ফিবিয়ে সযত্নে অলংকৃত করতে গিয়ে হাবিয়ে বসেছেন সব আধেয়টুকু—তবে তাকে বিডম্বিত প্রয়াস ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ভাবতীয় অলংকারশাস্ত্রে যাকে বিশ্বয় বস বলা হয় তাব সঙ্গে এ-জাতীয় বচনায় ঔপন্যাসিকেবা যে strangeness-কে মূলধন কবে থাকেন তাব কোনো সংযোগ নেই। অথচ পদ্মানদীর মাঝিদের কথায় মানিকবাবু আঞ্চলিক ভাষা, আঞ্চলিক জীবনকে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ কবেও জীবনের গভীর নদীপ্রতিম বহনকে কেমন উদ্ভাসিত কবে তুললেন। আঞ্চলিক-তাকে অতিক্রম কবাই আঞ্চলিক কথাসাহিত্যেব শেষ লক্ষ্য। সে-কথা চতুর্থ-পঞ্চম দশকেব ঔপন্যাসিকেবা মাত্র মৌখিক সূত্রে জানেন। এই বোধেব সম্যক ব্যবহার না ঘটায় মনোজ বসুর বিখ্যাত উপন্যাস জল-জঙ্গল, জল ও জঙ্গলেব বিশ্বাস্ত বাস্তবালেখ্য হিসাবে চমৎকার হয়েও উপন্যাসেব মহিমায় বিশিষ্ট হতে পারেনি। শিল্পীব আন্তরিকতা তাব বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে বসসিদ্ধির পথে নিয়ে যায়। কিন্তু সে-আন্তরিকতা শিল্পীব সদিচ্ছামাত্র নয়। জীবন বহন্রেব গভীর উপলব্ধিতে ও জীবনার্থ সন্ধানের তীব্র প্রেবণায় এবং টানে সে আন্তরিকতাৰ অনিবার্য আবির্ভাব। সে উপলব্ধি যেখানে নেই আন্তরিকতাৰ বিকল্প হিসাবে সেখানে নানা পল্লবগ্রাহিতাব ডাক পড়ে।

আঞ্চলিক জীবন এবং প্রায়ই অন্তাজ জীবন অথবা অপবিচিত্র শ্রমজীবী-জীবনকে অবলম্বন কবে নবীন লেখকদের হাতে যে কটি উপন্যাস লেখা হয়েছে তার মধ্যে আলোচনার যোগ্য বা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস তিনটি—সতীনাথ ভাট্টাভীৰ ঢোঁড়াই

চরিতমানস, অদ্বৈত মল্লবর্মাণের তিতাস একটি নদীর নাম এবং সমরেশ বসুর গল্প। তিনটি উপন্যাসেই লেখকদের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ব্যক্তিগত সাহস অভিজ্ঞতার প্রসারিত রূপের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তিনজনেই ধৃত বিষয়কে এমনভাবে নিঃশেষে ব্যবহার করেছেন যে পাঠান্তে পাঠকের মনে এই ফলশ্রুতির উদয় হয়—এর বেশি কিছু এ-জীবন সম্বন্ধে আমরা আর জানতে পারতাম না। কিন্তু এই তিনটি উপন্যাসেও দেখা যায় যে উপন্যাসের পটকে এঁরা যত চেনেন, পটলগ্ন ব্যক্তির ছন্দকে শেষ পর্যন্ত তেমন নিষ্ঠায় রূপময় করতে পাবেননি। তাই ঢোঁড়াই চরিতমানসের প্রথম খণ্ডের আশ্চর্য বিকাশশীলতা দ্বিতীয় খণ্ডে বাধাগ্রস্ত এবং অবসিত। তাৎমাটুলির প্রাকৃত পরিবেশে বুনো লতার মতো বৃদ্ধি এবং শেষে উন্মূলতা, আমাদের যে ঢোঁড়াইয়ের সমব্যথী করে, দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে অসীম শূন্যতার মুখোমুখি সেই লোকটা শুধু করুণার উদ্বেক কবে গেল। প্রথম খণ্ডের পরে আর তার ব্যক্তিজীবন আমাদের কাছে নবীন বিকাশের কোনো তাৎপর্য সৃষ্টি কবেনি। আগস্ট আন্দোলনের পটে তার নতুন অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এ-কথা সত্য। কিন্তু প্রথম খণ্ডে ঢোঁড়াই চরিতমানস বাংলা সাহিত্যে তুলনারহিত। বৌকাবাওয়া, গান্ধি বাবা, বটহিয়ার গান, রেবণগুণী,—চেতনার প্রাথমিক স্তরে পড়ে রয়েছে এমন একদল মানুষের অতি মন্থর বিবর্তনকে ঢোঁড়াইয়ের আশৈশবের সঙ্গে যুক্ত করা অতীব দুর্লভ—সতীনাথবাবুর শক্তিশালী লেখনী সে কাজে পারঙ্গম ছিল এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বৌকাবাওয়া সতীনাথবাবুর শক্তির স্মারক-চিহ্ন হয়ে থাকবে।

ব্যক্তির বিকাশের এই শর্তকে তিতাস একটি নদীর নামে অনুসরণ করার প্রয়োজন লেখক অন্তর্ভবই করেননি আদর্শে। তিতাসের মন্থর শ্রোতের পাশেপাশে উদাসীন মালোপাড়ার জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু জড়িত জীবিকার ছবিকে কাব্যময় ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন অদ্বৈতবাবু। তিতাসের শ্রোতের মতোই ভাষাতেও এসেছে একটা মৃদু সঙ্গীত—যা জীবনের মৃদু এবং মেদুর, স্থখ এবং দুঃখকে ধ্বনিত করেছে অসীম নীলাকাশের অক্লান্ত নদীর অস্পষ্ট এবং চিরন্তন স্রব কল্লোলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। অথচ ব্যক্তির বিকাশের সূত্রকে লঙ্ঘন করেও তিতাস নদীর মালোদের কাহিনী ডকুমেন্টারি আলেখ্যে রূপান্তরিত হয়নি। বরঞ্চ যা বলা হয়েছে—বইখানি যেন নদীর পাঁচালি হয়ে উঠেছে। লেখক যেন এখানে কোনো ব্যক্তির কাহিনীকে ধারণ করতে চান না। নদীর যেমন বিশেষের প্রতি কোনো পক্ষাপাত নেই, কাহিনীও তেমনি এখানে বিশেষ কিছু

ঘাটে বাঁধা নয়। এখানে স্নিগ্ধ বিষয় জীবনের করুণ শ্রীটুকু পলকে-পলকে মৃতি ধারণ করেছে—এবং কোনো ভাবপ্রবণ অশ্রুর মূল্য সে-কারণ্যকে অমর্যাদা করতে হয় না। উপন্যাস পাঠের ফলশ্রুতি তিতাস একটি নদীর নাম পাঠ করে অবশ্যই মেলে না। সেই পূর্ণবৃত্ত অভিজ্ঞতার সমগ্র রসরূপ এখানে নির্মিত হয়নি, এও ঠিক। কিন্তু জীবনমুগ্ধতাব অক্ষয় সম্পদের একটা সমালোচনা-নিরপেক্ষ শ্রী আছে, সেই সম্পদে বইখানি সম্পন্ন।

গঙ্গা সেই সমগ্রতার সন্ধানে আর-একপদ অগ্রসর রচনা, যদিও তিতাসের শাস্ত্র নিয়তি বা অদৃষ্টবোধজনিত উদাসীন শ্রী থেকে তা বঞ্চিত। কিন্তু এও স্মরণীয় যে সমবেশ বসুর লক্ষ্য তা ছিল না। নদীমূত্রে গ্রথিত অদৃষ্ট তিতাসের কাহিনীতে মূল বোধ হিসাবে কাজ করেছে। নদীর প্রতিকূলতার সঙ্গে জড়িত মৃত্যুবোধ গঙ্গার মূল চেতনা। সমবেশবাবু কাহিনীর শেষার্ধ্বে এই মৃত্যুবোধকে স্তিমিত করে এনেছেন হিমির খাতিরে। যতক্ষণ তা করেননি ততক্ষণ গঙ্গার খরস্রোতের সঙ্গে সেই মৃত্যু-চেতনাকে মিলিয়ে উপন্যাসের ঈঙ্গিত গতিতে শিল্প-সাক্ষ্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক বিলাস সমবেশবাবুর সাহিত্য-জীবনের তো বটেই, চতুর্থ-পঞ্চম দশকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র-সৃষ্টিগুলির মধ্যেও অন্যতম। অভিনব বিষয়বস্তুকে আঁকড়ে ধরার যে-ব্যক্তিগত সাহসিকতায় সমবেশবাবু বর্তমান বাংলা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী তার পরিণত ফসল গঙ্গায়। বিলাসের উপসংহার বিষয়ে আমাদের শিল্পগত আপত্তি সত্ত্বেও এ-কথা ন্যূনাধিক পবিমাণে স্বীকার্য। হিমি বইখানির সর্বাপেক্ষা দুর্বলতম অংশ। তার ভালবাসায় মধ্যবিত্ত নায়িকার ধাঁচ এসে পড়ায় বিলাসের সমুদ্র-যাত্রার ফলশ্রুতি সৃজিত হয়নি। অবশ্য বিলাস সমুদ্রে যেতে না-পারলে, অথচ সমুদ্রের আশ্বান অহরহ তার বুকে বাজতে থাকলে বইখানি জীবনের গভীর তাৎপর্যে আলোকিত হত—শুধু জেলেদেব কাহিনীই হত না। ডিটেল সম্বন্ধে অতি-সতর্কতায় এ-গ্রন্থেও চতুর্থ ও পঞ্চম দশকের পাঠকের সংবাদগত কৌতূহল-বৃত্তিকে তুষ্ট করার প্রবণতা প্রকাশিত। সমবেশবাবু বর্তমান বাংলা সাহিত্যে বৈপরীত্যের এক আশ্চর্য সমাবেশ। হিমিকে দেখলে স্বতঃই মনে হবে সমবেশ বসুব নারীচরিত্র-গুলি একেবারেই কল্পনাসিদ্ধ নয়, একই নারীর বিভিন্ন ধোরফেরকে তিনি বিভিন্ন নামে হাজির করেন, কিন্তু পাঁচুর কথা মনে পড়লেই, বিশেষ তার মৃত্যুর সিচুয়েশন—স্তুপ্তিত হতে হবে লেখকের বাস্তব জ্ঞানে ও তার রূপায়ণের ক্ষমতায়।

গঙ্গা সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক আপত্তিগুলিকে ধামা চাপা না-দিয়েও, যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যের তথাকথিত অভিজ্ঞতার অভিনব উপন্যাসগুলির বিপুল ব্যর্থতার দিকে তাকিয়ে এ-কথা বলতে হয় যে, গঙ্গার ঔপন্যাসিক দৃঢ়তা এ-জাতীয় অন্য উপন্যাসগুলির তুলনায় সিদ্ধির অনেক নিকটতর। ব্যক্তিরূপে বিলাস গঙ্গার ক্ষুরধার পটভূমিকায় আশ্চর্য বীর্যবানরূপে চিত্রিত হওয়ায়, মধ্যবিত্ত পশুতার প্রতিক্রিয়ায় আমাদের ভালবাসাকে গায়তই আকর্ষণ করে। জীবনের চলিষ্ণু মূর্তি, শ্রমে-শ্বেদে-শ্রান্তিতে অপরূপ, কিন্তু আকাজক্ষায় দুর্মর মানুষ—সমরেশ বসু এই ব্যাপারটুকুকেই তাঁর সাহিত্য-জীবনের সম্বল করেছিলেন। এ-সম্বলের মহত্ব কোথায় বিলাসকে দেখলে তা বোঝা যায়। কিন্তু সমরেশবাবু এই বিষয়-গৌরবের কোনো সার্থকতর শিল্পগত প্রমাণ উপন্যাসের ক্ষেত্রে আর দিতে পারেননি। তাঁর অভিজ্ঞতা ও কল্পনার দৈন্য দুইই সমপরিমাণে প্রকট হয়েছে কলকাতাই মধ্যবিত্ত জীবন-ভিত্তিক উপন্যাস ত্রিধারায়। এখানে দেখা যায় যে, যে-সমাজের প্রকৃত চেহারা এবং প্রকৃত সংকট কোনোটিকেই তিনি চেনেন না, তার কতগুলি একান্ত বহিরঙ্গ পরিচয়কেই তিনি সর্বস্ব বলে ভুল কবেছেন। এই গ্রন্থের নায়ক-পরিকল্পনায় গোরা উপন্যাসেব আদর্শ ব্যবহার সে-कारणेই হাস্তকর হয়েছে।

•• ছয় ••

আমরা সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস-বিষয়ক আলোচনার প্রারম্ভে এ-কথা বলেছিলাম যে (সমকালের ঘনময় মূর্তিকে স্বীকার করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুদ্ধ-ভূভিক্ষ-দেশবিভাগে জর্জরিত বাংলা দেশেব অবক্ষয়িত অবস্থাকে ব্যাখ্যা করতে অস্বীকৃত হয়ে স্থানগত এবং কালগত পশ্চাদপসরণ করে বাংলা দেশের উপন্যাসের দুই মূর্তি গড়ে উঠেছে। তার এক মূর্তিতে অতীতাত্মক বাসনা অথবা অপরিস্ফুট-অঞ্চলমুখিনতা। কিন্তু এরই সঙ্গে-সঙ্গে বাংলা উপন্যাসের সমকাল-মুখিনতার প্রবহমান স্রোতটুকুও কম মূল্যহীন নয়। বরঞ্চ বলা যেতে পারে যে সমকাল এবং কলকাতাকে অবলম্বন করে বাঙালী মধ্যবিত্তের জীবনের নতুন স্ফটিকতা এবং জিজ্ঞাসাকে ঝাঁরা উপন্যাসে ব্যবহার করলেন, তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে তিরিশের ধারাবাহী এবং ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। যে-অবক্ষয়, স্থায়ী মূল্যবোধগুলির ভাঙন এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশ্বাসহীনতা বাঙালী মধ্যবিত্তকে যুদ্ধ পরবর্তীকালে জর্জরিত করে ফেলল, এমন কি তার আঘাতে বেদনাবোধ এবং মৃত্যুতে দুঃখবোধ, এ-সবও যখন হারিয়ে যাওয়ার মুখোমুখি, তখন বাঙালী ঔপন্যাসিকদের এক

সংখ্যালঘিষ্ঠ জীবননিষ্ঠ অংশের রচনায় এই অবক্ষয়িত চেহারার প্রতিফলন দেখা গেল।)

চতুর্থ ও পঞ্চম দশকের সমকালীন কলকাতাকে নিয়ে ষাঁরা উপন্যাস লিখেছেন তাঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর এবং মানিকবাবুর কথা ছেড়ে দিলে পৃথক ভাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন বুদ্ধদেব বসু। তাঁর রচিত তিথিডোর উপন্যাসখানি যদিও আমাদের পূর্ব অনুল্লেখ্যে কথিত সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না, তথাপি কলকাতার ছা-পোয়া মধ্যবিত্ত জীবনের যা কিছু গোবব, তার যা কিছু সততা সমস্তের আশ্চর্য পরিবার-কেন্দ্রিক চিত্র তিথিডোর। উপন্যাসটির প্রধান পাত্র-পাত্রীদের বাদ দিয়ে বলা যেতে পারে যে সমগ্র রচনাটি যে ব্যক্তির পরম স্নেহের আলোকে সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে তিনি রাজেনবাবু, নাথিকার পিতা। নির্বন্ধ স্নিগ্ধতার প্রতি বিভূতিভূষণের গ্রায় বুদ্ধদেববাবুবুও পক্ষপাত আছে। তার শিল্প-সার্থক মূর্তি গঠিত হয়েছে রাজেনবাবুর পরিবারকে ঘিরে। স্নেহে প্রেমে পরিপূর্ণ একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে ছন্দোপতনের মতো হারীত এবং বিজন বুদ্ধদেববাবুর উপন্যাস-বিসয়ক চিন্তার দৌলোর নিদর্শন এ-কথা মেনে নিয়েও, এই উপন্যাসকে, যে স্নিগ্ধ দিনগুলি আর একটু পরেই বাংলা দেশ হারিয়ে ফেলল তার শেষ অকৃত্রিম চিহ্ন হিসাবে আমরা মনে রাখব। বিজন এবং বিজনের ব্যবসায়ের বুদ্ধদেব মজুমদার তৎকালীন বাংলা দেশের আসন্ন পতনের পূর্বাভাস। বুদ্ধদেববাবু তাদের চিনতেন না, আমাদের চেনাতেও চাননি, সেটা এ-উপন্যাসের সামগ্রিকতার পক্ষে সঙ্গতই হয়েছে। আর একটি কারণে তিথিডোর উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে ভবিষ্য-প্রভাবী। উপন্যাসটির উপসংহারে শ্রোতাময় চেতনার বাহন হিসাবে যে জয়েসীয় গদ্যরীতির সফল নিরীক্ষা, তা পঞ্চম দশকের বাংলা সাহিত্যের নবীন পরীক্ষাশীলদের কাছে পূর্বসূরী হিসাবে সক্রিয় হয়ে রয়েছে।

কিন্তু কাল যে প্রবল এবং কালবৈগুণ্য যে প্রবলতর তা বোঝা গেল বুদ্ধদেববাবুর নির্জন স্বাক্ষর পাঠ করে। যে আত্যান্তিক বিনষ্টির চেতনা জীবনানন্দকে ক্রমশই করে তুলেছিল ধূসর, সেই হতাশাস অবস্থাকে বুদ্ধদেববাবুর মতো নির্বন্ধ স্নিগ্ধতার উপাসকও যে এড়াতে পারছিলেন না নির্জন স্বাক্ষরে তা স্পষ্ট। নির্জন স্বাক্ষরের মতো ঘোরালো প্লট বুদ্ধদেব বসুর আর একখানি উপন্যাসেরও নেই। বোঝা যায় যে নবাগত জটিলতা তাঁকে স্পর্শ করেছে কিন্তু এও বোঝা যায় যে এ-জটিলতার আহ্বানকে গ্রহণ করার উপযুক্ত পাত্র তিনি নন। তার জন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে বিমল মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র

পর্যন্ত। বিমল মিত্রের ছাই উপন্যাসে যুদ্ধকালীন বিপর্যয়কে ধারণ করার প্রথম প্রয়াস এবং সবিশেষ আন্তরিক প্রয়াস সর্বদা স্মরণীয়। তাঁর বাস্তবকে জানার ব্যগ্রতা যে কত গভীর ছিল এ-বইখানি তার প্রমাণ। আবার জীবনের অবক্ষয় এবং মৃত্যুর ব্যভিচার আমাদের কোন্ পক্ষু অসহায়তার মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বারো ঘর এক উঠোন উপন্যাসখানি তার একটি স্মারক-স্মৃতি। এই উপন্যাসে লেখক তৎকালীন বাংলা দেশের রূপক নির্মাণ করেছিলেন নির্মম দুঃসাহসিকতায় এবং যে-নিরাসক্তি প্রায় নিষ্ঠুরতার সামিল তাকে তিনি প্রজ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মতো জালিয়ে বেখেছিলেন এই উপন্যাসে, যে-অগ্নিকুণ্ডে আমাদের এতদিনের শুনে-রাখা সমস্ত সুন্দর সুকুমার কথাগুলো এবং স্মৃতিগুলো পুড়ে ছাই হয়েছে। কোন্ কলকাতাকে দেখে, কোন্ জীবনের ছিন্নমস্তা মূর্তিকে দেখে, সহ্য করতে না পেরে স্থানগত এবং কালগত পশ্চাদপসরণ শুরু করেছিলেন তৎকালীন বাঙালী সাহিত্যিকেরা, তাকে জানতে গেলে পড়তে হয় বাবো ঘর এক উঠোন। কত আগর! হারিয়েছি বিনা ক্রন্দনে তা যদি কোথাও বলা হয়ে থাকে তবে তা বলা হয়েছে এই একটি উপন্যাসে ও প্রবোধকুমার সান্ত্বালের অঙ্গার নামক ছোট গল্পে। প্রবোধকুমার সান্ত্বাল অঙ্গারে সংযম রাখতে পারেননি। ছোট গল্পের মিত পরিসরেও তিনি অসংযত হয়ে পড়েছিলেন গল্পের উপসংহারে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সে-ক্ষেত্রে নিষ্করণ ও নিষ্পলক দৃষ্টিতে অগ্নি-দাহটিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এবং পরিশেষে ভয়শেষটুকু নেড়ে-চেড়ে দেখিয়েছেন আর কোথাও এক কণা প্রাণাবশেষও বাকি রইল কিনা।

কিন্তু এই বিষয়-চেতনার মধ্যে একটা সংকট আছে। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের উক্ত অবক্ষয়ের চেহারাকে, তার স্বরূপকে ব্যাখ্যা করায় তদ্রূপ লেখক প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় নিজ শিল্পজীবনের একটা চোরাবাঁলি সৃষ্টি করে বসেন। এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসা তাঁদের পক্ষে আর সম্ভব হয় না। মধ্যবিত্ত জীবনের অতলগামী ক্ষয়িতাকে দেখতে দেখতে তাঁরা ভুলে যান, উপন্যাসিকের কাজ অজুর্নের অস্ত্র-পরীক্ষার কালে বিচ্ছিন্ন ভাবে পাখির মাথাটুকুকে দেখামাত্র নয়। সমগ্রকে জানা ব্যতীত উপন্যাসিকের মুক্তি নেই। এবং বাস্তবের দ্বন্দ্বময় স্বরূপকে না উপলব্ধি করা পর্যন্ত সমগ্রকে ধারণ করাও সাধ্যাতীত। তাই জ্যোতিরিন্দ্রবাবু বারো ঘর এক উঠোনের নিঃসংশয়িত লক্ষ্যভেদের পরে অকস্মাৎ দেখেন বিষয়বস্তু যেন নিঃশেষিত। নীল রাত্রি, মীরার ছপুর এবং বারো ঘর এক উঠোনের নামোল্লেখ কালান্তরক্রমিকতা রক্ষার এই জ্ঞান কোনো প্রয়োজন নেই

যে এরা বিষয়-নির্বাচন, কাহিনী নির্মাণ ও বক্তব্য—কোনো বিবর্তনের সাক্ষ্যই বহন করে না। সমগ্র পৌছলে সুখও নেই, দুঃখও নেই। তেমনি কালো অথবা সাদা তার কোনো রঙও নেই। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু যেন সমকালীন জীবনকে নিষ্ঠুরের কালো রঙে ছুপিয়ে দেখাতে চান। তাঁর দৃষ্টি এর ফলে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। মানিকবাবুর মন্ত্র-শিষ্য জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। মানিকবাবুর বিবর্তন তাঁর স্বধর্ম অনুযায়ী হয়নি। কিন্তু বিবর্তনকে রোধ করেও মানিকবাবু উদ্ধার পেতেন না। জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর শিল্পধর্ম নিশ্চয় জীবন-বিষয়ক বক্তব্য থেকেই উৎসারিত হবে। সে-কারণে জীবনের দিকেই তাঁকে তাকাতে হবে বারেকারে। দুঃখের বিষয় এই তাকানোর ব্যাপারটাতে তাঁর ব্যত্যয় আছে। আছে বলেই তাঁর বিবর্তন বিষয়বস্তুর দিক থেকে এগুতে পারল মা। এই ব্যাপার নিজেই যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে বারো ঘর এক উঠানের পর আর তাঁর বক্তব্যগত কোনো গতি নেই তখনই আঙ্গিকের বিচ্ছিন্ন সাধনা তাঁকে পেয়ে বসেছে। এ-আঙ্গিক জীবনোপলব্ধির কোনো অনিবার্য আকর্ষণে উদ্ভূত নয়। বক্তব্যের শূন্যতাকে আচ্ছন্ন করার জন্যই এর জন্ম, কেননা এই আঙ্গিক-সাধনা লেখক অথবা পাঠককে আঙ্গিকরীতিতেই আবদ্ধ করতে চায়। দীপ-শিখার মতো আলোকসম্পাত কবে তা জীবনকে চেনাতে চায় না।

এই ত্রুটি নরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং সন্তোষকুমার ঘোষের শক্তিশালী দুটি উপন্যাস-কীর্তিরও কোনো পরবর্তী বিবর্তন ঘটতে দেয়নি। চেনামহল ও মোমের পুতুল-এ মরণদশাগ্রস্ত কলকাতাই মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তর্দৃষ্টি-দীপ্ত আলোখ্য অঙ্কন করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই যুদ্ধোত্তর জীবনের সকল বিডম্বনা এবং মূল্যবোধের বিনষ্টিকে লেখকেরা দৃঢ় হাতে ধারণ করেছেন এবং নিবাসক্ত মন নিয়ে ধৃত বিষয়কে বিগ্ৰস্ত করেছেন উপন্যাসে। যদিও সন্তোষকুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ন্যায় মনোজ্ঞ নন, তথাপি উঁচুতলার জীবনের ফাঁকিবাজি, জালিয়াতি এবং ধনতান্ত্রিক সমাজের সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মোমের পুতুলের রসরূপ নির্মাণে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। চেনামহলে যদিও মানুষের ঐকান্তিক সংপ্রচেষ্টা যে কিছুতেই পরাভূত নয় তার ইঙ্গিত এখানে-ওখানে ছড়ানো রয়েছে, এবং যদিও সন্তোষকুমারের মোমের পুতুলে সেই ইঙ্গিত একেবারেই অনুপস্থিত তথাপি সন্তোষকুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্র অপেক্ষা অবক্ষয়ের চরিত্র চিত্রণে অনেক বেশি গভীরতর দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু গোয়ালার গলিতে সন্তোষকুমারের পদচিহ্ন ছিল শিথিল। মোমের পুতুল কিন্তু গোয়ালার

গলি অপেক্ষা অগ্রবর্তী পদক্ষেপ নয়, শুধু এখানে তিনি শুরু করে মাটিতে পা বসাতে পেরেছেন এইমাত্র। কিন্তু এই অবক্ষয়ের কদমেই পদক্ষেপকারী লেখকও ডুবে গেলেন অতি সত্ত্বর। নরেন্দ্রনাথ বর্তমানে আন্তরিকভাবে ঔপন্যাসিক প্রয়াস পরিহার করেছেনই বলা চলে। সন্তোষকুমার সে-ক্ষেত্রে নতুন আঙ্গিক-রীতির দ্বারস্থ হয়েছেন বক্তব্যহীন অনাথের মতো। মুখের রেখায় তাঁর ব্যর্থতা বক্তব্যের ব্যর্থতার জন্মই পরিহার করা যায়নি।

সম্ভবত প্রাচীন নায়ক পরিকল্পনা মহাযুদ্ধোত্তর নানা সংঘাতে ক্ষুদ্র মধ্যবিত্ত জীবনে কার্যকরী ছিল না। সেই কারণে যারা ক্ষয়ের বিপুল সর্বনাশা তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধরত মানুষের মুক্তিও এঁকেছেন তাঁরাও পুরাতন ঔপন্যাসিক সংস্থান-রীতিকে পরিহার করে নতুন রীতির অভিমুখী হতে চলেছেন। ননী ভৌমিকের ধূলামাটি এবং বিমল করের দেওয়াল দুইখণ্ড এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ননী ভৌমিকের উপন্যাসের বিষয়বস্তু একটি সংগ্রামী মধ্যবিত্ত পরিবারের কিশোর চেতনার ক্রমবিকাশ। এখানে প্রাচীন নায়ক-পরিকল্পনার কথা ওঠেই না— তিনিও সে প্রয়াস করেননি। বিমল করের দেওয়ালের নায়িকা সূধা কার্যকারণ পরম্পরাতেই এমন স্তমিত এবং নায়ক সূচারু এমন ভূমিকাবিহীন, বিপরীত উদাহরণ হিসাবে সমরেশ বসুর ত্রিধারা উপন্যাসে কর্মবীর নায়ক রাজেনের আতিশয্য এমন হাস্যকর যে এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হতেই হয় যে, সচেতন লেখকদের কাছে এই সময়ে প্রাচীন নায়ক-পরিকল্পনার ঐতিহ্য একটা দারুণ আঘাত পেয়েছে। এই আঘাতের প্রতিক্রিয়াতেই ননী ভৌমিক এবং বিমল করের মতো শক্তিশালী এবং দূরদর্শী লেখকেরা অ-নায়কোচিত নায়ক, সীমিত সময়খণ্ড, চেতন-অচেতনের দ্বৈতাদ্বৈতে ও অন্তর্ভাষণের আলোকে চলিষ্ণু জটিলতাকে ধারণের প্রয়াস প্রভৃতি নবীন নিরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন। ব্যক্তির চেতনাকে ব্যবহার করাই এই নতুন পরীক্ষার মূল কথা। বিমল করের ফাল্গুনের আয়ু, খোয়াই, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় ভুবন, সীমন্ত-নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের তিন প্রহর, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্তর্মনা প্রভৃতি এই বিতর্কিত নবীন নিরীক্ষার নবীন পদচিহ্ন। কিন্তু তা এখনও বিতর্কিত বলেই এবং সে-বিতর্কের মধ্যে বর্তমান গ্রন্থের লেখকও একজন অংশীদার বলেই নতুন প্রতিশ্রুতি-প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থে এখনকার মতো স্থগিত রইল।

অবশ্য এমন কথা কখনই সত্য নয় যে কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবন অবলম্বন করে আদি-অন্ত সমন্বিত উপন্যাস অথবা বাংলা দেশের বিভিন্ন দিকে ছড়ানো বাঙালী জীবন-ভিত্তিক উপন্যাসের সমৃদ্ধ প্রয়াস একেবারেই স্তিমিত হয়ে পড়েছে। অসীম রায়ের একালের কথা ও গোপালদেবের প্রসঙ্গ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বুদ্ধিপ্রধান বাংলা উপন্যাসের ক্ষীণ কিন্তু তীব্র ধারায় তিনি যে শক্তিশালী সংযোজন সে-কথাও বলেছি। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের শিল্পাঞ্চলে অথবা গ্রামে, কলকাতার বাইরে, জীবন যেখানে শত তরঙ্গভঙ্গে, নানা টানে এবং দাক্ষায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে, স্বদেশের সেই সমগ্র পরিচয় স্বভাবতই ঔপন্যাসিকদের কাউকে কাউকে আকর্ষণ করেছে। জাতীয় বেদনা এবং আশা বাসনার সংঘাতময় মূর্তিকে তাঁরা জীবনের মৃত্তিকায় ও অশ্রু-স্নেহের রঙে রচনা করতে উদ্যুক্ত হয়েছেন। গুণময় মাল্লা এবং অমিয়ভূষণ মজুমদার সেই সব বিরল ঔপন্যাসিকদের তুজন। ঔপন্যাসিকের স্বভাব তাঁদের সহজাত। লখিন্দর দিগারে এবং জুনাপুর স্টীলে গুণময়বাবু বাংলা দেশের দুই নবীন ধারা সম্বন্ধে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তাতে এ-কথা বিশ্বাস করা অসঙ্গত হবে না যে, এ-দেশের বৃহৎ অসংগঠিত জনগোষ্ঠী নিয়ে মহাকাব্যোপম উপন্যাস রচনার যোগ্য নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গুণময়বাবুর আছে। তিনি ততটা ব্যাপকতা ও বিশালতাকে বোঝেন ততটা যদি বিশেষের বিশেষ স্তরকে সমগ্রের সঙ্গে সঙ্গতি মিলিয়ে বুঝতে শেখেন তাহলে তাঁর সিদ্ধির গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে। জীবন এবং শিল্প সম্বন্ধে দৃষ্টিসাম্যে আমাদের এ-যুগের ঔপন্যাসিকে বা এখনও অভ্যস্ত হননি বলেই তজ্জনিত অসঙ্গতি থেকে তাঁরা এখনও আত্মরক্ষা করতে পারেন না। বিরাটের দিকে দৃষ্টি যেমন গুণময়বাবুকে বিশেষের সম্বন্ধে মাঝে মাঝে অনবহিত করে তোলে, তেমনি গৌরকিশোর ঘোষের একখানি উপন্যাস, জল পড়ে পাতা নড়ে-তে বিশেষের দিকে অতি-মনোযোগ তাঁকে বিশাল উপন্যাসের পটাকাশের সঙ্গে যুক্ত হতে দেয়নি। গৌরকিশোরবাবুর উপন্যাসটিতে ছোট এপিসোড, দৃশ্য, সিচুয়েশন বিশেষ সার্থকতার সঙ্গে, জীবন সম্বন্ধে স্বাস্থ্যবান সচেতনতায় চিত্রিত হয়েছে, কিন্তু সমগ্রের সঙ্গে অস্থিত হবার পথে বারেবারে তারা হোঁচট খেয়েছে।

সে-ক্ষেত্রে সরল কিন্তু অনাড়ম্বর শক্তিতে উপন্যাসের আকাশ মৃত্তিকায়, প্রান্তরে-প্রান্তরে এক অচ্ছেদ্যতার আবহাওয়া রচনা করতে পারেন অমিয়ভূষণ। তিনিই

বর্তমান কালের একমাত্র তরুণ ঔপন্যাসিক যিনি গ্রামীণ আর্থনীতিক কাঠামোকে তার তাৎপৰ্য্য সমেত বোঝেন। তার নানা স্তরের ভাঙা-গড়ার সঙ্গে ব্যক্তির টানাপোড়েনকে যুক্ত করতে পারেন। অথচ গৌজামিলের সাহায্যে যে কিছু মিলিয়ে দেওয়া যায় না এ-সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান স্পষ্ট। তাঁর গড শ্রীখণ্ড এবং ছুখিয়ার কুঠি, এই দুইখানি উপন্যাসের প্রয়াসগত তারতম্যের মধ্যেও এই সত্যের কোনো হেরফের নেই। গড শ্রীখণ্ড বর্তমান বাংলা কথাসাহিত্যের বহু বিতর্ক-জটিল ও কুতর্ক-কুটিল আকাশে একমাত্র নিঃসংশয় শিল্পসৃষ্টি যা কালোত্তীর্ণ হবার ক্ষমতা রাখে। গড শ্রীখণ্ডে একটি যুগের জাতীয় বেদনা বিপুল ঐকতানে ঝংকৃত হয়েছে। জাতীয় জীবনের একটি চড়ান্ত বেদনাময় মুহূর্তে একটা গোটা সমাজের কথা চিত্রিত হয়েছে এই উপন্যাসে। জীবনের সেই বেদনাকে এই উপন্যাসের সর্বত্র প্রায় হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়। মানুষের জীবনের সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক, ছিন্নমূল হবার পূর্বক্ষণটিতে কোথায় টান পড়ে, কেমন কবে গুঁড়িয়ে যায় বহুকালগত সম্পর্ক—লেখক যেন অপূর্ব নিরভিমান মন নিয়ে সেগুলিকে দেখেছেন, নিবাসক্তির বাজসিংহাসন তাঁর বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি, বেদনায় যখন ছাপিও উয়ল হয়ে যাবার কথা, তখনও। উত্তর বঙ্গের জীবন, কোনো প্রকার আঞ্চলিকতার প্রয়াস ব্যতিবেকেই ধৃত হয়েছে পরম নিশ্চিতিতে ও বিশ্বাসে। সমাজের সর্বস্তরের, বিশেষ উচ্চতলার—মাঠাল মশাইদের মতো মানুষগুলি সম্বন্ধে অমিয়ভষণের জানা-শোনা-দেখা যদি সম্পূর্ণতা পায়, তিনি যদি প্রতিষ্ঠায় শান্ত হয়ে না পড়েন এবং সংহতির দিকে আর একটু অভিনিবিষ্ট হন, তাহলে বাংলা উপন্যাসের একদিকেই দৈন্ত্য তিনি ঘোচাবেন—গড শ্রীখণ্ডে সে ইঙ্গিত ফাঁপন নয়। বাজার-চালু বহু-সংস্করণধন্য অনেক ঔপন্যাসিকই অমিয়ভষণের কাছে ঔপন্যাসিকেব শ্রম, নিষ্ঠা, বিস্তৃতি ও অভিজ্ঞতা বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে পাঠ গ্রহণ করতে পাবেন।

গড শ্রীখণ্ডের পর ছুখিয়ার কুঠির পরিমিত পরিসরে অমিয়ভষণ ভিন্ন ধরনের শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ক্রম-অগ্রসরমান একটি বাজপথের ধাক্কায় একটি গ্রাম ও একটি মেয়ের প্রতিক্রিয়াকে প্রায় প্রতীকে-রূপকে সাজিয়ে ফেলেছেন লেখক। বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও ব্যবহারে শেষ ক্রটি এসেছে জন্ম-মৃত্যুস্তরের পুরাতন কোণলের অবতারণায়। তথাপি উপন্যাসটির প্রথমার্শের ছন্দোগুণ সার্থক শিল্পীর স্বাক্ষরধন্য।

বিমল কর প্রমুখ নতুন নিরীক্ষাশীলেরা এখন নিরীক্ষাশীল। তাঁদের প্রতি আমার

প্রদীপ আছে। ইতোমধ্যে অমিয়ভূষণ মজুমদার, গুণময় মাল্লা এবং অসীম রায়ের মতো ঔপন্যাসিকদের সং শিল্পদায়িত্ববোধকে এলোমেলো নৈরাজ্যের মাঝখানে স্বীকৃতি না দিলে সমালোচক সত্যদ্রষ্ট হবেন।

একশো বছরের ইতিহাস রয়েছে আমাদের উপন্যাস সাহিত্যের। সেই পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথে নানা শৈথিল্য এবং নানা শক্তির পর্যায়ক্রম উপস্থিত ছিল। পশ্চাৎপদতা ও অগ্রচারিতায় তার গতি শুধুই সবল ও ঋজু নয়, নয় শুধুই দুর্বল ও বন্ধিম। কমিষ্ট জীবন ও তন্মিষ্ট জীবনচেতনার সাযুজ্য জাতির জীবনকে যত সমৃদ্ধ করবে—যত লেখকেরা মুক্তি পেতে থাকবেন নিজ নিজ অহমিকার হাত থেকে, অসন্তুষ্টির হাত থেকে, আসক্তির হাত থেকে, যতই তাঁরা অতীতকে ব্যবহার করতে থাকবেন, বর্তমানকে নিংড়ে নিতে পারবেন—ততই তাঁরা রচনা করবেন বাংলা উপন্যাসের ভবিষ্যৎ গৌরবের ভূমিকা। এ-পথে নিষেধ শুধু একটাই—আমরা যেন ফেনিলতাকে কখনও সমুদ্র বলে না ভুল করি, পাতা-বাহারকে না ভাবি অরণ্যের গহনতা।

নির্ঘণ্ট

অ

অকিঞ্চন—২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৭

অগ্রদানী—২৮৭

অঙ্গার—৩৬৩

অচলা—২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬

অচিন্তাকুমার—৭০, ২৬৮, ২৬৯, ২৮২,
৩২১

অজয়া—২৭০, ২৭১, ২৭২

অডিসি—২৪

অডেন—৩২৬

অতিথি—১৭১

অতীন—১৯৬

অদ্বৈত মল্লবর্মণ—৩৪২, ৩৪৮, ৩৫৯

অধিকারী—১২৯

অনঙ্গ ডাক্তার—২৪১

অন্তঃশীলা—৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৮

অন্তর্মনা—৩৬৫

অন্নদা দিদি—২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮,
২৬৪, ২৬৫

অন্নদাশঙ্কর রায়—১৬৪, ২৮৩, ৩২০,
৩২১, ৩২৫, ৩৩০, ৩৩৮, ৩৪০

অন্নপূর্ণা—২৩২, ২৩৩

অপু—২৮৪, ২৮৫, ২৮৬

অপূর্ব—১৬৬, ১৬৭

অভয়ের বিয়ে—২৩০

অভাগীর স্বর্গ—২৫৩

অমরনাথ—১২০, ১২৪, ১২৫, ১২৬,
১৪৩

অমিত—১৬২, ২৮৪, ৩২১, ৩২৩

অমিয় চক্রবর্তী—৩৪৫

অমিয়ভূষণ মজুমদার—৩৪২, ৩৪৭, ৩৪৮,
৩৬৭, ৩৬৮

অযান্ত্রিক—৩১৩

অরক্ষণীয়া—২৪৭

অসাধু সিদ্ধার্থ—২৭০

অসীম রায়—৩৩৯, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৭,
৩৪৮, ৩৫১, ৩৬৬, ৩৬৮

অহিংসা—৩১২

অহীন—২৮৮, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৭

আ

আইভান হো—১৫০

আইরিন ফরসাইট—২২৬, ২২৭

আউটসাইডার—৩৯

আকাশ পাতাল—৩৪৬, ৩৫৫

আত্মশক্তি—২০০

আনন্দময়ী—৩৮, ২০০, ২০১, ২১২,
২১৩, ২২৭, ২৩৪

আনন্দমঠ—১৫৪

আনা কারেনিনা—৩৭, ৩৯, ৪০, ৪১,
৪২, ৪৩, ৬৪, ১৪৬, ১৪৮, ২৩৬,
২৪৩, ২৪৬

আবর্ত—৩৩৩

আয়ান ওয়াট—৯৯

আর্নল্ড্ কেটল্—১৬, ২৪

আরতি—২৯৪, ২৯৫

আর্য্যক—৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫,
৩০৬, ৩০৮, ৩১০

আরোগ্য—৩১২, ৩১৭

আরোগ্য নিকেতন—২৯৪, ২৯৬, ২৯৮

Arnold and Peter—১১২

Art of Fiction—১২

আলালের ঘরের দুলাল—৬৬, ৭৮,

৮৭, ৮৮, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৬,

৯৭, ৯৮, ১০১, ১১৩, ১১৪

আশা—১৬২, ১৭৩, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯,

১৮১, ১৮৬

ই

Ulysses—৯, ১১, ২৩, ৩৯

ইছামতী—৩৪৬, ৩৫০, ৩৫৬, ৩৫৭

ইন্দিরা—৬৩, ৬৫, ৭৮, ১১৩, ১১৪,

১১৫, ১২০, ১৩৪

ইন্দির ঠাকরুণ—৩০৩

ইন্দ্রনাথ—১৬৬, ২৫৬—২৫৯, ২৬৩,

২৬৪, ২৬৫

ইন্দ্র রায়—২৯০, ২৯২, ২৯৭

ইলিয়াড—২৪

ইসাবেল—২১

ইয়ুং—২১

জ

জৈবর গুপ্ত—১১৬

উ

উইলিয়ম কসমো মঙ্কহাউস—৮০

উজ্জয়িনী—৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৯,

৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৮

উত্তম—২৭৮, ২৭৯

উত্তরঙ্গ—৩৪৬, ৩৫০, ৩৫১

উত্তরায়ণ—২৮৮, ২৯০, ২৯৪, ২৯৬

উপনায়ন—২৬৮, ২৬৯, ২৮২, ২৮৩,

৩২২

উপনিবেশ—৩৪০

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—২৩০

উপেন্দ্রনাথ দাস—১৯১

উ

উনপঞ্চাশী—৩৪২

এ

একদা—২৮৫

একালের কথা—৩৪৩, ৩৫১, ৩৬৬

এনড্রু—৫৪, ৫৫

এফিংহাম—৩২৭

এমা বোভারি—৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ২৪৩

এমিল—১২৯

অ্যান্ ইন্ভেন্টিভ এজ—৭৯

An Introduction to the

English Novel—১৬

এরেনবুর্গ—৩১১

এলিয়ট—১০, ২০, ১১২, ৩২৬

এলোকেশী—২৩২

Aspects of Novel—২৪

‘ঐতিহাসিক-উপন্যাস’ (রবীন্দ্রনাথ)

—১৪৯

গুহর অ্যাণ্ড পীস—১১, ৩২, ৩৭, ৫০,

৫১, ৫২, ৫৪, ১৫০, ১৫১, ২০৫

ওড টু নাইটিঙ্গেল - ৩৭

ওডিসি—৩৩৪

ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ—১৮, ৭৯, ৮০, ১১৫,
১১৬, ১১৭, ১২৯

ওয়েলি—৩২৫, ৩২৬, ৩২৮

Walpurgis night—৩২৪

ঐ

ঔরঙ্গজেব—১৫৩, ১৫৪

ক

কন্‌রাড—২১, ৫৮, ২০১

কপালকুণ্ডলা—৬২, ১১৪, ১১৭, ১১৮,
১২১—১৩৩, ১৩৭, ১৫৬, ১৭১, ২৮১

কবি—২৮৭, ২৮৮, ২৯০, ২৯৬, ২৯৭,
২৯৮

কমল (শেখ প্রমথ)—২০১

কমলমণি—১২০, ১৩৪, ১৩৫

কমললতা—২৬৪

করালী—২৮৮, ২৯০, ২৯২, ২৯৩,
২৯৪, ২৯৯

করুণা—৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯২

কলকাতার কাছেই—৩৫৭

কলিঙ্গ—৩২৮

কল্লোল—২৬৮, ২৬৯, ২৮১, ২৮২
২৮৩, ৩২৩

কাদম্বিনী—২৩২

কানাই—২৯৯

কাপালিক—১২৩, ১২৯, ১৩১

কারেনিন—৪১

কার্লাইল—২০০

কালিন্দী—২৮৭, ২৮৮, ২৯৪

কিন্তু গোয়ালার গলি—৩৪৭, ৩৬৪

কিরণময়ী—২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩

কিশোরী—২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬,
২৭৭, ২৭৯

কীটস—৯৪, ১১৬, ২২৯

কীর্তি নিয়োগী—৩১৫

কুটজভ—১৫২, ১৫৩

কুন্দ—৬৩, ৬৪, ১১৮, ১২২, ১২৫,
১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৬৪

কুবের—৩৩, ৩১৬, ৩১৮, ৩১৯

কুমার সাহেব—২৫৯

কুমু—৪৩, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৪৯, ১৬২,
১৬৪, ১৬৮, ১৭০, ১৮৭, ২২৩
—২২৭, ২৩৩, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭

কুসুম—৩১৪

কৃষ্ণদয়াল—২১২, ২১৩

কৃষ্ণকান্তের উইল—৩৭, ৪৫, ৪৬, ৪৮,
১২০, ১২১, ১২৪, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫,
১৪১—১৪৯, ১৭৩, ১৮৪, ২৩৫

কৃষ্ণেন্দ্র—২৯০, ২৯৪, ৩০০

কেরী সাহেবের মুল্লী—৩৫৬

কেষ্ট—৩২২

কৈলাস—৬৫, ১৬৫

কোম্‌তে—১২৪

কোল্‌রিজ—৩০৮

Craft of Fiction—৫০

ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট—২৩, ৩৯,
৪৪

ক্লাভদিয়া—৫১, ৫২, ৫৩

ক্ষুধিত পাষণ—১৭১

খ

খগেনবাবু—২৮৪, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬,
৩৩৮

খোয়াই—৩৬৫

গ

গঙ্গা—৩৪৬, ৩৫১, ৩৫২, ৩৬০, ৩৬১

গজেন্দ্রকুমার মিত্র—৩৪৮, ৩৫৭

গণদেবতা—২৮৬, ২৮৮, ৩১৫

গণনাট্য সংঘ—৩৪৫

গতিহারা জাহ্নবী—২৭৩

গল্পগুচ্ছ—৩০১

গল্‌স্‌ওয়ার্দি—২২৬

গড় শ্রীখণ্ড—৩৬৭

গিরিবালা—১৯০, ১৯৩, ১৯৬, ১৯৮

গুণময় মাল্লা—৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৭, ৩৪৮,
৩৫১, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮

গৃহদাহ—২৩৪, ২৪২—২৪৬

গোকুল নাগ—২৬৮, ২৮২, ৩২২

গোত্রান্তর—৩১৩

গোপাল—৩১৪, ৩১৫

গোপাল হালদার—২৮৩, ২৮৫, ৩৩৬,
৩৪১, ৩৫৪, ৩৫৫

গোপালদেব—৩৫১, ৩৬৬

গোবিন্দলাল—৪৫, ৪৬, ৪৮, ১১৭,
১১৮, ১২১, ১৩৪, ১৩৫, ১৪১—
১৪৮, ১৫৫, ১৬১, ১৬৪, ১৭৩,
১৭৪, ১৮০, ১৮৪, ১৮৫, ২৩৫

গোরা—৩৮, ৬৫, ৭০, ৭১, ৭২, ৯৭,

৯৮, ১৫৯, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪,

১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭০, ১৭১,

১৭২, ১৮৪, ১৮৬—১৮৮, ১৯০,

১৯২, ১৯৪, ১৯৫—২১৫, ২৪৭,

২৪৯, ২৫০, ২৯০, ৩২৩, ৩৩৪, ৩৬১

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য—৩৪২, ৩৪৮

গৌরকিশোর ঘোষ—৩৪৮, ৩৬৬

ঘরে বাইরে—১৬৩, ১৬৯, ২১৫, ২৩৪

চতুষ্কোণ—৩১২, ৩১৩, ৩১৭

চতুরঙ্গ—৭২, ১৬১, ১৬৮, ১৭০, ১৭১,

১৭২, ১৮৭, ২১৬—২২৩, ২৮১,

৩২৩, ৩৩৭

চন্দ্রমুখী—২৭৮

চন্দ্রশেখর—১৫২, ১৫৪, ১৫৭, ২৩৬

চার অধ্যায়—১৯৬

চারুবাবু—২৩০, ২৩১

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—৮৭, ৮৮, ৮৯,
৯০, ৯১

চিহ্ন—৩১২, ৩১৭, ৩৪২, ৩৪৩

চেখভ—১৯৬

চেনামহল—৩৪৭, ৩৬৪

চেস্টারটন—২৬৫

চোখের বালি—১৪৭, ১৫৯, ১৬১,

১৭০, ১৭৩—১৮৬, ১৮৭, ২২৮,

২৩৫, ২৩৮

ছ

“ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ”—১৭১

ছাই—৩৬৩

ছিরে ঘোষ—২৯৪, ২৯৫, ২৯৭

ছোট বোঁঠান—৪৩, ৪৮, ৪৯, ৩৫৫

জ

জগদীশ গুপ্ত—২৬৬—২৭১, ২৭৩, ২৭৪,

২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ৩১৮, ৩১৯,

৩২০, ৩৪০

জগদীশ পান্না—৩০৯

জঙ্গম—২৮৫

জগমোহন—২১৬, ২১৭, ২১৮, ২২২

জন স্টুয়ার্ট মিল—১০৬, ১০৭, ১০৮,

১০৯, ১১০, ১১৫, ১১৬

জর্জ ইলিয়ট—১৯, ২১

জল জঙ্গল—৩৫৮

জল পড়ে পাতা নড়ে—৩৬৬

জয়েস—২১, ২২, ২৩, ৩৯, ১৫৯, ৩৩৬

জাগরী—৩৪২

জাঁ ক্রিস্তফ—৩৭

জীবন মশাই—২৯৮

জীবনানন্দ দাশ—৩০১, ৩৬২

জীবনানন্দ—২৬৫

জুনাপুর ষ্টীল—৩৬৬

জেন অস্টেন—১৯, ২১, ২৩, ৫০,

২৮০, ২৮১

জেবউম্মিসা—৬১, ১৫১—১৫৩

জোড়া দিঘির চৌধুরী পরিবার—৩৩৯

জোলা—২৪, ২৯, ৩০, ১৫৯

জোয়াকিম—৩২৪

জ্যাঠাইমা (পল্লীসমাজ)—২৩৩, ২৩৪,

২৩৮, ২৩৯

জ্যাঠামশাই (চতুরঙ্গ)—২১৬, ২১৭

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়—৩৪৮, ৩৬৫

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী—৩৪২, ৩৪৪, ৩৬২,

৩৬৩, ৩৬৪

ঝড় ও ঝরাপাতা - ৩৪২, ৩৪৩

ট

টমাস মান—২২, ২৫, ৫১, ৫২, ৫৪,

২২৬, ৩২৪

টলস্টয়—১৯, ২০, ২২, ২৫, ৩২, ৩৩,

৪০, ৪১, ৪২, ৪৫, ৫৪, ১৪৮,

১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ২০৫, ২৯৫

টিলিয়ার্ড—২০৫, ২০৬

টুকি—২৭৮, ২৭৯

টুর্গেনিভ—৪৭, ১৯০, ১৯২

ট্রেস—২৯২

Tristram Shandy—৯

ঠ

ঠকচাচা—৯২, ৯৩, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ৯৯,

১০০, ১০১

ঠকচাচী—৯৩, ৯৪, ৯৯

ড

ডন্ কুইকসোট—৩০

ডিকেন্স—১৭, ১৮, ১৯, ২৩, ১০০,

১১৫, ১১৭, ১১৯, ২৬৫

ডিফো—১৫, ১৬, ২৩, ৩০, ৩১, ৪৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৯৯, ১১৩
 ডেভিড কপারফিল্ড—২৩
 দি নাইট এক্সপ্রেস—৮০
 দিবাকর—২৪১
 দীপক চৌধুরী—৩৪৪
 দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—৩৪৭, ৩৪৮, ৩৬৫

ঢ

ঢোঁড়াই চরিত মানস—৩৪৬, ৩৫৮
 ৩৫৯
 দুই বিঘা জমি—১৮৮
 দুগিয়ার কুঠি—৩৬৭
 দুর্গেশনন্দিনী—১১৩, ১১৪, ১২৮, ১৩৭

ত

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—৬৩
 তারাকর—২৮৩ - ৩০০, ৩১২, ৩১৯, ৩২০, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৭, ৩৫০, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৬২
 তারাকরণ—১৩৪
 তারিণী—২৪০, ২৫১
 তিতাস একটি নদীর নাম—৩৪৬, ৩৫৯, ৩৬০
 তিথিডোর—৬১, ২৮২, ৩৫২, ৩৬২
 তিন প্রহর—৩৬৫
 তৃতীয় ভুবন—৩৬৫
 তোরাপ—১৯৪, ১৯৫
 ত্রিধারা—৩৫২, ৩৬১
 তুর্বুন্ধি - ১৮৮, ১৮৯, ১৯০
 দৃষ্টি প্রদীপ - ৩০৩, ৩০৪
 দৃষ্টিপাত—৩৪২, ৩৪৯
 দেওয়াল—৩৬৫
 দেবদাস—২৪৬
 দেবেন্দ্র—১২২, ১২৪, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৪০, ১৪১
 দেবু ঘোষ—২৮৮, ২৯০, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৭, ২৯৮
 দেশে বিদেশে—৩৪২, ৩৪৯
 দে সরকার—৩৩০, ৩৩১
 দেবরু পান্না - ৩০৯, ৩১০
 দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়—৮৭
 দ্বৈরথ—৩৩৯

দ

দরিয়া—১৫১
 দস্তয়েভস্কি - ২০, ২৩, ২৫, ৪৫
 দাস্তে—২০
 দামিনী—১৬৮, ১৮৭, ২১৬—২২৩, ২৩৭
 দামোদরবাবু—২২৯
 দিগম্বরী—২৩২

ধ

✓ দাওতাল সাহ—৩০৪, ৩০৫, ৩০৬
 ✓ ধাতুরিয়া—৩০৪
 ধাত্রী দেবতা—২৮৬, ২৮৮, ২৯০, ৩১৪, ৩৫২
 ✓ ধূর্জটিপ্রসাদ—১৬৪, ২৮৩, ৩৩৩, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৫৪

খুলামাটি - ৩৬৫

ন

নগেন্দ্রনাথ—৬৩, ১২২, ১২৪, ১২৫,
১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯,
১৪১, ১৪২, ১৬১

নটবর—২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৭,
২৭৯

নতুনদা—২৫৫

ননীবালা—২১৮, ২১৯

ননী ভৌমিক—৩৪৭, ৩৪৮, ৩৬৫

নন্দলাল ওয়া—৩০৬

নফর সংকীর্তন—৩০০

নবকুমার—১১৭, ১২৩, ১২৮, ১২৯,
১৩১, ১৩২, ১৩৩

নবাবু বিলাস—৭৫, ৯৩

নবীন—১৬৬

নবীনচন্দ্র—১১৬

নবেন্দু ঘোষ—৩৪১, ৩৪৩

নরেন্দ্রনাথ মিত্র—৩৪২, ৩৫২, ৩৬২,
৩৬৫

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—২৩০, ২৩১

নষ্টনাড়—১৭৩, ২৩৪, ২৩৬, ৩৩৭

নাকছেদী—৩০৪

নাগিনী কথার কাহিনী—২৮৮

নাট্যা—৫১, ৫৪, ৫৫

নাপিত (গোরা)—৬৫, ১৯৯, ২৪৯,
২৫০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—৩৪০, ৩৪১, ৩৪৩

নারায়ণী—২৩২, ২৩৩, ২৬৫

নিকোলাস—৫১, ৫৪

নিখিলেশ—১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৯,
১৭০, ১৮৭, ২১৫, ২১৬, ২২৫

নাগু ঠাকুর—২৮৮

নির্জন স্বাক্ষর—৩৬২

নিতাই—২৯০, ২৯৪ ২৯৮, ২৯৯

নিশাকর—১৪৭, ১৪৮, ১৮২

নীল রাত্রি—৩৬৩

নীলকমল—১৫৭

নীলদর্পণ—৮৬, ১৯১

নীলমাধব—৭৮

নেথলুডফ—২৩, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ২৯০,
২৯৫

নেপোলিয়ন—১৫২, ১৫৩, ১৫৪

Napoleon's Russian

Compaign—১৫৪

নৈবেদ্য—১৯১, ১৯২

নোকাডুবি—১৫৬, ১৬৯

প

পঞ্চাশের পথে—৩৪২

পটলভাঙার পাঁচালি—২৮২

পথিক—২৬৮, ২৮২, ৩২২

পথের দাবি—১৬৬

পথের পাঁচালি—৩৭, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪

পণ্ডিতমশাই—২৪৭ ✓

পদ্মানদীর মাঝি—৩৩, ৩১২, ৩১৩

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—৩৪৪

পরশুরাম—৩৫২

পরিমল গোস্বামী—৩৫২

পরেণবাবু—৩৮, ২০০, ২০১, ২০৪,
২১২, ২১৩, ২১৪
পল্লীসমাজ—২৩৩, ২৪৭, ২৪৮
পশুপতি—১২৬
পাকা—৩১৮, ৩১৯
পাঁক—২৮২
পানুবাবু—২০২, ২১৩
পাসি লাবক—৫০
পিউ—৩২৭, ৩২৮
পিকারেস্ক উপন্যাস—৮৬, ৯৮, ৯৯, ১০০
পিকারো—৯৯
পিটার—৩৩
✓ পিয়ারী বান্ধিজী—২৫৯, ২৬০, ২৬১,
২৬৩
পিয়োর—১৫১
পুতুলনাচের ইতিকথা—৩১২, ৩১৩
পূর্ণেন্দু পত্নী—৩৫১
প্রেমেন্দ্র মিত্র—২৬৯, ২৮২, ৩২১, ৩২২
প্রস্তু—৩৩৪, ৩৩৬
The Portrait of a Lady—২০
প্যারীচাঁদ—৬৮, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪,
৯৫, ৯৬, ১০০, ১০১
প্রতাপ—১১৭, ১১৮, ১২০, ১৫৪,
১৫৫, ১৫৭
প্রতাপাদিত্য চরিত্র—৮৯
প্রফুল্ল রায়—৩৪৮
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—২৩০, ২৩১,
২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭৩, ২০৯
প্রবীর—২৮৮, ২৯০, ২৯৫
প্রবোধকুমার সান্যাল—৩৬৩

প্রমথ চৌধুরী—৩২১
প্রমথনাথ বিশী—৩৩৯, ৩৪২, ৩৪৮,
৩৫৬
প্রাণতোষ ঘটক—৩৪২, ৩৪৮
প্রায়শ্চিত্ত—১৭২
প্রেটো ক্যারাটিয়েভ—১৫১

ফ

ফরসাইট সাগা—২২৬
ফর্স্টার—১৯, ২৪, ৩৭
ফরুসদার—১৯২, ১৯৪, ২৫০
ফসিল—৩১৩
ফানুসের আয়ু—৩৬৫
ফিল্ডিং—১৫, ১৬, ২৩, ৩০, ৬২
ফুলমণি—৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯২
Phases of Fiction—১৫
ফ্রেড—২১, ২৮১, ৩০১
ফ্রান্সিস পালগ্রেভ—১৫০
ফ্রবেয়াব—২০, ২১, ২৪, ৪০, ৪৩

ব

বক্রেখর—৯৫, ৯৬
বকিমচন্দ্র—৫৭, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৮,
৭৬, ৮৩, ৯৫, ১০১—১৫৭, ১৫৯,
১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৪, ১৬৬, ১৭৩,
১৭৫, ১৯২, ২০২, ২৩৫, ২৬৭, ২৮১,
২৮৩, ২৮৪, ২৮৮, ২৮৯, ২৯৪
বঙ্কু—২৬৩, ২৬৪
বনফুল—২৮৪, ২৮৫, ৩৩৯, ৩৪০
বনোয়ারী—২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৯

বনোয়ারীলাল (আব্দুল)—৩০৯

বরদাসুন্দরী—২১২, ২১৩, ২১৪

বরদাবাবু—৯২, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮

বসন্তয়েল—১৪, ১৮

বংশী—৩৫৫

বাজাবভ—৪৭, ১৯৩, ২৯০

বাডেনব্রুকস—২২৬

বাথসেবা—২৯২

বাদল—২৮৪, ৩২০, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪,

৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩৩০,

৩৩২

বাবুবামবাবু—৬৬

বার্ক—৯৪

বাবো ঘব এক উঠোন—৩৪৪, ৩৪৫,

৩৪৭, ৩৬৩

বালজাক—১৯, ২০, ২৩

বায়বন—১১৬

বিজ্ঞান—৬১, ৩৬২

বি টি. বোডেব ধারে—৩৪৬

বিজাসাগব—৭৬, ৮৫, ৮৭, ১০৩, ১০৫,

১০৬, ১১০

বিনয়—৩৮, ৭০, ৭১, ১৫২, ১৬৬, ১৬৭,

২০৮, ২০৯, ২১০, ২১৪

বিহু—২৮২, ২৮৩

বিনোদিনী—১৪৭, ১৬২, ১৭৩—১৮৬,

২২৮, ২৩৫, ২৩৭, ২৩৮, ২৪৬

বিন্দু—২৩৩

বিপাশা—৩০০

বিপ্রদাস—১৬৮

বিপ্রপদ—২৮৭

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—৩৫২

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—২৮৩, ২৮৪,

৩০১—৩১০, ৩১৯, ৩২০, ৩৪০,

৩৫০, ৩৫৪, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৬২

বিমল কর—৩৪২, ৩৪৭, ৩৪৮

বিমল মিত্র—৬৯, ৩৪২, ৩৪৮, ৩৬২,

৩৬৩

বিমল মুখোজ্যে—২৮৮, ২৯০, ২৯২

বিমলা—১৬৯, ১৮৭, ২১৫, ২১৬

বিলাস—৩৫১, ৩৬০, ৩৬১

বিশ্বজ্বর—২৭৮, ২৭৯

বিশ্বজ্বব রায় (তাবাশকব)—২৯২

বিশ্বেশ্বরী—২১২

বিষ্ণু দে—১৬৪, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৫৩

বিষবৃক্ষ—৬৩, ৬৪, ৬৬, ১২২, ১২৪,

১৩৩—১৪১, ২৬৮

বিহাবীলাল (চোথেব বালি)—১৬২,

১৬৬, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২,

১৮৩, ১৮৬, ১৮৭, ২৩৫, ২৩৮

বিহাবীলাল চক্রবর্তী—৭৭, ৭৮, ৮০

বীণা—৩৩০

বুদ্ধদেব বসু—৬১, ৭০, ১৫৯, ১৬৭,

১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ২৬৯, ৩৫২,

৩৬২

বুদ্ধু সিং—৩০৯

বেকটেশ্বর—৩০৪

বেণী ঘোষাল—২৩৩, ২৩৪, ২৩৯, ২৪০,

২৫১, ২৫৩

বেণীবাবু—৯২, ৯৫, ৯৬

বেদে—২৬৮, ২৮১, ২৮২

বৈষ্ণব—১০৪, ১০৭, ১১০, ১১৫,
১১৬

বৌকা বাওয়া রেবণগুণী—৩৫৯

বৌ-ঠাকুরানীর হাট—১৫৯, ১৭৩

বৌরানী—২৩১, ২৭১

ব্রাউনলো—২১৪, ২৫০

‘ব্রাহ্মণ’ (রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ)—১৯৪

Bleak House—১৮

ভ

ভাটমতী—৩০৯, ৩১০

ভার্জিনিয়া উল্ফ—১৫, ৭০

ভারতী—৮৫, ২৩১, ২৩২, ২৩৪

ভাঁড়ু দত্ত—৯৫

ভুবন—২৭৪

ভূমিকা—৩৫৫

ভ্রমস্বি—৪১, ৪২, ১৪৬, ২৩৬

ভ্রমর—৪৩, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯,

৬৫, ১২১, ১৪১—১৪৮, ১৫৫, ১৬১,

১৭৩, ১৮৪, ১৮৫, ২২৭

ম

মজুমদার—৩৬২

মঞ্চী—৩১০

মটুকনাথ—৩০৪

মণিহারী—১৭২

মণীন্দ্রলাল বসু—২৩০, ২৩১

মতি নন্দী—৩৪৮

মতিবিবি—১২৩, ১৩২, ১৩৩

মতিলাল—৯২, ৯৩, ৯৫, ৯৬

৩৭৮

মধুসূদন—৪৫, ৪৬, ৪৯, ১৬৪, ১৮৭,
২২৩—২২৭, ২৩৩, ২৭৫

মধ্যবর্তিনী—২৬৮

মন—৩৪৭

মনোজ বসু—৩৪৮, ৩৫৮

মনোরমা—১১৭, ১২৬, ১৩৩

মম্বস্তর—২৯৯, ৩১২, ৩৪৩

মবারক—১৫১

Moby Dick—৯

মল ফ্রাণ্ডস—৯৯

মহাভারত—২৪

মহাশেতা ভট্টাচার্য—৩৪৮

মহিমচন্দ্র (অন্নদাশঙ্কর)—৩২৯, ৩৩৩

মহিম (গৃহদাহ)—২৪৪, ২৪৫

মহিম (গোরা)—৬৫

মহেন্দ্র (রবীন্দ্রনাথ)—১৬১, ১৬২, ১৭৩

—১৮৬, ১৮৭, ২২৫, ২৩৩

মহেশ—২৫৩

মাইকেল মধুসূদন—৭৬

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—৩৩, ৭২, ২৮৩,

২৯৫, ২৯৬, ৩১১—৩১৯, ৩৪০,

৩৪১, ৩৪৩, ৩৫৪, ৩৫৮, ৩৬২, ৩৬৪

মাদামোয়াজেল ডু মোপঁয়া—১৫৯

মাদাম বোভারি—৩৭, ৩৯, ৪০, ২৩৬,

২৪৬

মাধব চাটুজ্যে—১১৯, ২৪৯

মারউড—৩২৬, ৩২৮

মাসেল—৩৩২

মাসলোভা—৪৪

মিঃ মিকোবর—৩০, ১০১

মিছিল—২৬৮, ২৮২

মিস মেয়ো—৮৮

মিসেস স্যামুয়েলস্—৩২৯

মীরার ছপুর—৩৪৫, ৩৬৩

মুকুন্দরাম—২০

মুখের রেখা—৩৬৫

মুর—১১৬

মৃণাল—১৪৩

মৃণালিনী—১১৪, ১২৩, ১২৬, ১৩৩,
১৩৭

মৃগয়ী—২২৯

মেঘ ও রৌদ্র—১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১,
১৯৭, ২৪৮

মেজদিদি—২৬৫, ৩২২

মেবিয়ন—৩২৬

মেরিডিথ—৭০

মোপার্সা—১০, ৪৩

মোমের পুতুল—৩৪৭, ৩৬৪

মোহানা—৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫

ম্যাজিক মাউণ্টেন—৯, ২২, ৩৯, ৫০,
৫১, ৫২, ৩২৪, ৩২৬

শ্রীমতী ম্যালেন্স—৯০, ৯১, ৯২

য

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—২৭৮

যশোদা—৩১৮, ৩১৯

যাদব—৩১৭, ৩১৯

যুগলপ্রসাদ—৩০৪, ৩০৮, ৩০৯

যুবনাথ—২৮২

যোগানন্দ—৩২৯

যোগাযোগ—৩৯, ৪৫, ৪৮, ১৬১, ১৬২,

১৭০, ১৭১, ২২৩—২২৭, ২৭৩

যোধপুরী—১৫৩

র

রঙ্গলাল—১১৬

রঘুবর প্রসাদ—৩০৭

রজনী—১১৪, ১১৫, ১২০, ১২১, ১২৪,
১২৬, ১৩৪, ১৪৩, ১৫৪

রত্নদীপ—২৩০, ২৩১, ২৭১

রবিন্সন্ ক্রুশো—৩১, ৪৭, ৫৮, ৫৯,
৬০, ৬২

রবীন্দ্রনাথ—৫৭, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮,
৬৯, ৭১, ১৪৯, ১৫০, ১৫২, ১৫৭—

২২৭, ২২৯, ২৩০, ২৩২, ২৩৪,

২৩৬, ২৩৭, ২৪০, ২৪৭, ২৪৮,

২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯,

২৭০, ২৭৬, ২৭৯, ২৮২, ২৮৩,

২৮৪, ২৮৯, ৩০১, ৩০২, ৩২১,

৩২৩, ৩৩৮, ৩৪৬

রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য—১৬৭

রমলা—৩৩৪, ৩৩৬

রমা—২৩৩, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৫১,
২৫২, ২৫৩

রমাপদ চৌধুরী—৩৪২, ৩৪৮,
৩৫৭

রমাপতি—১৯৯, ২৪৯

রমাসুন্দরী—২৩০

রমেশ—২৩৩, ২৩৪, ২৩৯, ২৪০, ২৫১,
২৫২, ২৬৫

রমেশচন্দ্র দত্ত—৬২, ৬৩, ৭৭, ৭৮, ৮০

২৪৭, ২৪৯

রস—৩৫২

রাইকমল—২৮৭

রাখাল—২৩১, ২৭১, ২৭৩

রাজর্ষি—১৫৯, ১৭৩

Rajmohon's Wife—১১৩

রাজলক্ষ্মী (শ্রীকান্ত)—২৪১, ২৫৯, ২৬০

—২৬৪, ২৭৮

রাজলক্ষ্মী (চোখের বালি)—১৭৫, ১৭৬,

১৭৭, ১৮৪, ১৮৫, ২৩৩

রাজসিংহ—৩৭, ১২১, ১২৪, ১২৬,

১৩৫, ১৪৯—১৫৪

✓ রাজু পাঁড়ে—৩০৪

রাজেন—৩৫২, ৩৬৫

রাধা—২৮৮, ৩৪৬, ৩৫৫

রামতনু লাহিড়ী—৯৬

✓ রামদীন—২১১

রামমোহন—৭৬, ৮১, ৮২, ৮৫, ৮৭,

১০৩

রামরাম বসু—৮৯, ৩৫৬

✓ রামেশ্বর—২৯২, ২৯৭

রাসকল্‌নিকফ—৪৩, ৪৪, ৪৫

রাসবিহারী—২৭২

✓ রাসবিহারী সিং—৩০৪, ৩০৬

রাশ্বিন—১১৫

রিনা ব্রাউন—৩০০

রিচার্ডসন—১৫, ১৬, ১১৩

রুশো—১২৯

রেজারেকসন—২৩, ৩৯, ৪৪, ২৯৫

রেশমী—৩৫৬

রোমিও জুলিয়েট—২৩৬

রোহিণী—৪৫, ৪৬, ৪৮, ৬৫, ১২১,

১২৪, ১২৫, ১৩৫, ১৪১—১৪৯,

১৭৩, ১৭৪, ১৮২, ১৮৪, ২৩৫,

২৩৭, ২৩৮, ২৪৬

ল

✓ লখাই—৩৫১

লখিন্দর দিগার—৩৪৩, ৩৫১, ৩৬৬

লঘুগুরু—২৭৮

✓ লুচি—২১১

লবঙ্গলতা—১২০, ১৩৪

লরেন্স—২১, ২২, ২৩

ললিতা—৩৮, ৭০, ৭১, ২০৮, ২০৯,

২১০, ২১২, ২১৩, ২১৪, ৩৩১

লালবান্ধী—৩৫৭

লিপিকা—১৭১

লীলানন্দ—২১৬, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২২

লুসি—১২৯

লুৎফউল্লিসা—১৩১, ১৩৩

লেসলি স্টিফেন—১৬

লোকরহস্য—৭৫

শ

শঙ্কর—২৮৫

শঙ্খবিষ—৩৪৪

শচীশ—১৬২, ১৬৮, ১৭০, ১৮৭, ২১৬

—২২৩, ২৩৭

শরৎ—৭৭, ৭৮

শরৎচন্দ্র—৬৮, ৬৯, ১৭০, ২২৮—২৭০,
২৭৮, ২৭৯, ২৮৩, ২৮৪, ৩২১,
৩২২, ৩২৩, ৩৩৪, ৩৩৭, ৩৪৬,
৩৫২

শরৎ সরোজিনী—১৯১

শশিভূষণ (মেঘ ও রৌদ্র)—১৯০, ১৯২,
১৯৩, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮

শশিভূষণ দাশগুপ্ত—২০৫

শশী—২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৯৫, ২৯৬,
৩১৪, ৩১৫, ৩১৮, ৩১৯

শহরতলী—৩১২, ৩১৭

শার্লট ব্রিটি—৭০

শিবতোষবাবু—২২২, ২১৩

শিবরাম চক্রবর্তী—৩৫২

শিবনাথ—২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৮,
২৯০, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৭,
৩১৪, ৩৫২

শিবনাথ শাস্ত্রী—৯৬

শিলালিপি—৩৪৩

শেক্সপীয়ার—২০, ১২০, ১৩৩, ১৭০,
২২৯, ২৬৫

শেলী—১৮, ৯৪, ১১৬

শেষ প্রশ্ন—২৩৪

শেষের কবিতা—১৭২

শেষের পরিচয়—২৬৬

শ্যামা (বন্ধিমচন্দ্র)—১২৯, ১৩০

শ্যামা (স্বর্ণলতা)—১৫৭

শৈবলিনী—১৫৫

শ্রীকান্ত—১৬৬, ২৫৪, ২৬৪, ২৬৫, ৩২১,
৩২৩

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—১২৬, ১২৮,
১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ২১৬, ২৪০,
২৪১, ২৪৪, ৩৩০

শ্রীনাথ বহরুপী—২৫৬

শ্রীবিলাস—১৬২, ১৬৬, ২১৬, ২২০,
২২২, ২২৩, ২৩৭

শ্রীশ—১২০, ১৩৪, ১৩৫

স

সতীনাথ ভাট্টা—৩৪২, ৩৪৮, ৩৫৮

সতীশ—২৪০, ২৪১

সত্যাসত্য—৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩,
৩২৪, ৩৩০

সন্তোষকুমার ঘোষ—৩৪২, ৩৪৪, ৩৬২,
৩৬৫

সন্দীপ—১৮৭, ২০২, ২১৫, ২১৬

সপ্তপদী—২৯০, ২৯৪

সব্যাসাচী—১৬৬, ১৬৭

সর্বজয়া—৩০৩

সমরেশ বসু—৩৪২, ৩৪৬, ৩৪৮, ৩৫০,
৩৫২, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬৫

সমাচার চন্দ্রিকা—৮৪

সমাচার দর্পণ—৮১, ৮২

সরীসৃপ—৩১২, ৩১৩

সংসার—৬৫, ৭৭

Sign of Four—৯

সাবিত্রী—২৪০, ২৪১, ৩৩৬

সাহিত্যপত্র—২০০

সাহেব-বিবি-গোলাম—৪৩, ৩৪৬, ৩৫৫

সিদ্ধার্থ—২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩

সীতারাম—১১৩, ১১৪, ১১৭, ১১৮,
১২৫, ১৫৪
সীমন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—৩৬৫
স্বকুমার সেন—৯৮, ১৯১
স্বচরিতা—৩৮, ৬৫, ১৬৩, ১৬৪, ২০১,
২০২, ২০৪, ২১২, ২১৩, ২১৪
স্বচাক্র—৩৬৫
স্বধা—৩৬৫
স্বধী—৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৮,
৩২৯, ৩৩১, ৩৩৮
স্বধীন্দ্রনাথ দত্ত—১৬৪, ১৭১, ১৭২, ২৩৫,
৩৩৫
স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—৮৮
স্ববোধ ঘোষ—৩১৩
স্ববোধ সেনগুপ্ত—১১৮, ১৩৩, ১৪৫,
১৪৬, ১৪৭, ১৫২
স্বরবালা—২৪৩
স্বরেশ—২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫,
২৪৬
স্বরেন্দ্র—১৪০, ১৪১
স্বরেন্দ্র বিনোদিনী—১৯১
স্বর্ঘমুখী—৪৬, ১২২, ১৩৫, ১৩৮, ১৩৯,
১৪২, ১৪৩, ১৮৫
সেনদিদি—৩১৪
সৈয়দ মুজতবা আলি—৩৪৯
সোনিয়া (ওঅর অ্যাণ্ড পীস)—৫১,
৫৪, ৫৫
Segur—১৫৪
সোনিয়া (ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্ট)—
৪৪, ৪৫

সোম ফরসাইট—২২৬
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—২৩০
স্কট—১৭, ৬১, ১১৬, ১৫০
স্টাদাল—১৯, ২০, ২৩, ২৫
স্বর্ণলতা—৬৩, ৭৮, ৯৫, ১০১, ১৫৬,
১৫৭
স্বদেশী সমাজ—২০০
স্মলেট—১৫, ১৬

হ

হবলাল—১৪৮
হরকুমার—১৯৩, ১৯৪, ২৪৮
শ্রীহরি ঘোষ—২৯০
হরিমোহিনী—৬৫, ১৬৫, ২০৪
হাওয়ার্ড ফার্স্ট—৩১১
হার্ডি—১৯, ২২, ২৩, ৫৭, ২৮৯, ২৯১,
২৯৩
হান্স কার্টপ—৫১, ৫২, ৫৩, ৩২৪,
৩২৬
হারীত—৩৬২
হান্সলী বাকের উপকথা—২৮৭, ২৮৮,
২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৬, ২৯৭,
২৯৯, ৩৪৭
হিমি—৩৬০
হীরা—৬৩, ১২২, ১২৪, ১২৫, ১৩৪,
১৩৫
হতোম পাঁচার নকশা—৭৫, ৭৮,
৯৩
হেনরি জেমস—১২, ১৯, ২০, ২৬, ৩০,
৩১১, ৩৫৭

হেমচন্দ্র (রমেশচন্দ্র দত্ত)—৭৭, ৭৮

হামনেট—১০

হেমাঙ্গিনী—২৩২

হোসেন মিয়া—৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮

হের সেটেম্‌ব্রিনি—৫১, ৫৩, ৩২৪

৩১৯

- - - - -

